মুক্তপুরুষ
স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রী গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

শ্রীউমাশঙ্কর মজুমদার

মুক্ত পুরুষ
স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রী গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

প্রাচ্য ভারতী * কলিকাতা—৪

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৪
প্রকাশ করেছেন
শ্রীউষারাণী বসু
প্রাচ্য ভারতী
৩৮নং, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪
প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
শ্রীপ্রভাতকুমার কর্ম্মকার
মুদ্রাকর
শ্রীমোদনারায়ণ দাস
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড্
১১৪, ১১৬, বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
ব্লক করেছেন
সিটি আর্ট প্রডাক্‌সন
৪, সরকার বাইলেন,
কলিকাতা—৬
ছবি ও প্রচ্ছদপট ছেপেছেন
মোহন প্রেস
করিস্ চার্চ্চ লেন,
কলিকাতা—৯
প্রুফ দেখেছেন
শ্রীশিশিরকুমার পাল

—প্রাপ্তিস্থান—
বাণী বীথি
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্থলভ সংস্করণ পাঁচ টাকা
শোভন সংস্করণ ছয় টাকা

—অনন্তভাবময় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বকল্যাণাত্মিকা ভাবধারাই বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মময় জীবনে। ···লীলা-সংবরণের পূর্ব্বে 'নরেনের মধ্যে' স্বীয় শক্তি-সঞ্চার ক'রে ঠাকুর ব'লেও ছিলেন তাকে,—"আজ আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে আমি ফকির হ'লাম। এই শক্তিতে তুই জগতে অনেক কাজ ক'রতে পারবি।"—তাই মনে হয়,—স্বামিজীকে না জানলে ঠাকুরকে জানাও ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ অসীম কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ। তাঁর বিরাট ও বিপুল চরিত্র জাতির সম্মুখে এক সুমহান্ আদর্শ! আমার অপটু তুলিকায় এতবড় একটি চরিত্রের রূপ দিয়ে—তাকে রস-সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব কি-না,—তা নিঃসন্দেহেই চিন্তার বিষয়। কিন্তু স্বামিজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধানুরাগ আমাকে সম্ভব-অসম্ভব কিছু চিন্তা ক'রবার অবকাশ দেয়নি।··· দুঃসাহসী পথিকের মত আমি 'পথের সম্বলের' কথা না ভেবেই পথে নেমে পড়েছি। অবশ্য সাহিত্য-সাধনার প্রতি জীবনে একাগ্র নিষ্ঠা এবং সাধনীয় বিষয়ে আন্তরিক সযত্ন প্রয়াস—যদি সম্বল হয়,—তবে তা' আমার আছে। আর আছে,—মূককে যিনি বাচাল করেন,—পঙ্গুও যাঁর কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করতে পারে—তাঁর ভরসা।—এবং সান্ত্বনা এই যে, স্বামিজীও বলেছেন,—প্রচেষ্টা সৎ হলে ওপর থেকে সাহায্য আসে।···

গল্প বা উপন্যাস-রচনার রীতিতে জীবনী-রচনার প্রয়াস আমাদের সাহিত্যে বড় একটা হয়নি। কোন জীবনীকে গল্প বা উপন্যাসের রূপ দেওয়াও অবশ্য নানা কারণে সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব এবং চরিত্রের মর্য্যাদা-রক্ষার দায়িত্বও অনেক সময় অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।···তবু আমার মনে হয়—যথাসম্ভব গল্প ক'রে ব'ললে,—এবং ব'লতে পারলে—বিষয়টি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার পক্ষেই সরল-সহজবোধ্য ও হৃদ্য হ'য়ে ওঠে এবং বর্ণনীয় চরিত্রটিও অধিকতর সুস্পষ্টভাবে—চিত্তের ওপর রেখাপাত করতে পারে।

সেই ধারণায় আমিও স্বামিজীর সমগ্র জীবনের কথা যথাসম্ভব এবং যথাসাধ্য গল্প ক'রে বলবারই চেষ্টা করেছি। অবশ্য রচনার ধারা অব্যাহত রাখতে স্থানবিশেষে আমাকে বাধ্য হ'য়েই একটু স্বাধীনভাবে চলতে হ'য়েছে। তবে কোন চরিত্রের মর্য্যাদা যাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়;—অথবা কোথাও কোন অসঙ্গতি বা বিকৃতি যাতে না ঘটে; আমি সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হ'য়েই চলেছি।···বস্তুতঃ, আমার এ-রচনা বর্ণনাত্মক নয়—প্রকাশাত্মক।—স্বামিজীর জীবন-স্রোত দিনের পর দিন যেদিকে যেভাবে

ক্রম-পরিণতির দিকে বয়ে চলেছে,—আমি সর্ব্বত্র ছায়ার মত তারই অনুসরণ ক'রে চলবার চেষ্টা করেছি এবং তাঁর স্বরূপটি জটিলতা ও অস্পষ্টতা-মুক্ত ক'রে প্রকাশ করতে যেখানে যতটুকু অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন—তার বেশি কোথাও এতটুকু অগ্রসর হইনি। আমার এই বইখানিকে তাই স্বামিজীর জীবনী না ব'লে জীবন-আলেখ্য বা জীবন-চিত্র বলাই হয়ত যুক্তির দিক দিয়ে সমীচীন।

পাছে মূল গল্পের গতি ব্যাহত হয়, অথবা স্বামিজীর আসল রূপটি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়,—সেজন্য আমি তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন বা ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অথবা প্রসঙ্গতঃ অন্য কোন ব্যাপার নিয়েও—কোথাও পাতা জুড়ে—আলোচনা বা বিশ্লেষণ করতে বসিনি।—বস্তুতঃ সে শক্তিও আমার নেই। আর আমার ক্ষেত্রও ঠিক তা' নয়। আমার ভূমিকা কথকের; আমি কথকের কার্য্যই করেছি।

তা'ছাড়া, আমি কোথাও চেষ্টা ক'রে—অথবা বাগাড়ম্বর বা বর্ণনার জোরে স্বামিজীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার হীনপ্রয়াসও করিনি। যাতে আপন চরিত্র-মহিমায় তিনি আপনিই ফুটে উঠ্‌তে পারেন, সর্ব্বত্রই তার সুযোগ রেখে চলেছি। আমার প্রয়াসের মধ্যে স্বামিজীর চরিত্রটি যদি ফুটে উঠবার সুযোগ পেয়েই থাকে,—তাহলে তাঁর আধ্যাত্ম-জীবন, ধর্ম্মমত অথবা স্বদেশ বা স্বজাতি-প্রেমের আস্বাদ থেকেও পাঠক-পাঠিকারা একেবারে বঞ্চিত হবেন না ব'লেই আমি আশা করি। আমার প্রয়াস সফল কি বিফল হয়েছে—তা অবশ্য পাঠক-পাঠিকাগণেরই বিচার্য্য।

পরিশেষে নিবেদন—এই পুস্তক রচনায় আমি সাধারণতঃ যাঁদের বই থেকে অল্প-বিস্তর সাহায্য নিয়েছি, তাঁদের নাম শ্রদ্ধাভরেই পুস্তকের শেষে উল্লেখ করেছি। তা'ছাড়াও, অপর কোন কোন লেখকের রচনার সংস্পর্শে আসার সুযোগও আমার ঘটেছে।—কিন্তু প্রত্যেকের নাম স্মরণ রাখা সম্ভব নয়; তবে—যাঁর রচনা থেকে—আমি যেভাবেই হোক কোন সাহায্য পেয়ে থাকি,—তাঁদের প্রত্যেকেরই নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্তরই হয়েছে। সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা না চেয়ে অন্য পথ নেই। বইখানি তাঁদের অন্তরে কথঞ্চিৎ প্রীতি সঞ্চার করতে পারলেও আমার প্রয়াস সফল হয়েছে মনে করবো।

মেজেডিহী (ওয়ারিয়া)
বর্দ্ধমান

—স্নেহধন্য
গৌরগোপাল



১

"না, আর পারিনে বাপু এই ডাকাত ছেলেকে নিয়ে!"—বিব্রত বিরক্ত হয়ে ব'লে ওঠেন ভুবনেশ্বরী,—"যা গোঁ ধরবে,—তাই করে ছাড়্‌বে। বুকে ভয়-ডরও নেই,—আর মানেও না কাউকে! এ ছেলেকে সাম্‌লাবার সাধ্যি আমার বাপেরও নেই!"

—কতই বা আর বয়স?—বড় জোর তিন বছর। কিন্তু এই তিন বছরের শিশুর উপদ্রবেই বাড়ীর সকলে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। যেমন দুরন্ত—তেম্‌নি দুর্দ্দম! এই ছুটছে—এই পড়্‌ছে—এই ফেল্‌ছে—এই ভাঙ্গ্‌ছে—একে মার্‌ছে—ওকে ধর্‌ছে,—সে এক হুলস্থুল কাণ্ড!

"এই বিলে,"—গর্জ্জে ওঠেন এবার ভুবনেশ্বরী,—"এদিকে আয় বল্‌ছি শীগ্‌গির। ভালয় ভালয় দুধটুকু খেয়ে যা। নইলে আজ সারাটি দিন আর তোকে কিচ্ছু খেতে দেব না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা? কার-ই বা গরজ পড়েছে শুন্‌তে?—সারাদিন তো সারাদিন—দশদিন খেতে না দিলেও যে ওর কিছু ব'য়ে যাবে,—এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না বিলের হাবেভাবে। মায়ের কথা একদম অগ্রাহ্য ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লো সেখানে অনড়-অটল পাথরের মতো।

"এসো মাণিক আমার, এসো!"—গরমের কাজ নয় বুঝে ভুবনেশ্বরী নরম হ'য়ে আসেন,—"সোনা আমার, এসো! দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"—দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যান তিনি ছেলের দিকে। কিন্তু বিলে কি ধরা দেবার ছেলে? মাকে এগিয়ে আস্‌তে দেখে সে ছুটে গিয়ে আরও পঞ্চাশ হাত তফাতে দাঁড়ায়!

মুস্কিলে পড়েন ভুবনেশ্বরী। ছেলে এতক্ষণ যদিও বা কতকটা নাগালের মধ্যে ছিল,—এখন এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—যেখানে ভুবনেশ্বরী তো ভুবনেশ্বরী,—বাড়ীর ঝি-চাকরদের পক্ষেও যাওয়া খুব সুগম নয়।

ভুবনেশ্বরীর মেজাজ তিক্ত হয়ে যায়,—কথায় ঝাঁজ থাক্‌লেও স্বরে যেন কিছুটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। মুখ বিরস ক'রে বলেন—"থাক্ তবে ঐখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে। আজ তোর খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ!"

"কি হ'লো কি, বৌমা?"—সহসা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন এক বর্ষীয়সী নারী। ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি এদিকে মুখ ফেরান,—"এসো মা এসো।"— আপ্যায়নের সুরেই তিনি অভ্যর্থনা করেন বৃদ্ধাকে। তারপর যেন একটু দম নিয়ে বলেন, "আর হবে কি মা?···বিলের পিছু ছুটে ছুটে আমি হিমসিম খেয়ে গেলাম! এত দুরন্ত চঞ্চল একরোখা ছেলে কি আর হয়!— দু'দুটো ঝি রেখেছি শুধু ওকে সাম্‌লাবার জন্যে। কিন্তু তারা সাফ্‌ বলে দিয়েছে,—'খোকাবাবুকে নিয়ে পারব না মা!' ঐ, ঐ দেখুন,—পাছে ধরে ফেলি,—তাই একেবারে আমার ত্রিসীমানা ছেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বর্ষীয়সীর মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে,—"তা আর কি কর্‌বে মা?···দামাল ছেলে যে!···কথায় বলে,—ছেলে হ'লো দামাল তো ঘরদোর সামাল! এ বয়সে তো একটু চঞ্চল হবেই মা!"

"একটু!"—অপার বিস্ময়ে ভুবনেশ্বরী গালে হাত দেন,—চোখদুটো তাঁর বিস্ফারিত হয়ে ওঠে,—বিস্ময়ের সুরেই তিনি বলেন,—"এই যদি হয় একটু মা,—তবে বেশিটা যে আবার কেমন, তা' ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে!··· চার-চারটে মেয়ের পর শিবের কাছে অনেক মাথা খুঁড়ে একটি ছেলে চেয়েছিলাম; স্বপ্নেও দেখেছিলাম, যেন আশুতোষ ছেলে হয়ে আমার কোলে আসছেন। কিন্তু এখন দেখছি, ভূতনাথ নিজে না এসে তাঁর একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে।"

কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে ভুবনেশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে; যেন একটা বিষম ত্রুটি করে ফেলেছেন,—এইভাবে বিবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর চোখমুখ!··· এ স্বপ্নের কথা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও কাউকে জান্‌তে দিতেন না তিনি; কিন্তু আজ বড় তিক্ত-বিরক্ত হয়েই তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়! নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেই মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সাম্‌লে নেন্‌; প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে চলে আসেন অন্য কথায়। বৃদ্ধার মনে কিন্তু কথাটা নিয়ে কোন আলোড়নই জাগে না। হয়ত বা তাঁর মন ছিল তখন অন্যদিকে।

এদিকে কখন যে বিলে চুপি চুপি এসে—অদূরে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশস্তি শুন্‌ছিল,—তা কেউই টের পান নি। মাথায় রেশমের মত নরম একমাথা থোকা থোকা চুল—কয়েকগুচ্ছ তার নেমে এসেছে কপালে। ডাগর ডাগর টানাটানা চোখদুটি দুষ্টামিতে ভরা! কিন্তু সেই দুষ্টামির সঙ্গেই পাশাপাশি ফুটে উঠেছে যেন এক মাধুর্য্যময় অপূর্ব্ব সারল্য! চপল দৃষ্টির চাপল্যরাশি ভেদ ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে এক স্নিগ্ধ স্বচ্ছ গভীরতা। সর্ব্বাঙ্গে মেখেছে ধূলো।

ধূলায় ধূসর সেই সুঠাম গৌরকান্তি দেখে মনে হচ্ছে—যেন শিশু দিগম্বর বিভূতি মেখে দাঁড়িয়ে আছেন নির্ব্বিকার চিত্তে—নির্লিপ্ত মহিমায়!

ছেলের দিকে চেয়ে ভুবনেশ্বরীর অন্তর কি-যেন এক স্বর্গীয় ভাবের আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে! ভাব-সমাহিত মায়ের চোখের কোণে অশ্রু টলটল করে! বাষ্পের ভারে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়! মনে মনে তিনি দেবাদিদেবের চরণে মাথা নোয়ান,—অস্ফূট কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হয়ে ওঠে,—জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর!

সহসা বৃদ্ধার স্বরে তাঁর চমক ভেঙ্গে যায়। বৃদ্ধাও কিছুক্ষণ ধ'রে—বিলের অপরূপ রূপমাধুরীর দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থেকে বলেন,—"তুমি ঘরে চল বৌমা, খোকা এবার নিজেই আস্‌বে। আর তাড়া দিও না!"

ভুবনেশ্বরীও আর কিছুই না ব'লে—নীরবে অগ্রসর হন ঘরের দিকে। একটু পরেই দেখা যায়,—বিলেও ধীরে ধীরে আঙ্গিনা পার হয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সেই চলার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে,—যেন সে নিজেই নিজের প্রভু। তার ইচ্ছে হয়েছে,—যাচ্ছে,—ইচ্ছে না হলে তাকে নিয়ে যেতে পারে কে?

২

ধনে-মানে-যশে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সিমুলিয়ার দত্তবংশ ছিল সেকালে বিশেষ উন্নত,—তার সমৃদ্ধির কথা ফিরতো মুখে মুখে। গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে বিরাট প্রাসাদ, দ্বারে তার প্রহরা দিচ্ছে—পেতলের ঝকঝকে তকমা-আঁটা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দারোয়ান। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগত প্রভৃতির কোলাহলে সেই বিরাট অট্টালিকা সর্ব্বদাই গম্‌গম্‌ করছে! বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, নানা পাল-পার্ব্বণ ব্রতপূজা তো লেগেই আছে।

—বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। তাঁরই উপার্জ্জিত বিপুল অর্থে গড়ে উঠেছিল দত্ত বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি,—তার ধন-সম্পদের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

রামমোহনের পুত্র দুর্গাচরণ দত্তও যথেষ্ট শিক্ষালাভ ক'রে আইন-ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছিলেন। স্বীয় যোগ্যতায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনিও হয়ে উঠেছিলেন ধনে-মানে প্রসার-প্রতিপত্তিতে পিতার মতই উন্নত—পিতার সমানই খ্যাতিমান। কিন্তু তাঁর মর্ম্মকেন্দ্রে ধর্ম্মের প্রতি ছিল এক প্রবল আকর্ষণ—ভোগের চেয়ে

ত্যাগের দিকেই ছিল তাঁর সমধিক অনুরাগ : সজ্জনের সঙ্গ এবং সাধুসেবায় তিনি মনেপ্রাণে আনন্দলাভ কর্‌তেন প্রচুর !

কাজেই ধনৈশ্বর্য্য অথবা সম্মান-খ্যাতির মোহ তাঁকে বেশীদিন সংসারে আট্‌কে রাখ্‌তে পারেনি। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে পরিপূর্ণ যৌবনেই তিনি স্ত্রী এবং একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথের ভার আত্মীয়-স্বজনের হাতে দিয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে পাঁচ-ছয় বৎসর ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে অবশেষে উপনীত হন—বিশ্বেশ্বরের চরণ-ধূলি-পূত বারাণসীধামে।

সন্ন্যাস গ্রহণের বার বছর পরে—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে দুর্গাচরণ একবার জন্মভূমি দর্শন কর্‌তে আসেন। তখন কিন্তু তাঁর পতিব্রতা পত্নী পরলোকগতা হয়েছেন ;—আত্মীয়বর্গ বিশেষভাবেই চেষ্টা করেন পুনরায় তাঁকে সংসারে আবদ্ধ কর্‌তে। কিন্তু পরমার্থিক সুধারস-পানে চিত্ত যাঁর বিভোর হয়েছে,—যিনি পেয়েছেন দিব্যলোকের সন্ধান,— তাঁকে পথভ্রষ্ট করা কি এতই সোজা ? দুর্গাচরণ সকল বাধা কেটে— আবার বেরিয়ে পড়েন তাঁর সাধনার পথে।—সিদ্ধি-কামনায়।

যাবার আগে ক্ষণিকের শুভদৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর সংসার-জীবনের পরম প্রতীক—পুত্র বিশ্বনাথকেও অভিসিঞ্চিত ক'রে যান আশীর্ব্বাদ-ধারায়। ভগবানের দেওয়া নির্ম্মল কোমল কুসুম-কোরকটি তিনি ভগবানের চরণেই সমর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করেন চিরদিনের মতো। তারপর তাঁর আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি কোনো দিন।...

৩

মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি কৃতবিদ্য হ'য়ে আইন-ব্যবসায়ে ব্রতী হন। এটর্নির কাজ সুরু করেন কলিকাতা হাইকোর্টে। কর্ম্মজীবনে পিতৃ-পিতামহের পন্থাই অনুসরণ করেন তিনি।

নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় যার গভীর,— যিনি উদ্যোগী এবং উদ্যমী—ঐশ্বর্য্যের দেবী তাঁকেই বরণ করেন জয়মাল্য দিয়ে। উদ্যোগী এবং দৃঢ়চিত্ত বিশ্বনাথ অচিরেই আইন-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন প্রচুর। গভীর আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর নাম মফঃস্বলেও ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। ফলে অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হয়ে যায় তাঁর।

শুধু ব্যবহার-শাস্ত্রেই নয়, কাব্য-ইতিহাসাদি অন্যান্য বিষয়েও তাঁর অনুরাগ এবং অভিজ্ঞতা ছিল প্রগাঢ়। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নানা দেশের—বিভিন্ন

জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং উত্থান-পতনের ধারা তিনি লক্ষ্য করতেন একাগ্রচিত্তে। শহরের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত লোকের সমাগমে তাঁর বৈঠকখানা-গৃহটি জ্ঞানবিদ্যা-চর্চ্চার একটি কেন্দ্র হয়েই উঠেছিল।

তাঁর জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল উন্নত-উদার এবং যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ, আবার তার চেয়েও সংস্কার-বর্জ্জিত। দেশভ্রমণের সখ থাকায় নানাস্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেশামেশির ফলে বিশেষ কোন গোঁড়ামিও ছিল না তাঁর মধ্যে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলে লাহোর-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মুসলমান-বহুল স্থানে কিছুদিন বাস করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর আচার-ব্যবহারে ইস্‌লামী ভাবধারার সংমিশ্রণও ঘটেছিল অল্পবিস্তর। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন কতকটা বাইবেল এবং পুণ্যচরিত ঈশার অনুগামী।

তিনি অর্থার্জ্জনও করতেন যেমন বিপুল,—দু' হাত দিয়ে মুক্তপ্রাণে খরচও করতেন তেম্‌নি প্রচুর।

খাও, দাও, আনন্দ কর, হেসে খেলে দিন কাটাও! নিজে সুখে থাক,—পরকে সুখী কর,—এই ছিল তাঁর অন্তরের বাণী। স্ত্রীপুত্রাদি পাঁচজনকে নিয়ে যখন সংসার বেঁধেছ—তখন সংসারের যেটুকু আনন্দ - যতটুকু শান্তি,—যতটুকু সুখ আহরণ করতে পারো, করে নাও। জীবনকে দুঃখকষ্ট দিয়ে কি লাভ? সাধ-আকাঙ্ক্ষা যদি না-ই মিটলো—তবে আর অর্থের কি দরকার? নিজে চোখের জল ফেলো না,—পরের চোখের জলও মুছে দিতে ছুটে যাও অকাতরে। জীবনকে ভোগ কর পূর্ণভাবে,—কিন্তু ত্যাগের কথাটাও ভুলো না!···

মোট কথা, তিনি জীবন কাটাতেন রাজার হালে। তাঁর সকল জিনিষই ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাঁর সুপরিসর-সুসজ্জিত বৈঠকখানা-গৃহটিতে আসবাবপত্র যেন ধর্‌তো না। আস্তাবলে গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেতো! পিতৃ-পিতামহের কীর্ত্তিও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখে চল্‌তেন সর্ব্বতোভাবে।

৪

বিশ্বনাথের সহধর্ম্মিণী পুণ্যশীলা ভুবনেশ্বরীও ছিলেন স্বামীর মতোই উদার,—স্বামীর মতোই পরদুঃখে কাতর এবং চাল-চলনে স্বামীর মতোই উন্নত এবং সুরুচিসম্পন্না। তিনি ছিলেন একাধারে রূপীয়সী ও গুণবতী। যে সকল গুণ-গরিমা নারীকে মহীয়সীর পর্য্যায়ে উন্নীত করে, তার কোনটিরই অভাব ছিল না ভুবনেশ্বরীর মধ্যে। রাজেন্দ্রানীর মহিমায় তিনি যখন সংসারে ঘুরে বেড়াতেন,

তখন তাঁকে দেখে দেবীদর্শনের মত বিপুল শ্রদ্ধাই জেগে উঠ্‌তো সকলের অন্তরে। আত্মমর্য্যাদাশীলা সদাপ্রফুল্ল তেজস্বিনী এই নারী অন্যের সহিত ব্যবহারেও ছিলেন একান্ত সরল, মধুর এবং পরম অমায়িক।

—কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মনপ্রাণ ছিল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই গভীরভাবে নিবদ্ধ। দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। গৃহে যে শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—তিনি নিত্য অখণ্ড নিষ্ঠায়—অশেষ ভক্তিভরে তাঁর পূজার্চ্চনা করতেন। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু পুরাণগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ কর্‌তেন তিনি নিত্য-নিয়মিতভাবেই।

উদার-সুখী দম্পতি। কিন্তু সর্ব্বসুখ এবং আনন্দের মধ্যেও একটি দুঃখ প্রায় সব সময়ই আলোড়ন তুল্‌তো তাঁদের অন্তরে। ভগবান তাঁদের চারটি কন্যা দিয়েছিলেন বটে,—কিন্তু পুত্রমুখদর্শনে তাঁরা ছিলেন এ পর্য্যন্ত বঞ্চিত। আবার চারটি কন্যার মধ্যে নিতান্ত অল্প বয়সেই দুটি কন্যা তাঁদের ছেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য দৃঢ়চিত্ত পুরুষ বিশ্বনাথ কাজে-কর্ম্মে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মেলামেশায়,—কন্যাবিয়োগ এবং পুত্রের অভাব-জনিত ব্যথা অনেকটা ভুলে থাকতেন: কিন্তু ভুবনেশ্বরী—হাজার হোক কোমল-হৃদয়া নারী—তাঁর শোকতপ্ত মাতৃপ্রাণের গভীর কামনা অবিরতই তাঁকে অধীর ক'রে তুলতো একটি পুত্রের জন্য।

তাই প্রতিদিন পূজার্চ্চনার সময় তিনি তাঁর আরাধ্য দেবাদিদেব শিবের কাছে একটি পুত্রের জন্য জানাতেন ঐকান্তিক কামনা। প্রার্থনা কর্‌তে করতে তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো অজস্রধারে। সমগ্র চিত্ত তন্ময় হয়ে যেতো শিবের ধ্যানে। সেই রজতগিরিনিভদেহ—প্রশান্ত-সৌম্যমূর্ত্তি মহিমময় দেবতার চরণে—তাঁর অন্তরের আকুল কামনা প্রগাঢ় ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে লুটিয়ে পড়্‌তো অর্ঘ্যরূপে। কাশীধামেও বীরেশ্বর শিবের কাছে তিনি একটি পুত্রের জন্য মানত করেছিলেন তাঁর এক কাশীবাসিনী আত্মীয়ার সঙ্গে পত্রের দ্বারা যোগ সাধন ক'রে।

এত গভীর—এমন ঐকান্তিক প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয়,—তবে দেবতার মাহাত্ম্য আর থাকে কোথায়?

একদিন শিবপূজার পর ভুবনেশ্বরী ধ্যানে নিমগ্না—শরীর উপবাসী ও ক্লান্ত; মনও উপবাসের প্রভাবে হয়েছে স্বচ্ছন্দ-সহজ এবং এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ। শীর্ণশান্ত মূর্ত্তি হয়েছে যেন কোন্ স্বর্গীয় পুণ্যালোকে দীপ্ত! উপ অর্থাৎ সান্নিধ্যে (ভগবানের) বাস,—তাই 'উপবাসে' মন যে তদ্গত হবে,—

সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?—তন্ময় হয়ে উঠেছিল ভুবনেশ্বরীর পবিত্র বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়—দেবাদিদেব শিবের ধ্যানে। মনের সর্ব্বত্র যেন আশুতোষ বিরাজ করছিলেন নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রে অপার মহিমায় !

এই অবস্থায়—এই বাহ্যজ্ঞানহীন আন্তর চেতনায় ভুবনেশ্বরীর সারাদিন কেটে গেল শিবের মন্দিরে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল।—ক্রমে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন ভুবনেশ্বরী।

কেউ কেউ বলেন, জাগ্রত অবস্থায় মন যে সকল চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, —অন্তরের গভীরে যে সকল কামনা মুহুর্মুহু প্রাণকে ক'রে তোলে অধীর— ঘুমের ঘোরে মানুষের অবচেতন মনের মধ্যে জেগে ওঠে তারই প্রতিক্রিয়া। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে—মানুষ দেবাদেশ লাভ করে— অথবা তার জীবনে যা একদিন প্রকৃত সত্য হয়ে দেখা দেবে—তারই ছায়া দেখা যায় স্বপ্নের মধ্যে।

সে যাই হোক্‌,—নিদ্রার ঘোরে সহসা স্বপ্ন দেখ্‌লেন ভুবনেশ্বরী : যেন তুষারশুভ্র-বিমলকান্তি, শিরে দীর্ঘ জটাজুট—ভস্মভূষিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ—চক্ষে বরাভয়,—ওষ্ঠে অমৃতমধুর প্রাণজুড়ানো প্রশান্ত হাসি—ভোলানাথ শিশুরূপে তাঁর ক্রোড়ে আস্‌ছেন—আর ভুবনেশ্বরী পরম আগ্রহে—প্রাণের ঐকান্তিক কামনার আকুলতায়—দুই ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে তাঁকে বুকে তুল্‌তে যাচ্ছেন— অম্‌নি ঘুম ভেঙ্গে গেল ভুবনেশ্বরীর। চারিদিকে চাইলেন তিনি আকুল দৃষ্টিতে।… দিব্য স্বপনের মধুর রেশ তখনো তাঁর শিরা-উপশিরায় অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিবিড়তায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ছে—তাঁর চিত্তের সর্ব্বত্র জুড়ে জেগে উঠ্‌ছে বিপুল শিহরণ ! কার যেন অভয়বাণী দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় প্রবেশ কর্‌ছে তাঁর অন্তঃকর্ণে ; প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তিনি অনুভব কর্‌ছেন—যেন কার প্রাণারাম দেহ-সৌরভ !—

চমকভাঙ্গতেই ভুবনেশ্বরীর আবেগময় কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—শিব-শিব-শিব ! —ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন,—একি—স্বপ্ন ? —না, সেই মহাযোগী শিবময় দেবতার অপার করুণারূপে প্রকৃত সত্যেরই প্রকাশ ? ভুবনেশ্বরীর চিত্ত সমস্ত রাত্রিই বিভোর হয়ে থাক্‌লো—সেই আশা আশ্বাসময় অপূর্ব্ব স্বপনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তায়।

৫

স্বপ্নদর্শনের কয়েক মাস পরেই একদিন সকলের উদ্বেগ ও আনন্দের মধ্যে ভুবনেশ্বরী প্রসব করলেন এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র।—এতদিন যে তাঁর

অঙ্গে অঙ্গে মর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতি অণু-পরমাণুতে—চিত্তের ঐকান্তিক আকুল কামনায় মিশিয়েছিল,—আজ শিশুর রূপ ধরে সেই-ই নেমে এলো তাঁর বুভুক্ষিত অঙ্কের স্বর্ণ-সিংহাসনে।

সেদিন পৌষমাস, মকর সংক্রান্তি, কৃষ্ণাসপ্তমী—পিষ্টকপার্ব্বণের মহাধুমধাম! বাংলার ঘরে ঘরে নূতন ধান্যের সমারোহে উথ্‌লে উঠ্‌ছে যেন কমলার অজস্র বক্ষপীযুষ-ধারা,—চারিদিকে এক নবীন উৎসাহ-আনন্দের অপরূপ বিকাশ—তারই মাঝে মঙ্গলশঙ্খের ঘনরোলের মধ্যে বিশ্বনাথ দত্তের গৃহে জন্ম নিল এক শিশু,—হয়ত দেব-শিশুই!

সেই শুভদিন—ইংরাজি ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী—সেই অবিস্মরণীয় দিনটিকে বাঙালী—আর শুধু বাঙালী কেন,—সমগ্র ভারত এমন কি নিখিল বিশ্বও কি ভুলতে পারবে কোনদিন?—পাষাণের বুকে গভীরভাবে ক্ষোদিত যুগযুগান্তস্থায়ী শিলালিপির মত সেদিনের শুভ্র-পুণ্য স্মৃতি যে মহাকালের বুকে অনন্ত কালের জন্য চিরসমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে!

কে জান্‌তো সেদিন,—আজ ভুবনেশ্বরীর প্রাণ-মন নব আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে ভূমিষ্ঠ হ'লো যে শিশু,—ভাবীকালের বুকে সেই শিশুই একদিন প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌বে—ভারতীয় সাধনার—ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারীরূপে? কে জান্‌তো, সেই শিশুই একদিন জলদমন্দ্রস্বরে বিশ্ববাসীকে ডেকে শোনাবে—ভারতের মর্ম্মকেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত প্রাচীন ঋষিকণ্ঠ-নিঃসৃত শাশ্বতকালের সেই মহাবাণী,—তমসো মা জ্যোতির্গময়! কে জান্‌তো,—এই বীজরূপী শিশুই একদিন মহা-মহীরুহরূপে বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে অসংখ্য তাপিতজনকে দান কর্‌বে শান্তিদায়িনী সুশীতল ছায়া,—প্রতিষ্ঠা কর্‌বে—ভ্রান্ত সংস্কারের প্রভাবে জীর্ণ-পুরাতন- ভাঙাচোরা সমাজের বুকে—সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে গরিমা-দীপ্ত এক অভিনব রূপে?

সদ্যোজাত সুকুমার শিশুর সুঠাম আকৃতির দিকে চেয়ে সকলেরই মনে জেগে উঠলো পরম বিস্ময়। শিশু হুবহু তার পিতামহ সন্ন্যাসী দুর্গাচরণের মত হয়েছে দেখ্‌তে। সেই মুখ—সেই চোখ—সেই রঙ—এমন সাদৃশ্য আর দেখা যায় না! যেন দুর্গাচরণই তাঁর বহুদিনের পরিত্যক্ত গৃহ-প্রাঙ্গণে কোন এক মায়াবেশে অথবা কি এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফিরে এসেছেন শিশুরূপে! তাই শিশুর নামকরণের দিন অনেকে বল্‌লেন,—"খোকা যখন তাঁর ঠাকুরদা'র মতই হয়েছে,—তখন ওর নাম থাক—দুর্গাদাস।"

আপত্তি কি?—অন্যান্য সকলেও সায় দিলেন সে কথায়। কিন্তু ভুবনেশ্বরী বল্‌লেন,—না, ওর নাম থাক বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর শিবের কাছে মানত করেছিলেন ভুবনেশ্বরী পুত্রের জন্য। তাই তাঁর অন্তরের নিভৃতে সহসা জেগে উঠ্‌লো বুঝি এই প্রেরণা। আত্মীয়-স্বজনরা এ-নামেও আপত্তি করবার কোন কারণ দেখ্‌লেন না,—বল্‌লেন,—তাই থাক্।

কিন্তু ওতো হ'লো ডাকনাম: একটা মুখভরা শ্রুতি-মধুর ভাল নাম তো চাই?—নামেরও তো একটা প্রভাব আছে! এবং সেই প্রভাব মানুষের প্রতিষ্ঠার পথেও তো বড় কম সাহায্য করে না! গোলাপের নাম যদি হ'তো ভেরেণ্ডা—তাহলে হয়ত—সে তার অপূর্ব্ব কমনীয় শোভা এবং প্রাণ-মাতানো সৌরভ নিয়েও কতকটা নীচের ধাপে নেমে যেতো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম যদি রাখা হতো—'পটলচন্দ্র',—তবে হয়ত ঐ নামের জন্যেই কবির বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ব্যাহত হয়ে যেতো বহুল পরিমাণে।

কাজেই এমন একটা নাম রাখতেই হবে,—যা ভাবীকালের বুকে এই শিশুর প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে—শিশুর পরিচয় বা প্রতিষ্ঠার সোপান গড়ে তুল্‌তে—যে নামের মধ্যে থাক্‌বে—একটি জনগণমনজয়ী চিত্তাকর্ষী প্রভাব। কথাটা কেউই পারলেন না অগ্রাহ্য করতে। অবশেষে অন্নপ্রাশনের দিনে সকলের সম্মতিক্রমে শিশুর অভিধেয় নাম স্থির হলো,—'নরেন্দ্রনাথ'।

কিন্তু পোশাকী সাজ-পোশাকের মত পোশাকী নাম নরেন্দ্রনাথ এখন তোলাই থাক্‌লো। তাকে চাপা দিয়ে বীরেশ্বরই অধিকার করলে এখন নামের আসন,—বীরেশ্বরও শেষ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাক্‌তে পারলো না: বীরেশ্বর থেকে 'বীরে' হতে হতে শেষকালে তা দাঁড়ালো এসে 'বিলে'তে। আর এই বিলেকে যখন কোনমতেই বিকৃত করা সম্ভব হলো না,—তখন শিশুর বিলে নামটাই সুপরিচিত হয়ে উঠ্‌লো সকলের কাছে।…

৬

বিলের দুরন্তপনা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চল্‌লো,—ভুবনেশ্বরীর কানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগও আস্‌তে লাগ্‌লো নানা দিক থেকে। কি যে করবেন ভুবনেশ্বরী কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেন না। দুর্দ্দান্ত ছেলের প্রবল দাপটে তাঁরও মাথা যেন ঘুলিয়ে গেছে! এদিকে বিলের উর্ব্বর মস্তিষ্ক নিত্যনূতন এমন সব উপদ্রব-দৌরাত্ম্যের উদ্ভাবন কর্‌তে লাগ্‌লো,—যা কল্পনা করতে অনেক পাকা মাথাও হার মেনে যায়!

অত্যন্ত জ্বালাতন করলে কেউ যদি বিলেকে শাসন করতে যায়,—তবে ত উল্‌টো বিপদ! বিলে এমন কাণ্ড সুরু করে,—যার জন্যে শাসনকারীকে মনে মনে শপথ করতে হয়,—আর কোনদিন ভুলেও যাবে না ওকে শাসন করতে।

একদিন তো বিলের দৌরাত্ম্য একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। ধমক দিয়ে—চোখ রাঙিয়ে,—আদর করে, ভালবেসে,—এবং আরও নানা রকম চেষ্টা করেও ভুবনেশ্বরী কোনমতেই থামাতে পারেন না তাকে। উপরন্তু ইন্ধনপ্রাপ্ত আগুনের মত তার দৌরাত্ম্যের মাত্রা গেল আরও বেড়ে। ভুবনেশ্বরী বিভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌লেন,—ছেলের রকম দেখে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধিও গেল লোপ পেয়ে!

কিন্তু সহসা ভুবনেশ্বরীর মনে কি খেয়াল জাগ্‌লো, তিনি হাতে কতকটা জল নিয়ে বিলের গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন,—শিব, শিব, শিব!

অমনি কি আশ্চর্য্য—আগুনে জল পড়ার মত বিলের যাবতীয় উপদ্রব মুহূর্ত্তে গেল থেমে! ফণাধারী সর্প যেন সরোষে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে সহসা অমোঘ মন্ত্রের প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে! তীব্র উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো যেন কল টিপ্‌তেই নিভে গেল!

স্থির-শান্ত-স্তব্ধ হয়ে—ডাগর ডাগর চোখ মেলে বিলে চাইতে লাগ্‌লো চারিদিকে। যেন আকুল হয়ে খুঁজছে কা'কে! বিস্মৃতির অতল তল থেকে অতি-পরিচিত কোন্ এক একান্ত আপনার জনের কথা যেন মনে পড়ে গেছে তার!

ছেলের ভাবান্তর দেখে অপার বিস্ময়ে ভুবনেশ্বরীর চোখেও তখন পলক পড়্‌ছে না। সারা মুখ ছেয়ে ফুটে উঠেছে এক প্রগাঢ় চিন্তার ছায়া! ছেলে তাঁর শিবের দেওয়া,—মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাঁর! তাই সেই পরমযোগী—ত্যাগীশ্বর সন্ন্যাসীর নামে বিলের এই অদ্ভুত ভাবান্তর—ভুবনেশ্বরীর সমগ্র চিত্তকে কি যেন এক অবাঞ্ছিত শঙ্কার দোলায় দুলিয়ে দিয়ে যায়! সন্ন্যাসী পিতামহ দুর্গাচরণের আকৃতির সহিত বিলের আকৃতির অপূর্ব্ব সাদৃশ্যও তাঁর বুকের মাঝে কাঁপন জাগিয়ে তোলে,—তাইত, তাঁর এত সাধের বিলে শেষপর্য্যন্ত সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়ে নাকি?

না-না-না,—কথাটা ভাব্‌তেই তিনি জোর ক'রে বাধা দেন তাঁর চিন্তাস্রোতের মুখে। নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর করবার জন্য নিজের মনেই বারবার বলেন, এ অমূলক ধারণা—অহেতুক ভয়! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ছেলের মঙ্গলের জন্য অবশেষে সঁপে দেন তিনি তাকে সেই যোগেশ্বরেরই চরণে।

3/419

৭

এর পর থেকে বিলের দুরন্তপনা বন্ধ কর্‌বার একটা পথ যেন পেয়ে যান ভুবনেশ্বরী। যখনই বিলের উপদ্রব চরমে ওঠে—তখনই তিনি হাতে ক'রে একটু জল নিয়ে 'শিব শিব' বল্‌তে বল্‌তে ছিটিয়ে দেন বিলের গায়ে-মাথায়। অম্‌নি দুরন্ত বিলে 'তাণ্ডব নাচ' ছেড়ে শান্তশিষ্ট হ'য়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো!

এবং শুধু তাই নয়,—নানাভাবে শিবের নাম ক'রে ভুবনেশ্বরী দেখেন,—শিবের প্রসঙ্গমাত্রই ছেলের ভাবান্তর হয়। একদিন বিলে যখন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না,—ভুবনেশ্বরী হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, দেখ্‌ বিলে,—তুই যদি এম্‌নি ক'রে আমাকে জ্বালাতন করিস্‌, তাহলে শিবঠাকুর আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।

কথাটা শুনেই বিলের চোখ মুখ শুকিয়ে যায়।···ক্ষুদ্র শিশু,—শিবকেই বা কতটুকু জানে—আর কৈলাসেরই বা কি বোঝে? কিন্তু তবু কেন জানি না,—কৈলাসে শিবের কাছে যেতে না পাওয়ার ভয় তাকে কাতর ক'রে তোলে। যেন তার সবচেয়ে প্রিয় স্থানটিতেই যেতে দেওয়া হবে না তাকে। একি পূর্ব্ব-সংস্কার? না,—আর কিছু?—সকল ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ, সর্ব্ব কামনা-শূন্য মহাধ্যানী, মহেশ্বরই জানেন সে নিগূঢ় কথা!

কিন্তু বিলের দৌরাত্ম্য তো চলেছে অষ্ট প্রহরই। কতই বা আর ভুবনেশ্বরী হাতে জল নিয়ে প্রস্তুত থাক্‌বেন? কতই বা আর শিবের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি শান্ত রাখবেন ঐ দুর্দ্দান্ত বেপরোয়া ছেলেকে?—কাজেই বিলের উপদ্রব ঠিক সমানেই চলে: বরং দিনের পর দিন যত তার বয়স বাড়ে,—তার দৌরাত্ম্যের মাত্রাও নব নব রূপে ঠিক বাড়তে থাকে তেমনি!

দিদিদের সঙ্গে তো তার একদম বনে না! তাদের যেন সে পেয়ে বসে সব চেয়ে বেশি! তারা হয়ত বসে কোন কাজ কর্‌ছে—এমন সময় বিলে কোত্থেকে ছুটে এসে তাদের পিঠে বসিয়ে দিলে গুম্‌গুম্‌ ক'রে কয়েকটা কিল। কখনো বা তাদের চুল ধ'রে এমন টান মারলে যে,—তারা উল্‌টে গেল পড়ে। আবার কখনো বা তাদের গায়ে-মাথায় ধূলো-বালি দিয়ে তাদের বিব্রত ক'রে তুল্‌লে! তা'ছাড়া খুপোখুপি, চিম্‌টিকাটা, পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সটান্‌ ছুটে পালানো, এসব তো আছেই।

দিদিরা অতিষ্ঠ হ'য়ে ভুবনেশ্বরীর কাছে গিয়ে অভিযোগ করে,—দেখো মা, দেখো, তোমার সাধের ছেলের কীর্ত্তি!—বল্‌তে বল্‌তে তারা কেউ হয়ত কয়েক গাছি ছেঁড়া চুলই মাকে দেখায়।

ভুবনেশ্বরী হাসবেন—কি রাগ করবেন,—কিছুই খুঁজে পান না। মেয়েদেরও অভিযোগের সুর চড়তে থাকে,—চুপ ক'রে থাক্‌লে যে বড়? এম্‌নি ও যা' খুশী, তাই ক'রবে?'—মা তখন ব'লে ওঠেন বিরক্ত হ'য়ে—তা আমাকে আর কি বল্‌ছিস?—পারিস তো বিলেকে ধরে বেঁধে রাখ তোরা। আমি আর পারিনে বাপু।

একদিন তো সত্যিই দুরন্ত ভাইকে ধরে বেঁধে রাখবার জন্যে দিদিরা ছুট্‌লো তার পিছুপিছু। বিলে সেদিন তাদের জ্বালাতনের একশেষ করে ছেড়েছিল। কিন্তু বিলে ছুট্‌ছে যেন উদ্দাম হাওয়ার মত। বেচারী দিদিদের সাধ্য কি তাকে ধরে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে বিলে গিয়ে দাঁড়ালো নর্দ্দমার পাশেই এক আস্তাকুঁড়ের ওপর। ব্যস,—আবার কি?—দিদি বেচারীদের যত শ্রম সবই হ'লো পণ্ড! বিলের না হয়,—নর্দ্দমা-আস্তাকুঁড় কিছু বাছ-বিচার নেই,—নোংরা ধূলোমাটি আর চন্দন ওর কাছে সব সমান, কিন্তু মেয়েছেলে হ'য়ে দিদিরা তো আর নর্দ্দমা মাড়িয়ে আস্তাকুঁড়ে যেতে পারে না। বাধ্য হ'য়ে তাদের থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকৃতে হয় হতভম্বের মতো!

দিদিরা জব্দ হয়েছে দেখে বিলের সে কি মজা! সে বেশ জানে—দিদিরা যতই লম্ফঝম্প করুক, ঐ দূরে দাঁড়িয়েই কর্‌তে হবে। তাদের ক্ষমতার সীমা ঐ পর্য্যন্তই। সুযোগ পেয়ে সে নানারকম মুখভঙ্গী ক'রে দিদিদের ভেংচি কাটে,—বিদ্রূপের সুরে বলে, আয়, আয় না,—ধর না আমাকে। এই তো আমি আছি, কই ধর্‌ দেখি? দেখি তোরা কত বাহাদুর!

তার হাবভাব দেখে দিদিদের পিত্তি জ্বলে যায়! কিন্তু পিত্তিই জ্বলে, ফল কিছু হয়না। বিলে আরও মজা পেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সমানে ভেংচি কাটে তাদের! বেগতিক দেখে বিলের কাছে হার মেনে দিদিরা শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে আসে ঘরে।

৮

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম'ত আছেই আছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সাড়া পেলেই বিলে বিপুল উৎসাহে ছুটে আসে দেউড়িতে! স্থির প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে সাধুদের বেশ-ভূষার দিকে। তাঁদের মাথায় জটা, মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি, হাতে ত্রিশূল, চিম্‌টে বা

কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—পরণে 'গেরুয়া',—কা'রো কা'রো বা কৌপীন,—এর প্রত্যেকটিই বিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষভাবেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার শিশুমন চলে যায় কোন এক কল্পলোকে: তাদের মধ্যে সে তার ভবিষ্যতের নিজেকেই খুঁজে বেড়ায় কি-না সেই জানে! অথবা তার বিগত কোন জন্মের ছবি সংস্কারবশে তার চিত্তে ভেসে ওঠে কি-না তাই বা কে বল্‌তে পারে?

এম্‌নিভাবে প্রায়ই সাধু-সন্ন্যাসী দেখ্‌তে দেখ্‌তে—আর নানাভাবে শিবের প্রসঙ্গ শুন্‌তে শুন্‌তে বিলের মনের মধ্যে কোন্ দিক্ দিয়ে কখন কিসের যে প্রেরণা জেগে উঠ্‌তো, তার হদিস পেতো না কেউই। দুরন্ত হলেও বিশ্বনাথবাবুর সংসারে সে যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ-রস বয়ে এনেছে প্রচুর পরিমাণে—একথা কে অস্বীকার কর্‌বে? দুষ্টামির মধ্যেও যে এত মধু থাকে, এর আগে তাই বা কে জান্‌তো? ডাকাত ছেলে তার দস্যিপনার মধ্যেই আবার অনেক সময় এমন অনেক কিছু ক'রে বসতো—যা দেখে তার দুরন্তপনার কথা ভুলে গিয়ে—মুগ্ধনেত্রে চাইতে হতো তার দিকে; গভীরভাবে ভাব্‌তে হতো তার কথা।

হঠাৎ একদিন সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ভুবনেশ্বরী দেখ্‌লেন,—বিলে কোত্থেকে এক টুক্‌রো গেরুয়া রঙের কাপড় যোগাড় ক'রে কৌপীনের মত কোমরে জড়িয়ে পরেছে: আর এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে মহানন্দে!—

ছেলের সেই অপরূপ সাজ-সজ্জা দেখে মা তো অবাক্!—"এ-কিরে বিলে?"—সস্নেহ বিস্ময়ে ভুবনেশ্বরী অপাঙ্গে ছেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—"এ-কি পরেছিস্?"

'আমি শিব হয়েছি।'—বিপুল উল্লাসে নৃত্য ক'রে বিলে বলে ওঠে: তার চোখেমুখেও ফুটে ওঠে আনন্দের এক অপূর্ব্ব দীপ্তি।

মা মনে মনে শিউরে ওঠেন—এইটুকু ছেলে, এখন থেকে শিব হবার এত সাধ জাগে কেন তার? বিলে কিন্তু "শিব হ'য়েছি শিব হ'য়েছি"—ব'লে সমানে দু'হাত তুলে নাচতে থাকে। তার সেই অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা শেষ পর্য্যন্ত মায়ের চিত্তেও এক নূতন ছন্দের সুর ধ্বনিত করে তোলে!—আপন ভুলে চেয়ে থাকেন তিনি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে।…

তখন দুপুর বেলা—এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী বেড়াতে এসেছেন বিলেদের বাড়ী। বিলে কোমরে সেই গেরুয়া রঙের কাপড়টুকু জড়িয়ে শিব সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন ভুবনেশ্বরীকে,—এ আবার খোকার কিসের খেয়াল বৌমা?

"ও শিব হ'য়েছে !"—স্নেহ-রঞ্জিত মৃদু-মন্দ হাসি ফুটে উঠ্‌লো ভুবনেশ্বরীর মুখে। বৃদ্ধারও কৌতুক বেড়ে গেল,—"ও, তাই না-কি ?"—প্রীতিফুল্ল দৃষ্টিতে তিনি আবার চাইলেন বিলের দিকে : "তা দাদু", বল্‌লেন মৃদু হেসে—"শিবের মাথায় তো লম্বা লম্বা জটা আছে, তোর জটা কই ?"

চোখ দুটো বড় করে বিলে তাকালো বৃদ্ধার দিকে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্‌লো যেন একটা সমস্যা,—সত্যিই তো, শিবের ছবিতে মাথায় জটা আছে যে !

তার হাবভাব লক্ষ্য ক'রে আরও উচ্ছল হয়ে উঠ্‌লো বৃদ্ধার কৌতুক,—কোটরগত চোখদুটি নেচে উঠলো পরম পুলকে,—"দেখো দাদু,"—ভুবনেশ্বরীর দিকে একবার সহাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বল্‌লেন,—"মুনি-ঋষিদের মতো ধ্যান কর্‌লে মাথায় লম্বা-লম্বা জটা হয়—মাথার জটা একেবারে মাটি ছুঁয়ে যায় !"

বিলে একাগ্র হয়ে শুন্‌লো বৃদ্ধার উপদেশ। শিব হবার যেটুকু বাকী আছে তার যেন একটা পথ পেয়ে গেল সে। কিন্তু ধ্যান ? ধ্যান জিনিষটা যে কি তা তো কেউ তাকে শেখায়নি !···বৃদ্ধাও ভেঙ্গে ফুটে বল্‌লেন না—ধ্যানের অর্থ। কিন্তু 'ধ্যান' কথাটাই যেন তার শিশুমনে ধারণা এনে দিলে—ধ্যানের সম্বন্ধে। অনেক সময় কোন কথার সঠিক অর্থ না বুঝলেও কথাটাই যেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে পরিস্ফুট করে তোলে। মা যে কেন 'মা' হলো—শিশু তার কিছুই বোঝে না,—কিন্তু মা বল্‌তে সে তার মা-টিকেই বোঝে।

বিলের মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল ধ্যানের অর্থ। নাড়া পেয়ে তার মনে সাড়া জেগে উঠ্‌লো। আর কোনদিকে না চেয়ে, কোন জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে সে তক্ষুনি বস্‌লো গিয়ে নিরালায় ঠিক পূজার আসনে বসার মতোই। তার পর চোখবুজে মগ্ন হ'লো ধ্যানে।

কিন্তু অদম্য কৌতূহল জেগে আছে তার মনে। মাঝে মাঝে তাই তার নিবিষ্টতা কেটে যেতে লাগ্‌লো। একটু একটু চোখ খুলে এপাশে-ওপাশে চেয়ে সে দেখ্‌তে লাগ্‌লো,—জটা কতটা বেরিয়েছে ;—মাটি ছুঁতেই বা আর বাকী আছে কত ?

কিন্তু জটাতো জটা,—অনেকক্ষণ ধ্যান করে একগাছা চুলও বড় হ'লো না মাথার। বিলের মন ভরে উঠ্‌লো দারুণ অভিমানে ; চিত্ত বিমর্ষ হ'য়ে উঠ্‌লো নিরাশার দুঃখে ! অভিমানে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সে ফিরে এলো মায়ের কাছে। চোখ দুটি তার ছলছল করছে। বৃদ্ধাও তখন চলে গেছেন সেখান থেকে।

ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে বিলে মা'কে ব'ললে,—কই, এতক্ষণ ধরে তো ধ্যান করলাম,—জটা তো বেরুলো না ?

ভুবনেশ্বরী বুঝলেন,—বৃদ্ধার নিছক তামাসাকেই সত্যি বলে ধ'রে নিয়েছে বিলে। কিন্তু সেকথা ব'লে ছেলের মনকে সন্দিগ্ধ বা আহত করতে ইচ্ছা হ'লো না তাঁর। কোলের মধ্যে বিলেকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—তা' বাছা, কাঁদছিস কেন ?···এক-আধ ঘণ্টায় বা দু'এক দিনের ধ্যানে কি আর জটা গজায় ?··· অনেক-অনেকদিন ধ'রে মন একটুও চঞ্চল না ক'রে ধ্যান কর্‌লে তবে বেরোয় মুনি-ঋষিদের মত জটা।

গভীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে—সমগ্র চিত্ত সজাগ করে বিলে শুন্‌লো মায়ের কথা। জটার ব্যাপার যাই হোক, ধ্যান বস্তুটি কিন্তু আজ থেকে সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বস্‌লো তার মনে।···

৯

'জয় নারায়ণজী কী জয় !'

জটাজুটধারী এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন—বিশ্বনাথবাবুর দেউড়িতে।··· বিলে তখন একখানি নূতন কাপড় প'রে—সৌখিন বাবু সেজে কোঁচা দুলিয়ে মহা স্ফূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে।

নূতন কাপড়ের গন্ধে তার মনও ভরে উঠেছে যেন এক নূতন আনন্দে। সঙ্গীদের সঙ্গে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু বকে চলেছে সে !···বালখিল্যের দল তাকে মেনে নিয়েছে নেতা ব'লে।···হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, নেতা হবার সহজাত অধিকার নিয়েই সে এসেছে পৃথিবীর বুকে। সহসা সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে চকিত হ'য়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো সে দেউড়িতে। অনুচরের দলও সেখানে এসে জুট্‌লো তার পিছু পিছু।

'জীতা রহো খোঁকা বাবু !'—এতগুলি ছেলের মধ্যে সন্ন্যাসীর উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো বিলের মুখের ওপর। ক্ষুদ্রশিশু হ'লেও তার আকর্ষণী-শক্তিতে সম্মোহিত হ'য়ে পড়লেন যেন সংসার-ত্যাগী প্রৌঢ় সন্ন্যাসী।

বিলেও দেখ্‌ছে সন্ন্যাসীকে যেন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। দেখ্‌ছে তার বিভুতি-রঞ্জিত সৌম্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি, দেখ্‌ছে তাঁর—বেশ-বাস : গেরুয়া কাপড়ের রঙটাই যেন তার শিশু-চিত্তকে রাঙিয়ে দিচ্ছে—কি এক অপূর্ব্ব রঙে।

কিছুক্ষণ পরে সম্মোহন কাট্‌লো সন্ন্যাসীর। স্বর যোগাল তাঁর নিরুদ্ধ কণ্ঠে। হিন্দি বাংলায় মিশিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বললেন তিনি,—'মহারাজ বনে খোঁকাবাবু !' তারপর যেন একটু কৌতুক করবার সাধ হ'লো তাঁর,

"সাধুবাবা আপ্‌নিসে কুছ্‌ ভিখ্‌ চাইছে।"—সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি ক'রে হাত ছুটি প্রসারিত করলেন তিনি। মুখে তাঁর অনাবিল প্রীতির মৃদুমন্দ হাসি!

সাধুবাবা হাত পেতেছেন কিছু পাবার জন্যে!·· কি দেওয়া যায় তাঁর অঞ্জলি ভ'রে।—বিলে ভেবে আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। চঞ্চল দৃষ্টিতে সে চাইতে লাগ্‌লো এদিক-সেদিক। তার শিশু-অন্তরের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠ্‌লো,—ওই প্রসারিত হস্ত তো এমনি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না! কিন্তু কি দেবে সে?

সহসা তার মাথায় এসে গেল একটা মতলব। মুহূর্ত্তে কত সাধের নূতন কাপড়খানি কোমর থেকে খুলে আনন্দে তুলে দিল সে সন্ন্যাসীর হাতে। অপার তৃপ্তিতে ভরে উঠ্‌ল তার মন!

সন্ন্যাসী তো অবাক!···এ-কি অতুলনীয় দান!···ছোট পাঁচ-ছয় হাতি কাপড়,—সন্ন্যাসীর পরণের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত; কিন্তু এই ক্ষুদ্র সরল শিশুর অন্তর থেকে যে বিরাট মহান এক দাতার মূর্ত্তি উঁকি মারলো,—তার দান তো কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না? সে যে মাথায় তুলে রাখবার মতো!

সন্ন্যাসী সে দান প্রত্যাখান করলেন না। কাপড়খানি পরম আনন্দে মাথায় বেঁধে—বিলেকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেলেন অন্যপথে।

সংবাদটা মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়লো বাড়ীর সর্ব্বত্র। সকলে হৈ-হৈ ক'রে উঠ্‌লো! কাপড়খানি স্নেহময়ী জননী ভুবনেশ্বরী নিজে পরিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেকে। কিন্তু কি বলবেন ভুবনেশ্বরী? ছেলে তো তাঁর যা' প্রাণ চায়—তাই ক'রে বসে। আর কতোই বা পারেন তিনি!

কথাটা বিশ্বনাথের কানে গিয়েও উঠলো! কর্ম্মব্যস্ত মানুষ তিনি,—পুত্রের সবকিছু কীর্ত্তিকলাপ লক্ষ্য করবার মত অবকাশ তাঁর কোনদিনই ছিল না। তবু তো কিছুকিছু তাঁর চোখে পড়তো,—কানেও আস্‌তো: কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করতেন না: বরং যেন একটু কৌতুকবোধ ক'রেই চলে যেতেন মৃদু হেসে। বিলের কীর্ত্তিগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনার ছায়া দেখ্‌তে পেতেন কি-না,—তিনিই জানেন।

আজকের ঘটনাটা শুনেও খুব কড়াকড়ি কিছু বললেন না তিনি। তবে বিলের ওপর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে ব'লে দিলেন সবাইকে। ভুবনেশ্বরীকে ব'ললেন,—সাধু-সন্ন্যাসী এলে বিলেকে যেতে দিয়ো না তাদের কাছে।

কিন্তু বিলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা তো সহজ কথা নয়! কখন কোন ফাঁকে সে যে কি ক'রে বসে,—কে এত খবর রাখে তার? হঠাৎ এসে কেউ কিছু

চাইলে চোখের সাম্‌নে যা পায়, তাই দিয়ে দেয় অম্লানবদনে। দিয়ে দিলে আর রক্ষা কি!

কোনমতেই তার সঙ্গে পেরে না উঠে একদিন ভুবনেশ্বরী একটা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে দিলেন তাকে। দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে ডেকে আদেশ দিলেন দৃঢ়কণ্ঠে,—বিলে যতোই চেঁচামেচি করুক,—কেউ যেন দরজা খুলে না দেয় তাকে।

মুক্ত বিহঙ্গের মত অবাধ-গতি, স্বাধীন, বেপরোয়া শিশু!···সহসা এইভাবে বন্দী হ'য়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো তার আত্মা।···কেন,···কি দোষ করেছে সে? কোন্ অপরাধে তার এই কঠোর শাস্তি?···অধীর অন্তরে সে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে থাকে। ঘরের এটা-ওটা ফেলে ভেঙ্গে তছ্‌নছ্ করে। ঘরের মধ্যে বন্দী দুর্দ্দান্ত শিশুর উপদ্রবে বাহিরের সকলে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কেউ দরজা খুলে দিতে সাহস করে না ভুবনেশ্বরীর ভয়ে।

হঠাৎ বিলে চুপ করে যায়। গম্ভীর হয়ে ভাবতে থাকে, যারা তার ওপর এই দারুণ অবিচার করেছে, অযথা দিয়েছে তাকে বন্দীত্বের এই গুরুতর দণ্ড— উল্‌টে তাদের দণ্ড বিধান করা যায় কেমন করে!

মাথাটি ক্ষুদ্র হ'লেও এক বিরাট মস্তিষ্ক ছিল তার মধ্যে। আর শিশু-বয়সেই সেই মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী-শক্তি প্রকাশ পেতো নানাভাবে। কি যেন ভেবে ঠিক ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো,—জানালাপথে দৃষ্টি ফেলে দেখ্‌লে, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—শীর্ণদেহ, ছিন্নবাস এক ভিখারী বালক।

বিলে হাত-ইসারায় ডাক্‌লো তাকে। ভিখারী বালকটিও তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো জানালার পাশে।

বিলে তো এই-ই চাইছিল।·· টপ্ ক'রে ঘরে পাতা চৌকিটার ওপর উঠে সে আল্‌না থেকে একটা ভাল দামী কাপড় নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে ভিখারী ছেলেটির হাতে।

অবাক বিস্ময়ে হতভম্বের মত চোখ তুলে ছেলেটা তাকালো বিলের মুখের দিকে। এতটা তো সে আশা করেনি! আশা করার মতো দুঃসাহসই বা তার আস্‌বে কোত্থেকে? একটা পয়সা চেয়েও যাকে কুকুরের মতো তাড়া খেতে হয়,—এতবড় একটা দান পাবার কল্পনা করাও তো তার পক্ষে মূঢ়তা।

কিন্তু ভুল নয়, স্বপ্ন নয়,—একান্ত সত্য! কাপড়খানা একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যেই এসে গেছে তার। অন্তর তার ভ'রে উঠ্‌লো কৃতজ্ঞতায়; কিন্তু পাছে হঠাৎ কেউ দেখতে পেলে কেড়ে নেয়,—এই ভয়ে সে আর মুহূর্ত্ত দাঁড়ালো না সেখানে।

দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট ভিখারী বালকের শীর্ণ-নিষ্প্রভ মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌তে—বিলেরও মনপ্রাণ ভরে উঠ্‌লো এক অপূর্ব্ব আনন্দে। কিন্তু কোথায় যে ছিল আরও কয়েকজন ভিখারী,—দেখাদেখি তারাও ছুটে এলো জানালার পাশে। বিলেও পেয়ে গেল ভারী মজা! যে হাত বাড়ায়,—তারই হাতে আল্‌না থেকে একখানা জামা কি কাপড় নিয়ে ফেলে দেয় জানালা গলিয়ে।... দানের আনন্দে সে যেন মেতে উঠেছে! মনে মনে ক্রূর হাসিও হাসছে—কেমন, আর তালা দিয়ে রাখ্‌বে?

এদিকে বাড়ীর এক ঝি বাইরে এসেছিল কোন কাজে। বিলের কাণ্ড-কারখানা নজরে পড়তেই তো তার চক্ষু স্থির! উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লো সে ভুবনেশ্বরীর কাছে,—'মা, মা!' হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ কপালে তুলে বললে—'দেখো গিয়ে খোকাবাবুর কাণ্ড। সর্ব্বনাশ করেছে! ঘরের আল্‌নায় যত জামা-কাপড় ছিল—সব বিলিয়ে দিয়েছে জানালা দিয়ে ভিকিরীদের ডেকে।'

'অ্যাঁ—বলিস কি?'—ব্যাকুল হ'য়ে ত্রস্তপদে ছুট্‌লেন ভুবনেশ্বরী। যা ছেলে,—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ওকে! ঝন্ ঝন্ ক'রে তালা খুলে ফেললেন তিনি। আল্‌নার দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল,—বুঝলেন, বাঁধ দেবার আগেই বেরিয়ে গেছে স্রোতের জল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুবনেশ্বরী চাইলেন ছেলের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে। বিলের সর্ব্বাঙ্গে তখন ঘাম ঝর্‌ছে। কিন্তু বসে আছে সে পরম নিশ্চিন্তে—যেমন শান্ত—তেমনি নির্ব্বিকার। শাস্তিদাতাদের শাস্তি দিতে পেরে জয়ের আনন্দে মনের যত ক্ষোভ যেন মিটে গেছে তার। আনন্দ-কোলাহল-মুখর ভিখারীদলের ছবিটিও যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিচ্ছে তার বেদনাহত চিত্তে।

নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবনেশ্বরী! কণ্ঠও যেন তাঁর ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।...

১০

দুরন্ত হ'লেও সৎ এবং সুন্দরের প্রতি বিলের অন্তরে ছিল একটি সহজাত আকর্ষণ। যাদের অনুভূতি গভীর,—তাদের পক্ষে সেটুকু ধ'রে ফেলা কঠিন ছিল না। তা'ছাড়া, কয়েকটি অনন্য-শিশু-সুলভ গুণও বিকাশ পেতে লাগ্‌লো তার মধ্যে ধীরে ধীরে।

ভুবনেশ্বরী যখন রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি বই পড়তেন,—তখন দুর্দ্দান্ত বালক বিলে সেই সব গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে সমস্ত চাঞ্চল্য এবং দুরন্তপনা ভুলে তন্ময় হ'য়ে যেতো ভাবগ্রাহী ভক্তের মত। তখন তার শিশুচিত্তে যে নিবিষ্টতার সঞ্চার হতো—বহু প্রবীণ শ্রোতার পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না।

সর্ব্বগুণের আকর আদর্শপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-মহিমা তাকে আকৃষ্ট করতো মনে-প্রাণে। রামের পিতৃভক্তি, অলৌকিক সত্যনিষ্ঠা, ভক্ত-বাৎসল্য, শৌর্য্য, মহত্ত্ব, ক্ষমাশীলতা তার শিশু-অন্তরে জাগিয়ে তুলতো এক মহৎ অনুপ্রেরণা। আবার রামভক্ত মহাবীর হনুমানের অকপট ভক্তি, আত্মহারা প্রেম—অদ্ভুত সাহসিকতা, অপূর্ব্ব বীরত্ব এবং প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যও তাঁর চিত্তে বড় কম শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতো না।

সেদিন এক কথকঠাকুর বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে রামের চরিত-কথা পাঠ করছিলেন।…ভুবনেশ্বরী এবং আরও কয়েকজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী শুন্‌ছিলেন সেই অমৃতকথা আগ্রহে একাগ্র হয়ে। বিলেও কাছাকাছি ব'সে কথকঠাকুরের প্রতিটি কথাই শুনে যাচ্ছিল মন দিয়ে। সে বালক,—স্বভাবতঃই চপল তার মতি,—কিন্তু তবু তাকে দেখলেই মনে হচ্ছিল,—প্রাণারাম রাম যেন তারই প্রাণকে অভিভূত করেছেন সবচেয়ে বেশি।

হঠাৎ হনুমানের প্রসঙ্গ আস্‌তেই বিলের একাগ্রতা আরও বেড়ে উঠ্‌লো। কথায় কথায় কথকঠাকুর রহস্যভরে ব'ললেন—'মহাবীর হনুমান কদলী খুব ভালবাসেন এবং কদলীবনেই থাকেন।

মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো বিলের দুই আয়ত নেত্র।—অ্যাঁ, তাই কি? আগ্রহ দমন করতে না পেরে চঞ্চলকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলো কথকঠাকুরকে,—'আপনি যে ব'ললেন,—হনুমান কদলীবনে থাকেন,—কথা কি সত্যি?'

বালকের কৌতূহল দেখে ভারী কৌতুকবোধ করলেন কথকঠাকুর,—পরিহাস-তরল কণ্ঠে ব'ললেন—সত্যি বই কি!—দেখ না কলাবনে গিয়ে ধ্যান ক'রে; তাঁর দেখা পাবে।

অকপট শিশুমন! কথকঠাকুরের কথা সেখানে বদ্ধমূল হ'য়ে যায় সত্য ব'লেই। হনুমানের দেখা পাওয়া যাবে,—এই কৌতূহল বিলের সমগ্র চিত্তকে আশায় অধীর ক'রে তোলে,—সে কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

বাড়ীর পাশেই ছিল এক কলার বাগান।—আর ধ্যান জিনিষটার ধারণা তো আগে থেকেই ছিল বিলের মনের গভীরে সদাজাগ্রত! সে কলাবনের মধ্যে

ঢুকে—এক জায়গায় আসন ক'রে বসে—চোখদুটি বুজে এক মনে ধ্যান করতে লাগ্‌লো মহাবীর হনুমানের।

কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল একটানা গভীর ধ্যানে ;—হনুমানের দর্শনকামনায় বিলের প্রায় সন্ধ্যাই হ'য়ে গেল নীরব-নিশ্চল-নিবিষ্টতায় ; কিন্তু কই হনুমান তো দেখা দিলেন না। বিলের সমগ্র চিত্ত মথিত হয়ে উঠলো দারুণ অভিমানে—গভীর দুঃখে,—নিরাশার তীব্র বেদনায়। মর্ম্মবেদনা যেন অন্তরে নিরুদ্ধ থাকতে না পেরে ফুটে উঠলো মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুরূপে। শ্লথ চরণে সে ফিরে এলো বাড়ীর মধ্যে।—এবং নিজেকে আর সাম্‌লাতে না পেরে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে ঢলে পড়লো ভুবনেশ্বরীর কোলে।

"কি হ'লো, কি হ'লো বিলে?"—আকুল হ'য়ে জননী বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে,—"কি হয়েছে বাছা,—কেন কাঁদছিস?"—তাঁর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো অসীম ব্যাকুলতা!—বিলে অনেক ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ললে তার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা।

ভুবনেশ্বরী বুঝলেন,—সরল শিশু কথকঠাকুরের পরিহাস সত্য বলেই মেনে নিয়েছে। ফলে নিরাশার বেদনায় চিত্ত আহত হয়ে উঠেছে তার। কিন্তু বুদ্ধিমতী স্নেহশীলা জননী আঘাত করতে চাইলেন না—পুত্রের সরল বিশ্বাসের ওপর। কি জানি, এই বিশ্বাস করবার স্বভাবজাত শক্তিই হয়ত তাকে নিয়ে যাবে একদিন অনেক উচ্চে—পরম এক সত্যলোকে। এটা না হয় পরিহাস কিন্তু সবইতো আর পরিহাস নয়! এই বিশ্বাস যে মানুষের মনে আত্ম-বিশ্বাসকেও জাগিয়ে তোলে।

তিনি সস্নেহে বিলের মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে—তার অশ্রুলাঞ্ছিত কোমল কচি গণ্ডদুটি মুছিয়ে দিয়ে ব'ললেন সান্ত্বনার সুরে,—"তা বাছা, তার জন্যে তুই দুঃখ করছিস্ কেন? শুনলি তো, কথকঠাকুরের মুখে,—প্রভু রামচন্দ্রের কাজে হনুমান সর্ব্বদাই ব্যস্ত। রামের কাজে আজ হয়ত তিনি কোথাও গেছেন,—অন্যদিন নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবি।"

ঠিক, ঠিক!—বালকের মন থেকে কেটে গেল সন্দেহের মেঘ,—অভিমান সরে গিয়ে চোখেমুখে ফুটে উঠলো আবার সেই সরল বিশ্বাসের দীপ্তি—ঠিকই তো,—রামের কাজে ব্যস্ত হ'য়ে থাকলে অন্য কাজের কি ক'রে অবসর করবেন তিনি? রামের যে অনেক কাজ!

ভুবনেশ্বরী দেখলেন,—ঔষধ ধরেছে! বিলের মুখে চুমো দিয়ে গভীর মমতায় ব'ললেন—চল, তোমার জন্যে খু-উ-ব ভালো দুটো সন্দেশ রেখেছি—খাবে। বিলে যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হ'য়ে মায়ের সঙ্গে চললো—অন্য ঘরে।

3/419

* * * * *

সেদিন কি একটা উৎসবে সারা কলকাতায় ধুম-ধড়ক্কা লেগে গেছে !—বিলেরও মন ছুটেছে আনন্দের তুফানে ভেসে ! আনন্দটা উৎসবের নয় ! উৎসবের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় হরদম যে গাড়ী-ঘোড়া ছুটছে,—বিরাম নেই—সংখ্যা নেই,—পথচারী পথ পাচ্ছে না,—আনন্দটা তারই। নেহাত কচি বয়স থেকেই গাড়ী-ঘোড়ার প্রতি আকর্ষণ ছিল তার প্রবল। গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ শুনলেই সে সব কিছু ভুলে ছুটে আসতো দেউড়িতে ; চেয়ে থাকতো দুটি চোখ বিস্ময়ে স্থির ক'রে রাস্তার পানে—যেখানে ছুটছে ঘোড়া, ছুটছে গাড়ীর পর গাড়ী।

কোচম্যানদের তো সে দেখতো খুব উঁচু দৃষ্টিতেই। উঁচু কোচ-বাক্সের ওপর ব'সে আছে রাজা-মহারাজার মত। এক হাতে ধরেছে ঘোড়ার লাগাম, আর একহাতে চাবুক চালাচ্ছে সপাং সপাং—কি মজা ! ওর ক্ষমতা কি কম ?—অত বড় ঘোড়া ছুটে চলেছে ওর চাবুকের জোরেই !…একটু এদিক-সেদিক গেছে কি অম্‌নি পড়বে লাগামে টান,—চলবে চাবুক সপাং সপাং !

উৎসবের দিন—বিলে যেন মনের সাধেই গাড়ী-ঘোড়া দেখে নিচ্ছিল। বিকালে বিশ্বনাথবাবু—ভুবনেশ্বরী ও বিলেকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বেরিয়ে পড়লেন কতকটা ঘুরে আসবার জন্যে।…তাঁর গাড়ী-ঘোড়ার তুলনা তো শহরে খুব কমই মিল্‌তো !…আর কোচম্যানও ছিল পাকা লোক—যেন পৌরাণিক যুগের এক নিপুণ 'সারথি।' তার চালনার গুণে গাড়ী ছুটতে লাগলো ঝড়ের মত—অথচ নিশ্চিন্তে ও নির্ব্বিঘ্নে।

বিলের আনন্দ তখন দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে !…দু'পাশাড়ি কত বাড়ীর পর বাড়ী—দোকান, রঙ্গমঞ্চ-পার্ক ইত্যাদি ফেলে ছুটেছে তাদের গাড়ী,—তার আগে-পাছে এ-পাশে ওপাশেও ছুটছে কত গাড়ী-ঘোড়া—বিলে দেখছে দু'চোখ ভ'রে,—উদ্বেল হ'য়ে উঠছে তার অন্তর।…মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করছে অদ্ভুতকর্ম্মা কোচম্যানের বাহাদুরীর বহর ! মন তার ভরে উঠেছে কোচম্যানের প্রতি শ্রদ্ধায়।

সহসা বিশ্বনাথবাবু বিলের দিকে সস্নেহে চেয়ে প্রশ্ন করলেন,—হাঁ রে বিলে, বড় হয়ে তুই কি হবি বল্‌ দেখি ?

কোচম্যান বিলের অন্তরে তখন এক উচ্চ স্থানই অধিকার ক'রে বসেছে।

সে প্রাণ খুলে উত্তর দিলে,—কোচম্যান !

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু, সঙ্গে সঙ্গে ভুবনেশ্বরীও। সরল-প্রাণ অনভিজ্ঞ শিশুর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পেয়ে—সস্নেহ কৌতুকে

ভুবনেশ্বরী জড়িয়ে ধরলেন বিলেকে তাঁর বুকে—'কোচম্যান হবি,—না? ·· কোচে ব'সে গাড়ী চালাতে বুঝি খুবই সাধ হয় তোর?'—মুগ্ধদৃষ্টিতে চাইলেন তিনি ছেলের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানির দিকে।

বিলে অকুণ্ঠিতভাবেই জবাব দিলে—হুঁ।

পরিহাসের হাসি হেসে বললেন বিশ্বনাথবাবু—'আচ্ছা তাই হবে, বড় হলে ভাল দেখে গাড়ী-ঘোড়া কিনে দেবো তোকে।'

বিলের মন ভ'রে উঠ্‌লো পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে। বুঝিবা তার কল্পনানেত্রে একবার ভেসেও উঠলো,—সে বড় হয়েছে,—এবং চাবুক হাতে করে বসে আছে কোচ-বাক্সের ওপর!

১১

আর কোনদিন কলাবাগানে গিয়ে বিলে হনুমানকে খুঁজেছিল কিনা,—জানা যায় না; তবে রামায়ণ শুন্‌তে শুন্‌তে তার অন্তর রামের প্রতি ভক্তিতে ক্রমশঃ এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো যে—সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে নিকটবর্ত্তী দোকান থেকে একদিন রামসীতার এক যুগলমূর্ত্তিই কিনে নিয়ে এল পূজো করবার জন্যে।

তারপর চিলে ছাদের ওপর সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে দুই বন্ধুর সে-কি পূজার্চ্চনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুই অপকট সরল-বিশ্বাসী শিশুভক্ত বসে আছে চোখ বুজে তাদের আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তির সম্মুখে, ধ্যান করছে গভীর নিবিষ্টতায়। সঙ্গীর চোখ বা মাঝে মাঝে খুলে যায়,—কিন্তু কানের কাছে ঢাক-ঢোল বাজলেও বিলের স্তিমিত চক্ষু দুটি বন্ধ থাকে সেই একইভাবে।

একদিন তো এই অবস্থায় বারবার ঝাঁকানি দিয়ে তবে তার চৈতন্য সম্পাদন করতে হয়।

কিন্তু এমন প্রগাঢ় নিষ্ঠার ওপরও হঠাৎ আঘাত পড়ে। কোচম্যানদের প্রতি উচ্চ ধারণার ফলে বাড়ীর কোচম্যানটির সঙ্গে বিলের ভাব জমে উঠেছিল প্রচুর। তাই সে প্রায়ই আস্তাবলে গিয়ে গল্পগুজব করতো তার সঙ্গে।

লোকটি নিজের কাজে পটু ছিল বটে,—কিন্তু তার দোষ, সে নিজেকে ভাবতো একজন সবজান্তা বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেই। আর আজে-বাজে এমন সব গল্প করতো বিলের কাছে,—যা শুনলে অন্য লোক ভাবতো,—বেশ মজা করেই গাঁজায় দম দিয়েছে সে।

বিলের কিন্তু অগাধ আস্থা তার ওপর। সে তার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করে বর্ণে-বর্ণে,—ভাবে সহিস যা বলে, তা শুধু অভ্রান্ত নয়—একেবারে অকাট্য। সহিস হয়ত সুখ পায়নি তার বিবাহিত জীবনে, হয়ত দুঃখেরই হয়ে উঠেছিল তার দাম্পত্য জীবন, তাই সে কথায় কথায় একদিন ব'ললে বিলেকে, "দেখ খোকাবাবু,—বিয়ে করা ভারী খারাপ, বিয়ে করলেই জীবনে আসবে দুঃখ, অশান্তি, নানা দিক দিয়ে। বিয়ে তুমি কোনদিন ক'রো না খোকাবাবু—করেছ কি,—অম্‌নি চ'লে যাবে তোমার জীবনের যা-কিছু সুখ, যা-কিছু আনন্দ।"

অজ্ঞান-অবোধ বালক না হ'লে বিলে হয়ত বিপুল তর্কই জুড়ে দিত;—সুখী দম্পতির নজীর সে দেখাতে পারতো অনেক। এমন কি নিজের বাপমাকেই পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ ক'রতো সে। তবে অতখানি জ্ঞানবুদ্ধি বা বোধও তার হয়নি—আর বিবাহ-সম্বন্ধে ওইটুকু ছেলের ধারণাই বা কি?—এদিকে আবার সহিসের কথাও তার কাছে—'বেদবাক্য'। ফলে কতকটা অভিভূত এবং সম্মোহিত হয়েই সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলে,—"জীবনে আমি কখনো বিয়ে করবো না দেখে নিও।"

কোচম্যান্ অহেতুক আনন্দেই তার পিঠ চাপড়ে তাকে বাহবা দিলে,—ঠিক আছে খোকাবাবু!

* * * * *

বাড়ীর মধ্যে এসে রামসীতার কথা মনে পড়তেই বিলের কচি মনে জেগে উঠলো প্রবল আলোড়ন! তার আরাধ্য রামসীতা যে বিবাহিত! সে প্রতিজ্ঞা করেছে,—জীবনে বিয়ে করবো না ব'লে,—তা'হলে বিবাহিত যারা,—তাদের পূজো সে করবে কেমন করে!

বিলে ভাবতে লাগলো নিশ্চুপভাবে। ঠিকই ত,—রামসীতাও তো দুঃখ পেয়েছেন অনেক। বিয়ের পর রাজার ছেলে রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন বনে বনে, কত কষ্টেই দিন গেছে তাঁর। আবার সেখান থেকে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে লঙ্কার রাবণ।...তারপর যদিও বা অনেক কাণ্ড ক'রে সীতার উদ্ধার হলো তো, রাম সিংহাসনে ব'সে তাঁকে বর্জ্জন ক'রে নির্ব্বাসিত করলেন নিবিড় অরণ্যে। শেষে দুজনেরই হলো অপার দুঃখ—দারুণ অশান্তি! না, বিয়ে ক'রে রামসীতারও জীবন দেখছি অশেষ দুঃখেই কেটেছে!...সহিস বলেছে, খাঁটি সত্যিকথাই। কোন ভুল নেই!

'কিন্তু'—বিলের চিন্তার মোড় ফিরলো আবার অন্যদিকে—'মা যে বলেন: রামসীতার প্রেমের তুলনা নেই। তা যেমন নির্ম্মল—তেমনি স্বর্গীয়! রাম জগতের আদর্শপুরুষ—সীতা বিশ্বের নারী-শিরোমণি! তবে—তবে,

—মায়ের কথা কি মিথ্যা?' সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ফুটে ওঠে তার নবদুর্ব্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম রামের পুণ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি। ভেসে যায় বিলের যত কিছু যুক্তি-তর্ক, সন্দেহ-বিবাদ—সেই কমললোচনের পেলব-শান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি-ক্ষরিত অমৃতের অজস্র ধারায়।…না,—না, এই তো তার আরাধ্য! কেমন করে বর্জ্জন করবে সে—চির-সুন্দর এই দেবতাকে প্রাণের সিংহাসন থেকে? কিন্তু সহিসের কথা? আবার বিলের মাথা তালগোল পাকিয়ে যায়। রামকে বর্জ্জন করতেও প্রাণ চায় না, আবার গ্রহণ করতেও যেন কোথায় বাধে। ভাবতে ভাবতে তার শিশু-মস্তিষ্ক যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো: দারুণ সমস্যার কোন সমাধান করতে না পেরে এক দুঃসহ অব্যক্ত ব্যথায় তার দুই চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়লো অসহায়ের মত।

সেই অবস্থায় সে ছুটলো ভুবনেশ্বরীর কাছে। তার চোখে জল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ভুবনেশ্বরী। তিনি কিছু ব'লতে না বলতেই রুদ্ধপ্রায় স্বরে বিলে জানালো তার প্রাণের বেদনা মায়ের কাছে।

সব শুনে ভুবনেশ্বরী বুঝলেন,—"মুর্খের কল্পনাশক্তি হ'লে জাগরিত,—যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।"—এ-ও হয়েছে তাই। সহিস এক আজগুবী ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে সহজবিশ্বাসী শিশুর মস্তিষ্কে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিলেকে বোঝাতে গেলে—মুস্কিল বাধবে আরও বেশি। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী জননী সে পথে না গিয়ে সহজেই দিলেন সমস্যার সমাধান করে। বিলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ব'ললেন,—তাতে আর কি হয়েছে বিলে! কাজ কি তোর রামের পূজো করে? এবার থেকে তুই শিবের পূজো কর।

ব্যস, আর দ্বিতীয় কথা বলতে হলো না। মায়ের ঐ একটি কথাতেই কাজ হলো।—বিলের মাথা থেকে চলে গেল যত সব উদ্ভট কল্পনা!…দেখতে পেলো সে তার গন্তব্য পথ।…ভাগ্যিস, শিবতত্ত্ব সে আর ঘাঁটতে চাইলো না—নইলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সেখানেও কেউটে উঠতো ফণা তুলে। উঠতো শিবের পর দুর্গার কথা।…এবং আরও এমনি কত।

কিন্তু শিবের আর সন্ন্যাসীর প্রতি সহজাত আকর্ষণ তো তার ছিলোই,—এখন আবার সেই শ্বেত-সুন্দর বিশালদেহ, চন্দ্র-লাঞ্ছিত ললাট, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত পরমযোগী ত্যাগীশ্বর দেবতার প্রসন্ন বদন তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতেই তার মনপ্রাণ যেন একবাক্যে সায় দিয়ে উঠলো,—ঠিক ঠিক – আজ থেকে সে শিবেরই আরাধনা করবে।

সেই দণ্ডেই সে উঠে গেল দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে চিলে ছাদের ওপর।…রামসীতার মূর্ত্তির কাছে গিয়ে সেদিকে চাইতেই কিন্তু সে আবার কেমন

দুর্ব্বল হয়ে পড়লো।…যুগল-মূর্ত্তি হাসছে তখনো তেম্‌নি অপার সৌন্দর্য্যে, তেম্‌নি পরিপূর্ণ মহিমায়! আজানুলম্বিতবাহু, ধনুর্ব্বাণধারী রামের নেত্রযুগল থেকে ক্ষরিত হচ্ছে তেম্‌নি প্রাণ-জুড়ানো সুধা।—চোখ তার ভরে এলো জলে। দুঃখ হলো তার ঐ অভিরাম মূর্ত্তি নির্ম্মমভাবে সরিয়ে দিয়ে ওখানে অন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার মন তার টানলো অন্যদিকে।…চিত্তের মাঝে ফিরে এলো কিসের যেন এক সবলতা,—সে নিমেষে রামসীতার যুগলমূর্ত্তিটি তুলে নিয়ে—সেই সুউচ্চ ছাদ থেকে ফেলে দিলে একেবারে নীচে—মাটির ওপর। মূর্ত্তির দশা যে কি হলো তা সে দেখলো না, তবে বুঝলো অনুভবেই। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে সে, ঠিক যেন প্রতিমা-নিরঞ্জনের পর।

তার পরদিনই সে বাজার থেকে একটি শিবমূর্ত্তি কিনে এনে প্রতিষ্ঠা করলো রামসীতার শূন্য আসনে।…

১২

তারপর আর কি?…নিত্য সেই মূর্ত্তির সাম্‌নে ব'সে—কখনো একাকী কখনো বা আর আর ছেলেদের নিয়ে—ধ্যান করতে থাকে বিলে। কোন কোন দিন আবার খড়কুটো যোগাড় ক'রে সাধু-সন্ন্যাসীদের মত সামনে ধুনি জ্বালিয়েও বসে। অন্যান্য ছেলেদের মন চঞ্চল; বিলের টানেই তারা ধ্যানে বসে,—কিন্তু কোনমতেই মন নিবিষ্ট করতে পারে না তারা—মাঝে মাঝে গোপনে চোখ খুলে চায় এদিক সেদিক।

আর বিলে?…সে কিন্তু প্রকৃতই ধ্যানের মধ্যে ডুবে যায়। ধ্যান করতে করতে বাহ্য অনুভূতিও অনেক সময় থাকে না তার।

একদিন তো এই ধ্যানের সময় এক লোমহর্ষণ ব্যাপারই ঘটে বসলো। সঙ্গীদের নিয়ে বিলে বসেছিল ধ্যানে,—সকলেরই চোখ বন্ধ। যেন বালখিল্য ঋষিগণ বসে গেছেন পরমব্রহ্মের গভীর চিন্তায়!…কিন্তু জায়গাটায় মশার উপদ্রব বড় বেশি।…কালো কালো বড় বড় মশার কামড়ে আর আর ছেলেদের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। উঃ আঃ ক'রে তারা চোখ খোলে—আবার বোজে! কিন্তু বিলে সেই যে চোখ বুজেছে তো বুজেছেই। গায়ে অসংখ্য মশা বসে দংশন করছে তাকে সাধ মিটিয়ে—বিলের কোন হুঁসই নেই। অনড়-অচল স্তিমিতচক্ষু প্রস্তরমূর্ত্তির মত সে স্থির—নির্বিকল্প!

আচম্বিতে একটা ভয়-বিহ্বল রব উঠলো! অন্যান্য ছেলেরা চোখ খুলতেই দেখলে, এক বিষধর সর্প ফণা তুলে বক্র-দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। ছেলেরা 'সাপ সাপ' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো আর্ত্তকণ্ঠে। ডাকলো ব্যাকুলভাবে,—এই বিলে, সাপ, সাপ, ওঠ, ওঠ—পালা!

কিন্তু বিলের কোন সাড়া নেই,—সে তেম্‌নিই স্থির।…প্রাণভয়ে অন্যান্য ছেলেরা তখন যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।…কিন্তু বিলে কি মরবে সাপের কামড়ে?…তাই ছেলেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সংবাদটা জানালো সকলকে।

বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরী ত্রস্তে ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে।…এসে যা দেখলেন, তা যেন নিজের চোখের ওপরেই অবিশ্বাস এনে দেয়।…সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।… প্রকাণ্ড সর্প! হিংসা-কুটিল নেত্রদুটি জ্বলছে যেন দুটি অগ্নিকণার মত! ফণা বিস্তার ক'রে হিস্‌ হিস্‌ ক'রে দুলছে বিলের সম্মুখেই, আর বিলে ঠিক তেম্‌নি বসে আছে,—নিশ্চল, নির্ব্বিকার, ধ্যান-স্তিমিত-চক্ষু বুদ্ধের মত। খল বিষধর ভুজঙ্গও যেন ভুলে গেছে তার ক্রুর প্রবৃত্তি সেই অখণ্ড মনঃ-সংযোগ প্রভাবে। যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে সে কোন সম্মোহন-মন্ত্রে।

বিবর্ণ পাংশু মুখে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরী। সমান তালে দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে লাগলো দারুণ শঙ্কায়—দুটি স্নেহাতুর অধীর হৃদয়! কিন্তু কি করবেন তাঁরা?…কোনরূপ চঞ্চলতা দেখালে—অথবা চীৎকার করলে—সাপ হয়ত ক্রুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বিলের মুখের ওপরই ছোবল মেরে বসবে।—ভাবতেও দারুণ শঙ্কায় শিউরে উঠলেন দুজনে!

এদিকে সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষীণ চাঁদের স্বল্প আলোকে জায়গাটার বুকে জমে উঠেছিল অস্পষ্ট আলো-আঁধার। নিরুপায় জনক-জননী ভগবানের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে উদ্বেগভরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন স্থানুর মতো নিশ্চল—নিথর!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটু পরেই সাপটা ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে—স্বাভাবিক বক্রগতিতেই আপনা থেকে চলে গেল সে জায়গা ছেড়ে। রুদ্ধশ্বাস জনক-জননী এতক্ষণে শ্বাস ফেললেন।…মরা দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো তাঁদের।…ব্যাকুল অধৈর্য্যভাবে দুইজনে এসে বিলের হাত দুটি ধ'রে নাড়া দিলেন সবলে—'এই বিলে, বিলে,—তুই কি এম্‌নি ক'রে কোন্‌দিন মরবি রে? এক্ষুনি যে সাপের মুখে প্রাণটা গিয়েছিল!'

'অ্যাঁ—সাপ!'—মা-বাপের ঝাঁকানি খেয়ে এতক্ষণে বিলের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো—'কই সাপ?…কোথায় সাপ? আমি তো জানিনে কিছু।'—

চোখে তখনো একটা জড়িমা নিয়ে সে চাইতে লাগলো এ-দিক্ ও-দিক্।—যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে!

'সাপটা কি এখনো তোর জন্যে বসে আছে?'—মৃদু তিরস্কারের মধ্যেই এক অব্যক্ত আনন্দ ও অসীম স্নেহ ঝরে পড়লো বিশ্বনাথের কণ্ঠে,—'থাকলে তোকেও আজ আর আস্ত থাকতে হতো না।'

ভুবনেশ্বরী আকুল স্নেহে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'নে, চল বাড়ীর মধ্যে। তারপর কথা কইবি। উঃ, আজ কি সর্ব্বনাশই না ডেকে এনেছিলি রে।'—মনে মনে দেবাদিদেব আশুতোষকে স্মরণ ক'রে তিনি ব'ললেন,—'দয়াময়, আজ যে বিলে রক্ষা পেয়েছে, সে কেবল তোমারই কৃপা।'……

বিলের এই গভীর ধ্যান-নিমগ্নতা কিন্তু আজ তার জনক-জননীর মনে এক গভীর দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নই জাগিয়ে তুললো!

১৩

বিলের জন্যে বাড়ীতেই ছোটখাটো একটি পাঠশালা বসিয়েছেন বিশ্বনাথ বাবু।…সাধারণের পাঠশালায় অবশ্য প্রথমে ভর্ত্তি করা হয়েছিল তাকে।… পাঠশালাটিও তার পছন্দ হয়েছিল বেশ—সঙ্গী-সাথীও জুটেছিল মনের মত। কিন্তু হলে কি হবে?—পাঠশালায় গিয়ে বিলে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে লাগলো যে—গুরুমশায় পড়লেন মহা ফাঁফরে,—তাই ত, কেমন ক'রে এই ছেলেকে শিক্ষা দেবেন তিনি! কি করে মেটাবেন তার জিজ্ঞাসু মনের ক্ষুধা?

অগত্যা ছেলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে বিশ্বনাথকে বাড়ীতেই খুলে দিতে হ'লো এক পাঠশালা। বিলের জনকয়েক সহপাঠীও জুটিয়ে দিলেন তিনি সেখানে নিজের খরচাতেই। নইলে পাঠশালায় যে সঙ্গীগুলি পেয়েছিল,—তাদের অভাবে বিলে হয়ত অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

অবিলম্বেই সমপাঠীদের নেতা হ'য়ে উঠলো বিলে। ছেলেরা তাকে সানন্দে মেনে নিল দলপতি বলে। বলা বাহুল্য, আরও ছোটতে প্রকাশ পেয়েছে নেতৃত্ব করবার তার এই সহজাত অধিকার! ক্ষুদ্র শিশুদের ক্ষুদ্র নেতা,—কিন্তু প্রভাব তার কম নয়,—ছেলেরা তাকে ভয়ও করে আবার ভালও বাসে। সে-ও বেঁধে ফেললে সকলকে আনুগত্য ও প্রীতির বাঁধনে।

বিলে লেখাপড়াতেও যেমন অগ্রণী—খেলাধূলাতেও তেমনি। আবার কত রকম খেলা-ধূলা যে তার মাথায় আসে! দৌড়-ঝাঁপ তো আছেই, আবার কখন কখনও নিজে রাজা সেজে—আর আর ছেলেদের সাজায় কাউকে মন্ত্রী, কাউকে সেনাপতি,—কাউকে শহরকোটাল। কখনো বা কাউকে অপরাধী সাজিয়ে রাজ-দরবারে তার বিচারও চলে! বিচারের সময় বিলের সে রাজোচিত গাম্ভীর্য্য দেখলে অবাক হ'তে হয়! যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সে। কখনো বা ভাঙ্গা টিন,—কাঠের টুক্‌রো, লৌহখণ্ড ইত্যাদি এনে কারখানা বানায়,—আর নিজে সেজে বসে তার হেড ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেদের কাউকে সাজায় মিস্ত্রী—কাউকে বা কুলী। হোক্ খেলা,—কিন্তু খেলার ছলেই ছেলেদের মেনে নিতে হয় তার আদেশ।

পাল-পার্ব্বণে সঙ্গীদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে তো তার আর জুড়ী নেই। কোথাও কোন পূজো হচ্ছে, চললো সেজেগুজে—দলবেঁধে। কোথাও যাত্রা-রামায়ণ-কথকতা-কৃষ্ণকীর্ত্তন হচ্ছে—ছুটলো সেখানে তার ছোট-ছোট অনুচরের দলটি নিয়ে। আর নেতা কি সে এমনিই হ'য়েছিল? দলের মধ্যে কা'রো যদি কোন বিঘ্ন-বিপদ ঘটলো,—অমনি বিলে এল সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে তার সাহায্যে, যদি কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া হলো অমনি মধ্যস্থ হয়ে দিলে সব মিটিয়ে। দলপতির কর্ত্তব্য যেন তার অধিগত।

অবাধ-উদ্দাম প্রাণ-প্রাচুর্য্যভরা, সদা-উৎসাহী, অকপট বালক! কোন-না-কোন কাজে মেতে থাকতে চায়—অবিরাম, অবিশ্রান্ত। দুরন্তপনা তার রূপ বদলাতে সুরু করেছে দুর্জ্জয় আগ্রহে,—অখণ্ড নিষ্ঠায়;—মূককীট থেকে ক্রমশঃ জন্ম নিতে সুরু ক'রেছে যেন এক সুন্দর প্রাণবন্ত প্রজাপতি!

বিলের পড়াশোনা করার ধরণ ছিল কিন্তু এক অদ্ভুত রকমের। বাড়ীতে যে গুরুমশায় তাকে পড়াতেন, বিলে তাঁর কাছে পড়তো,—না তিনিই বিলের কাছে পড়তেন, তা' ঠিক বোঝা যেতো না। পড়া তৈরীর সময় চোখ বুজে বিলে দিব্যি আরামে থাকতো শুয়ে,—আর গুরুমশায় অনর্গল বলে যেতেন—সেদিনের পাঠ সম্বন্ধে তাঁর যা' কিছু বলবার আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে,—তারপর বিলেকে সেই পাঠ সম্বন্ধে—যে কোন দিক দিয়ে—যেভাবেই প্রশ্ন করা হোক্,—সে তার উত্তর দিত একেবারে নির্ভুল!

রাত্রে বিলে তাদের এক আত্মীয় রামচন্দ্র দত্তের কাছে শয়ন করতো। এই ভদ্র-লোকের কিছু জ্ঞান-গোচর ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণে। শুয়ে শুয়ে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনেক সূত্র বিলেকে শিখিয়ে দিতেন মুখে মুখে,—তাঁর কাছ থেকে এক বছরের মধ্যে সে মুগ্ধবোধের অনেক অংশই আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

কিন্তু বিলেকে চড়া কথা ব'ললে কোন কাজই হতো না,—শিক্ষা দিতে এসে কেউ যদি শাসনের ভাব দেখাতেন, তবেই তার মেজাজ যেতো বিগড়ে! মিষ্টিকথার সে ছিল গোলাম! ঐটুকু তো বয়স—তা সে আর কত? ছয় কি সাত বছরই হবে,—তবু যদি তার অনুচরদের মধ্যে সে কোনপ্রকার অন্যায় বা ঔদ্ধত্য দেখতো, অমনি ফেটে পড়তো বোমার মত,—কিন্তু যে মিষ্টি কথায় তার দোষ পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিত—তাকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে নাচতেও তার কুণ্ঠা ছিল না।

১৪

বিখ্যাত এটর্নি বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানাগৃহে নিত্য যে সকল মক্কেলের সমাগম হতো, তাঁদের মধ্যে যে নানা বর্ণ ও বিভিন্ন জাতি ছিল,—সে কথা বলাই বাহুল্য। আইন-আদালতে প্রয়োজন না থাকে কা'র? একজনের না থাকলেও অন্যজন তাকে টেনে আনে।

তখনকার প্রথা-অনুসারে –বৈঠকখানাগৃহে সারি সারি বড় ছোট নানারকমের হুঁকো সাজানো থাকতো। আবার প্রত্যেকটি হুঁকোই চিহ্নিত থাকতো কোন না কোনভাবে। যেমন ব্রাহ্মণের হুঁকোয় বাঁধা থাকতো—কড়ি, কায়স্থের হুঁকোয় কলম, ইত্যাদি। তামাক সাজবার জন্যে একজন চাকর অবিরতই থাকতো তটস্থ হয়ে। কত তামাক-টিকেই যে দিনান্তে পুড়তো,—তার হিসাব রাখাও ছিল সুকঠিন। মক্কেলগণ নিজের নিজের হুঁকোয় যখন তামাক খেতে সুরু করতেন,—তখন কুণ্ডলীকৃত প্রগাঢ় ধূম-পুঞ্জে—বৈঠকখানাগৃহে যেন ঘন মেঘেরই সঞ্চার হতো।

মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান। নবাবীচালে হেলেদুলে বৈঠকখানায় ঢুকে তিনি যখন "ইয়া আল্লা, খোদা তুমিই সত্য!"—ব'লে বালিশে হেলান দিয়ে নিজের হুঁকোয় টান দিতে সুরু করতেন,—তখন কোত্থেকে বিলে ছুটে এসে 'চাচা চাচা' বলে তাঁর কাছ ঘেঁসে বসতো মহা আগ্রহে।

এই মক্কেলটি সত্যই ভারী ভালবাসতেন বিলেকে। বিলে কি আশা নিয়ে এসেছে,—তা তক্ষুনি বুঝে নিতেন তিনি। অমনি সুরু হতো তাঁর—আষাঢ়ে অফুরন্ত গল্প! পাঞ্জাব, আফগানিস্থান প্রভৃতি দুর্গমদেশের কাহিনী বলে যেতেন তিনি অনর্গল। তার কোথায় যে সুরু—আর কোথায় যে শেষ,—তা তিনিই জানতেন,—কিন্তু বিলে উৎকর্ণ হয়ে শুনে যেতো সেইসব অসংলগ্ন

কাহিনী। কিন্তু তারই মধ্যে সেই অজানা-অদেখা, সুদূর—দুর্গম দেশের, যতখানি ছবি ফুটে উঠতো তার চোখের ওপর—তাইতেই তার শিশুমনে জেগে উঠতো—এক অপূর্ব্ব প্রেরণা—এক অদম্য ঔৎসুক্য।

মুসলমান ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে সন্দেশ এনে তার ক্ষুদ্র শ্রোতাটির—কানের সঙ্গে রসনাও তৃপ্ত করাতে ভুলতেন না। বিলেও বিনা-দ্বিধায় তাঁর দেওয়া মিষ্টান্নাদি 'প্রাপ্তিমাত্র' খেতে সুরু করতো পরম রুচি এবং আনন্দে। হিন্দু সন্তানের সেই কদাচার দেখে, হিন্দু মক্কেলগণ ঘৃণায় শিউরে উঠতেন,—ছিঃ ছিঃ, এ-কি অনাচার! ধর্ম্ম রসাতলে যাবে যে!

কোন কোন দিন এমনি সময় বিশ্বনাথবাবুও এসে পড়তেন বৈঠকখানা গৃহে। ব্যাপারটা তাঁর চোখ এড়াতোনা। কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্য করতেন না। অবশ্য বিলের প্রতি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এমনও কোন লক্ষণ দেখা যেতোনা তাঁর হাবভাবে। মক্কেলরাও কিছু বলবার সাহস না পেয়ে—কেবল আড়চোখে চাইতেন তাঁর দিকে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো যেন গুরুতর অভিযোগ।

বিলের কিন্তু বুঝতে বাকী থাকতোনা যে, তার মিষ্টান্ন খাওয়া নিয়ে মক্কেলদের মনে একটা অস্বস্তির ভাব জেগেছে। সরব না হলেও নীরব আলোচনা চলছে মনে মনে! কিন্তু কেন? কি অন্যায় হয়েছে তাতে? ভালবেসে 'চাচা' তাকে সন্দেশ দিয়েছেন, সে খেয়েছে; তার জন্যে এত চাপা অস্বস্তি কেন?—

* * * * *

সেদিন বৈঠকখানায় তখন কোন মক্কেল ছিল না। হঠাৎ বিলে ঢুকে চারিদিকে চাইলো একবার তীব্র দৃষ্টিতে। সারিসারি সাজানো হুঁকোগুলি কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুললো তার মনে! হুঁকোগুলি সে রোজই দেখে,—কিন্তু আজকার দেখা—আর আগের দেখায় তফাৎ যে অনেক! আজ তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক অমীমাংসিত প্রশ্ন,—এক দুর্ব্বোধ্য রহস্য!

এতগুলি হুঁকো কেন? একটি হুঁকোতেই তো তামাক খেতে পারে সকলে! অথবা সব হুঁকোই তো ব্যবহার করতে পারে সকলেই? তাতে কি তামাকে আগুন ধরবেনা, না ধোঁয়া বেরোয়না?

"আচ্ছা, এতগুলো হুঁকো কেন রেখেছ এখানে?" চাকরটা এই সময় সেখানে ঢুকতেই বিলে প্রশ্ন করলো তাকে।

ভারী কৌতুক বোধ করলো ভৃত্য ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী প্রশ্ন শুনে।—'হেঁ হেঁ খোকাবাবু',—হাসতে হাসতে পরম বিজ্ঞের মত জবাব দিল সে,—'তাও জাননা? বামুন কায়েত শুদ্দুর মোছলমান, কত জাতেরই না মক্কেল আসছে বড়বাবুর

কাছে। সবাই কি এক হুঁকো টান্‌তে পারে? হেঁ হেঁ, মামলা বুঝতে এসে কি লোকে জাত খোয়াবে খোকাবাবু?'

জাত খোয়াবে?—সে আবার কি! জাত? সে কেমন জিনিষ? খোয়াই বা যায় কেমন করে? আর 'জাত' বলে যদি কিছু থাকেই—তাতেই বা দোষ কি? মানুষ তো সবাই? একজন মানুষ আর একজনের পাত্রে না খাবে কেন? রুচিগত প্রশ্ন অবশ্য আসতে পারে? কিন্তু জাত মানা-না-মানায় কি আসে যায়? সত্যিই কি মানুষের তাতে কোন ক্ষতি হয়? কোন বিপদ ঘটে,—কিম্বা মরে যায় মানুষ?

বেশত, পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? জাত তো তা'হলে আমারও একটা আছে! আমিও তো হিন্দু-কায়স্থ;—আমি যদি ব্রাহ্মণের বা শূদ্রের—অথবা মুসলমানের হুঁকোয় টান দিই,—তাহ'লে আমারও তো কোন বিপদ ঘটবে?

বিলে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগলো। সে বালক, বাল-সুলভ মনোভাব নিয়েই হয়ত করছিল এই সব চিন্তা, কিন্তু তার চিন্তার প্রভাব যে বৃদ্ধকেও চিন্তিত করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট,—এ-ধারণা কি তার ছিল? পরীক্ষকের কৌতূহল নিয়েই—একে একে প্রত্যেকটি হুঁকোয় টান দিতে সুরু কর্‌লে সে; চাচার দেওয়া মিষ্টান্ন খাওয়ায় মক্কেলদের মনে অস্বস্তি জেগেছিল,—তাই মুসলমানের হুঁকোটিতে—সে ইচ্ছা করেই টান দিলে কয়েকটা বেশি।

ঠিক এমন সময় বিশ্বনাথবাবু এসে পড়লেন সেখানে। বিলেকে হুঁকোয় টান দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কৌতূহলী হয়ে,—ও কি হচ্ছে রে বিলে?

"এই জাত না মান্‌লে কি হয়, তাই দেখ্‌ছি।"—পরিষ্কার কণ্ঠে অকুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলে বিলে।—হো হো করে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথ বাবু সকৌতুকে,—'তবে রে দুষ্টু, তোর ঘটে ঘটে এত বুদ্ধি!'

হাসতে হাসতেই তিনি চলে গেলেন—নিজের পাঠ-কক্ষে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিলের মধ্যে আজ তিনি যেন ভবিষ্যতের এক বৃহৎ সম্ভাবনার ছায়াই দেখতে পেলেন। এদিকে বিলে তখন ভাবছে—জাত না মেনে একে একে হুঁকোগুলোয় তো টান দিলুম: কিন্তু কই, কোন বিঘ্নই তো ঘটলো না! তবে? তবে এ ঝঞ্ঝাটের কি দরকার? বিলের বাল-চিত্তে সেই গভীর প্রশ্ন জেগে থাকলো বুঝিবা ভস্মাচ্ছন্ন অনির্ব্বাণ বহ্নির মতই।

৯৫

চড়কের মেলা বসেছে। বিলেকে আর ধরে রাখে কে? এক সঙ্গীকে নিয়ে সে ছুটলো চড়ক তলায় মেলা দেখতে!

মেলায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে দেখলো নানা রকমের সুন্দর-সুন্দর মাটির ঠাকুরমূর্ত্তি বিক্রী হচ্ছে সেখানে! দুর্গা, শিব, কালী, কৃষ্ণ,—রাম, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—এবং আরও কত কি? যেমন তাদের রঙ—আর তেমনি গঠন! একটি শিবের মূর্ত্তি ভারী পছন্দ হলো বিলের। আর পছন্দ যখন হয়েছে, তখন কিনে ফেলতেই বা দেরি কি?

মূর্ত্তিটি কিনে সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো বিলে।—তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বিলে এটা ওটা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে আনমনে। কিন্তু সঙ্গীটি তার সঙ্গে সমানে চলতে না পেরে পিছিয়ে পড়েছে অনেকখানি।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে চমক ভাঙ্গলো বিলের। চকিতে পেছন ফিরে সে দেখলো—ঘোড়ার গাড়ীটা ছুটে আসছে অত্যন্ত দ্রুতবেগে। উদ্দাম হয়ে উঠেছে ঘোড়ার গতি।—আর সঙ্গী-ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একেবারে চাপা পড়ে আর কি ঘোড়ার পায়ের তলায়!

বিলের চোখের সামনে মুহূর্ত্তে যেন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে গেল! সঙ্গীর জীবন বিপন্ন দেখে—সে নিজের জীবন-মরণের কথাও গেল ভুলে। মহাদেবের মূর্ত্তিটি বগলদাবা করে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো গাড়ীটার দিকে। তারপর বিদ্যুৎগতিতে একেবারে ঘোড়াটার সামনে লাফিয়ে পড়ে—হ্যাঁচকা এক টান মেরে নিয়ে এলো সঙ্গীকে নিরাপদ স্থানে।

ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক যে, পথের দু'পাশের লোকের মনে হলো যেন একটা ভোজবাজির খেলা হ'য়ে গেল তাদের চোখের সামনে! দু'একজন আনন্দে ছুটে এসে বিলের পিঠ চাপড়ে বললে,—বাহবা, বাহবা ছেলে! বাহাদুর বটে! হ্যাঁ, এমনিই তো চাই। এমন সব ছেলে না হলে কি দেশের কল্যাণ হয়?

কেউ বা বিলেকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে বললে,—কালে তুমি একটা মানুষ হবে বাবা! তোমার মধ্যে অনেক বড় প্রাণ আছে।

বিলে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সঙ্গীকে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো। ওঃ, আজ যদি ছেলেটির কিছু হয়ে যেতো!—বিলে ভাবতে লাগলো,—কেমন করে বাড়ী ফিরতো সে? কি বলতো তার বাপ-মাকে? সেই যে তাকে

সঙ্গে ক'রে এনেছিল! কৃতজ্ঞতায় সে বারবার মহাদেবের মূর্ত্তির চরণেই মাথা ঠেকাতে লাগলো।

এদিকে ভুবনেশ্বরী তখন ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাইত, এত দেরী হচ্ছে কেন? যা ডানপিটে ছেলে, কোথায় যে কি ক'রে বসে কে জানে!

আঁধার তখন ঘনিয়ে এসেছে বেশ। ভুবনেশ্বরীর মন আর স্থির হচ্ছে না। সহসা পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন—মহাদেবের মূর্ত্তি হাতে সঙ্গীকে নিয়ে বিলে বাড়ী ফিরেছে—সম্পূর্ণ অক্ষত, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

ভুবনেশ্বরীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছুটে গেল।—"কোথায় ছিলি রে বিলে, এতক্ষণ?"—চঞ্চল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি,—"এদিকে আমি মরছি তোদের জন্যে ভেবে ভেবে। তোকে নিয়ে তো আমার একদণ্ডও সোয়াস্তি নেই বাবা!"

"না, মা, মিছেমিছি দেরি করিনি।"—শান্তকণ্ঠে মৃদু হেসেই জবাব দিলে বিলে,—ঘটনাটা সে সবিস্তারে বর্ণনা ক'রলে মায়ের কাছে।

গভীর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে—বিলের মাথায় হাত রাখলেন ভুবনেশ্বরী,—'আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তোর অন্তর আরও বড় হোক্। হ্যাঁ, মানুষের কাজই তো এই বাবা! পরের উপকারের চেয়ে মহৎ কি আর কিছু আছে—"

আনন্দে ও গর্ব্বে তাঁর কণ্ঠস্বরও গাঢ় হয়ে উঠলো! মায়ের আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ পেয়ে বিলেরও বুক ফুলে উঠ্‌লো সত্য ও মহান্ সুন্দরের প্রেরণায়।

* * * * *

"না, না, না।"—ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানালো বিলে,—"ইংরাজি আমি পড়বো না, ও তো বিদেশী ভাষা,—কি লাভ হবে শিখে? তার চেয়ে নিজের ভাষা শিখলে অনেক লাভ।"

মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে বিলে। বাড়ীর পাঠশালায় পড়াশোনা আর কত চলতে পারে? কিন্তু ইংরাজি সে কিছুতেই পড়তে চায় না। এ, বি, সি দেখলে অষ্টাঙ্গ জ্বলে যায় তার! অনেকে অনেক ক'রে বোঝায় তাকে। কেউ বলে, ইংরেজ এখন দেশের রাজা। কাজেই ইংরাজি হলো আমাদের রাজভাষা—না শিখলে কোন উন্নতিই হবে না জীবনে।

কেউ বা যোগ করে,—হলোই বা বিদেশী? ভাষা শিখতে দোষ কি? ইংরাজি ভাষা শিখলে—জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটে কত?

কেউ ভয় দেখায়,—শোন্, ইংরাজি না শিখলে,—এ যুগে মানুষ ব'লে কেউ পুঁছবে না তোকে। অমন চমৎকার ভাষা কি আর আছে রে জগতে?

"স্বদেশী ভাষার চেয়েও ?"—দৃপ্তকণ্ঠে ব'লে ওঠে বিলে। ডাগর ডাগর প্রশ্নপূর্ণ চোখ মেলে চায় সকলের দিকে। মনে মনে অবশ্য বিলের যুক্তিটাকে কেউ অসার বলেও উড়িয়ে দিতে পারে না,—সত্যিই তো—"বিনে স্বদেশী ভাষা,—পূরে কি আশা ?"

যা হোক্, শেষ পর্য্যন্ত অনেক ক'রে ক্রমাগত বুঝিয়ে বুঝিয়ে এক আত্মীয়-প্রতিম বৃদ্ধ বিলেকে রাজী ক'রে তোলেন ইংরাজি পড়তে। বিলে কি তখন জান্‌তো,—আজ যে ভাষা শিখতে সে এত ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছে—ভাবীকালের বুকে একদিন—সেই ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রে সে সমগ্র বিশ্বজনের মন মাতিয়ে তুলবে ? আর শুধু বিলেই কেন,—নিজের ভবিষ্যৎটা কেই বা জানতে পারে কোন্ দিন ?

তার যে নাম এতদিন তোলা ছিল তোলা-পোশাকের মত—সেই নামই অবশ্য লেখাতে হয়েছে স্কুলের খাতায়—সুতরাং এখন বিলে হয়েছে নরেন্দ্রনাথ বা নরেন। তবে কি আর হঠাৎ ক'রে 'বিলেকেই' বাদ দেওয়া যায় ? বাইরে যা হোক্—বাড়ীর মধ্যে বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সে পনেরো আনা বিলেই রয়ে গেছে। তবে সাধারণের কাছে তার পরিচয় এবার গড়ে উঠ্‌তে লাগলো—নরেন্দ্রনাথ বা নরেন নামেই।

* * * * *

নরেন ইংরাজি ভাষা পড়তে চাইছিল না বটে,—কিন্তু পড়তে যখন আরম্ভ করলো,—তখন আর তাকে ঠেকায় কে ? কোন বিষয়ই তাকে দ্বিতীয়বার বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। একবারই তার পক্ষে যথেষ্ট।

স্কুলে এসেও সে কিছুদিনের মধ্যে সমবয়সী ছেলেদের নেতা হয়ে ওঠে। বয়স সমান হলে কি হবে,—কি যে এক ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল তার ওই ক্ষুদ্র শরীরে,—যা কোন ছেলেই অবহেলা করতে পারতো না সহজে। এখানেও ছেলেরা তাকে যেমন মেনে চলে, তেমনি প্রীতির চক্ষেও দেখে। সেও সকলকে ভালবাসে সমভাবে। অনেক সময় কাকে সে বেশি ভালবাসে—এই নিয়ে ছেলের দলে তুমুল তর্ক-বিতর্কই পড়ে যায়।

খেলাধূলার ঝোঁকও যেন এখানে এসে বেড়ে গেছে তার। মার্ব্বেল খেলা, হুটোপাটি, ছুটোছুটি, হাডুডু, লম্ফঝম্প, ঘুষোঘুষি—এর কোনটাই বাদ দিতো না সে। আর নিত্য-নূতন কত রকমের ক্রীড়ারই না উদ্ভাবন করতো !—এই বয়সে মুষ্টিযুদ্ধেও সে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল রীতিমত। তার কঠোর শাসনে ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ বা মারামারি করবারও যো ছিল না।—

আবার আমোদ-প্রমোদ বা কৌতুকপ্রিয়তায় সে সকলকে এমন মাতিয়ে তুলতো যে, সকলে ভুলে যেতো—এই হাস্যমুখর ছেলেটিকে সময়ে ভয় করেও চলতে হত দস্তুরমত!

অস্থির-চপল-চঞ্চল সে আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। পড়ে সে আর কখন? সারাটা দিন তো খেলা-ধূলায়, আমোদ-প্রমোদে—রঙ্গপ্রিয়তায়, হাসিমস্করায় কাটে;—কিন্তু একবার যদি বই নিয়ে বসেছে, অমনি কোথা হতে এসে যায় অখণ্ড মনঃ সংযোগ,—আর একটি ঘণ্টার মধ্যেই সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে ফেলে সে-দিনের পাঠ—পড়াশুনার ফলও করে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে ঢের ভাল।

১৬

"বড় হ'লে আমি কি হব জানিস্?"—ক্লাসে ব'সে প্রশ্ন করে নরেন সহপাঠীদের। সহপাঠীরা কি উত্তর দেবে? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

"এই ছ্যাখ,"—দক্ষিণ করতল প্রসারিত ক'রে ধরে সে সকলের সম্মুখে,—"আমি বড় হলে সাধু-সন্ন্যাসী হব। এই যে সব রেখা দেখছিস্,—এ-সব সাধু-সন্ন্যাসী হবার চিহ্ন। যার তার হাতে এ-সব থাকে না। বুঝ্লি?"

বুঝুক—আর না বুঝুক,—অগত্যা সকলকে বলতে হয়,—হুঁ।

নরেন প্রশ্ন করে,—"তা তোরা কে-কে সাধু-সন্ন্যাসী হবি বল্ দেখি?"

নরেনের টানে পড়ে সকলেরই উৎসাহ জেগে ওঠে সাধু হবার। সকলেই প্রায় ব'লে ওঠে সমস্বরে,—আমি হব, আমি হব।"

মোট কথা, সাধু-সন্ন্যাসী হবার প্রেরণাটা বাল্যকাল থেকেই উপলব্ধি করতো নরেন অন্তরে অন্তরে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রেরণা নিয়েই সে যেন এসেছিল জগতে। সন্ন্যাসী হয়ে সে কি কি করবে,—তারও একটা ফিরিস্তি দিতে ভুলতো না ছেলেদের কাছে। তারপর পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করতো—"আচ্ছা, বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীরা কি করে বল্‌তো?"

সোৎসাহে ব'লে উঠতো সকলে নিজের নিজের মনের মত কথা।

"দূর বোকা!"—ধমকে উঠতো নরেন তাচ্ছিল্যভরে,—"কিচ্ছু জানিস্ না তোরা। বড় বড় সাধুরা হিমালয় পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় থাকেন,—শিবঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের দেখাও হয় প্রায়ই। হুঁ, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া বুঝি সোজা কথা! আগে ঘোর বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে গিয়ে—বড় বড় সাধুদের পায়ে ধরতে

হবে। তারা একটা লম্বা সরু বাঁশের ওপর বলবেন শুতে। যদি পারিস,—তবেই পরীক্ষায় 'পাস',—তাঁরা চেলা করে নেবেন। আর যদি না পারিস তবেই প্যাচার মত মুখ ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে হবে।"

বলতে বলতে নিজের মুখেও প্যাঁচার মুখের ভঙ্গী ফোটাবার চেষ্টা করে নরেন। প্রাথমিক পরীক্ষার কথা শুনেই কিন্তু সহপাঠীদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়! সকলেই চুপ ক'রে থাকে; নরেন কিন্তু উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বলেই যায় সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা। যেন সে সব জেনেশুনে বসে আছে এরই মধ্যে।

*　　　*　　　*　　　০

দুরন্তপনায় নরেন্দ্রনাথ এখনও কিন্তু বিলের ঠিক কাছাকাছিই রয়ে গেছে। যদিও পাড়ার সকলেই তাকে প্রীতির চক্ষে দেখে, মেয়ে-পুরুষ বড়-ছোট সকলের সঙ্গেই কোন-না-কোন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে সে, সব বাড়ীতেই তার অবারিত-দ্বার : তবু তার বেপরোয়া হাবভাব,—আর দুঃসাহসিক কাজগুলি দেখে,—সকলেই বলে, "ছেলেটির সবই ভাল কিন্তু ভারী ডানপিটে!" স্কুলের ছুটির পর কত আজগুবী কাণ্ডই না সে ক'রে বেড়ায়! তার এক সহ-পাঠীদের ছিল একটা চাঁপাগাছ। সোনার বরণ ফুলে ফুলে গাছটার সর্ব্বাঙ্গ যখন সুন্দরী তরুণীর যৌবন-শ্রীর মত ঢলঢল ক'রতে থাকে,—আর তার সুবাস চারিদিকের বাতাসকে আমোদিত ক'রে তোলে তীব্র-মধুর সৌরভে,—তখন পাড়ার এমন লোক নেই যে গাছটার প্রতি আকৃষ্ট না হয় পথে যেতে যেতে।

নরেনও এই গাছটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে;—তবে যতটা না ফুলের আকর্ষণে, অথবা সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে,—তার চেয়ে অনেক বেশি দোল খেয়ে মজা করতে। আর কি সাংঘাতিক সে দোল খাওয়া! দেখলে দুই চোখ আতঙ্কে স্থির হয়ে যায়; বুকের ভেতরটাও শঙ্কায় শিউরে ওঠে দুরু দুরু করে! গাছের ডালে পা দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, মাথাটাকে নীচু ক'রে হাত দুটোকে ছড়িয়ে সে এন্তার দোল খেয়ে যায়! ভাবনা নেই—ভয় নেই—চারিদিকে কি হচ্ছে-যাচ্ছে সেদিকেও দৃষ্টি নেই,—দোল খেয়েই চলেছে আপন মনে। পায়ের দড়ি যদি কোন রকমে ছিঁড়েই যায়, তবে যে সে কোথায় গিয়ে ছিটকে প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে,—সে সম্বন্ধেও কোন হুঁস নেই তার। নীচে দাঁড়িয়ে সহপাঠী—ভয়-বিস্ময়-উদ্বেগ-জড়িত স্থির-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—নির্ভয়-নিশ্চিন্তে দোদুল্যমান নরেনের দিকে।

হঠাৎ একদিন এই ব্যাপারটা প'ড়ে যায় সহপাঠীর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার চোখে! সমগ্র অন্তর মুহূর্ত্তে কেঁপে ওঠে বৃদ্ধের!—"এই এই, ও-কি হচ্ছে? নাম,

নাম!"—উচ্চকণ্ঠে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে আসেন তিনি গাছতলার দিকে—"অ্যাঁ, তোমার কি জীবনেরও ভয় নেই বাপু,—দড়ি ছিঁড়ে পড়লে মাথাটা যে গুঁড়ো হয়ে যাবে, সে কথা ভেবেছ? নাম, নাম।"

বৃদ্ধের বারবার অনুরোধে নরেন উল্‌টো লাফ দিয়ে ডালের ওপর সোজা হয়ে বসে—পায়ের দড়ি খুলে দ্রুত নেমে আসে নীচে।

এ দুরন্ত ছেলে তো সহজে ছাড়বে না,—বৃদ্ধ ভাবেন মনে মনে,—একে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিতে হবে;—কিন্তু যেমন-তেমন ভয় দেখানোর তো কর্ম্ম নয়!—চুপ ক'রে একটু ভেবে বলেন তিনি,—"খবরদার বল্‌ছি, আর কখন চড়তে যেয়োনা ও-গাছে। ওই গাছে এক ভীষণ ব্রহ্মদৈত্য থাকে,—যারা গাছে চড়ে, তাদের ঘাড় মট্‌কে দেয়। কোন দিন তোমারও ঘাড় মট্‌কে দেবে! বুঝলে?"

নরেন কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে থাকে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারী খুশী—হ্যাঁ, যেমন বুনো ওল্, তেমনি বাঘা তেঁতুল পড়েছে! আর ভুলেও আসবে না চাঁপাগাছের দিকে।—পৌত্রের দিকে চেয়ে বলেন,—"খবরদার, তুইও চড়তে যাস্‌নে কোন দিন।"—নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সাফল্যে আনন্দিত হয়েই ফিরে যান তিনি বাড়ীর মধ্যে।

কিন্তু যেই তিনি পিছু ফিরেছেন, অমনি নরেন আবার তেমনি চড়ে বসে গাছে। সহপাঠী শঙ্কাকুল স্বরে ব'লে ওঠে,—"ও কি, ও কি? আবার উঠ্‌লি কেন গাছে? ঠাকুরদা সত্যি কথাই বলেছে ভাই! এ গাছটাতে বেহ্মদত্যি থাকে,—আর বাগে পেলেই ঘাড় মট্‌কে দেয়। নেমে আয় বল্‌ছি শীগ্‌গির।"

ঠোঁট উল্‌টিয়ে বিদ্রূপের সুরে জবাব দেয় নরেন,—"বেহ্মদত্যি জীবটা কেমন তাই দেখবার জন্যেই তো আবার উঠলুম গাছে। আসুক না সে একবার আমার কাছে,—সে আমার ঘাড় মটকায়, না আমিই তার ঘাড় মটকাই, দেখে নিই।" তারপর পা-দুটো আবার ডালের সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে বলে,—"দুত্তেরি, তোদের যত সব আজগুবী কথা। বেহ্মদত্যি ব'লে কিছু আছে নাকি আবার জগতে? তোদের এই চাঁপাগাছে থাকে,—আর কেউ তাকে কোন দিনই দেখতে পায় না।—হুঁ, বললেই হলো অমনি!—তোর ঠাকুরদা' বলেছে বলেই বুঝি মেনে নিতে হবে! কেন? কেউ কিছু বলবে—আর অমনি বিচার-বিবেচনা না করেই—সত্যি বলে মেনে নেবো? ঠাকুরদাদারা অমন কত ভয় দেখায়! ওসব কিছু নয়।"

বেপরোয়া বালকের কথা। কিন্তু কথাগুলি সত্যই কি তাৎপর্য্যহীন?…সহপাঠী কিছু বলবার মত না পেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একদিন চাঁপাগাছে দোল খেতে খেতে ঐ সহপাঠীর পিতার নজরেই প'ড়ে যায় নরেন। ভদ্রলোক নরেনকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। গম্ভীরকণ্ঠে ডাকলেন তিনি,—"এই নরেন, নেমে এসো দেখি গাছ থেকে।"

নরেন তাঁর কথা অমান্য করলো না। পায়ের বাঁধন খুলে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে ভদ্রলোকের কাছে এসে দাঁড়াল।

"তুমি বুঝি সারাদিন এমনি দুরন্তপনা ক'রেই ঘুরে বেড়াও?" ভদ্রলোক স্বরে একটু কৃত্রিম রুক্ষতা এনেই প্রশ্ন করেন,—"লেখাপড়া বুঝি কিছু কর না?"

"কেন করবো না?"—নরেন জবাব দেয় বেশ সপ্রতিভভাবেই,—"লেখাপড়াও করি,—খেলাধূলাও করি।"

"লেখা পড়া কর,"—ভদ্রলোক মনে মনে একটু হেসে নরেনকে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করলেন,—ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের। প্রত্যেকটিরই জবাব দিলে নরেন—একেবারে নির্ভুল,—এমন কি কোন প্রশ্নেরই উত্তর ভেবে দিতে হলো না তাকে।

ভদ্রলোক তো বেজায় খুশী! "বা, বা, ঠিক বলেছো!—হ্যাঁ' পড়াশোনাও কর বটে দেখ্‌ছি।—তা' তোমার বাবা তো থাকেন লাহোরে, তোমার দেখাশোনা করে কে?"

"কেন, মা?"—যেন একটা অবান্তর প্রশ্নই করেছেন ভদ্রলোক,—এইভাবে ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দেয় নরেন,—"মা আমাকে কি কি করতে হবে—তা ব'লে দেন। তাঁর উপদেশমত আমি পড়ে যাই।"

ভদ্রলোক মনে মনে স্বীকার করলেন,—কালে এ ছেলে একটি মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রশংসা না ক'রে শুধু বললেন,—"কিন্তু দুরন্তপনা কি বেশি করা ভালো? পড়াশোনায় আর একটু মন দাও,—আরও শিখতে পারবে।"

নরেন আর কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায়। অবশ্য আর ফিরে চায় না চাঁপাগাছের দিকে।

এরপর থেকে উক্ত ভদ্রলোক নরেনের জীবনের গতিবিধির দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখতে থাকেন একান্ত আগ্রহে।

3/419

১৭

—"এই শোন্, শোন্। চুপ কর্ঃ একটা কথা আছে।" কয়েকজন ছেলে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে কিসের যেন আলোচনা করছিল। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ এসে সে আলোচনায় বাধা দিলে। ছেলেরা নরেনেরই সহপাঠী। বাধা পেয়ে তারা একযোগে আলোচনা বন্ধ ক'রে তাকালো নরেনের দিকেঃ চোখে তাদের গভীর প্রশ্ন!

নরেন বললে,—"চল্, মেটেবুরুজে বেড়িয়ে আসি।"

"কেন, সেখানে কেন?"—প্রশ্ন করলো একটি ছেলে।

"জানিস না?"—ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দিলে নরেন,—"সেখানে না-কি লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি খাঁর খুব বড় একটা পশুশালা আছে,—হেন পশু নেই,—যা নেই সেখানে। কত না-দেখা জন্তু-জানোয়ারও দেখতে পাবি। যাবি তো?"

"যাব।"—সোৎসাহে ব'লে উঠলো ছেলের দল। তারা নরেনের উৎসাহ পেয়েছে,—আর তাদের ধ'রে রাখে কে? অবিলম্বে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। অভিভাবকদের আদেশ নিয়ে—নরেনের নেতৃত্বে ছেলের দল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হলো মেটেবুরুজ যাত্রায়।...নরেন তাদের নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলো।

যাবার সময় বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই গেল তারা;—নবাবের পশুশালাও দেখলে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে। কিন্তু ফিরবার সময় নৌকায় উঠে বেধে গেল এক গণ্ডগোল। দলের একটি ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে বমি ক'রে ফেললে নৌকারই ওপর।—মাঝিরা তো রেগে আগুন! তারা সকলেই মুসলমান। রূঢ়কণ্ঠে তারা হুকুম করলো,—"এক্ষুনি আমাদের নৌকা সাফ করে দাও।"

ছেলেরা বললে,—"আমরা ডবল ভাড়া দেব,—তোমরাই সাফ করবার ব্যবস্থা কর।"

আরও রেগে উঠলো মাঝিরা। যা-তা গালিগালাজও দিতে লাগলো ছেলেদের। সাফ ক'রে না দিলে- একে একে সকলকে জলে ফেলে দেবে,—এমন ভয়ও দেখালো তারা। তাদের ভাব-গতিক দেখে ছেলেরাও প'ড়ে গেল মহামুস্কিলে; মনে মনে তাদের ভয়ও হ'লো খুব!

বয়সে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে নরেন ছোটই হবে। তবু সে দলের নেতা। কি ক'রে এই গণ্ডগোল মেটানো যায়,—সে বিষয়ে খুবই চিন্তা কর্‌তে লাগলো সে। নরম ক'রে অনেক কথা বললেও মাঝিদের।·· কিন্তু ছেলে-ছোকরা দেখে মাঝিরা তাদের পেয়ে বস্‌লো বেশি করে।—এবং নৌকা কিনারার কাছাকাছি আসতেই বললে—এই থাকলো, আমরা ঘাটে আর নৌক বাঁধছি না।···আগে সাফ কর,—তবে সে কথা।

মাঝিদের জেদ দেখে নরেন তখন উদ্ধারের উপায় ভাবতে লাগলো,—হঠাৎ তীরের দিকে চেয়ে সে দেখলো—অদূরে রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে দু'জন গোরা-পল্‌টন—আর ঠিক এই সময়ই ভাগ্যক্রমে মাঝিদের অসাবধানতায় নৌকাটা একটু কাত হয়ে ঘুরে গেল তীরের দিকে। অমনি নরেন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা ক'রে, প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে—পড়লো গিয়ে তীরের ওপর।···তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো গোরা সৈন্যদের দিকে।

ছেলেরা তখন হতবাক হয়ে গেছে অপার বিস্ময়ে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা ধাবমান নরেনের দিকে।—কি করবে সে ?

এদিকে নরেন গোরা সাহেবদের কাছে এসে যেভাবে পারলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাদের মুস্কিলের কথা জানালো সাহেবদের। তাদের সাহায্যও চাইলো উদ্ধারের জন্যে।

আট বছরের একটি সুগঠিত-তনু প্রিয়দর্শন চমৎকার ছেলে,—তার ওপর সাহেবদের কথায় যাকে বলে—'স্মার্ট'! সাহেবরা তো বেজায় গলে গেলো। যদিও হুইস্কি জাতীয় কিছু পেটে পড়ায়,—তাদের পদক্ষেপ তখন বেশ সংযত ছিল না, তবু তারা খোস মেজাজে বললে—All right my boy, all right my boy, don't you worry. নরেনের পিছু পিছু এসে উপস্থিত হ'লো তারা একেবারে নৌকার নিকট।

ছেলেদের বিস্ময়ের সীমাতো ছিলই না—ব্যাপার দেখে, মাঝি-মাল্লাদেরও তখন চোখ কপালে উঠেছে! অ্যাঁ—এ কা'দের ডেকে আন্‌লো পুচ্‌কে ছেলেটা ? এ যে দেখছি—পল্‌টনের সাহেব!···সঙ্গে সঙ্গে মাঝিদের দৃষ্টি পড়লো—সাহেবদের কটিবন্ধে আবদ্ধ রিভলবার দুটির দিকে, - অমনি ভয়ে তাদের চোখ-মুখ গেল শুকিয়ে।

এদিকে একেবারে হাতের বেত উঁচিয়েই জড়িত অথচ উগ্রকণ্ঠে গর্জ্জে উঠলো সাহেবরা,—'কাঁহে লেড়কা লোককো উত্‌রানে নেহি দেতা। জলদী উতার দেও!—নেহি তো মার ডালেগা!' হাতের বেত ঘন ঘন নেচে উঠ্‌লো তাদের।

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর, সেলাম হুজুর!—একযোগে সেলাম করতে করতে ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে বললো মাঝিরা,—আভি উতার দে'তা—আভি উতার দে'তা।—সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ঘাটে বেঁধে—বেশ যত্ন ক'রেই নামিয়ে দিল সকলকে।—কি জানি বাবা, কোমরের ঐ দুটো যদি গুড়ুম গুড়ুম করেই ওঠে!

সাহেবরা সিগারেট ধরিয়ে নরেনের দিকে চেয়ে প্রফুল্লকণ্ঠে বললে,—All right my dear boy, now good-bye.

Good-bye ব'লে নরেন এবং তার দেখাদেখি ছেলেরাও অভিবাদন জানালে সাহেবদের।

নরেনের সৎসাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বয়স্করাও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে স্বীকার করলেন—"ডানপিটে আট বছরের ছেলেটার মাথায় যে বুদ্ধি জেগেছিল—আমাদের মাথাতেও বোধ হয় এমনটি জাগতো না।…না, বাহাদুর ছেলে বটে নরেন!"

১৮

—দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথ পড়লো এগারো বছরে। দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পুষ্টি এবং বুদ্ধির প্রসারতাও ঘটেছে—দিনের পর দিন। জ্ঞানের পিপাসা ক্রমশঃই বেড়ে উঠেছে তার। নূতনকে জানবার,—নূতন কিছু শেখবার আগ্রহ এবং প্রেরণাও তাকে একদণ্ড স্থির থাকতে দেয় না।

সে বালক,—কিন্তু বালক হলেও যেন অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে স্বতন্ত্র।—বালক-সুলভ চপলতা তার যতই থাক,—তবু যেন অন্যান্যের চেয়ে সে অনেক বেশি স্থিরবুদ্ধি—অনেক বেশি চিন্তাশীল!—অনেক কিছুর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার নিজস্ব প্রতিভা! অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে দুরন্তপনা—খেলা-ধূলা, হুটোপাটি, ছুটাছুটি, লম্ফ-ঝম্ফ—সে কিছু কম করে না, বরং বেশিই করে,—তবে যখন দল হতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তার মন যেন বয়সের স্বল্পতা অতিক্রম ক'রে ঘুরতে থাকে, কোন্ এক কল্পরাজ্যে—অন্তর যেন কোন বিগত জীবনের স্মৃতির দোলায় আন্দোলিত হতে চায়!

কার যেন বিরাট সত্তা তার অন্তরে প্রকাশ পাবার জন্যে কুঁড়ির মধ্যে গন্ধের মতই রুদ্ধ আবেগে অধীর হয়ে ওঠে! তাই সে যখন ধ্যানে বসে, চোখ বোজা মাত্রই তার মন চলে যায় বাহ্যজগৎ ভুলে অন্তর্লোকে; কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের

চোখ থাকতেই চায় না বন্ধ হ'য়ে, বারবারই খুলে যায়। বইয়ের একটি পৃষ্ঠা পড়তে অন্যের যে সময় লাগে, মুহূর্ত্তে সকল বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে এনে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করার শক্তির জন্যে সেই সময়ের মধ্যে নরেন পড়ে ফেলতে পারে চার পৃষ্ঠা। এই খানেই—সাধারণ হ'য়েও সে অসাধারণ। ডানপিটে হ'য়েও প্রশংসনীয়—প্রশান্ত—সুন্দর!

বরাবরই ভুবনেশ্বরী তার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে এসেছেন,—কিন্তু তবু জননীর প্রতিই নরেন্দ্রনাথের ভক্তি অগাধ—অপরিসীম! মা—তার কাছে দেবী, মায়ের বাক্যই—তার কাছে বেদবাক্য। মায়ের নির্দ্দেশ অলঙ্ঘ্য তার কাছে। যতই কেন দুরন্ত সে হোক্ না—মাকে না জানিয়ে সে কিছু করে না,—অথবা বাইরে তাকে কেন্দ্র ক'রে যদিই বা কিছু ঘটে—বাড়ীতে এসে মাকে জানায় সে সরলভাবেই।

পুত্রের প্রতি মায়ের শিক্ষাও তেমনি কি চমৎকার!—"ফল যাই কেন হোক্ না, বাছা,—জীবনে যা সত্য ব'লে মনে করবে, তা করতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। সত্যের জন্য অনেক সময় হয়ত রূঢ় বেদনা সহ্য করতে হবে—কিন্তু তবু সত্যকে ছাড়া চলবে না কোনদিনই। কর্ত্তব্যের প্রতিও কোনদিন কোন কারণে বিরূপ হবে না। কখনো অশান্ত বা উদ্ধত হয়ো না,—কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময়ই দাঁড়াবে দৃপ্ত হয়ে।"

মায়ের শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত ক'রতে চেষ্টা করতো নরেন সমগ্র অন্তর দিয়ে। তার ক্ষুদ্র দেহের বিশাল অন্তরে যে মানুষটি থাকতো,—সে যখন জেগে উঠতো,—তখন যেন সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি,—কিন্তু তার সুপ্তির সময় আবার সে "ডানপিটে বিলে" হয়ে মিশে যেতো ছেলের দলের ভিড়ে। অবশ্য এঅবস্থাতেও তার স্বাতন্ত্র্য ছিল লক্ষ্যের বস্তু।

* * * * *

বিলাত থেকে 'সিরাপিস্' নামে ড্রেড্‌নট জাতীয় এক বিরাট মানোয়ারী জাহাজ এসেছে কলকাতার বন্দরে। নরেনের সহপাঠীদের ইচ্ছা হ'লো—সেই যুদ্ধের জাহাজখানা তারা যাবে দেখতে। কিন্তু এমনি তো আর হবে না? অনেক হাঙ্গামা আছে। কলকাতা বন্দরের বড় সাহেবের পাস ছাড়া কারো যাবার হুকুম নেই সেখানে।

তবে উপায়?...হ্যাঁ, উপায় আছে বৈকি! নরেন থাকতে উপায়ের ভাবনা কি! ছেলেরা সকলে এসে ধ'রে বসলো নরেনকে,—"ভাই, তোকে যেমন ক'রে হোক বড়সাহেবের কাছ থেকে 'পাস' আনতে হবে।...তুই ভিন্ন এ কাজ আর কেউই পারবে না।"

"কেন—তোরা আছিস কিজন্যে ?"—কৌতুকহাস্যে নরেন তাকালো সকলের দিকে।

"নে—নে, আর ঠাট্টা করিসনে।"—একজন ব'লে উঠ্‌লো ব্যগ্রস্বরে,—"ইঃ, আবার জেনেশুনে মস্করা করা হচ্ছে বাহাদুরী নেবার জন্যে! তা তোকে আর বাহাদুর না বলছে কে ?—একশ'বারই বলছি আমরা। এখন কবে যাবি বল ?"

"কবে ?"—দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠ্‌লো নরেনের—"কবে আবার কি ? আজই। এর কি আর দেরী করলে চলে ?"

নরেনের প্রাণ তখন নেচে উঠেছে আগ্রহে ও উৎসাহে। বন্ধুরা সমস্বরে ব'ল্‌লে—"যা, যা, তবে আগে সেখান থেকেই ফিরে আয়।"

বড়সাহেবের অফিস চৌরঙ্গীতে। অফিসের দরজায় উপস্থিত হ'য়ে নরেন দেখলে বড় বেগতিক। দ্বারে পাহারা দিচ্ছে—এক বিশাল দেহ, দীর্ঘগুম্ফ চাপরাশী! অধিকাংশ লোককেই ঢুকতে দিচ্ছে না সে—ভাগিয়ে দিচ্ছে। নেহাত বাছ-বিচার ক'রেই ঢুকতে দিচ্ছে কাউকে কাউকে।

প্রথমটা ভারী দমে গেল নরেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার ভেতরের মানুষটি যেন সজাগ করে তুললো তাকে! সে ধীর অথচ গম্ভীর পদে চাপরাশীর কাছে গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললো,—"দারোয়ানজী, হাম বড়া সাহেবকো সাথ দেখা করনে আয়া। লড়াইকা জাহাজ দেখেগা।"

ভ্রুকুটি ক'রে চাপরাশী চাইলো নরেনের দিকে! এতটুকু একটা ছেলে,—সে-কিনা চাইছে,—এতবড় একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে! লড়াইয়ের জাহাজ দেখবে! ইস্! আবদার আর কি! "ভাগ্ ভাগ্"—তাচ্ছিল্যের স্বরে গোঁফে তা দিতে দিতে ধমকে উঠলো সে—"নেহি যানে মিলেগা। সাহেবকো ফুরসুৎ নেই হ্যায়।"

নরেন দেখলে—এই গুঁফো বদ্‌মেজাজী চাপরাশীটার জন্যে সব মাটি হ'য়ে যায়! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অফিসের পেছনদিকে চেয়ে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—আশা-ভরসায়।···সে দেখলে—একটা সরু লোহার সিঁড়ি পেছন দিয়ে উঠে গেছে দোতালায়। সাহেবের কক্ষ দোতালাতেই।···নরেনের মনে হ'লো, ঐ সিঁড়ি দিয়েও হয়ত যাওয়া যায় বড়সাহেবের ঘরে।

তাড়াতাড়ি সে চাপরাশীর সম্মুখ থেকে সরে পড়লো। চাপরাশীটা ভাবলো,—ছেলেটা ভয় পেয়ে চলেই গেল। এদিকে নরেন ঐ সরু সিড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে দেখে—একেবারে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে সে। বেশ সপ্রতিভভাবেই পর্দ্দা সরিয়ে ঢুকে গেল সে বড়সাহেবের কক্ষে।

সাহেবের কক্ষটি তখন নানা লোকে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।···একের পর এক নিজ নিজ প্রয়োজন জানাচ্ছে সাহেবকে—অবশ্য লিখিতভাবে। নরেনও একটি দরখাস্ত লিখে এনেছিল সঙ্গে ক'রে। একটু সুযোগ পেতেই সে এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে সেলাম ক'রে দরখাস্তটি ধ'রে দিলে—টেবিলের ওপর সাহেবের সম্মুখেই।

সাহেব একবার নরেনের মুখের দিকে চাইলেন, তারপর চাইলেন দরখাস্তের দিকে। তারপর একটু হেসে দরাজ সহি দিলেন—দরখাস্তের ওপর।

নরেনকে তখন আর পায় কে! কাগজখানি নিয়ে—পকেটে ভ'রে আর লোহার সিঁড়ি দিয়ে না নেমে সোজা পথেই সে নেমে এলো নীচে। তাকে দেখতেই চাপরাশী বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠলো—"আরে, তোম্ ক্যায়সে উপ্‌রমে গিয়া থা!"

"হাম যাদু জান্‌তা হ্যায়।"—গর্ব্বিত ভঙ্গীতে, অথচ কণ্ঠে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে, উত্তর দিলে নরেন।

চাপরাশীর চাড়া-দেওয়া গোঁফের আগা যেন একটু নেমে গেল,—মুখখানা আমসীর মত করেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে!

এরপর আর কি? নরেন অনুচরদের নিয়ে হল্লা করতে করতে বন্দরে গিয়ে—জাহাজ দেখে এলো।···

১৯

সেদিন স্কুলে ঘটলো আবার এক কাণ্ড। ক্লাসের একটি ছেলে পড়া ব'লতে না পারায় শিক্ষকমহাশয় দিক্-বিদিক ভুলে প্রহার করছিলেন তাকে নির্ম্মমভাবেই। ছেলেটি পড়াশোনায় একটু অমনোযোগী; আর এই শিক্ষকের বিশ্বাস,—দুষ্ট-ছেলেকে শায়েস্তা করতে হ'লে কঠোর বেত্রদণ্ডই তার অমোঘ ঔষধ।

ছেলেটির নির্য্যাতন দেখে ব্যথায় ও উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠছিল নরেনের অন্তর! কিন্তু শিক্ষককে বাধা দেবার কি অধিকার আছে তার? প্রহারের সময় শিক্ষকমহাশয় রাগের দাপে যে-সব বিকৃত অপরূপ মুখ-ভঙ্গী করছিলেন,—তা দেখে নরেনের উত্তেজনাটা কিন্তু পরিণত হলো উপহাসে। সে হঠাৎ হেসে উঠলো জোরে!

আর যায় কোথা? এত বড় অশিষ্টাচার বরদাস্ত করলে দুনিয়া যে উল্‌টে যাবে! ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মত এগিয়ে এসে নরেনের চুলের মুঠি ধ'রে তার গালে কষে দুই

চড় দিয়ে গর্জ্জে উঠলেন শিক্ষক,—"আমার কাছে বেয়াদপি? বল, আর হাস্‌বি না।"

—মাথা নুইয়ে গুম হ'য়ে থাকলো নরেন। তার নীরবতা উত্তেজিত শিক্ষককে আরও রুষ্ট ক'রে তুল্‌লো। তাঁর মনে হ'লো—ছেলেটা তাকে অগ্রাহ্য করছে। চঞ্চল প্রকৃতি ব'লে কোনদিন নরেনের প্রতি শিক্ষকটির সুনজর ছিল না;—আজকের ব্যাপারে তাকে দস্তুরমত শায়েস্তা করবার যেন একটা জেদ চেপে গেল শিক্ষকের মাথায়। বেদম প্রহার ক'রতে ক'রতে তিনি নরেনের কান ধ'রে এমন জোরে টান দিলেন যে—কান ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে লাগলো ঝর ঝর করে!

আর সহ্য হলো না নরেনের—সিংহশিশুর মতই গর্জ্জে উঠলো সে—"খবরদার বলছি, আর মারবেন না। এভাবে আমাদের মারবার কি অধিকার আছে আপনার?"

ঠিক এমন সময় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর যাচ্ছিলেন বারন্দা দিয়ে পেরিয়ে; নরেনের দৃপ্ত কণ্ঠে চমকে উঠে থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি। এদিকে নরেন তাঁকে দেখতে পেয়েই—নির্ভীকভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তার অবস্থা দেখিয়ে দৃঢ় স্বরেই বললে,—"দেখুন, স্যার কিভাবে মেরেছেন আমাকে মাষ্টার মশায়; এ রকম যদি হয় এবং এর যদি প্রতিকার না হয়,—তাহলে আমি এ স্কুল ছেড়ে দেব।"

নরেনের কানের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন কোমলপ্রাণ বিদ্যাসাগর,—উঃ, এ লোকটা শিক্ষক না পাষণ্ড!...শিক্ষকদের এই অমানুষিক ব্যবহারে যে তাঁর স্কুলের বদনাম হবে!...তিনি উত্তেজিতভাবে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে রূঢ়কণ্ঠে তিরস্কার করলেন শিক্ষককে—তুমি মানুষ, না পশু?...শিক্ষকের কর্ত্তব্য না বুঝেই এসেছ শিক্ষকতা করতে? এটা কি খুন করার জায়গা না কি?... সাবধান,—তোমার ব্যবহারে আর কোনদিন যদি কোন ত্রুটি দেখি,—তবে সেই দণ্ডে আমি তোমায় তাড়িয়ে দেব।

হঠাৎ কারো রুটি মারতে স্বভাবতঃই কাতর ছিলেন বিদ্যাসাগর, তাই এ-যাত্রা শিক্ষকটি রক্ষা পেয়ে গেলেন কোনরকমে। এরপর বিদ্যাসাগর নরেনকে অনেক সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে ক্লাসে যেতে বললেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহস্পর্শে ও ন্যায় বিচারে মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল নরেনের।

ক্লাসের ছেলেরা কিন্তু আজ বেশ বুঝলে,—নৈতিক সাহস কা'কে বলে।—আর কেমন ক'রেই বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। তাদের কারো ওপর এই নির্য্যাতন হ'লে, তার সাহসই হতো না,—মাষ্টারের বিরুদ্ধে এমনি অভিযোগ করার। অথচ নরেনই ছিল ক্লাসের সব ছেলের চেয়ে বয়সে ছোট।... কিন্তু বিশেষত্ব তো তার এইখানেই!

* * * * *

মেট্রোপলিটান স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণী-সভা। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন দেশপ্রেমিক বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিতোষিক বিতরণের পর এই সভার মধ্যেই স্কুলের একজন বিদায়ী শিক্ষককে ছাত্রদের পক্ষ হতে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে।

কিন্তু সময় যখন এসে পড়লো—তখন ছেলেরা সব ভেবেই আকুল। শিক্ষকের বিদায়-অভিনন্দনে ছাত্রদের পক্ষ থেকে তো কিছু বলা দরকার ?...কিন্তু বলবে কে ?···একে তো সভা-সমিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখ খুলে কিছু বলাই ছিল ছেলেদের পক্ষে শক্ত ; তার ওপর সভাপতির আসনে বসে আছেন সুরেন্দ্রনাথ। অত বড় দেশ-বিশ্রুত বক্তার সাম্‌নে এগিয়ে এসে একটি কথাও উচ্চারণ করার মত সাহস আছেই বা কার ?···

সহসা নরেন ধীরপদে অকম্পিত হৃদয়ে এগিয়ে এলো সভাপতির আসনের কাছে।···ছেলেদের জোড়া জোড়া চোখ বিস্ময়ের আধিক্যে দীপ্ত হয়ে নিবদ্ধ হলো নরেনের দিকে। এগিয়ে এসেছে নরেন,—কিন্তু বুক ঢুই ঢুই করতে লাগলো অন্যান্য ছেলেদের।

নরেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। শ্রদ্ধেয় সভাপতিকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে, সে পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় সুস্পষ্ট উচ্চারণে প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা করলো—সেই শিক্ষকের গুণাবলী এবং তাঁর বিদায়ে ছাত্রদের অন্তরে যে বেদনা জেগেছে, তার বর্ণনা ক'রে।

বক্তৃতার শেষে সভার চারিদিকে উঠলো মৃদু কলগুঞ্জন। ছেলেদের তো কথাই নেই—উপস্থিত শিক্ষকগণ—এমন কি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথও বিস্মিত হলেন কিশোর নরেনের ইংরাজির জ্ঞান ও বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে।

মুগ্ধচিত্তে সুরেন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেন নরেনের,—স্নেহ-পূরিত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করলেন তাকে প্রাণভ'রে।

সভা ভাঙ্গলে ছেলেরা নরেনকে ছেঁকে ধরলো চারিদিক থেকে। মহা উল্লাস পড়ে গেছে তখন তাদের মধ্যে।—"আজ তোর থেকেই আমাদের সকলের মুখ রক্ষা হ'লো ভাই।"—বললো তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, নরেনকে আলিঙ্গন ক'রে। "ভবিষ্যতে তুই খুব বড় বক্তা হ'তে পারবি।"

কোনরূপ স্পর্দ্ধার ভাব কিন্তু দেখালো না নরেন। মুখে ফুটে উঠলো তার সহজ সরল হাসি ! ছেলেদের সকলের সঙ্গে সমান আনন্দে যোগ দিল সে—একটি সাধারণ ছেলের মতোই।

* * * শ্রীউমাশংকর সরকার

নরেন গেছে থিয়েটার দেখতে। এক সৌখিন নাট্য-সংঘ করছে এই অভিনয়।
…বয়স তখন তার মাত্র চৌদ্দ বছর—পড়ছে মেট্রোপলিটান স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণীতে—আজকাল অবশ্য তাকে বলে অষ্টম শ্রেণী।

খেলাধূলা, ব্যায়াম, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির ন্যায় সঙ্গীত-বাদ্যের ওপরও ছোটবেলা থেকে নরেনের ঝোঁক ছিল প্রবল। বিশেষ আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সহিতই সে করতো সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা। ভাল ভাল ওস্তাদের কাছ থেকে সঙ্গীত বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য কথাও সে জানবার চেষ্টা করতো অদম্য কৌতূহলে।… গান শুনতে শুনতে সে সম্পূর্ণ গানটি আয়ত্ত ক'রে ফেলতো একেবারে নিখুঁত; সুর-লয়-তাল—কোথাও কোন ত্রুটি হতো না।…এমন কি কোন গানের ছন্দটি মাত্র দেখে সে তার সুর, তাল ইত্যাদিও ঠিক ক'রে নিতে পারতো নিপুণ সঙ্গীত-শিল্পীর মতোই।

সঙ্গীত চর্চ্চার দিকে যেমন ছিল আকর্ষণ—গলাটিও ছিল তেমনি মধুর—চিত্তমোহী। ইতিমধ্যেই সুকণ্ঠ ব'লে অনেকের প্রশংসা লাভ করেছিল সে: সঙ্গীতের আরোহে ও অবরোহে তার সুললিত কণ্ঠের অমিয় সুর যখন ওঠা-নামা করতো, তখন শ্রোতৃবৃন্দের সমগ্র হৃদয়-মন যেন সব কিছু ভুলে ডুবে যেতো সেই মূর্চ্ছনার উচ্ছল তরঙ্গে।

গীতবাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকায় নাট্যাদি অভিনয়ের দিকেও ঝোঁক ছিল তার। কোথাও কোন ভাল নাট্য-সম্প্রদায় কোন ভাল বই অভিনয় করছে শুনলেই নরেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতো আগ্রহভরে। কোন কোন নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ বেছে নিয়ে অভিনেতাদের মত আবৃত্তি এবং অঙ্গভঙ্গী ক'রেও সে আনন্দরস উপভোগ করতো প্রচুর।

আজও নরেন এসেছে তার স্বাভাবিক আগ্রহ এবং অনুরাগ নিয়ে অভিনয় দেখতে। দর্শকের সংখ্যা বড় কম হয়নি। অভিনয়ও জমে উঠেছে বেশ! অভিনেতারা সকলেই স্ব-স্ব ভূমিকায় সু-অভিনয় ক'রে একটি আনন্দময় মধুর পরিবেশ গড়ে তুলেছে! দর্শকগণ মুগ্ধ হয়ে দেখছে সেই সুন্দর অভিনয়।

সহসা রসভঙ্গ ক'রে ধ্বনিত হ'লো কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। চকিতে সকলেই চেয়ে দেখলো,—একজন আদালতের পেয়াদা হাজির হয়েছে সেখানে। প্রধান যে অভিনেতা তাকে একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে সে বলছে,—আইন ও আদালতের হুকুমে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। আপনাকে এক্ষুনি এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

মুহূর্তে—নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো রঙ্গস্থল! বুঝিবা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা বাজ খসে পড়লেও লোকে স্তব্ধ হয়ে উঠতো না এভাবে! কি সর্ব্বনাশ!—প্রধান অভিনেতাকেই যদি এ সময় গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়, তবে তো এমন জমাট অভিনয় একেবারে পণ্ড! অথচ আদালতের হুকুমঃ অমান্য করবার মত দুঃসাহসই বা কার আছে?

বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো সকলের চোখমুখ! চারিদিক থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ উঠে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও থমথমে ক'রে তুললো।

কিন্তু আচম্বিতে সকলের বিস্ময় উদ্রেক ক'রে ধ্বনিত হলো কার একটি সুস্পষ্ট সতেজ কণ্ঠঃ যান, যান আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যানঃ অভিনয় শেষ হ'লে গ্রেপ্তার করবেন। এতগুলি লোকের মনঃক্ষুণ্ণ ক'রে, আশা-আগ্রহ ভেঙ্গে দিয়ে, ওকে এখন এখান থেকে ধ'রে নিয়ে যেতে আমরা দেবো না,—না কখনোই না।

সকলের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলোঃ কে এই তেজোদৃপ্ত নির্ভীক?…দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কার এ কণ্ঠস্বর?—কিন্তু আর কার হবে!—সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো বক্তা নরেন, দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আদালতের পেয়াদাকে নিষেধ করছে!—দেখাদেখি অন্যান্য লোকের বুকেও সাহস জেগে উঠলো, তারাও গর্জ্জে উঠলো এবার—ঠিক, ঠিক, এ সময় ওকে আমরা কিছুতেই গ্রেপ্তার করতে দেবো না। অভিনয় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।

আদালতের পেয়াদাটি স্তব্ধ হয়ে গেলো।—আইন তার পেছনে থাকলে কি হবে, সম্মিলিত জনতার দৃঢ় প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে উক্ত অভিনেতাকে ধ'রে নিয়ে যাবার সাহস হলো না তার। অগত্যা তাকে অপেক্ষা করতে হলো অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত।

দর্শকগণ শতমুখ হয়ে উঠলো নরেনের প্রশংসায়—সাবাস ভায়া, সাবাস! আজ তুমি না থাকলে—আমাদের জমাট আনন্দটা মাঠে মারা যেতো।… বাহাদুরী আছে তোমার।

মনে মনে সকলেই স্বীকার করলে,—নরেন শুধু অসাধারণ নয়, অতুলনীয়ও বটে!

২০

মধ্যপ্রদেশ—রায়পুর।

…বিশ্বনাথবাবু বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে এসেছেন আজ কয়েক মাস। কিছুদিন হ'লো—পুত্রদের নিয়ে ভুবনেশ্বরীও পৌছলেন এসে রায়পুরে স্বামীর কাছে।…বলা আবশ্যক যে, নরেনের পর আরো দু'টি পুত্র লাভ করেছেন তিনি। বড় 'নরেন্দ্রনাথের' নাম-অনুসারে তাদের নাম রেখেছেন মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। ছোট ভাইদের প্রতি নরেনের প্রগাঢ় মমতা!

সে বছর নরেন পড়ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে—সুতরাং পড়াশোনা বন্ধ রেখেই তাকে আসতে হয়েছে পিতার কাছে।

তখন রেললাইন ছিল মাত্র নাগপুর পর্য্যন্ত। অথচ নাগপুর থেকে রায়পুর ছিল—বহু দূর। সুদীর্ঘ দুর্গম পথ গো-যানের সাহায্যে অতিক্রম ক'রে পৌছতে হ'তো রায়পুরে।—আবার সময় কি লাগতো কম? পূরো দুটি সপ্তাহ ধ'রে চলেও শেষ হ'তো না।

দুর্গম হ'লেও—পথ ছিল বিচিত্র ও মনোরম শোভা-সম্পদে পূর্ণ।…সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই যেন প্রকৃতি এক মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। শ্যামল তরুলতাগুল্ম—নানাবর্ণের অপূর্ব্ব-সুন্দর ফুলে-ফলে মণ্ডিত হয়ে পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে অনুপম সৌন্দর্য্য-সম্ভার নিয়ে। নীরব ভাষায় প্রচার করছে যেন অনাদি-অনন্ত কালের পরম এক শাশ্বতবাণী। বিচিত্র বর্ণের—বিচিত্র গঠনের নানাজাতীয় বিহঙ্গকুল গাছে-গাছে শাখায়-শাখায় নেচে বেড়াচ্ছে বিপুল পুলকে;—আর চারিদিক মাতিয়ে তুলছে মধুর কাকলীর তানে!—দুই পার্শ্বে ধ্যান-গম্ভীর স্থবির ধূর্জ্জটির মত বিন্ধ্য-অচলের সুউচ্চ শৃঙ্গমালা স্পর্শ করছে যেন সুদূরের অনন্ত নীলাকাশ। বিন্ধ্যাটবীর নিবিড়তাও মাঝে মাঝে মনকে নিয়ে যাচ্ছে কোন এক অতল গভীরতায়।

গো-যানে যেতে যেতে নরেন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে পথের দুই পার্শ্বের সেই মধুর মৌন-গম্ভীর দৃশ্যাবলী। দেখতে দেখতে যেন কোন্ অজানার ডাকে—কা'র অপার মহিমায় তার প্রাণের কন্দরে জেগে উঠছে এক অপূর্ব্ব ভাবের কল-কল্লোল। প্রকৃতির ভাবরাজ্যে মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে সে আত্মহারা হয়ে।

এখন সে যেন আর বালক নয়। তার অন্তরে সুপ্তি থেকে জেগে উঠেছে যে, সে এক পরিপূর্ণ মানুষ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে যখন সে ডুবে যায় ধ্যানের মধ্যে, তখন যেন কোন এক প্রবুদ্ধ ভাবুক আত্মা তার চিত্তকে সমাহিত ক'রে তোলে অপূর্ব্ব

প্রেরণায়—দৃশ্যতঃ তখন সে অল্পবয়স্ক বালক—কিন্তু অন্তরের অনুভূতির গভীরতায় সে তখন তার প্রকৃত বয়স অতিক্রম ক'রে চ'লে যায় বহু উচ্চে।

ধ্যানমগ্ন—আত্ম-সমাহিত অবস্থায় একবার তার কতক্ষণ কেটে যায়,—সে তা' টেরও পায় না। যখন ধ্যান ভাঙ্গলো—তখন সে দেখে বহুদূর পথ অতিক্রম ক'রে চলে এসেছে তারা। পেছনে পড়ে আছে নিবিড় বনানীর দিগন্তব্যাপী অস্পষ্ট ধূসর ছবি।—আর দূর-দূরান্তের এক ক্রম-বিস্তৃত বিলীয়মান পটভূমি।

* * * * *

রায়পুরে স্কুল ছিল না। কিন্তু বিশ্রামরত পিতার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গলাভ এর পূর্ব্বে নরেনের জীবনে আর ঘটেনি কোনদিন। পিতার উপদেশ, শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা—তার জ্ঞান-পিপাসু চিত্তকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করতে লাগলো—নানা উৎকৃষ্ট অবদানে। পিতার জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, উদার মনোভাব—এসবেরই ওপর নরেনের শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর। পিতৃ-সাহচর্য্যে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার যতই পূর্ণ হয়ে উঠতো, ততই তার চিত্তের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যেতো অদম্যভাবে।

আর বিশ্বনাথবাবুর শিক্ষার ধারাও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মামুলী পথে শিক্ষাদান তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। নানা বিষয়ের অবতারণা ক'রে তিনি তীক্ষ্ণধী, সূচ্যগ্রবুদ্ধি পুত্রের সঙ্গে মনের ভাবের এবং মানসিক সম্পদের আদান-প্রদান করতেন।···প্রশ্নোত্তর ছলে—বহু বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা চলতো পিতা-পুত্রে। তর্কও বেধে যেতো উভয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে।··· সে তর্কে অনেক সময় জয়লাভ করতো নরেন। পুত্রের জয়ে—জননী ভুবনেশ্বরীর বুক গর্ব্বে-আনন্দে ভরে উঠ্‌তো। পিতাও প্রাণখোলা গৌরবের হাসি হেসে অভিনন্দিত করতেন পুত্রকে।

পিতৃবন্ধু অনেকেই আসতেন বেড়াতে নরেনদের বাসায়। বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুর যে-সব বিষয়ের আলোচনা হতো,—তা দুরূহ হোক্ আর সহজই হোক্—প্রয়োজন বুঝলে নরেন নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে ছাড়তো না সে-সব বিষয়ে। বালকের বুদ্ধিমত্তা দেখে তার পিতৃবন্ধুগণও মুগ্ধবিস্ময়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো নরেনের প্রতিভা-দীপ্ত মুখের দিকে।

একদিন এক ভদ্রলোক নরেনের বক্তব্য সম্বন্ধে সহসা বিরূপ মন্তব্য ক'রে বসেন। পরম বিজ্ঞের মত নরেনের বালসুলভ জ্ঞানবুদ্ধির উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন,—দেখ বাবা, তুমি নেহাত ছেলেমানুষ—এসব বিষয়ে তোমার অধিকার আসতে এখনও দেরি আছে ; বয়স যখন বাড়বে—তখন বুঝতে পারবে নিজের ভুল।

কিন্তু নরেনের বিশ্বাস ছিল—তার বক্তব্য অভ্রান্ত, কোনদিক দিয়েই তার অসারতা প্রমাণ হবার নয়। কাজেই সে দৃপ্তস্বরেই ব'লে ওঠে,—'কিন্তু আপনি কি মনে করেন জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে বয়সের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে ?··· বয়স অল্প হ'লেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হ'তে এমন তো অনেককেই দেখা গেছে। আবার অনেক বয়স্কের মধ্যেও দেখা গেছে,—শিশুর মতোই অবজ্ঞতা অথবা জ্ঞানের অভাব। আপনি আবার ভেবে দেখুন,—আমি যা ব'লেছি, তা নির্ভুল।'

শেষের দিকে নরেনের কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার ভাব। তাঁর সেই কণ্ঠে চমকে উঠ্‌লেন ভদ্রলোক,—এবং যা'কে বালক ব'লে তুচ্ছ ক'রেছিলেন—তার কথা আবার ভাবতে লাগলেন গভীরভাবে।···শেষ পর্য্যন্ত তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো—নরেনের কথাই ঠিক।

*   *   *   *   *

পুরুষ মানুষ হ'লেও বিশ্বনাথবাবু সখ ক'রে নিজের হাতে দু'একটা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতেন।—পাচক-পাচিকাদের বলতেন পরিহাসভরে—'দেখো, রান্না কাকে বলে।'—রায়পুরে এসেও মাঝে মাঝে তাঁর এই সখ জেগে উঠ্‌তো।—রন্ধনের সময় নরেনকে ডেকে বলতেন তিনি হাসতে হাসতে—'শিখে রাখ্, শিখে রাখ্,—যা শিখে রাখ্‌বি, জীবনে তাই একদিন কাজে লাগ্‌বে। রান্না-বান্না করাও একটা শিল্প-বিশেষ।'

আনন্দে যোগ দিত নরেন পিতার সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী এতে যথেষ্ট আমোদ বোধ করতেন। এই রায়পুরে আর আর বিদ্যার মত রন্ধন-বিদ্যাও শিখে ফেলেছিল নরেন নিপুণভাবে।···

*   *   *   *   *

দু'বছর পরে বিশ্বনাথবাবু সকলকে নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। এই দু'বছরে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে আরও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে নরেন। ···নিজের প্রতি একটা মর্য্যাদাবোধও জেগে উঠেছে তার অন্তরে। আত্মবিশ্বাসও আগের চেয়ে অনেক প্রবল—অনেক দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে।

রায়পুরের জলবায়ুতে তার স্বাস্থ্যও গড়ে উঠেছে—ভেঙ্গেচুরে নূতন হয়ে। সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যেন উদ্দাম গতিতে,—কিন্তু সে প্রবাহ আবিল নয়,—সম্পূর্ণ অনাবিল। চোখে-মুখে ফুটে উঠছে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি—প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোক। পিতার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানালোকের স্পর্শে এবং স্বীয় সহজাত বুদ্ধির প্রভাবে স্কুলের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষাই লাভ করেছে সে সেখানে।

তবু মুস্কিল বাধলো তার পড়াশোনা নিয়েই।…দীর্ঘ দু'বছর সে স্কুলে অনুপস্থিত; —যে শ্রেণীতে সে পড়ছিল দু'বছর আগে—স্কুলের নিয়মে তাকে পুনরায় ভর্ত্তি হতে হয় সেই শ্রেণীতেই। কিন্তু নরেনের প্রবল ইচ্ছা এবং বিশ্বনাথবাবুরও তাই,—সে সাম্‌নের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে। অনর্থক দুটো বছর নষ্ট হোক্—এ কামনা পিতা-পুত্র কারুরই নয়।

শিক্ষকেরা কিন্তু কোনক্রমেই নরেনের নাম তুলতে চাইলেন না প্রথম শ্রেণীতে।…তাও কি হয় কখনও? পুরোপুরি দু'টি বছর যে ছেলে স্কুলের পাঠ্যক্রম-অনুযায়ী পড়াশোনাও ক'রলো না - তার নাম কেমন ক'রে, কোন্ যুক্তিতে—পরীক্ষার মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে—প্রথম শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে?…শিক্ষাবিভাগের বিধি-নিষেধের বাইরে যাওয়াও তো সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথবাবুর চেষ্টা বিফল হলো না। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ-স্থানীয় প্রভাবশীল ব্যক্তিদের বিশেষ অনুমতিতে নরেনের নাম তোলা হ'লো প্রথম শ্রেণীতেই। পুত্রের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ওপর বিশ্বনাথবাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ—তাকে সুযোগ দিলে সে যে অবহেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বে সাফল্যের সঙ্গে,—এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা দুর্ব্বলতাও ছিল না তাঁর মনে।

এই সুযোগ পেয়ে নরেনেরও উৎসাহ জেগে উঠলো প্রচুর। পরীক্ষার তখন কয়েকমাস মাত্র বাকী।…তা হোক্, তবু নরেন মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো,—যেমন করেই হোক্ প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়ে প্রস্তুত হ'য়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে; এবং উত্তীর্ণ হ'বে বিশেষ সাফল্যেরই সহিত। যে সুযোগ দিয়েছেন তাকে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ,—তার মর্য্যাদা সে অক্ষুণ্ণ রাখবেই।

অসাধারণ অধ্যবসায়ে নরেন—ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তার অনধীত যা কিছু ছিল,—সবই আয়ত্ত ক'রে ফেললো অল্প সময়ের মধ্যেই—এবং পরীক্ষাও দিল যথাসময়ে। পরীক্ষার ফল বার হতে আশ্চর্য্যের সহিত সকলে দেখলো—সে বছর একমাত্র নরেনই মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম বিভাগে।

পুত্রের এই বিস্ময়কর সাফল্যে বিশেষ সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত হ'য়ে বিশ্বনাথবাবু একটি সুন্দর পকেট ঘড়ি পুরস্কার দিলেন নরেনকে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও তার প্রশংসা করতে লাগলেন শতমুখে। বয়স তখন তার ষোল বৎসর।

3/419

২১

নরেন কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ। সাহিত্যের ছাত্র সে। …সম্পূর্ণ নূতন এক পরিবেশের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার পথে আজ সে অগ্রসর : কিন্তু তবু যেন মধুময় বাল্যকালের অসংখ্য মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে তার মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে।…শৈশব এবং কৈশোরের সঙ্গীদের সারল্য-প্রীতি-প্রফুল্ল মুখগুলি সহজে ভুলতে পারে না সে। এক একটি স্মৃতি যেমনি মনের মধ্যে উদিত হয়,—অমনি তার মন যেন কলেজের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে কিসের এক চাঞ্চল্যতায় ফিরে চায় অতীতের দিকে : পড়াশোনায় অখণ্ড মনোযোগিতাও যেন তার ভেঙে যায় খণ্ড খণ্ড হ'য়ে।

—কিন্তু মনের ওপর নরেনের অধিকারও ছিল অদ্ভুত। মন তাকে যেদিকেই টানুক—বল্গারুদ্ধ অশ্বের মত তাকে সংযত করবার প্রচুর শক্তি নরেন রাখে। তাই শীঘ্রই সে মন থেকে যাবতীয় চাঞ্চল্য অপসারণ ক'রে—সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে—ধীর, দৃঢ় ও নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চললো অদম্য উৎসাহে—উচ্চশিক্ষার পথে।

তবে প্রেসিডেন্সী কলেজে তার বেশিদিন কাটলো না। পর বৎসরই সে ভর্ত্তি হ'লো জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে।…খুব ভাল লাগলো নরেনের এই কলেজ। পড়াশোনাতেও এলো তার অটল মনঃ-সংযোগ। তার মার্জ্জিত বুদ্ধি,—জ্ঞান-আহরণের প্রবল অধ্যবসায়—প্রবল ধীশক্তি এবং অল্প সময়ের মধ্যে বহু সুকঠিন জটিল বিষয় আয়ত্ত করবার দক্ষতা দেখে শুধু তার সহপাঠীরাই নয়,—কলেজের অধ্যাপকগণও যেন চকিত-বিস্ময়ে চাইলেন তার দিকে। বুঝতে পারলেন তাঁরা—একটি অসাধারণ সমুজ্জ্বল প্রতিভার সমাগম হয়েছে কলেজে।

সাহিত্য, ন্যায় এবং দর্শনের ওপরই নরেনের অনুরাগ ছিল প্রবল। সুতরাং এই সব বিষয়ের অনুশীলনে একনিষ্ঠভাবেই নিমগ্ন হ'লো সে তার জ্ঞানবিদ্যার সাধনায়। ইংরাজি ভাষার ওপর খুব শীঘ্রই তার দখল জন্মালো প্রচুর। ইংরাজিতে কোন বিষয় রচনা,—ইংরাজিতে বক্তৃতা দেওয়া—ইংরাজি ভাষায় পরস্পর বাক্যালাপ ইত্যাদি বিষয়ে সে তার উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে গেল বিস্ময়করভাবে।

নেতৃত্বের অধিকার তো তার সহজাত! শৈশব এবং কৈশোরের মত সে কলেজে এসেও স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও মধুর ব্যবহারে—নৈতিক সাহস ও

দৃঢ়চিত্ততায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার সহপাঠীদের নেতৃত্বের আসন অধিকার ক'রে বসলো। সহপাঠিগণ বিপুল প্রীতি এবং আনন্দে সমগ্র চিত্ত দিয়ে মেনে নিলো তাকে দলপতি ব'লে। তার ক্ষুরধার যুক্তি এবং তর্কের মুখে অন্য সকলের যুক্তি-তর্ক যেন বাতাসে কর্পূরের মতই কোথায় উবে যেতো।··· তর্কের শ্রেণীতে (Debating Class) তারই ছিল জয়জয়কার! বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যস্থতা ক'রতে,—সমুচিত পরামর্শ দিয়ে ছাত্রসঙ্ঘের সকল সমস্যার সমাধান ক'রতে—তার প্রভাব ছিল অসীম। তাই সহপাঠিগণও নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দিয়েছিল তাকে বিনা দ্বিধায় এবং অকপট আনন্দে।

আবার কলেজে কোন বিষয় আলোচনার জন্য যখন ছাত্রসভার অধিবেশন বসতো,—তখন নরেনই নির্ব্বাচিত হতো তার সভাপতি অথবা প্রধান বক্তা।··· সে সভাপতি হ'লে সহজে অন্য কেউ প্রধান বক্তা হ'তে রাজী হ'তো না,—আবার তাকে প্রধান বক্তার আসনে বসালে—সভাপতি হওয়াও ছিল অন্যের পক্ষে সুকঠিন। যা'হোক্, ব্যাপারটা বিশেষ রঙ্গ-রহস্যের মধ্যেই নিবৃত্ত ক'রে নরেন চালিয়ে যেতো সভার কাজ।

বক্তৃতা সে যখন দিত,—তখন তার দৃঢ়, ঋজু ও উন্নত দেহ,—ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত অবয়ব, প্রদীপ্ত ললাট—অন্তর-দর্শী সমুজ্জ্বল দৃষ্টি সকলকেই আকৃষ্ট করতো নিবিড়ভাবেই।···গোমুখী-ধারার মত তার মুখ থেকে যখন অনর্গল ভাষার ফোয়ারা ছুটতো—তখন তার মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠের উত্থান-পতন, অপূর্ব্ব শব্দবিন্যাস, ভাবের আবেগ এবং বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মবিশ্লেষণ সকলকে সম্মোহিত ক'রে নিয়ে যেতো যেন এক অননুভূত আনন্দের রাজ্যে। কলেজের ইংরেজ বা ভারতীয় অধ্যাপকগণ সকলেই নরেনের গুণাবলীর জন্য প্রীত ও মুগ্ধচিত্তেই প্রশংসা করিতেন তার। তাঁরা এমন মন্তব্যও করতেন,—ভাবীকালের বুকে এই বালক যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেবে,—আজই তার অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

*   *   *   *

বিদ্যার্জ্জনের গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যেই যে তার সব সময় কাটতো,—তা নয়, সময়ে সময়ে সে এমনি হাল্কা হ'য়ে উঠতো যে, তার রঙ্গপ্রিয়তায়, কৌতুকে, অনাবিল হাস্য-পরিহাসে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে যেতো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনে—সহপাঠীদের মধ্যে যেমন কেউ তার জুড়ি ছিল না,—প্রাণখোলা আনন্দের তরঙ্গ-হিল্লোলে নিজে মেতে অপরকে মাতাতেও তেমনি সে ছিল অদ্বিতীয়।

শরীর ও স্বাস্থ্য-সংগঠক ব্যায়াম বা খেলাধুলার প্রতি অনুরাগ তো তার বেড়েই চলেছিল দিনের পর দিন : সঙ্গীতচর্চ্চা এবং নাট্যাভিনয়ও করতো সে প্রচুর আনন্দে। বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, ফারসী প্রভৃতি বহু ভাষারই সঙ্গীতে এবং নানারূপ বাদ্যযন্ত্রেও সে ইতিমধ্যে অধিকার লাভ করেছিল বড় বড় ওস্তাদদের কাছ থেকে।…ঠুংরী, খেয়াল, গজল, টপ্পা, ধ্রুপদ, চৌতাল—কিছুই ছিল না তার আয়ত্তের বাইরে।

বন্ধুবান্ধবের দল তাকে পেলে আনন্দে হৈ-হৈ ক'রে উঠতো,—'এই নরেন এসেছে,—নরেন এসেছে—এবার সুরের ফোয়ারা ছুটবে।'—চারিদিক থেকে তারা ছেঁকে ধরতো নরেনকে গান গাইবার জন্যে।…

একদিন তখনও অধ্যাপক ক্লাসে আসেননি : সহপাঠীরা তাকে ধ'রে বস্‌লো,— এই ফাঁকে গাইতে হবে একখানা গান।

'দ্যুৎ, সে কি ভাল ?'—নরেন হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,—'প্রফেসর হঠাৎ এসে পড়লে বলবেন কি ?' না, না, এখন নয়।"

কিন্তু কে শোনে তার কথা ? কোনমতেই রেহাই পেলো না সে,—শেষ পর্য্যন্ত গাইতেই হ'লো তাকে।

নরেনের সুধাস্রাবী কণ্ঠের সুর-লহরীর মূর্চ্ছনায় যখন বন্ধুরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুব্ধ হ'য়ে গেছে, এমনি সময় অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকতে গিয়েই গানের সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে থমকে দাঁড়ালেন দরজার পাশে সম্মোহিতভাবে। গান শেষ হ'লে তবে ঢুকলেন ক্লাসরুমে। নরেনের মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি একবার। কিন্তু ব'ললেন না কিছু।

গ্রীক নৃত্যকলা-অনুসারে নৃত্যবিদ্যাও বিশেষ নৈপুণ্যেরই সহিত আয়ত্ত করেছিল নরেন। তার নৃত্য ছিল উচ্চাঙ্গের ভাব-ব্যঞ্জক বীরনৃত্যের এক বিস্ময়কর শিল্প। অপরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, সুগঠিত, সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গিমায় যখন সে তালে তালে নৃত্য ক'রতে ক'রতে মধুরকণ্ঠে গান গাইতো, তখন দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই ভাবাবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকতো তার দিকে; চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যেন হুঁসও থাকতো না কারো।

বেশ ভূষার পারিপাট্য বা সৌখিন বিলাসের দিকে সে কিন্তু একেবারেই ছিল নিস্পৃহ ও অনুরাগশূন্য। সমপাঠীদের মধ্যে কাউকে যদি খুব বেশি বেশ-বিন্যাস ক'রতে দেখতো, তবে নরেন বিদ্রূপ করে ব'লতো তাকে,—মেয়েমানুষ হবি নাকি ? প্রসাধনের যে বড় চহট দেখছি ! দেখ, জন্মেছিস্‌ পুরুষ হয়ে— নারীর মত প্রবৃত্তির বশে কাপুরুষ হ'য়ে উঠিস্‌নে। পুরুষকে সবদিক দিয়ে পুরুষই হ'তে হবে। বুঝলি ?

সহপাঠী পড়তো দারুণ লজ্জায়,—চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে উঠতো তার,—অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি পালাতো সে নরেনের সম্মুখ থেকে। পরদিন কিন্তু দেখা যেতো সে অনেকটাই সংযত হ'য়ে উঠেছে!

*　　*　　*　　*　　*

এই কলেজ-জীবনেই স্থচনা হ'লো তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তনের।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস,—ভ্রমণকাহিনী, ভারতের প্রাচীন সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের অলৌকিক বিচিত্র জীবন-ধারা, ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানসমূহের বিগত গৌরবের কাহিনী ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ডুবে যেতো সে আত্মহারা সাধকের গভীর নিষ্ঠায়। মনশ্চক্ষুর সাম্নে যেন অজ্ঞাতসারেই ভেসে উঠতো তার ভাবী জীবনের পরমপ্রেয় এবং চরম শ্রেয়—এক সমুজ্জল চিত্র-রূপ।

দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিই তার আকর্ষণ ও অনুরাগ ছিল সমধিক প্রবল।—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের উৎকৃষ্ট দর্শন-গ্রন্থসমূহ প'ড়ে প্রত্যেকটি জটিল তত্ত্ব এবং তথ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে,—নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে চাইতো সে—তার মূল সূত্র।

মানুষের জীবনে যৌবনের যখন প্রথম আবির্ভাব হয়,—তখন তার রঙীন দৃষ্টির সম্মুখে তুনিয়াও যেন রূপায়িত হয়ে উঠে এক অপূর্ব্ব-সুন্দর রঙীন রূপে। লাল চশমা-আঁটা চোখে চেয়ে দেখার মত তখন চারিদিকের সব কিছুই মনে হয় লাল! উদ্দাম হয় তার মনের গতি; দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে চিত্ত ছুটতে চায় বল্গাহীন অশ্বের মত। যে সংযত হয়ে যৌবনের বীর্য্যবত্তাকে ঠিক পথে নিয়োগ করতে না পারে,—তার পতন অনিবার্য্য; কিন্তু যে যৌবন-উন্মেষিত সমস্ত শক্তিগুলিকে সংহত ক'রে চলতে পারে কল্যাণের পথে,—তারই হয় জয় জয়কার!

নরেন ছিল এই শেষোক্ত শ্রেণীর যুবক। কাঠিন্যে-কোমলতায়—সারল্যে-পবিত্রতায়,—ওজস্বিতা ও নমনীয়তায় মিলে উদ্ভিন্ন যৌবনে দিয়েছিল তাকে এক অপূর্ব্ব শ্রী! দৃষ্টি ছিল তার যেমন স্বচ্ছ—তেমনি উদার—আবার তেমনি আবিলতা-বর্জ্জিত। সেই দৃষ্টিপথে সহসা কোন 'অন্যায়' পড়লে মুহূর্ত্তে তা ভেঙ্গে যেতো খণ্ড খণ্ড হয়ে,—আর যা' ন্যায়, যা' সঙ্গত—তা' স্থায়িভাবে আসন নিতো তার চিত্তরাজ্যে।

দর্শনের মধ্য দিয়েই তার তরুণ চিত্ত-কন্দরে প্রবাহিত হতে সুরু হলো এক নবীন চিন্তার ধারা। তার জীবনে জেগে উঠলো অপূর্ব্ব এক জ্ঞান-পিপাসা। জগৎ কি? এর কোথায় আদি—অন্তই বা কোথায়? এই জড়-জগতের অন্তরালে কি আছে? এই যে অনন্ত-অসীম প্রকৃতির লীলাস্থল বিশাল বিশ্বরাজ্য,

—এর প্রকৃত কোন নিয়ন্তা আছে কি না? মানুষ জগতে আসে আবার চলে যায়; কিন্তু কি উদ্দেশ্য তার জীবনের? ধর্ম্ম কি? কোথায় তার ভিত্তি? এই যে নানাজনকে নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়,—এর মূলে প্রকৃত কোন সত্য নিহিত আছে কি-না; —না—এ শুধু পুরোহিত-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-পূরণের এক কূট চাতুর্য্যপূর্ণ বিভ্রান্তিকর পন্থা? ঈশ্বর ব'লে প্রকৃতই কেউ আছেন, না,—মানুষের স্বকপোল-কল্পিত কোন অবাস্তব সত্তাকেই মানুষ প্রচার করছে 'ঈশ্বর' ব'লে? জগতে তো বহু ঈশ্বরপ্রেমিক সাধক আছেন, তাঁদের মধ্যে দেখেছেন কি কেউ ভগবান বা ঈশ্বরকে স্বচক্ষে?

এইরূপ অজস্র চিন্তাই তার চিত্তকে মধ্যে মধ্যে অধীর ক'রে তোলে—প্রকৃত তথ্য জানবার জন্যে। অবশ্য তার মনোরাজ্যের এই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ খুবই কম। পড়াশোনা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-সঙ্গীত, সব কিছুই ক'রে চলেছে সে যথারীতি পূর্ব্বের মত,—কোন পরিবর্ত্তনই তার দেখা যায় না বাইরে থেকে,—অথবা অসাধারণ মনঃ-সংযমের জন্যে নরেন যখন যে-টি করে,—তা ক'রে সে পরিপূর্ণ অন্তরেই—অন্য কিছুর চিন্তা তখন কোনমতে বিচলিত করতে পারে না তাকে। মনোরাজ্যে তুমুল আলোড়ন চললেও তাই সে অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মের প্রতি থাকে সমান মনোযোগী এবং সমভাবেই দায়িত্বশীল। তাই কেউই বুঝতে পারে না বাইরে থেকে তার অন্তরের আলোড়ন।

কিন্তু মন তার যে জিনিষ চায়, তাও তো পেতে হবে তাকে? জানতে হবে অজানিত তথ্য: মীমাংসা করতে হবে যুগ যুগ ধ'রে যা পড়ে আছে অমীমাংসিত হ'য়ে। চলে আসছে গড্ডলিকা-প্রবাহের মতই!

মনের এই তীব্র পিপাসা নিয়ে তৃষাতুর ব্যক্তির বারি-লাভের আকুলতায় সে ছুটোছুটি করতে থাকে নানা জায়গায়, নানা ঈশ্বর-জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের কাছে। অবশ্য ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যগুলিও সে সম্পাদন ক'রে যায় রীতিমত ঐকান্তিক নিষ্ঠায়।...

২২

ঊনবিংশ শতাব্দী। বাংলার ও বাঙালীর সে এক গৌরবময় যুগ। একটি শতাব্দীর বুকে এরূপ বহু মনীষার সমাবেশ—কোন দেশে কোন একটি জাতির মধ্যে কদাচিৎই হয়ে থাকে। বাঙালী চিরদিনই মনে রেখেছে—এই সুবর্ণযুগের কথা। মনে রেখেছে এবং রাখবেও -যুগ-যুগান্ত ধ'রে। এ যে তার অতুলনীয় গর্ব্বের সামগ্রী!

—তখন বাংলার প্রতিভাকাশে ভাস্বর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় সমুদিত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-তপোবনের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। যুগাবতার—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবও হয়েছে এই যুগসন্ধিক্ষণে। সাহিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজ-সংস্কারে, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাংলার বুকে জেগেছিল প্রাণময় এক আন্দোলনের সাড়া। বাঙালী আগ্রহাকুল অন্তরে এগিয়ে চলেছিল বিরাট এক ভাবী পরিবর্ত্তনের দিকে। এই যুগেই খৃষ্টান মিশনারিগণ চেষ্টা করেছিল খৃষ্টধর্ম্মকে বাংলার মাটিতে বদ্ধমূল করতে। দেশের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকাংশে শিথিল হওয়ার ফলে কিছুকিছু সাফল্যও লাভ করছিল তারা। ধর্ম্মের নামে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, এবং কুসংস্কারপূর্ণ নানারূপ অনুষ্ঠানও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল দেশের বুকে। শিক্ষার অভাব এবং পরাধীনতার চাপেও দিগভ্রান্ত পথিকের মতই বাঙালী নেমে যাচ্ছিল অধঃপতনের স্তরে—এগিয়ে যাচ্ছিল ধ্বংসের দিকে।

—কিন্তু দেশ ও জাতির মধ্যে এতগুলি যুগপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব ব্যর্থ হতে পারে না কোনদিন। গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে রাজা রামমোহন বেদান্তের সারমর্ম্ম নিয়ে প্রবর্ত্তন করলেন—এক নব ধর্ম্ম। তা'ছাড়া—বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের অভাব দেখে তিনি দেশের কল্যাণকর বিষয়বস্তু নিয়ে সৃষ্টি করলেন গদ্য-সাহিত্য। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আত্মনিয়োগ করলেন শিক্ষা এবং সমাজ-সংস্কারে। সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু উৎকৃষ্ট নীতিমূলক পুস্তক অনুবাদ ক'রে বাংলার গদ্য-সাহিত্যের গঠন ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতেও নিয়ে এলেন তিনি এক যুগান্তর!

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো—নির্ঝরের মত বিবিধ সম্পদ-সমৃদ্ধ হৃদয়গ্রাহী কথা-সাহিত্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও বাংলার ধর্ম্মক্ষেত্রে সৃষ্টি করলেন এক অপূর্ব্ব আলোড়ন। তা' ছাড়া, পরম সাধক দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবধারা বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলে এক নবচেতনার সতেজ বীজ। ফলে, বাঙালী এক নূতন আলোক দেখতে পেয়ে সহসা চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে লাগলো ধ্বংসের পথ থেকে।

কিন্তু দেশের বুকে ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো তখনও। রাজা রামমোহন খৃষ্টান মিশনারিদের প্রভাব খর্ব্ব করলেন বেদান্তের সূক্ষ্ম, গভীর ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে। তিনি হিন্দুদের কতকগুলি কুসংস্কার এবং মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধেও তুললেন ঘোর প্রতিবাদ। বেদান্তের মত-অনুযায়ী তিনি বললেন,—"মূর্ত্তি

গ'ড়ে ঈশ্বরের আরাধনার পদ্ধতি অতি নিকৃষ্ট। 'ব্রহ্ম' সত্য, নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিকল্প। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই বস্তু—পৃথক নয়। ধ্যানে, ধারণায় ও চিন্তায় সেই এক ব্রহ্মেরই আরাধনা করা উচিত।" তাঁর এই মতের জন্যেই তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম হলো 'ব্রাহ্মধর্ম্ম'।

স্বীয় মতপ্রচারের জন্যে রাজা রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন—ব্রাহ্মসভা। খৃষ্টান মিশনারী ও গোঁড়া হিন্দুরা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করলো রামমোহনকে। রামমোহন কিন্তু বিচলিত না হয়ে স্বমতে দাঁড়িয়ে থাকলেন দৃঢ়, অবিচলিত ও অনমনীয়।

কিছুদিন পরে দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমের দূতরূপে রামমোহন যাত্রা করলেন বিলাতে—সেখানকার রাজ-দরবারে বাদশাহের বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে। যাত্রার পূর্ব্বে বাদশাহ তাঁকে সম্মানিত করলেন 'রাজা' উপাধি দিয়ে। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, তিনি আর দেশে ফিরলেন না,—বিলাতেই ব্রিষ্টলনগরে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তবু ব্যাহত হলো না ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তদীয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ সেন প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার লাভ করলো বিস্ময়কর-ভাবে। দলে দলে বহু শিক্ষিত লোক যোগ দিলেন ব্রাহ্মসভায়, দীক্ষিত হলেন ব্রাহ্মধর্ম্মে।

কিন্তু সহসা মতভেদ ঘটায়—একটি ব্রাহ্মসভা ভেঙ্গে পরিণত হলো তিনটি প্রতিষ্ঠানে। গুরুর সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় কেশবচন্দ্র পৃথক ক'রে একটি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার নাম দিলেন 'নববিধান'। আবার কেশচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ ঘটায় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্থাপন করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'।

২৩

এদিকে নরেন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্ত আকুল হয়ে উঠছে দিনের পর দিন—প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের জন্যে। অজ্ঞেয়বাদের পেছনে ছুটে নিজেকে সে আর পরিতৃপ্ত রাখতে পারছে না কোনমতে। দর্শনশাস্ত্রের গভীর থেকে গভীরতম স্থলে প্রবেশ ক'রেও সে তার অন্তর-উত্থিত প্রশ্নের কোন সদুত্তরই পায়নি। বহু জ্ঞানী সাধকের নিকট গিয়ে এবং নানাভাবে তাদের প্রশ্ন ক'রেও সে ব্যর্থ হয়েছে। মাঝে মাঝে তার চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে,—তবে কি জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের

নিয়ন্তা কেউই নেই,—বিশাল এই সৃষ্টিরাজ্যের সবকিছুই কি চলছে,—আপন ইচ্ছামত? যদি ঈশ্বর বলতে কেউ থাকেন,—তবে তিনি প্রত্যক্ষীভূত না হবেনই বা কেন? অথচ জলের আশায় ছুটে—দেখা যাচ্ছে সে জল নয়—মরীচিকা! ঈশ্বর-তত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এক 'গোলক ধাঁধাঁ'।···তবে কি 'ঈশ্বর' ব'লতে সত্যিই কেউ নেই?

কিন্তু 'ঈশ্বর নেই', ভাবতেও তার সমগ্র প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা বেদনা জেগে ওঠে: অনাদি-অনন্তকালে ধ'রে যাঁর মহিমার কথা কীর্ত্তিত হয়ে আসছে জগতে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে,—সেই পরমপুরুষকে অস্বীকার করতেও নরেনের মন সায় দেয় না: অথচ অপ্রত্যক্ষীভূত অবাঙ-মানস-গোচর কা'রো অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিতেও তার অন্তর আলোড়িত হয়ে ওঠে দারুণ সন্দেহের ধাক্কায়।

—এইরূপ ধাক্কা খেতে খেতে সে অবশেষে ঝুঁকে পড়লো ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে। যেহেতু বাংলার ধর্ম্মজগতে ব্রাহ্মধর্ম্মসভাগুলিই তখন এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছে দেশবাসীর অন্তরে। ঈশ্বরোপলব্ধির সাধনায়—বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রাহ্মধর্ম্মাচার্য্যগণ তখন অনেকখানি অগ্রসর।

তা' ছাড়া সমাজে এবং ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরুষ এবং নারীর অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সমানভাবে। নবযুগের অগ্রদূত তরুণ নরেন্দ্রনাথও মনেপ্রাণে চাইতো এই সাম্যনীতি। তবে তিনটি সমাজের মধ্যে সে এসে যোগ দিলে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। কারণ, এরা জাতিভেদ প্রথার ছিলেন ঘোর বিরোধী। আর নরেনও ছিল তাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আদি সমাজ' জাতিভেদ প্রথার পক্ষে না থাকলেও বিপক্ষে ছিল না। পক্ষান্তরে—'নববিধানের' ব্রাহ্মভক্তগণের সাধনার অঙ্গ-হিসাবে কতকগুলি কৃত্রিম হাবভাবের প্রতি মোটেই আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না নরেন্দ্রনাথের অন্তরে। কেশবচন্দ্রকে তাঁর শিষ্যগণ প্রচার করতেন ভগবান-প্রেরিত মহাপুরুষ ব'লে। ভ্রান্ত বিশ্বাসে, দুর্ব্বল যুক্তিবিচারে একথা মেনে নেওয়াও ছিল—নরেন্দ্রনাথের সচেতন মনের একান্ত বিরুদ্ধে। ফলে, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই', তাকে আকৃষ্ট করলো সমধিক।

যথারীতি সমাজে গিয়ে নরেন যোগ দিতে লাগলো উপাসনায়—মেনে চলতে লাগলো সমাজ অনুমোদিত প্রত্যেকটি বিধি।···কিন্তু তার উদার ন্যায়ধর্ম্মী চিত্তে বিদ্বেষ বা সংকীর্ণতার লেশমাত্রও ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দের অগাধ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির ওপর তার শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর।···তাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গিয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা আলোচনা করতেও সে দ্বিধা ক'রতো না কোনদিন। প্রায়ই আসতো সে এঁদের কাছে।

* * * * *

কিন্তু অনেক আলোচনা এবং বিস্তর ছুটাছুটি ক'রেও তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পেলো না নরেন। শুধু মহর্ষি বা ব্রহ্মানন্দই নন,—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকে অনেক কথাই বল্‌লেন তাকে; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন,—এমন কথা সোজা জোর দিয়ে কেউই ব'লতে পারলেন না তাকে। সকলেরই যুক্তি যেন ভাসা-ভাসা। যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অন্তর তার আকুল হয়ে উঠলো তার প্রশ্নের প্রকৃত কোন উত্তর না পেয়ে।

একদিন তো গঙ্গাবক্ষে ভাসমান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বোটের মধ্যে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ কোন জটিল আলোচনা না ক'রে—সোজা জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো মহর্ষিকে,—মহর্ষি, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন কোনদিন কি ঈশ্বরকে?

নরেনের দীপ্তিমান চোখমুখের দিকে চেয়ে মহর্ষি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সেই প্রদীপ্ত চোখে-মুখে দেখ্‌লেন তিনি এক মহাজিজ্ঞাসা,—এক অমীমাংসিত পরম প্রশ্ন।

"দেখিনি বৎস! তবে উপলব্ধি করেছি তাঁকে সমগ্র অন্তর দিয়ে।"—ধীরে ধীরে মহর্ষির কণ্ঠে কথা ফুটলো।—"তুমি সাধনা কর, তুমিও উপলব্ধি করবে। তোমার দেহে আমি যোগীর চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; তুমি গভীরভাবে ধ্যান কর,—সত্য এবং শান্তিলাভ করতে পারবে।"

মুহূর্ত্তে দমে গেল নরেন্দ্রনাথ,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষ করেননি তবে ঈশ্বরকে!···নরেনের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কথায় কথায় মহর্ষি আজ বহু উপদেশই দিলেন তাকে।

মহর্ষির প্রতিটি উপদেশই পরম শ্রদ্ধাভরে মনের মধ্যে গেঁথে নিল নরেন। কিন্তু তার আসল প্রশ্নের কোন সমাধান না হওয়ায়—অন্তরে যেন একটা গভীর অতৃপ্তি রয়েই গেল তার।

২৪

দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুরের আগমনে তাঁর আনন্দের সীমা নেই,—বাড়ীতেই একটি ক্ষুদ্র উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন—তিনি ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে।

মাতৃভাবের সাধক ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : তাঁর সাধনায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মৃন্ময়ী জগৎজননী—শ্রীশ্রীকালী চিন্ময়ী হ'য়ে উঠেছেন ;—মায়ের মধ্যেই ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছেন—পরমাত্মাকে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, শিব, দুর্গা, কালী সবাই সেই এক অদ্বয় পরমেশ্বররূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন ঠাকুরের দিব্য দৃষ্টিতে।

এখনও অনেকের ধারণা—ঠাকুর পাড়াগাঁয়ের এক অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ,—আবার একটু পাগলামিও নাকি আছে তাঁর মধ্যে। কিন্তু কত জন্ম-জন্মান্তরের বেদ-বেদান্ত দর্শন-উপনিষদ-তন্ত্র-মন্ত্রের শিক্ষা ও জ্ঞান যে ভাবের পাগল ঐ অশিক্ষিত পূজারী সরল ব্রাহ্মণের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে,—সে কথা কে বুঝবে? যে ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে, সেই জানে সে নিগূঢ় তত্ত্ব! কথায় আছে—'তুমি জানাও যারে সেইতো জানে!'—ঠাকুর যাকে জানবার সুযোগ দিয়েছেন,—সেই জেনেছে,—সেই বুঝেছে ঠাকুরের লীলা-মাহাত্ম্য।

ভাবের পাগল ঠাকুর—গান শুনতে ভারী ভালোবাসেন। কিন্তু যে-সে গান নয়,—মাতৃপ্রেমের, ঈশ্বর মহিমার—প্রাণহরা গান।···অনেক সময় গানের সুরে—সুরের রাজা সেই অব্যক্ত, অচিন্ত্যপুরুষ তার সমস্ত সত্তা নিয়ে জেগে ওঠেন—ঠাকুরের অন্তরের মধ্যে ; হারিয়ে ফেলেন তিনি বাহ্যজ্ঞান—যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর সুরে ভুলে যেতো রাধা···লাজ-ভয়-কুল-মান—সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এবং জগৎকেও।···দেখতে দেখতে ঠাকুর নিমগ্ন হয়ে যান ভাব-সমাধির মধ্যে।

—কাজেই মিত্রমহাশয় ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্যে একজন ভাল গায়কের সন্ধান করতে লাগলেন। যার অমৃত-নির্ঝর সুরে আনন্দ পাবেন সকল আনন্দের আকর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ! কিন্তু তেমন গায়ক কই? এত শীগ্‌গির পাওয়াই বা যায় কোথায়?—পাবেনই বা কাকে?

ভাবতে লাগলেন সুরেন্দ্রবাবু।···হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল নরেন্দ্রনাথের কথা! —অ্যাঁ, তাইত!—চমকে উঠলেন তিনি যেন ধাক্কা খেয়ে! বিস্মৃতি কেটে গেল তাঁর।···পাড়ার মধ্যেই তো রয়েছে অমন ওস্তাদ গাইয়ে ছেলে,—তার মধুর কণ্ঠের সাবলীল, সুমধুর সুরধারায় তৃপ্ত না হয় কে? তাকে ছেড়ে আর কাকে খুঁজতে যাবেন তিনি? ঠাকুর নিশ্চয়ই প্রীত হবেন—নরেনের গান শুনে।···আর তিলার্দ্ধ মাত্র বিলম্ব না ক'রে সুরেন্দ্রনাথ ছুটলেন নরেনের কাছে।

*　　*　　*　　*　　*

নরেন তখন বড় বেশি সময় বাড়ীতে থাকতো না। সেখানকার গোলমালে পড়াশোনার ব্যাঘাত হ'তো তার। তাই সে নিকটেই তার মাতামহীর বাড়ীতে দ্বিতলে সিঁড়ির কাছে যে ছোট ঘরটি ছিল, তারই মধ্যে অধিকাংশ সময় ব'সে করতো পড়াশোনা।

একেতো নরেনের মন আজীবন ছিল ত্যাগ ও বৈরাগ্যধর্ম্মী; তার ওপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশের পর—বেশবিন্যাস, আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই হয়ে পড়েছিল সে সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন! তাই তার ঘরের মধ্যেও কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। স্বল্প-পরিসর ব'লে নরেন ঘরখানিকে বলতো 'টঙ্'।

আসবাবের মধ্যে ঘরে ছিল একটা ক্যাম্বিসের খাট,—তার ওপর ছোট একটা বালিস,—তাও সব সময় সেটা পরিষ্কার থাকতো না। মেঝের ওপর ছিল একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা! দড়ির আল্‌নায় ঝুলতো দু'একখানা ধুতি বা একটা পিরান কিংবা একটা গামছা।

ঘরের এককোণে থাকতো—একটি তানপুরা, একটি সেতার, আর একটা বাঁয়া। অপরকোণে একটা থেলো হুঁকো,—তামাক, টিকে এবং গুল ও ছাই ঢালবার একটা মাটির সরা। অল্প বয়স থেকেই নরেন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তামাক সেবনে। তামাক খেতে খুব ভালবাসতো সে।

বলা বাহুল্য, উচ্চ প্রণালীতেই জীবন-যাপন করতে পারতো নরেন। ধনী পিতার পুত্র সে; কিসের অভাব ছিল তার? কিন্তু তার জীবন-ধারা যে খাতে বইতে সুরু করেছে, সেখানে ভোগ-বিলাসের স্থান কোথায়?—বৈরাগ্যের সুরই যে বেজে উঠেছিল তার হৃদয় তন্ত্রীতে!

এই ঘরটির মধ্যে ব'সে নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষার পড়া পড়তো নির্ঝঞ্ঝাটে নিবিষ্টচিত্তে। সময়ে সময়ে আত্মোপলব্ধির চিন্তায়ও গভীরভাবে ডুবে যেতো সে। কিন্তু তবু তার সময় নষ্ট হ'তো অনেক। সে নিজে ছিল সঙ্গীতপ্রিয়, তার অনেক বন্ধুর মধ্যেও প্রবল আগ্রহ ছিল—তার গান শোনার। বন্ধুরা অনেক সময় এসে ব'লে উঠ্‌তো,—নে, নে, পড়াশোনা এখন রাখ,—দু'একখানা গান গা' এখন, শুনি। সব সময় পড়াশোনা করলে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে যে!

নরেনের হাতের বই কেড়ে নিতেও ছাড়তো না তারা কোন কোনদিন। আর নরেনও ছিল বন্ধু-বৎসল। সে এড়াতে পারতো না বন্ধুদের অনুরোধ। মৃদু-হেসে বই রেখে সেতার হাতে নিয়ে সে সুরু করতো গান গাইতে।

কিন্তু দু'একখানা গানেই কি আর শেষ হ'তো সে সঙ্গীত-পর্ব্ব? তাহলে আর গান-শোনা হ'লো কি? গানের পর চলতো গান,—কত রাগ-রাগিণী—কত বিভিন্ন তান-লয়-মান,—ইমন কল্যাণ, ঠুংরী, গজল, টপ্পা, খেয়াল, ধ্রুপদ, চৌতাল, সুর-ফাঁকতাল এবং আরও কত কি? দেখতে দেখতে—বেলা যে কত ব'য়ে যেতো—কোন হিসাবই থাকতো না তার।

*   *   *   *   *

নরেনের মাতামহীর বাড়ীর সদরে এসে মিত্রমশায় ডাকলেন উচ্চকণ্ঠে—নরেন, নরেন !

নরেন 'টঙ' থেকেই উত্তর দিল,—কে ?

"আমি সুরেন্দ্র,"—ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন মিত্রমশায়,—"বিশেষ দরকার আছে,—নেমে এসো একবার।"

নরেন তাড়াতাড়ি নেমে এলো। সুরেন্দ্রনাথ অমনি সস্নেহে তার হাত ধ'রে বললেন সাগ্রহে—"তোমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমার বাড়ী !" প্রয়োজনটাও তিনি ব্যক্ত করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কোনরূপ ওজর-আপত্তি করলো না নরেন। একে সে সঙ্গীতপ্রিয়,—তার ওপর মহা-আগ্রহে তাকে আহ্বান করেছেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুদেবকে গান শোনাতে। নরেন কি আর না ব'লতে পারে ?…তদ্দণ্ডেই সুরেনবাবুর পিছু পিছু তার গৃহে অনুষ্ঠিত উৎসব-সভায় এসে উপস্থিত হ'লো সে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়লো তার ওপর। প্রথম দৃষ্টিতেই নরেনের প্রতি কেমন যেন এক আকর্ষণ জেগে উঠলো ঠাকুরের মনে।…কি দেখলেন তিনি নরেনের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম-গভীর, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ?…মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে নরেনকে কাছে ডেকে বললেন,—"বসো এখানে।"

সরল অনাড়ম্বর বেশ, আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি, একমাথা চুলদাড়ি—আর স্বতোচ্ছ্বাসিত স্বচ্ছন্দ লঘু হাবভাব দেখে, ঠাকুরকে প্রথমে নরেনের কতকটা পাগলা ধরণের উদাসীন ব'লেই মনে হ'লো ! ঘুরেফিরে দু'তিনবার তার দৃষ্টি পড়লো ঠাকুরের দিকে। আজ সে কি ক'রে বুঝবে,—এই মানুষটিই একদিন নিয়ে যাবে তাকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোর বর্তিকা দেখিয়ে সত্যের পথে, সমস্ত অপূর্ণতা দূর ক'রে এনে দেবে তার জীবনের মাঝে এক নিবিড় পরিপূর্ণতা ? গান শোনাতে এসেছে ; তাই অবিলম্বে হারমোনিয়মখানি কোলের কাছে টেনে নিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলো নরেন।

কিন্তু কি—সে গান !…কি পীযুষ-ক্ষরা নরেনের কণ্ঠ-নিঃসৃত সম্মোহন সেই সুর ! ভগবৎ-প্রেম যেন ঝরে পড়ছে সেই সুরের মূর্চ্ছনায়—পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও তার অপূর্ব্ব মধুর ভাবে-রসে অভিভূত হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রোতৃবর্গ ;—বিমোহিতচিত্ত ঠাকুরের ভাবোজ্জ্বল নেত্র-কোণ দিয়ে ঝ'রে পড়তে লাগলো আনন্দের ধারা—দেবর্ষি নারদের গানে জগৎপিতা মাধবও বুঝি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন এইভাবেই !

গানের শেষে প্রীতি-বিহ্বল বিপুল আগ্রহে নরেনকে উদ্দেশ ক'রে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন সুরেন্দ্রনাথকে,—ছেলেটি কি করে? কা'র ছেলে?

সুরেন্দ্রনাথ সম্যক্ পরিচয় দিলেন নরেনের। তার গুণাবলীও অকপট আনন্দে ব্যক্ত করলেন—ঠাকুরের কাছে।

আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন ঠাকুর। ঘন ঘন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তিনি নরেনের শান্ত-সরল, তেজোদ্দীপ্ত নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত মুখখানির দিকে। কি যেন এক ভাবের আবেগে উছলিত হ'য়ে, সাদরে নরেনের পিঠ চাপড়ে ব'ললেন,—'বাঃ, বাঃ, খাসা ছেলে! হ্যাঁ—এমনিই তো চাই। এমন না হ'লে হবে কেন?'—তারপর সোজাসুজি নরেনকে ব'লে বসলেন,—'তা যেও না একদিন [redacted] ওখানে দক্ষিণেশ্বরে! এই তো কাছেই। যাবে তো? —ভুলবে না? না, না, যেও ঠিক একদিন।' শেষের দিকে যেন বিশেষভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

এই আকুল আহ্বান কোন্ সুদূরে যে তাকে ডাক দিলে,—নরেনের অবশ্য আজ তা' এই মুহূর্ত্তেই বুঝবার কথা নয়। তবু ঠাকুরের অনুরোধে নিতান্ত সাধারণ-ভাবেই ঘাড় নেড়ে সে জানালো তার সম্মতি!...

২৫

সম্মুখে পরীক্ষা: তাই নরেন সম্প্রতি পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেল; অন্য কোন কিছুর কথা বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় তার মন থেকে স'রে গেল দূরে। যে কাজ করতে হবে,—তা' বেশ ভালভাবেই করা চাই,—এই ছিল নরেনের অন্তরের কথা। কাজেই কোনদিকে না চেয়ে রীতিমত পড়াশোনা ক'রতে লাগলো সে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হ'লো বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে।

—পরীক্ষা চুকে গেলে এটা-ওটা-পাঁচটা অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় নরেন মন দিলে তার চিত্তের প্রসারতা-সাধনে। কিন্তু হঠাৎ তার কানে এলো,—তার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন—তার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছেন; এমনকি পাত্রী পর্য্যন্ত ঠিক হ'য়ে গেছে। পাত্রীপক্ষ বিয়ের যৌতুক-স্বরূপ দশহাজার টাকা দিতে চায়, আর নরেনকেও পাঠাতে চায় বিলাতে পড়াশোনার জন্যে।

—শুনেইতো নরেন্দ্রনাথের চির-বৈরাগ্যধর্ম্মী, নিত্যানুসন্ধানী মন একেবারে বেঁকে বসলো।...না,-না, বিয়ে সে করবে না,—করতে পারেই না, তাকে

জানতে হবে এই বিশাল জগতের রহস্য,—জানতে হবে সৃষ্টিকর্ত্তাকে—বুঝতে হবে তাঁর অনবদ্য—অনন্ত রহস্যময়—অপার-অচিন্তনীয় সৃষ্টির মহিমা!…সে কি সংসারের কোণে আবদ্ধ হ'য়ে খাঁচার পাখীর মত হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে এসেছে? বিশাল জগতের আহ্বান—সত্য ও নিত্যের দূরাগত বাঁশরীর তান—তার কানে যে বাজছে মুহুর্মুহুঃ! সে কি সেই নিত্যলোকের পরম আহ্বান অবহেলা করতে পারে কখনো? সংসারে আবদ্ধ হবার তো অনেক লোক আছে: বিশাল বিশ্বের সত্তার সঙ্গে প্রাণের সমগ্র সত্তা মিশিয়ে দিতে আছে ক'জন?

প্রাণের অধীরতা আর চেপে রাখতে না পেরে নরেন তাদের বাড়ীর রামচন্দ্র দত্তকে একদিন খুলে ব'ললে সব কথাই। রামচন্দ্র নিজেও ছিলেন ধর্ম্মানুরাগী; নরেনের অন্তরের ব্যাকুলতা তিনি অনুভব করতে পারলেন সহজেই। বুঝলেন,—মুক্ত-অনিলে সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে এসেছে যে বিহঙ্গ, সীমাবদ্ধ পিঞ্জরের বন্ধনা-শঙ্কায় তার প্রাণ হয়ে উঠেছে আকুল! গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি,—'ভাই, যদি ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে চাও,—যদি প্রাণের ক্ষুধার শান্তি চাও,—তবে আর এদিক-সেদিক না ক'রে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাও।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ!…সহসা চমক ভাঙ্গলো যেন নরেন্দ্রনাথের!…মনে পড়লো তার—পরীক্ষার আগে তিনি দক্ষিণেশ্বরের এক পাগলকে গান শুনিয়েছিলেন একদিন,—সরল-স্বচ্ছ সুগভীর দৃষ্টি—অপরিমেয় অকৃত্রিম সারল্য নিয়ে পাগল তার অন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেও—নরেন জোর করেই সরিয়ে রেখেছিল তাকে মন থেকে দূরে। তারপর পরীক্ষার চাপে একেবারে ভুলে গিয়েছিল তাঁর কথা। আজ ডাঃ রামচন্দ্র যেন তার সুপ্ত চৈতন্যকে জাগিয়ে তুললেন আঘাত দিয়ে। যেন একটা যবনিকা সরিয়ে দিলেন তার সম্মুখ থেকে।

নরেনের তৃষাতুর মন শান্তি চায়। কাজেই আজ আর উন্মাদ ব'লে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে উড়িয়ে দিতে সে পারলো না। শীগ্‌গির একদিন কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উঠলো গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে।

"আয়, আয়, আয়!"—তাকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ঠাকুর: যেন কতকালের পরিচয় নরেনের সঙ্গে—"এত দেরী ক'রে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে বসে আছি রে? বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে আমার জিভ যে জ্বলে গেল!"—ব'লতে ব'লতে তাঁর দুই চোখে অশ্রু টল্‌টল্ ক'রে ওঠে—গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর,—"আমার কথা কি একদম ভুলে থাকতে হয়?"

নরেন তো অবাক।…একি আপ্যায়ন!

পরম স্নেহ এবং আদরে ঠাকুর একেবারে নিজের পাশেই বসালেন নরেনকে। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন তিনি নরেনের মুখের দিকে অভিভূতের মত : তারপর সহসা যুক্তকরে ব'লতে লাগলেন,—প্রভু, আমি জানি, তুমি কে ? তুমি সেই পুরাতন ঋষি,—নররূপী নারায়ণ। জীবের কল্যাণের জন্যেই দেহ ধারণ করেছো।

সবন্ধু নরেন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে ঠাকুরের কাণ্ড-কারখানা দেখে। চোখে যেন তাদের পলকও পড়ছে না। মনের মধ্যে নরেনের তখন ঘোর দ্বন্দ্ব সুরু হ'য়ে গেছে —এ আবার কি পাগলামি ?—কি বলতে চান ঠাকুর ? তার মনে হলো, সে যে ঠাকুরকে উন্মাদ ব'লে ধারণা করেছিল,—তা'তে আর কোথাও ভুল নেই। উন্মাদ না হলে—কে কোথায় এমন ধারা আচরণ করে ?

কাজেই ঠাকুরের কথার ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে চুপ ক'রে থাকলো নরেন। ঠাকুর কিন্তু তখন নরেনকে আদর করতেই ব্যস্ত। তিনি নিজের হাতে জোর ক'রে নরেনকে মাখন, মিছরী ও সন্দেশ খাওয়াতে সুরু করলেন।

যতোই পাগল ব'লে মনে করুক ঠাকুরকে, কোনরূপ আপত্তি কিন্তু করতে পারলো না নরেন : তবে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললে—আর ওরা খাবে না ?

"ওরাও খাবে, তুমি খাও আগে।" ঠাকুরের যেন আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই : নরেনকে খাইয়েই চ'লেছেন। ক্রমে সবটুকু তিনি নরেনকেই খাইয়ে ফেললেন। শেষ পর্য্যন্ত অন্যের কথা আর মনেও থাকলো না তাঁর।

ঠাকুরের হাবেভাবে নরেনের বিস্ময় তখন যেন বেড়েই যাচ্ছে উত্তরোত্তর। তাকে খাইয়ে ঠাকুরের যেন কত তৃপ্তি ! অবশেষে বললেন,—দেখ্, আর একদিন শীগ্‌গির [redacted] [redacted] আসবি। কিন্তু একলাই আসবি,—কাউকে সঙ্গে আনিস নে। বুঝলি ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো নরেন। আপত্তির ভাষাও তার কণ্ঠে আজ আর জোগাল না।···

২৬

এরপর যদিও ঠাকুরকে উন্মাদ ব'লেই নরেনের ধারণা থাকলো,—তবু আর তাঁকে মন থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হ'লো না তার পক্ষে। ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণের মধ্যেও যেন কেমন একটা জীবন্ত আকর্ষণ—যেন ঈশ্বর-প্রেমের একটা নিবিড় ইঙ্গিত তার মনকে দোলায়িত করতে লাগলো বারে বারে। তার অন্তরে

জাগিয়ে তুলতে লাগলো যেন কোন্ এক সুদূর লোকের অমিয় সুরের প্রতিধ্বনি! পাগল হ'লেও—পাগলের মধ্যে যেন কি-এক অপূর্ব্ব বস্তু রয়েছে; নরেন ঠিক ধরতে পারছে না,—সে কোন্ বস্তু, অথবা সে বস্তু তার মনের ধারণামাত্র না অন্য কিছু!

—একমাস পরে নরেন আবার একদিন পায়ে হেঁটেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলো। আজ সে সত্যিই একলা এসেছে,—কাউকে সঙ্গে আনেনি। ঠাকুরকে উন্মাদ ব'লে ভাবলেও ঠাকুরের নির্দ্দেশ অবহেলা ক'রতে পারেনি তার অন্তর। নিত্যের ক্রিয়া বুঝিবা এমনি ক'রেই মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ বুঝতে পারে না,—কোন্‌দিক দিয়ে কি ঘটছে, কি হচ্ছে তার মধ্যে;—কোন্‌টা ভেঙ্গে কোন্‌টাই বা গড়ে উঠেছে তার জীবনে।

একটি তক্তাপোশের ওপর একাকী বসেছিলেন ঠাকুর যেন পরমশান্তির—চরমত্যাগের—অকৃত্রিম সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। নরেনকে দেখে আগের দিনের মতই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি। ব্যস্তভাবে তক্তাপোশ থেকে উঠে সাগ্রহে নরেনের হাত ধ'রে—তাকে বসালেন নিজের পাশে—একান্ত নিকটে! তার পরেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। আবিষ্টতার মাঝে অস্পষ্টস্বরে কি যে সব ব'লে যেতে লাগ্‌লেন,—তার এক বর্ণও বুঝলো না নরেন।

নরেন ভাবলো,—এই বুঝি পাগলের পাগলামি সুরু হলো! না জানি,—এরপর আবার কি ক'রে বসবে!···কিন্তু হঠাৎ যেন এক বিপুল শিহরণ খেলে গেল নরেনের শিরায়-উপশিরায়! ঠাকুর তখন ডান পা' দিয়ে নরেনকে স্পর্শ করেছেন! কি সে স্পর্শ!···কি অলৌকিক শক্তি তার মধ্যে! নরেনের মনে হতে লাগলো,—যেন বিশ্ব-প্রকৃতি সবেগে ঘুরতে ঘুরতে আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। চারিদিকের ঘরবাড়ী—গাছপালা—পায়ের নীচের মাটি,—মাথার ওপরের অনন্ত-অসীম নীল-নির্ম্মল আকাশ সবই যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে! নরেন ভুলে যাচ্ছে যেন তার নিজেরও অস্তিত্ব! তার মনে হচ্ছে—সেও মিশিয়ে যাচ্ছে ঐ অনন্ত বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের মাঝে।

—দারুণ শঙ্কায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো নরেন,—ওগো, ওগো, এ তুমি আমার কি করলে! আমার যে মা-বাপ আছেন। আমাকে ছেড়ে যে তাঁরা এক দণ্ডও বাঁচতে পারবেন না।

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঠাকুর। যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও হেসে উঠলো—সেই উচ্চহাসির সঙ্গে। নরেনের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে ব'ললেন ঠাকুর—'তবে থাক, থাক, এখন থাক। এখনও সময় হয়নি। তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ নেই—সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নরেন প্রকৃতিস্থ হলো। কিন্তু বুঝতে পারলো না, কিই বা এখন থাকবে—আর কিই বা পরে বা সময়ে হবে? খানিকটা শান্ত হবার পর সে ভেবে স্থির করলো,—ঠাকুর বোধ হয় ভাল "হিপনটিজম" অথবা "মেসমেরিজম" জানেন। তার মনের কোন অসংযত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাই ঠাকুর তাকে সম্মোহিত ক'রে ফেলেছেন! মনের শক্তি যাদের দুর্ব্বল, সম্মোহন-শক্তির প্রভাব তাদের ওপরই হয় বেশি। চিরকাল নরেনের নিজেকে দৃঢ়চিত্ত ব'লেই বিশ্বাস। কাজেই এই ব্যাপারটাকে চিত্তের এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের ক্রিয়া বলেই ধ'রে নিল নরেন।

* * * *

কিন্তু উন্মাদের কি অদম্য আকর্ষণ! নরেন আবার সপ্তাহকাল পরেই এসে হাজির হলো ঠাকুরের কাছে। কেউ যেন তাকে টেনে আনলো সেখানে। আজ কিন্তু সে নিজেকে রীতিমত প্রস্তুত করেই এসেছে। উপরন্তু ঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার একটা তীব্র কৌতূহলও জেগে উঠেছে তার মনে। নিজের সম্বন্ধে আজ তার আর কোন দুর্ব্বলতাই নেই।

সেদিন রাণী রাসমণির বাগানে বেশি লোকজন ছিল ব'লে ঠাকুর নরেনকে দেখেই তার হাত ধ'রে তাকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন—যদুমল্লিকের বাগানের একটি গৃহে: কিন্তু একটু পরেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

নরেন স্থিরভাবে ব'সে—দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মনের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলো ঠাকুরের অবস্থা! নিমীলিত দুই আয়ত চক্ষুর চারিদিকে যে গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছিল,—নরেন তাই দেখছিল পরম বিমুগ্ধতায়—একান্ত আত্মসমাহিতভাবে।

হঠাৎ কোন্ সময় সমাধি-ভঙ্গে ঠাকুর উঠে এসে নরেনকে স্পর্শ করলেন,—নরেন তা' টেরও পেলো না যেন। কিন্তু নিমেষেই সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লো সে। সেদিন তবু বা একটু চৈতন্য ছিল—আজ আর তাও থাকলো না। নরেনের এই বাহ্যজ্ঞানহীন—অন্তর্চেতনা-দীপ্ত আত্মস্থ অবস্থায় ঠাকুর তাকে প্রশ্ন ক'রে তার মুখেই শুনলেন,—সে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ,—জগতের কল্যাণের জন্যেই তার এ দেহধারণ!

—এরপর নরেন যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলো,—তখন দেখ্‌লো,—ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। মুখে তাঁর বরাভয়-ব্যঞ্জক মৃদুমন্দ মধুর হাসি। সে হাসি যেন অন্তরের অন্তরতম-স্থানকেও আলোকিত ক'রে তুলতে পারে। নরেনের মনে হলো,—এই সামান্য সময়ের মধ্যে সে ফিরে এসেছে—সুদূর কোন্ এক দিব্যলোক থেকে। কিন্তু অসীম দৃঢ়চিত্ত নরেনের ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে এসে আজ আবার তার নিজেরই এ-কি হলো!

২৭

পরম জিজ্ঞাসু মনের এমনি এক অধীর অবস্থাতেও পড়াশোনার দিকে বিন্দুমাত্র অবহেলা ছিল না নরেনের। আই-এ পাশ ক'রে বি-এ পড়তে লাগলো সে যথা-রীতি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে। বি-এ পড়তে আরম্ভ করেও অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপকগণের স্নেহ ও সহপাঠীদের শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আকর্ষণ করলো সে এক-যোগে। এখানেও কারো বুঝতে বাকী থাকলো না যে, নরেন্দ্রনাথ সত্যিই একটি প্রতিভা, এবং এ প্রতিভা কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের ন্যায়ই অলৌকিক ও সহজাত।

—দর্শনশাস্ত্রে নরেনের যে পূর্ব্ব থেকেই বিশেষ নিষ্ঠা ও অধিকার ছিল,—তা তো আগেই বলা হয়েছে: বি-এ পড়বার সময় সেই নিষ্ঠা ও অধিকার যেন আরও প্রগাঢ় এবং আরো ব্যাপক হয়ে উঠলো। অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, অসীম পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার যুক্তি, অপূর্ব্ব মননশীলতা—এর প্রত্যেকটিরই পরিচয় দিয়ে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ Rev. W. W. Hastie সাহেবকেও যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ ক'রে তুললো নরেন।

হেষ্টি সাহেব একদিন প্রচুর আনন্দে ও গর্ব্বেই ব'ললেন,—Narendra Nath Dutta is really a genius! I have never come across a lad of his talents and possibilities even in the German Universities amongst philosophical students. He is bound to make a mark in life.

* * *

—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে,—কলেজ, পড়াশোনা, সহপাঠী, পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে রীতিমত মগ্ন থাকলেও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের চিন্তা,—আর ভগবানের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য উদ্দাম কামনা—নরেনের অন্তরে বিরাজ করছিল ওতোপ্রোতভাবেই। ভারসাম্যের কথা ভাবতে গেলে—কোন্ দিকটা যে ঝুঁকে পড়বে,—বাইরে থেকে নরেনকে দেখে—সে কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা ছিল বিড়ম্বনামাত্র।

—ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি তার আকর্ষণ অদম্য হয়ে উঠলেও—এখনও পর্য্যন্ত সে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করতো মাঝে মাঝে। কারণ ধর্ম্মের নিগূঢ়

তত্ত্ব বা ভগবানকে জান্‌তে হলে,—ঠিক সে কোথায় দাঁড়াবে,—কোন্‌ পথ তার অবলম্বনীয়—তা' যেন স্থির করতে পারেনি এখনও। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গে এক একবার সে ভাবতো, প্রকৃতই কি তিনি এক অলোক-সামান্য মহাপুরুষ, পরমার্থপথের নিত্য-সাধক?—অথবা অবিরত ঈশ্বর-চিন্তা ক'রে ক'রে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে?···কিন্তু গভীর যে শ্রদ্ধা—নিবিড় যে আকর্ষণ জেগেছিল তার ঠাকুরের প্রতি,—তাকেও নরেন টলাতে পারতো না কোনমতে। তার অধীর মন এখনও তাই তাকে টেনে নিয়ে যেতো একবার এ-দিকে—আবার কখনো বা ও-দিকে।

—একদিন তার মনে হলো,—ভগবানকে চোখে দেখেছেন,—এমন কথা তো কেউই ব'লতে পারেনি তাকে,—এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও না! কিন্তু কথাটা তো কই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি? কিন্তু যা' অগাধ-জ্ঞানী, সত্যদ্রষ্টা মহর্ষিরও দৃষ্টির অতীত,—এক অর্দ্ধোন্মাদ অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ,—না হয় ভগবানের কথা ভেবে ভেবে তাঁর চিত্তে আত্মোন্মাদনাকর প্রেমই জেগে উঠেছে,—তা ব'লে কি তিনি সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেছেন, এমন কথা বলবার শক্তি রাখেন?

কথাটা ভাবতেই কিন্তু চম্‌কে উঠলো নরেন! যেন কোন বিরাট্‌ বস্তুকে সে ছোট ক'রে দেখছে, যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ককে সে সামান্য প্রদীপের আসনে টেনে নামাচ্ছে! তার নিজের সেই অজ্ঞতাই যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সাবধান করে দিলে,—না, না, সত্যিই কি তিনি উন্মাদ? উন্মাদ কি কখনো এত বড় অলৌকিক শক্তির আধার হতে পারে?—সাধারণ অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে কি কখনো—লোকচিত্ত-বিজয়ী এত বড় প্রভাব জন্মাতে পারে? না, না, কখনোই তা সম্ভব নয়। যা'র সদুত্তর সে মহর্ষির কাছে পায়নি,—তার সমাধান হয়ত আছে ঐ দক্ষিণেশ্বরের সরল, বালস্বভাব সদানন্দ ঠাকুরের কাছেই।

কিন্তু তিনিও যদি ব'লে দেন,—না, ঈশ্বরকে কখনো দেখিনি চোখে? তবে? ভাবতেই নরেন্দ্রনাথের মনটা যেন বহু উচ্চে উঠে—আবার ধপ্‌ ক'রে পড়ে গেল নীচে। ঠাকুরও যদি 'না' বলেন,—তবে সে আর কোথায় যাবে? কে দেবে তাকে প্রকৃত উত্তর? কে নিবারণ ক'রবে তার আকুল-করা প্রাণের পিপাসা? —ভাবতে ভাবতে নরেন কিন্তু তার চিত্তকে আবার দৃঢ় ক'রে তুললো,—তা' যাই বলুন তিনি, তবু তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে—ঈশ্বরকে তিনি দেখছেন কি-না?

ব্যাকুল অন্তরে নরেন আবার একদিন উঠলো এসে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই বসেছিলেন—পরম নির্ব্বিকার—সহজ-সারল্যের পবিত্র মূর্ত্তবিগ্রহ! যেন অপার্থিব কোন অপার সৌন্দর্য্যের অম্লান প্রতীক!

নরেন এসেই কোন ভূমিকা না করেই একেবারে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো—"ঠাকুর, আপনি কি কোনদিন ভগবানকে দেখেছেন নিজের চোখে?"

—মধুর স্মিতহাস্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো ঠাকুরের জ্যোতির্দীপ্ত প্রশান্ত আনন,—সরল গভীর উদার দৃষ্টি দিয়ে যেন ঝরে পড়লো—সুধার ধারা!—"হাঁ-গো, দেখেছি বই কি?"—অমৃতনিস্যন্দী কণ্ঠে বললেন তিনি,—"এই যেমন তোমাকে দেখছি,—ঠিক তেমনি! তুমি দেখতে চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি।"

অগাধ—অপরিমেয় বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল নরেন। ঠাকুরের দিকে চাইলো সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে! কত বড় আন্তর শক্তি থাকলে,—মানুষের প্রজ্ঞাদৃষ্টি কত স্বচ্ছ ও সুগভীর হলে,—কত গাঢ় প্রেমের অঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত হ'লে—মানুষ এত বড় কথা—এমনি দৃঢ় মুক্তকণ্ঠে—এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বলতে পারে?

কই, এত বড় কথা বলবার সাহসও তো আর কারো হয়নি! নিজে দেখা তো দূরের কথা,—অন্যকেও দেখিয়ে দেবার মত আত্মবিশ্বাস যার আছে,—যোগ বল, তপস্যা বল, সাধনা বল, ধ্যান বল, জীবনে কি আর বাকী আছে তার?… সে কি চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষীভূত—দক্ষিণেশ্বরের ঐ আধ-পাগলা, আত্মভোলা—অত্যন্ত সহজ—নিতান্ত সাধারণ ঐ ব্রাহ্মণ?—না, তাঁর মধ্যে বিরাট্ সত্তা—অসীম শক্তি, অসামান্য প্রজ্ঞা, অনন্ত প্রেম, অলৌকিক ঐশ্বর্য্য—অচিন্ত্য ঔদার্য্য, পরম বৈরাগ্য নিয়ে বিরাজ করছে যে, সেই ধ্যান-ধারণা-কল্পনাতীত অজ্ঞেয় পুরুষ? ভাবতে ভাবতে যেন নিজের অস্তিত্বও ভুলে যেতে লাগলো নরেন!…

২৮

এরপর কিন্তু কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন—উভয়েই একজন আর একজনকে কিছুদিন না দেখতে পেলেই আকুল হ'য়ে উঠতেন। আবার নরেনের জন্যে ঠাকুরের আকুলতাই হ'তো যেন বেশি! প্রথম দৃষ্টিতেই ঠাকুর বুঝেছিলেন, নরেন একটা খুব বড়দরের আধার। এমন কি আশ্চর্য্য হ'য়ে মাঝে মাঝে ভাবতেনও তিনি—তাইতো, কলকাতার মত জায়গায় এমন সত্ত্বগুণী পুরুষের উদ্ভব হ'লো কি ক'রে!…কিছুদিন নরেনকে না দেখলেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করতেন

একে-ওকে,—নরেনের খবর বলতে পারো ?···সে আসে না কেন ?···পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে বুঝি !

এদিকে পড়াশোনার চাপ যতই থাক, নরেনও মাঝে মাঝে না এসে থাকতে পারতো না দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। তাকে পেলে আনন্দের যেন সীমা থাকতো না ঠাকুরের। চোখেমুখে ফুটে উঠতো তাঁর এক নির্ম্মল প্রীতির অম্লান দীপ্তি—যেন কি মহার্ঘ রত্নই না পেয়েছেন তিনি ! কথায় কথায় কত কথাই যে বলতেন ঠাকুর সকলের সম্মুখে নরেনের সম্বন্ধে !

তখন ধর্ম্মজগতে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের অসীম প্রভাব ! অগাধ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যে তাঁর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং ভিন্নমতের পরিপোষক হলেও কেশবচন্দ্র ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসতেন তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে।

একদিন ঠাকুর স্বাভাবিক অথচ অবিচল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন সকলের সাম্‌নেই—'কেশব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানলাভ করেছে সত্য,—কিন্তু যে শক্তিতে সে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে,—এমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে নরেনের মধ্যে। কেশবের মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানের প্রদীপ,—কিন্তু নরেনের মধ্যে জ্বলছে জ্ঞান-সূর্য্য।'

কথা শুনে সকলের বিস্ময় যেন সীমা ছেড়ে গেল ; কিন্তু ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করতেও পারলো না কেউ। প্রতিবাদ করলো একজন,—সে স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ : তার সম্বন্ধে এত বড় প্রশংসা একান্ত অনুচিত ব'লেই মনে হ'লো তার। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো সে,—"কি বলছেন, ঠাকুর ?—কোথায় বিশ্ববিখ্যাত অগাধ-পণ্ডিত জ্ঞানী ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র,—আর কোথায় কলেজের একটা ছেলে নরেন !···কা'কে বড় ক'রে কাকে ছোট করছেন আপনি ? লোকে একথা শুনলে যে আপনাকে সত্যিই পাগল মনে করবে !"

"তা' আর কি বলবো বল।"—এতটুকু বিচলিত না হয়ে একান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে স্মিতমুখে বললেন ঠাকুর,—"মা যা' দেখিয়ে দিলেন,—তাইতো বললুম !"

নিস্পৃহকণ্ঠে উত্তর দিলে নরেন,—'মা দেখালেন, না আপনার নিজের মাথার খেয়াল, তাই বা কে জানে ! আমার তো মনে হচ্ছে—খেয়ালই বটে !'—মনে মনে সে ভাবলো,—ঠাকুরের নিশ্চয়ই মাথার দোষ আছে।

ঠাকুর বললেন কিন্তু পরম ঔদাস্যে,—'তা' তোর যা' ইচ্ছে,—তাই মনে কর, —আমার যা' ব'লবার বলে দিয়েছি ! মা আমাকে ব'লে দিয়েছেন,—নরেন ছেলেমানুষ, ওর কথায় কান দিস্‌নে।

'সবই আপনাকে ব'লে দিয়েছেন মা !' নরেন তখনও একটু অবহেলার হাসি হেসে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করলো।

*   *   *   *

কিন্তু ঠাকুরের কথা যতই পাগলামি ব'লে মনে হোক্ নরেনের,—ঠাকুরকে তো সে মোটেই হেলা করতে পারে না! আবার এক এক সময় ঠাকুরের অসংলগ্ন কথাগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রে তার প্রকৃত অর্থ বোঝবারও চেষ্টা করে সে। ঠাকুরের কিন্তু বিন্দুমাত্রও অপ্রীতি জাগে না নরেনের কথায়। বরং তাঁর মধ্যে এমন একটি ভাব সুস্পষ্ট প্রকট হ'য়ে ওঠে যে,—অন্যান্য যে সব যুবক বা ভক্ত-শিষ্য আসে ঠাকুরের কাছে,—তাদের সকলের চেয়ে ঠাকুর নরেনকেই স্নেহ করেন বেশি। "নরেন নরেন" ক'রে তিনি যেন অজ্ঞান!

একদিন নরেন ব'লে উঠলো,—"দেখুন মশায়, আপনার শেষকালে ভরতরাজার দশা না হলে হয়। ভরতরাজা হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ ক'রে—পরজন্মে হরিণই হ'য়েছিলেন।"

ঠাকুর একথার কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁরও মনে হলো,—তাইতো, নরেনের জন্যে তাঁর এতটাই বা হয় কেন? কই, আর আর অনেকেই তো আসে, কারো জন্যে তো এমন হয় না! তবে কি সত্যিই এ তাঁর মনের মোহ! অমনি প্রাণের ভেতর থেকে জগন্মাতা যেন বলে উঠলেন তাঁকে,—না, না, তাও কি হয়? নরেনের মধ্যে যে নারায়ণের সত্তা আছে: তাকে অবহেলা করবি কি ক'রে?

মুহূর্ত্তে ঠাকুরের ভাব পাল্‌টে যায়। সরল, সহজ, প্রীতি-উচ্ছলকণ্ঠে আপন মনে বলেন,—'নরেন মনে করছে আমাকে ঠকাবে!...সেদিনকার ছেলে!' বলতে বলতে তাঁর চোখ-মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রশান্ত হাস্যে!...

২৯

ঠাকুরের কাছে কত লোকই না আসতো যেতো।

ধনী-মানী, জ্ঞানী-গুণী, দীন-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান্—প্রভৃতি কেউ বাদ নেই। ধর্ম্ম-পিপাসু সকলেই ছুটে আসতেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর সকলকেই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসতেন,—'নরেনকে জানো তোমরা,—ঐ সিমুলিয়ায় বাড়ী, বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে?'—তারপর কারো কাছ থেকে কোন উত্তর পাবার আগে নিজেই ব'লে উঠতেন,—'খাসা ছেলে! লেখায়-পড়ায়, গাইতে-বাজাতে-নাচতে, খেলাধূলায় সবদিকেই চৌকষ। যে দিকেই যাবে—একটা কিছু না ক'রে ছাড়বে না।'...সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চোখে-মুখে ফুটে উঠ্‌তো যেন এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা! নরেনের প্রতি ঠাকুরের এই আকর্ষণ দেখে ডুবে যেতো সকলে অপার বিস্ময়ে।...

—কথাপ্রসঙ্গে একদিন নরেন ব'লে উঠলো ঠাকুরকে,—আপনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন,—যার কোন মাথামুণ্ডু নেই,—অর্থও হয় না কিছু। তাই ভালও লাগে না ও-সব কথা শুন্‌তে।

সরলপ্রাণ ঠাকুর হেসে উঠলেন, নিতান্ত সহজভাবেই,—'আমার কথা ভালো লাগে না তো,আমার কাছে আসিস্‌ কেন রে ছোঁড়া ?…না এলেই তো পারিস্‌!' কিন্তু নরেনের কি আর সে ক্ষমতা আছে ? কেন যে আসে,—তাই কি সে এখনো ভাল ক'রে বুঝতে পারে ? একটু চুপ ক'রে থেকে উত্তর দেয় সে, — আপনার কাছে আসতে ভালে লাগে তাই আসি।

হো-হো ক'রে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে ওঠেন ঠাকুর। নরেন তাঁকে এখনও সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে না পারুক, তাঁর তো আর নরেনকে বুঝতে বাকী নেই। ঠাকুর বুঝেছিলেন,—নরেন খুব উঁচুদরের সাধক, তবে সাকার উপাসনায় তার আস্থা নেই! কাজেই ঠাকুরও জোর ক'রে তাকে টানতে চাইতেন না সে-পথে। ওর যদি নিরাকার সাধনাতেই বিশ্বাস থাকে—তাই করুক। চিত্তের মাঝে প্রেম যখন দানা বেঁধে উঠবে,—তখন সাকার-নিরাকার সব একাকার হয়ে যাবে। প্রাণ যখন আকুল হ'য়ে উঠবে, অমৃতলাভের আগ্রহে,—মনও তখন চলে যাবে মতামতের অনেক উর্দ্ধে—এক নিত্য লোকে! 'যা' সাকার—তাই 'নিরাকার,' এপিঠ আর ওপিঠ। একটা 'পিঠ' দেখতে দেখতে কতক্ষণ না নজর পড়বে আরেকটা পিঠে। সবই ঠিক হ'য়ে যাবে সময়ে। কাজেই ঠাকুর জোর ক'রে কোন মতবাদই চাপাতে চাইতেন না নরেনের ওপর।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।"

যে যে-পথে পেতে চায় তাঁকে—সেই পথেই তিনি আসবেন তার কাছে। তবে আর চিন্তা কি ? তাঁকে চাওয়াটাই হচ্ছে আসল ;—কে কোন্‌ ভাবে চাইবে—তা নিয়ে এত বাক-বিতণ্ডা কেন ? যে যে পথেই যাক, সেই এক জায়গায় যাওয়া নিয়েই তো কথা !

সাকার সাধনায় বিশ্বাসী ঠাকুরের অন্যতম ভক্তশিষ্য রাখাল মহারাজকে নরেন একদিন বলেছিল,—সাকার সাধনা আবার সাধনা নাকি ?

"তা' ওর যদি সাকারেই আস্থা থাকে,"—কথাটা শুন্‌তে পেয়েই ঠাকুর ব'লে ওঠেন, —"তবে ও সেই পথেই যাবে—তুই বাধা দিস্‌ কেন ? যত মত—তত পথ।"

কি ছিল ঠাকুরের কথার মধ্যে—নরেন আর কোন উচ্চবাচ্য করলো না ; এবং শুধু সেইদিনই নয়, আর কোনদিনই নরেন—সাকার-নিরাকার নিয়ে কারো সঙ্গে কোন বাদ-প্রতিবাদ করতো না। অবশ্য ঠাকুরের সঙ্গে তর্কাতর্কি তার হতোই হ'তো।

একদিন ঠাকুর ঈশ্বরের আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন,—ব্রহ্মময় জগৎ! সবই ব্রহ্ম।

দৃঢ় প্রতিবাদ উঠলো নরেনের কণ্ঠে—তাও কি হয় না কি?…তা'হলে বলুন, ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম?

ঠাকুর হাসলেন,—ভাবের হাসি! এ প্রতিবাদে আদৌ অপ্রীত হলেন না তিনি। তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ছিল না,—সবই ছিল সাধনা-লব্ধ জ্ঞান,—সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি। যুক্তিবিচার অপেক্ষা প্রেমভক্তিকে তিনি ঈশ্বরলাভের পরম অনুকূল বলেই বিশ্বাস করতেন মনেপ্রাণে। তাই ধীরে ধীরে নরেনের মন থেকে সংস্কারগুলি দূর ক'রে সেখানে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি জাগাবার চেষ্টা করতেন অতি সন্তর্পণে। ঠাকুর কেমন ক'রে, কোন্ ভাবে, কি কথার কৌশলে—তাকে নিজের বিশ্বাসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—কোনমতেই তা' টের পেতো না নরেন।…

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠলেও—এখনও নরেন তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা গ্রহণ করতো পরীক্ষামূলকভাবেই। ব্রাহ্মসমাজের সভার অধিবেশনেও সে যোগ দিতে ছাড়তো না। অথচ ঠাকুরের প্রতি এতটুকু অসম্মান বা অভক্তিও সে সইতে পারতো না কোনভাবে।

মধ্যে কিছুদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে যায়নি, ঠাকুর আকুল হয়ে উঠলেন তার জন্যে। এক রবিবারে তিনি ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের সভায়। সে সভায় নরেনও ছিল। ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন সভার সম্মুখে, কিন্তু কেউ তাঁকে কোন অভ্যর্থনা করলো না। দৃশ্যটা শেলের মতই বিদ্ধ করলো নরেনের হৃদয়। এদিকে সভায় তখন ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে আলোচনা চলছিল,—তাই শুনে ভাবের আবেগে ঠাকুরের সমাধিস্থ হবার উপক্রম হ'লো। নরেন আর স্থির থাকতে পারল না। ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরের এলিয়ে-পড়া দেহখানি অতি যত্নে ও মমতায় বুকে ধ'রে তাকে নিয়ে এলো মন্দিরে। কিন্তু তখনও ঠাকুরের জন্যে কোন আগ্রহ বা উদ্বেগ প্রকাশ করলো না কেউ।

নরেন ঠাকুরকে সুস্থ ক'রে যথারীতি সুব্যবস্থায় পাঠিয়ে দিলে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু এই ব্যাপারে নরেন এমনি ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হলো যে,—এরপর আর কোনদিনই সে ব্রাহ্ম-সমাজে যেতো না। তার মন যেন অবিরত কেঁদে উঠতো,—না, না, যেখানে পরমহংসদেবের মত ব্যক্তিও কোন সম্মান পান না, সেখানে কি কোন ধর্ম্মানুরাগীর যাওয়া উচিত?

3/419

৩০

—আবার এই নরেনকে যখন কলেজে দেখা যেতো,—তখন সে একেবারে অনন্যমনা পাঠার্থী, তার সহাধ্যায়ীদেরই একজন,—বন্ধু, ভাই! সহাধ্যায়ীদের প্রতি তার সহানুভূতিই কি ছিল কম? নিজের দ্বারা হোক্, অন্যকে দিয়ে হোক্ —দুঃস্থ সহপাঠীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতো সে।

সহপাঠী হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়। এক বছরের বেতন সে কলেজে দিয়ে উঠতে পারেনি। অথচ পরীক্ষার আগে সব মিটিয়ে দিয়ে পরীক্ষার ফিঃ না জমা দিতে পারলে,—তার পরীক্ষার দফা ইতি। তবে মাইনের টাকাটা মকুব হ'লে কোন রকমে ফিঃ-এর টাকাটা জমা দিতে পারে সে। ভাবনায় প'ড়ে সে এলো নরেন্দ্রনাথের কাছে,—"কি হবে ভাই, নরেন?"—চিন্তিত বিষণ্ন মুখে একে একে সমস্ত কথাই জানালো সে নরেনকে।

তার মুখের বিষণ্নতা মুহূর্তে গলিয়ে দিল নরেনের সমগ্র অন্তর।—'তা' এতো ভাবিস কেন?' আশ্বাস দিয়ে বললে সে,—'আমি সব ঠিক ক'রে দেবো, রাজকুমারবাবুকে ব'লে ক'য়ে।'

রাজকুমার ছিলেন কলেজের কেরাণী। ছেলেদের বেতন, পরীক্ষার ফিঃ ইত্যাদির জমা-খরচ তাঁরই হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে—গরীব ছেলেদের দেয় টাকা অনেক সময় মকুব ক'রে দেবার ব্যবস্থাও করতে পারতেন। এক সময় সুযোগ বুঝে নরেন উঠলো গিয়ে হরিদাসকে নিয়ে রাজকুমারবাবুর কাছে কলেজের অফিসে।

'কি নরেন, খবর কি?'—নরেনকে দেখেই প্রশ্ন করলেন রাজকুমার। নরেন উত্তর দিলে,—আজ্ঞে, আপনি তো জানেন, হরিদাসের বাড়ীর অবস্থা ভালো নয়। তাই প্রায় এক বছরের কলেজের মাইনে সে দিয়ে উঠতে পারেনি। ঐ টাকাটা আপনাকে কোন রকমে মকুব ক'রে দিতে হবে। পরীক্ষার ফিঃ-টা না হয় সে দিতে পারবে কোন রকমে।

রাজকুমার সাদাসিদে মানুষ, বয়সও হয়েছে; একটু আধটু নেশা-ভাঙ ক'রে থাকেন সদানন্দেই। গরীব ছেলেদের বহু উপকারও করেছেন অনেক সময়। কিন্তু কি জানি কেন,—হরিদাসের কথা শুনে তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন,— 'হবে না, হবে না,—নিজের চরকায় তেল দে তুই। পরের ল্যাঠায় কেন?'

অভিমানী নরেন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয় কথা না ব'লে চলে এলো হরিদাসকে নিয়ে,—বাইরে দাঁড়ালো এসে একেবারে রাস্তার ওপর। তখন কিন্তু হরিদাসের মুখখানা ভাবনায় শুকিয়ে গেছে,—হায় হায়, তবে তো আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না!

তার শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে আশ্বাসের সুরে ব'লে উঠলো নরেন,—তুই হতাশ হচ্ছিস কেন বল্ তো।...ও বুড়োকে আমার জানা আছে, অমন মাঝে মাঝে খিঁচিয়ে ওঠে! তুই নিশ্চিন্ত হ'—আমি ঠিক ক'রে দেব সব। তোর পরীক্ষা দেওয়া নিয়েই তো কথা!

'তোরই ভরসায় আমি আছি ভাই।'—হরিদাস বড় আকুল দৃষ্টিতেই চাইলো নরেনের দিকে।

নরেন উত্তর দিলে,—'ঠিক আছে।'

এরপর নরেন এমন এক চাল চেলে বসলো যে,—রাজকুমারকে সে চালে মাৎ হ'তেই হ'লো। রাজকুমারের নেশার আড্ডাটি কোথায়,—তিনি কখন নেশা করতে আসেন,—এ সবই জানা ছিল নরেনের। সময় বুঝে সে একটু আগে থাকতে এসে আড্ডার চারিপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর যেই রাজকুমার নেশা জমিয়ে আড্ডার থেকে বেরিয়েছেন, অমনি মূর্ত্তিমান ধূমকেতুর মত তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো নরেন!

কেমন যেন আতঙ্কে চমকে উঠলেন রাজকুমার,—ঐ নরেন যে! তুই এখানে কেন?

"আজ্ঞে, আবার কেন? এই আপনারই জন্যে।"—মনে মনে বেশ একটু হেসে জবাব দিলে নরেন,—"আপনি তো অফিসে হরিদাসের কথা শুনে ব'কে ঝ'কে উঠলেন!—কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকি কি ক'রে? তাই—।"

—তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন রাজকুমার,—"আচ্ছা, আচ্ছা,—তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস—তখন কি আর 'না' বলতে পারি?"

—'তবে যে তখন ধমকে উঠলেন বড়!'

'ওরে পাগলা!'—আদরে নরেনের পিঠ চাপড়ে আমতা আমতা ক'রে উত্তর দিলেন রাজকুমার,—'তখন যে সেখানে অনেক ছেলেই দাঁড়িয়েছিল! দেখাদেখি যদি আবার অন্য ছেলেও আমাকে মাইনে মকুব করবার জন্যে ধ'রে বস্‌তো,—তাহলে কি করতুম বল্ দেখি?"

নরেন মনে মনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব ক'রলো,—'তা' তখন যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। এখন হরিদাসের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ!'—রাজকুমার প্রচুর আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন,—'সে আমার মনে থাকবে। তবে দেখিস বাবা, আমি এদিকে আসি,—একথা কোথাও বলিস নি যেন।'—শেষের দিকটা নিম্নস্বরেই ব'ললেন তিনি।

—হাসির চোটে নরেনের তখন দম ফাটবার যোগাড়! কিন্তু সে বহুকষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে দ্রুতপদে সরে পড়লো সেখান থেকে। আনন্দে তখন তার প্রাণ যেন নেচে উঠেছে,—যেমন ক'রেই হোক্ সে একটি সহপাঠীর উপকার করতে পেরেছে আজ!

৩১

'ও-সব সমাধি-টমাধি বাজে কথা!'—বললেন একদিন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথকে, —'ভাবটাব যা কিছু দেখ,—সব স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য মাত্র,—দৈহিক বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।'

কথাটা ভারী ধাক্কা দিয়েছিল নরেনকে। ক'দিন ধ'রেই সে তার মনকে স্থির করতে পারেনি। এ-ও কি সত্য? আচার্য্য শিবনাথ যা বল্‌ছেন,—তাই কি প্রকৃত ব্যাপার! আসলে ওঁর ভাব-সমাধির মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নেই? ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যার বিরাট্ সত্তা—জগৎময় পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণুর মধ্যে—জীবজগতের অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে প্রতিমুহূর্ত্ত ক্রিয়া করেছে—তাঁকে কি সত্যই ঠাকুর তাঁর অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেননি? গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত অনন্ত আকাশের মত সেই বিরাট্ সত্তা কি ঠাকুরের ঐ একান্ত সরল—শিশুর মত অকপট—ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে চরম অনুভূতিরূপে বিরাজ করছে না?

—না না, সেই বা কেমন ক'রে ভাবা যায়! তাঁর স্পর্শে—প্রাণের মধ্যে এত আকুলতা তবে জাগে কেন? এই চর্ম্মচক্ষু-প্রত্যক্ষীভূত—জগতের বহু উর্দ্ধে চিত্তকে কোন এক দিব্যলোকে নিয়ে যায়—তার পবিত্র স্পর্শের মধ্যে তবে সে কোন্ মহাশক্তি? বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত ক'রে অন্তরের প্রজ্ঞা-নেত্র খুলে দেয় কেন তবে তার অমিয় স্পর্শের প্রভাব?

—একবার নয় দু'বার নয়,—নরেন দেখেছে—বহুবার দেখেছে, অনুভব করেছে—সেই স্পর্শ! নিবিড় সান্নিধ্যে ব'সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখেছে সে—তাঁর ভাব-সমাহিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—এক জগৎদুর্ল্লভ জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত!

দেখেছে সে সমাধির সময় তাঁর চোখমুখে—কোন্ সুদূর থেকে নেমে আসে—দ্যুলোকের পরম প্রশান্তি—ফুটে ওঠে ভূলোকের অতীত—দুর্ল্লভ এক সম্মোহন ছবি !···তবে ?

—নানারূপ চিন্তাপ্রবাহে হাবুডুবু খেয়ে নরেন কিছু ঠিক করতে পারে না,—তবে আচার্য্য শিবনাথের ধারণার মধ্যে যে সারবস্তু খুব কিছু নেই,—এটা সে বুঝতে পারে—নিজের পরম উপলব্ধির প্রভাবে। মনটা তার অনেকটা শান্ত হয়। কিন্তু আচার্য্যের কথায় একটু প্রতিক্রিয়া হয় বৈকি ? পরমহংস-দেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-দর্শী অলৌকিক মহাপুরুষ ব'লে মেনে নিতে নরেনের যেটুকু দ্বিধা ছিল তা' যেন আর একটু বেড়েই যায়। মন যেন তার আরোও পরীক্ষার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

*   *   *   *   *

—এদিকে পরীক্ষার দিনও এগিয়ে আসে নরেনের। কাজেই পড়াশোনার মধ্যেও ডুবে পড়তে হয় তাকে। সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে চলে তার পড়াশোনা। সেই আগেকার ব্যবস্থা,—এখানে ওখানে পড়ে আছে এটা ওটা। পড়ে আছে হুঁকো-কলকে, তানপুরা, তবলা, বাঁয়া ইত্যাদি। পড়াশোনাও চলছে—বন্ধুরা আসছে—গান-বাজনা গল্প-গুজব চলছে। কিন্তু কিছুতেই নরেনের আসল কাজে ফাঁকি নেই,—ভুল নেই, অবহেলাও নেই। পাঁকাল মাছ—পাঁকেও আছে—গায়ে কিন্তু পাঁকের দাগও নেই কোথাও।

পরীক্ষায় পাস করতে হবে—এবং হবে তা ভালভাবেই। কাজেই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেশ কিছুদিন যেতে পারলো না সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সে তো না হয় যেতে পারলো না,—কিন্তু তাকে বেশি দিন না দেখে ঠাকুর থাকেন কি করে ? নরেনের অদর্শনে তাঁর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠলো ; এবং একদিন আর কোনমতে স্থির থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ছেড়ে নরেনের উদ্দেশে !

*   *   *   *   *

—নরেন, নরেন !

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-রত নরেনের কানে ঢুকলো সে আহ্বান। যুগযুগান্তের কত অকথিত বাণীই যেন মিশিয়ে আছে সে আহ্বানে।—শুধু কানেই ঢুকলো না,—কানের মধ্য দিয়ে একেবারে প্রবেশ করলো মর্ম্মে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নরেন,—আত্মভোলা ভাব-বিভোর সরল মানুষটি নিতান্ত সহজভাবেই পরমসুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নরেনের অপেক্ষায়।

—কে সে? আবার কে? এমন আকুলভাবে নরেনের বিরহে ছুটে আসবে কে আবার? মান-অভিমান যাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারে না,—শ্রেয় ও প্রেয়র কাছে যাঁর কোন মর্য্যাদাবোধই নেই—সেই রামকৃষ্ণ,—দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ—কিন্তু অলৌকিক—অপরূপ!

ঠাকুরকে দেখে নরেনের হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। মুহূর্ত্তে দুই চোখ ভ'রে এলো তার অজস্র জলে। তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নরেন যখন মাথা তুললো;—তখন তার দুই গণ্ড সিক্ত হয়ে গেছে অশ্রুধারায়! প্রাণ তখন দ্রব হয়ে গেছে,—স্নেহের তাপে। নরেন ভাবতে চেষ্টা করলো,—কি সে স্নেহ,- কি সে মমতা, কি সে প্রেম-ভালবাসা-প্রীতি—যার দুর্ব্বার আকর্ষণে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছুটে এসেছেন—তার সান্নিধ্যের আশায়? কিন্তু সে-দুর্জ্জেয়-তত্ব ভেবে উঠতে পারলো না সে অনেক করেও।

তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন ঠাকুর,—অনেকদিন যাসনি যে! যাসনি কেন? আমি ভাবলুম, ভুলেই বা গেলি আমাকে!

নরেনের মুখে কথা নেই। কি বলবে সে? যাঁর সান্নিধ্যে সব কিছু বলার—সব কিছু চিন্তার শেষ হয়ে যায়—যিনি সকল বাক্যের অতীত—সমস্ত ধারণার বাইরে তাঁকে কোন্ বাক্যের দ্বারা অভ্যর্থনা করবে সে? প্রাণের সমস্ত ভাষাই যে আত্মপ্রকাশের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে নরেনের!

কিন্তু হাজার কথায়ও যা প্রকাশ করা যায় না,—অনেক সময় একটি নীরব দৃষ্টিই তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রে দেয়,—তেমনি একটি অনন্ত-ভাষা-ব্যক্ত নীরব দৃষ্টিতে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নরেন নিয়ে গেল একেবারে ওপরে—নিজের আস্তানায়। বন্ধু-বান্ধবেরা ঠাকুরকে দেখে একটু এদিক সেদিক স'রে বসলো।

নরেনের সেই আগোছাল, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন আস্তানা,—কিন্তু ঠাকুরের মনে কোন বিকার নেই। তারই মাঝে বসলেন তিনি পরম আনন্দে,—ক্ষুদ্র অপরিসর কক্ষের সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যেন কি এক দিব্য জ্যোতিঃতে।

কিন্তু জ্যোতিঃর যিনি আধার,—তাঁর মনে জ্যোতিঃ-অজ্যোতিঃর প্রশ্ন কোথায়? সসীমের মাঝে কেমন ক'রে অসীম প্রচ্ছন্ন থাকে,—সাধারণের আবরণে অসাধারণত্ব কি ভাবে আবৃত থাকে, ঠাকুর তারই যেন দিব্য প্রকাশ! গামছায় ক'রে নরেনের জন্যে সন্দেশ বেঁধে এনেছেন ঠাকুর সেই দক্ষিণেশ্বর থেকে। সাগ্রহে নরেনের হাতে সেই সন্দেশ দিয়ে বললেন,—খা, খা, তোর জন্যেই এনেছি।

সে কি শুধু সন্দেশ! তার মিষ্টত্ব তো শুধু ক্ষীর-চিনির সংযোগেই দানা বাঁধেনি,—পরম পুরুষের প্রাণের অজস্র প্রীতি-সুধা যে মিশিয়ে আছে তার প্রতিটি অনুপরমাণুতে। নরেন গভীর প্রীতিতে সে সন্দেশ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের দিলে, নিজেও খেতে লাগলো। নরেন খাচ্ছে,—কিন্তু খাওয়ার তৃপ্তিটা যেন উপভোগ করতে লাগলেন ঠাকুর নিজেই।

সন্দেশ খাওয়া হলে বললেন ঠাকুর,—'ওরে নরেন, গান গা' একটা। অনেকদিন তোর গান শুনিনি আমি। আহা, কি সুন্দরই যে গাইতে পারিস্ তুই!'

নরেনও অমনি তানপুরা হাতে নিয়ে তার সুর বেঁধে ফেললে,—তারপর ধরলে গান,—

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি!
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিনী।
(তুমি) নিত্যানন্দ-স্বরূপিনী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্ম-বাসিনী।

গায়ক যতই মধুর সুরে গাক্ না,—শ্রোতার চিত্ত ভাবুক না হ'লে কি কোন গান জমতে পেরেছে কোনদিন?

কিন্তু নরেন গাইছে—ঠাকুর শুনছেন; ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন গ্রহণ করছেন—ভক্তের প্রাণের ভাব-মাধুর্য্য। 'নারদ-কীর্ত্তনে বিগলিত মাধব।' নরেনের মধুময় সুরে গান যতই জমে উঠতে লাগলো—ঠাকুরও তেমনি ক্রমে ক্রমে সমাধিস্থ হ'তে লাগলেন।

চোখে পলক নেই—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দনহীন,—মর্ম্মর মূর্ত্তির মত অনড়-অচল—একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি!…নরেনের বন্ধুরা ঠাকুরের এই ভাব-সমাধি কোন-দিন দেখেনি। কাজেই সকলেই মনে করলো,—ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠাকুরের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যে তাড়াতাড়ি জল ও পাখা আনতে ছুটলো তারা।

নরেন বাধা দিল,—না, না, ওসবের দরকার নেই। অসুস্থ উনি হননি। গান শুনতে শুনতে ভাব-সমাধি হয়েছে, আবার গান শুনতে শুনতেই চৈতন্য হবে। নরেন আবার গান ধরলো—

"একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে
নাচ মা শ্যামা দিগম্বরী।"

নরেনের কথাই ঠিক হ'লো। গান শুনতে শুনতে ঠাকুর চৈতন্যলাভ ক'রে উঠে বসলেন। যোগনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে জেগে উঠলেন যেন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

'দক্ষিণেশ্বরে যাবি'—সতৃষ্ণনেত্রে নরেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর, —'চল্ না, চল্ আমারই সঙ্গে। কতদিন যাসনি! আবার এক্ষুনি না-হয় ফিরে আসিস্।'

তদ্দণ্ডেই রাজী হ'য়ে গেল নরেন। যুক্তি-তর্ক দিয়ে ঠাকুরকে সে দূরে সরিয়ে রাখছে এখনও। কিন্তু ঠাকুর যে ক্রমে ক্রমে অধিকার ক'রে বসছেন তার প্রাণের সিংহাসন! বইপত্র তেমনিই পড়ে থাকলো, কেবল তানপুরাটি তুলে রেখে নরেন চললো ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে।

—দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন,—কলির শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন,—তবে কি কোন-এক নব কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতির ভূমিকা রচনা চলছে?

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥

—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখে—ধরার ধূলায় নেমেছেন কি তবে নররূপী নারায়ণ?...নব কুরুক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু ভক্তের জন্য আবার কি রচিত হবে নব গীতা? কে জানে!

৩২

—মেঘের অন্তরালে আকাশের কোথায় কোন্ বজ্র যে লুকিয়ে থাকে, কখন যে কার মাথায়—কি দারুণভাবেই পড়ে, তা' মানুষ কেমন ক'রে জানবে? নরেনের মাথার ওপরও এমনি এক বজ্র পতনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কথাটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগের।...নরেন তখন সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার দিনকতক পরে একদিন এসেছে সে বরাহনগরে তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। কথা-বার্ত্তা, গান-বাজনা ইত্যাদি হ'তে হ'তে রাত্রি বেজে গেল প্রায় এগারোটা। বন্ধুদের অনুরোধে অতরাত্রে আর বাড়ী না ফিরে—খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো নরেন—সেদিনকার মত সেইখানেই।

ঘুম অবশ্য কারো চোখে ছিল না। কত সম্ভব-অসম্ভব গল্প চলছিল বন্ধুদের মধ্যে শুয়ে শুয়ে!—হঠাৎ সেই শান্ত প্রীতিমধুর পরিবেশের মধ্যে হ'লো যেন প্রচণ্ড বজ্রপাত। রাত্রির গভীরতার মধ্যেই ঊর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে একজন লোক সেখানে এসে সংবাদ দিলে,—'হার্টফেল' ক'রে বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যু হয়েছে!

সে কি শুধু সন্দেশ! তার মিষ্টত্ব তো শুধু ক্ষীর-চিনির সংযোগেই দানা বাঁধেনি,—পরম পুরুষের প্রাণের অজস্র প্রীতি-সুধা যে মিশিয়ে আছে তার প্রতিটি অনুপরমাণুতে। নরেন গভীর প্রীতিতে সে সন্দেশ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের দিলে, নিজেও খেতে লাগলো। নরেন খাচ্ছে,—কিন্তু খাওয়ার তৃপ্তিটা যেন উপভোগ করতে লাগলেন ঠাকুর নিজেই।

সন্দেশ খাওয়া হলে বললেন ঠাকুর,—'ওরে নরেন, গান গা' একটা। অনেকদিন তোর গান শুনিনি আমি। আহা, কি সুন্দরই যে গাইতে পারিস্ তুই!'

নরেনও অমনি তানপুরা হাতে নিয়ে তার সুর বেঁধে ফেললে,—তারপর ধরলে গান,—

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি!
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিনী।
(তুমি) নিত্যানন্দ-স্বরূপিনী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্ম-বাসিনী।

গায়ক যতই মধুর সুরে গাক্ না,—শ্রোতার চিত্ত ভাবুক না হ'লে কি কোন গান জমতে পেরেছে কোনদিন?

কিন্তু নরেন গাইছে—ঠাকুর শুনছেন; ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন গ্রহণ করছেন—ভক্তের প্রাণের ভাব-মাধুর্য্য। 'নারদ-কীর্ত্তনে বিগলিত মাধব।' নরেনের মধুময় সুরে গান যতই জমে উঠতে লাগলো—ঠাকুরও তেমনি ক্রমে ক্রমে সমাধিস্থ হ'তে লাগলেন।

চোখে পলক নেই—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দনহীন,—মর্ম্মর মূর্ত্তির মত অনড়-অচল—একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি!···নরেনের বন্ধুরা ঠাকুরের এই ভাব-সমাধি কোন-দিন দেখেনি। কাজেই সকলেই মনে করলো,—ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠাকুরের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যে তাড়াতাড়ি জল ও পাখা আনতে ছুটলো তারা।

নরেন বাধা দিল,—না, না, ওসবের দরকার নেই। অসুস্থ উনি হননি। গান শুনতে শুনতে ভাব-সমাধি হয়েছে, আবার গান শুনতে শুনতেই চৈতন্য হবে। নরেন আবার গান ধরলো—

"একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে
নাচ মা শ্যামা দিগম্বরী।"

নরেনের কথাই ঠিক হ'লো। গান শুনতে শুনতে ঠাকুর চৈতন্যলাভ ক'রে উঠে বসলেন। যোগনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে জেগে উঠলেন যেন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

'দক্ষিণেশ্বরে যাবি'—সতৃষ্ণনেত্রে নরেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর, —'চল্ না, চল্ আমারই সঙ্গে। কতদিন যাসনি! আবার এক্ষুনি না-হয় ফিরে আসিস্।'

তদ্দণ্ডেই রাজী হ'য়ে গেল নরেন। যুক্তি-তর্ক দিয়ে ঠাকুরকে সে দূরে সরিয়ে রাখছে এখনও। কিন্তু ঠাকুর যে ক্রমে ক্রমে অধিকার ক'রে বসছেন তার প্রাণের সিংহাসন! বইপত্র তেমনিই পড়ে থাকলো, কেবল তানপুরাটি তুলে রেখে নরেন চললো ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে।

—দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন,—কলির শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন,—তবে কি কোন-এক নব কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতির ভূমিকা রচনা চলছে?

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥

—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখে—ধরার ধূলায় নেমেছেন কি তবে নররূপী নারায়ণ?…নব কুরুক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু ভক্তের জন্য আবার কি রচিত হবে নব গীতা? কে জানে!

৩২

—মেঘের অন্তরালে আকাশের কোথায় কোন্ বজ্র যে লুকিয়ে থাকে, কখন যে কার মাথায়—কি দারুণভাবেই পড়ে, তা' মানুষ কেমন ক'রে জানবে? নরেনের মাথার ওপরও এমনি এক বজ্র পতনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কথাটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগের।…নরেন তখন সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার দিনকতক পরে একদিন এসেছে সে বরাহনগরে তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। কথা-বার্ত্তা, গান-বাজনা ইত্যাদি হ'তে হ'তে রাত্রি বেজে গেল প্রায় এগারোটা। বন্ধুদের অনুরোধে অতরাত্রে আর বাড়ী না ফিরে—খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো নরেন—সেদিনকার মত সেইখানেই।

ঘুম অবশ্য কারো চোখে ছিল না। কত সম্ভব-অসম্ভব গল্প চলছিল বন্ধুদের মধ্যে শুয়ে শুয়ে!—হঠাৎ সেই শান্ত প্রীতিমধুর পরিবেশের মধ্যে হ'লো যেন প্রচণ্ড বজ্রপাত। রাত্রির গভীরতার মধ্যেই ঊর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে একজন লোক সেখানে এসে সংবাদ দিলে,—'হার্টফেল' ক'রে বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যু হয়েছে!

—কি দারুণ দুঃসংবাদ! শত বজ্রের আঘাতও কি এর চেয়ে বেশি ?…নরেন মুহূর্ত্তে অধীর হয়ে উঠলো ঃ প্রবল শোকাবেগে অন্তর মথিত ক'রে—চোখে ঝরে পড়লো তার অজস্র অশ্রু! হাহাকার ক'রে উঠলো তার সমগ্র প্রাণ!—বাবা, বাবা,—সত্যিই কি বাবা তাদের ছেড়ে গেছেন ?—সমবেদনায় কাতর বন্ধুবান্ধবগণ তাকে শান্ত ক'রে নিয়ে এলো বাড়ী।

কিন্তু যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন পরিবেশে, আপদে-অনাপদে, সুখে-দুঃখে চিত্তকে তদুপযোগী ক'রে নেবার মত সাধনা ছিল নরেনের মধ্যে। সদ্যোবিধবা জননী কাঁদছেন, ছোট ভাইরা কাঁদছে,—এসময় তার তো অধীর হলে চল্‌বে না! বুঝলো নরেন একথা পরম বিজ্ঞের মতই। চিত্তকে দৃঢ় ক'রে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে—জ্যেষ্ঠপুত্রের সমুচিত দায়িত্বে সম্পাদন করলো সে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি এবং বিধিসম্মতভাবেই।

তারপর কিন্তু যা আরম্ভ হ'লো—তা বর্ণনা করা ভাষারও সাধ্য নয়। বহু অর্থ অর্জ্জন করেছিলেন বিশ্বনাথবাবু,—কিন্তু মুক্তহস্ততার জন্য আদৌ সঞ্চয় ক'রে যেতে পারেননি। জীবনে হঠাৎ একদিন এমনি ক'রে শেষের দিন এসে যাবে,—তাও ভাবতে পারেননি তিনি ঘুণাক্ষরে। কেই বা পারে?

তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল,—সঞ্চয়তো তাঁর নেই-ই—উপরন্তু ঋণ আছে প্রচুর! ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে,—কোনরূপে শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর—কেমন ক'রে সংসার চলবে তাই হ'লো এক দারুণ সমস্যা।

—কিন্তু নরেন দমলো না। সামনে বিপদ দেখে ভয়ে অধীর হওয়া তার চরিত্রের ধর্ম্ম নয়। শোকাতুরা মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে সান্ত্বনার সুরে,—"ভেবোনা মা,—মাথার ওপরে আছেন ভগবান,—তিনিই বিপদে উদ্ধার করবেন আমাদের।"

কিন্তু ভুবনেশ্বরীও সাধারণ নারী নন! স্বামীশোকে তিনি আকুল,—তার ওপর নাবালক পুত্রগণের ভরণপোষণের চিন্তায় কাতর হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত ঃ তবু তিনি সর্ব্বংসহা ধরণীর মতই অকুল সমুদ্রে ভাসমান সংসার-তরণীর হাল ধরলেন দৃঢ়হস্তে! ভেঙ্গে পড়লে—তাঁর ছেলেরা সত্যিই ভেসে যাবে যে! কত সাধনার ধন, সোনার দুলাল নরেনের সান্ত্বনাস্থল যে আর কোথাও থাকবে না।—এই বিপদে—এই নিঃসম্বল-নিঃসহায় অবস্থায় মনে পড়লো তাঁর পাণ্ডবজননী কুন্তীর কথা। তিনিও তো পড়েছিলেন পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে—এমনি এক দারুণ সমস্যায়। কিন্তু ভেঙ্গে তো পড়েননি তিনি! ভুবনেশ্বরীও সান্ত্বনা দিলেন নরেনকে প্রগাঢ় স্নেহে। দুই ব্যথার ব্যথী মাতাপুত্রের পরস্পরকে এই সান্ত্বনা-দান কি গভীর মর্ম্মস্পর্শী, কত করুণ—আবার কতই না মধুর!

নিতান্ত অল্প খরচে এমন ক'রে সংসার চালাতে লাগলেন ভুবনেশ্বরী,—যাতে কোনভাবেই তাঁদের মান-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়। মুক্তহস্ত বিশ্বনাথবাবুর সহধর্ম্মিণী তিনি—খরচ ক'রে এসেছেন বরাবর দরাজ হাতে,—কিন্তু সেই দরাজ হাতকে এমনি সংযতভাবে তিনি নিয়োগ করলেন সকল দিকে যে, তাঁর সংসারে কত দুঃখকষ্ট চলছে কেউ তা টেরও পেলো না!

নরেন্দ্রনাথ বেশ বুঝেছিল,—পিতার মৃত্যুর পর এ সংসারের দায়িত্ব তারই। যেভাবেই হোক্, তাকে ভরণপোষণ করতে হবে,—তার শোক-কাতরা জননীকে—তার নাবালক ভাইদের। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে এ নৈতিক দায়িত্ব তারই! কিন্তু চিন্তা কি? কেউ তো—সংসারে আসেনি, ধনসম্পদ নিয়ে। শুধু হাত-পা নিয়েই তো এসেছে সকলে! ভগবান দিয়েছেন মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক। কাজের জন্য হাত-পা, চিন্তার জন্য মস্তিষ্ক,—এই দুইটির সাহায্যে কত মানুষ—কত নিম্ন থেকে কত উচ্চে উঠছে! তারও হাত-পা আছে, সেও লেখাপড়া শিখেছে,—পরিশ্রমে কাতর সে নয়,—তবে সেই বা কেন কোন একটা উপায় করতে পারবে না তার সংসার-পালনের?

* * * * *

—কিন্তু বাস্তবতার সম্মুখীন হ'য়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো নরেন। যেটাকে সে মনে করেছিল সহজ,—এখন কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখলো,—সহজ তো নয়ই,—বরং একান্তই দুষ্কর। দুনিয়ার এত লোক ক'রে খাচ্ছে, কত লোকের কত চাকরী জুটছে—তার চেয়ে বিদ্যাবুদ্ধি, কর্ম্ম-ক্ষমতাহীন কত ব্যক্তি কত কাজ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করছে,—সে কিন্তু রীতিমত লেখাপড়া শিখেও—সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত—অফিসে অফিসে ঘুরে ঘুরে দস্তরমত উমেদারী করেও যোগাড় করতে পারলো না কোন কাজ।···একি অদৃষ্টের পরিহাস,—না আর কিছু?

এদিকে সংসারে চলেছে নিত্য অভাব! অনাহার-অর্দ্ধাহার, অনুপযুক্ত আহারের মর্ম্মান্তিক সে দৃশ্য যেন দেখাও যায় না চোখে।···বাড়ীতে এলে সব দেখে শুনে—প্রাণের ভেতরটা হাহাকার ক'রে ওঠে নরেনের। ছোট ভাই মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র কাছে এসে দাঁড়ালে তাঁর মর্ম্মযাতনা আরও বেড়ে যায়। ভাই দুইটির কাতর মুখের দিকে সে যেন চাইতেও পারেনা। চোখ ফেটে হু-হু ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে। উঃ, এই সুকুমার বালকদুটির দুঃখ-কষ্টও সে দূর করতে পারছেনা! সময়ে সময়ে নিজের ওপরে দারুণ ধিক্কারই জন্মে যায় তার!

বিশ্বনাথবাবুর আমলে—যারা মধুর লোভে এসে জুটতো নরেনদের বাড়ীতে—কত রকম চাটুবাক্যে জানাতো হরেক রকম আত্মীয়তা—আজ ভাণ্ডার খালি

দেখে নরেনের ত্রিসীমানাতেও আসে না তারা। পথে-ঘাটে—নরেনকে দেখতে পেলে চলে যায় অন্যপথ ধ'রে। পাছে অভাবের তাড়নায় নরেন হঠাৎ হাত পেতে বসে,—এই ভয়ে।···কিন্তু ঐ হাত যে হাজার অভাবেও সহজে কারো কাছে প্রসারিত হবার নয়,—সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা কি তাদের আছে? বিশ্বাসের মেরুদণ্ড কিন্তু ক্রমেই ভেঙে যায় নরেনের! তবে কি এ দুনিয়ার সবই ফক্কিবাজি?···নিয়ম-শৃঙ্খলা কি শুধু কথার কথা? এত বড় একটা বিশ্বের কোন নিয়ন্তা বা নিয়ামক কি তাহ'লে সত্যিই কেউ নেই?···চোখের সাম্‌নে কত চোর ডাকাত-ভণ্ড-জুয়াচোর বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বরং নানা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেই দিন যাপন করছে—আর সজ্জন-ভদ্র-শিক্ষিত ব্যক্তি এক মুঠো অন্নের জন্যে উদয়াস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে হা-হা করে।···যা'র দরকার নেই,—বিনা চেষ্টায় মুঠো ভরে পাচ্ছে সে অজস্র অর্থ, ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা অপব্যয়ে, রকমারি খেয়ালে;—কিন্তু অর্থের অভাবে যার সংসারে দুগ্ধপোষ্য শিশুও মরছে অনাহারে, রুগ্ন-দুর্ব্বল পাচ্ছে না ঔষধ-পথ্য—তার ভাগ্যে জুটছে না অনন্ত চেষ্টাতেও নিতান্ত প্রয়োজনমত দুটো পয়সা!···তবে?

নিয়ন্তা বা নিয়ামকই যদি কেউ থাকবে এ বিশ্বের,—তবে কেন এ বিশৃঙ্খলা?··· কেনই বা প্রকৃতির এই নিতান্ত কল্পনাতীত বিকৃত আচরণ? কেনই বা এ দারুণ বৈষম্য? প্রকাণ্ড হস্তীকে চালনার জন্যে—চালক যদি অঙ্কুশ নিয়ে তার পিঠে ব'সে থাকে,—তবে কি সাধ্য হস্তীর সে এদিক-সেদিক যেতে পারে? বিশ্বের নিয়ন্তা-নিয়ামক, ঈশ্বর, জগদীশ ব'লে লোকে যাঁর বন্দনা গায়,—যাঁর অস্তিত্ব মানতে গিয়ে অনেকে নিজের অস্তিত্বও ভুলে যায়,—সত্যিই কি তবে তিনি নিছক মানুষের কল্পনা,—অথবা দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের স্বকপোল-কল্পিত এক অবাস্তব সান্ত্বনার স্থল?

—কিন্তু কি মুস্কিল! তাঁকে অস্বীকার করতেও যে নরেন প্রাণের মাঝে বেদনা অনুভব করে! কত যুগ যুগ ধ'রে কত ভক্ত-সাধক,—যোগী, সন্ন্যাসী, তপস্বী, শাস্ত্রদর্শী তাঁদের প্রাণের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে স্বীকার ক'রে গেছেন যাঁর অস্তিত্ব, যাঁর সর্ব্বব্যাপকত্ব; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ করেছেন যাঁকে অন্তরে অনুভব; দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর দেখেছেন যাঁকে প্রত্যক্ষ; সাকারবাদী পূজো করছে যাঁকে ধ্যান-সম্ভব নানা মূর্ত্তিতে—নিরাকারবাদী যাঁকে পরিব্যাপ্ত দেখছে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে, সেই বহু-উপলব্ধ, বহু-বন্দিত মহিমময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কি এক কথায় উড়িয়ে দেবার জিনিষ?···

হয়ত তিনি নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প; কারো সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে জগতের সৃষ্টি কি লয়ে কিছুই আসে যায় না তাঁর। কে কোথায় অনন্ত সুখে হাসছে,

কে কোথায় মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাঁদছে—বুঝিবা তার কোন সংবাদও রাখেন না তিনি।—অথবা জগতের মাঝে এই অসাম্য-বৈষম্য সৃষ্টি ক'রে তিনি আড়ালে দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখেন।

সহসা চমকে উঠ্‌লো নরেন্দ্রনাথ,—সত্যিই কি তাই? এত লোক তবে তাঁকে ডাকে কেন?...সাধক তাঁর প্রেমে ব্রহ্মানন্দ-সুখ লাভ করে কেন? কোটি কোটি লোক যে তাঁকে ডেকে কত আশায় কত ভরসা পাচ্ছে—তার মূলে কি তবে কিছুই নেই?

—কিছুই ঠিক করতে পারে না নরেন বিভ্রান্তের মত। এদিকে সংসারের অবস্থা দিনের পর দিন উঠছে চরমে। এত দুঃখের মাঝেও কিন্তু পড়াশোনা বাদ দেয়নি সে,—যথারীতি বি-এল পড়তে আরম্ভ করেছে কলেজে। কতদিন যে অনাহারেই কলেজে যেতে হয় তাকে, তা সেই জানে বেশ ভাল·ক'রে: সহপাঠীরা কিন্তু তার বাহ্য চালচলনে বিন্দুমাত্রও টের পায় না। তার শুকনো চোখমুখের দিকে চেয়ে তারা ভাবে,—হয়ত পিতৃ-বিয়োগে কাতর হয়েই নরেনের চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

পরণে মোটা ধুতি,—পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, গায়ে মোটা ছোটখাটো একটি কামিজ,—নরেন্দ্রনাথ চলেছে পদব্রজেই কলেজে। কত দিকে কত লোক যাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নেই তার কোনদিকে। পেছন থেকে সহসা ডেকে ব'লে এক ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান,—"আইয়ে আইয়ে বাবুসাব, কাঁহে পায়দলসে যাতে হেঁ, হামারা গাড়ীমে উঠিয়ে।"

নরেন পেছন ফিরে দেখে,—তাদের যখন সময় ভাল ছিল,—তখন কতবার এই গাড়ীতে চ'ড়ে কত জায়গায়ই না সে গেছে,—ভাড়াতো দূরের কথা,—কত বখশিসই না দিয়েছে এই কোচম্যানকে!...কিন্তু আজ?...গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে নরেনের।

কোচম্যান ব'লে,—"আইয়ে হুজুর, পয়সা নেহি হোগা তো উস্‌মে ক্যা? বহুৎ নিমক খায়া হ্যায় আপকো।"

নরেনের বুকের ভেতরটা আন্দোলিত হয়ে ওঠে: এরা তবু মধুপ-স্বভাব আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে ঢের ভাল। অথচ এরাই অশিক্ষিত দরিদ্র ছোটলোক বলে অবহেলিত!...কোচম্যানের দেওয়া অযাচিত সুযোগ কিন্তু সে গ্রহণ করে না,—তেমনি হাঁটতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে তার চোখের সম্মুখে মা ও ভাইদের ক্ষুধা-ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখগুলি!

আর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখা হয়ে যায় একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে।...“এই যে, কোথায় বেরিয়েছেন।”—প্রশ্ন ক'রে নরেন সৌজন্যের খাতিরে।

"কে নরেন ?"—ইতস্ততঃ ক'রে জবাব দেন ভদ্রলোক,—"এই—এই—বড্ড তাড়াতাড়ি আছে—যাব একবার ঐ-ঐ ইয়ের—তা' তোমাদের খবর সব ভাল তো ? মা ভালো আছেন ?"

—কণ্ঠে কোনরকম দুঃখ-কষ্টের আভাস নেই,—নরেন উত্তর দেয় অবিচল স্বাভাবিকভাবে—"হ্যাঁ, খবর সব ভালই। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন,—তাই প্রথমটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম, এখন অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছি।"

ভদ্রলোক অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নরেনের দিকে। তারপর নিজেই যেন কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'আচ্ছা, যাই এখন।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি পথের মোড় ফিরিয়ে চলে যান অন্যদিকে।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে নরেনের আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে,—ওঃ, এই লোকটাই তার বাবার কাছে কত না উপকৃত ! আর আজ তাকে দেখে এড়িয়ে যেতে চায়।…জগৎটার প্রকৃত ছবি—আভ্যন্তরিক চিত্র কি তবে সর্ব্বত্রই এমনি ! বাইরে যা'-কিছু আমরা দেখি,—সবই কি কৃত্রিম, সবই কি স্বার্থ-সাধনের ছলনা,—মানুষের মিষ্টি হাসির তলে কি সর্ব্বত্রই এমনি শাণিত ছুরি লুকিয়ে থাকে ? ভাবতে ভাবতে—সংসার-সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মন একান্ত বিরূপ হ'য়ে ওঠে। অনন্তবিশাল সৃষ্টি তার কাছে আসুরিক ব'লেই বোধ হয় !

*　　*　　*　　*

সকাল থেকেই নরেন বেরিয়ে গিয়েছিল কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায়। বেরোবার আগে সে ভুবনেশ্বরীর অজ্ঞাতে এবং অলক্ষ্যেই সন্ধান করে জেনে নিয়েছিল,—বাড়ীতে কি আছে, কি নেই।…নিজের হাতে বা পকেটে কি আছে,—সে সম্বন্ধে তো প্রতি মুহূর্ত্তই সে ছিল সজ্ঞান।

নানা জায়গা ঘুরে নরেন যখন বাড়ী ফিরলো,—বেলা তখন এগারোটাই হবে। কাল রাত থেকে ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া হয়নি,—তার ওপর এতটা বেলা পর্য্যন্ত ঘোরাঘুরি। চোখমুখ তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রস্ফুট প্রসূনের মত দেহের সুঠাম-সুগঠিত যে লাবণ্য তার দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে হতো,—দুঃখ-কষ্টের তাড়নায় তাও হতে বসেছে নিঃশেষ ! বাড়ী ফিরতেই তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে ভুবনেশ্বরীর অন্তরে মোচড় দিয়ে ওঠে,—"কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি বাবা এতক্ষণ ? যা যা, শীগ্‌গির চান কর, যেমন হোক্ দু'টো খেয়ে নে।"

আজন্ম সুখ-ভোগে পালিত, তাঁর কত সাধের কত আনন্দের কত দেবতার আরাধনার ফল এই নরেন আজ কি গভীর সংকটে পড়েছে,—কি দুর্বার মনোবলের সঙ্গে, নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করছে,—পদে পদে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে,—তবু ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই,—নেই অন্তরের মাঝে কোনরূপ দুর্ব্বলতা,—এসবই ভুবনেশ্বরী বুঝতেন সমগ্র মনপ্রাণ দিয়েই।

শিশুকৃষ্ণের পেলব হস্তে মনের সাধে ক্ষীর-সর-ননী তুলে দিয়েও যেমন যশোদার তৃপ্তি হতো না, এই সেদিনও ভুবনেশ্বরী তেমনি তাঁর "বিলের" হাতে কত উপাদেয় খাবারই না তুলে দিয়েছেন! কিন্তু আজ?…চোখের কোণে জল জমে ওঠে ভুবনেশ্বরীর। তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়ে উদ্গত অশ্রু মুছে ফেলেন তিনি, পাছে নরেন দেখে ফেলে!

এদিকে নরেন স্নান ক'রে জামা-কাপড় প'রে আবার বেরিয়ে পড়বার উপক্রম ক'রে।

'এখন আবার যাবি কোথায়?' ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ভুবনেশ্বরী,—'যেখানে যাবি, খেয়ে যা বাপু একমুঠো। কাল রাত থেকে যে কিছুই খাস্‌নি!' উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠ প্রবল দুঃখের আবেগে।

মাতৃপ্রাণের ব্যাকুলতা ও দুঃখ অনুভব করতে পারে নরেন। মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলে, ওহো, তোমায় বলতে যে ভুলে গেছি মা, আজ আমার নেমতন্ন আছে! ঐ জিতুদের বাড়ী কি একটা কাজ আছে কি-না! কিছুতেই ছাড়লো না ওরা! তোমরা খেয়ে নাও শীগ্‌গির, আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো না। আমি খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে একেবারে বিকেলে আস্‌বো।

এমন অনেকদিনই নিমন্ত্রণ থাকে নরেনের। বাড়ীর আয়োজন অপ্রচুর দেখলেই —একজন কল্পিত নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা এসে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা তার বাড়ী খুঁজে পাবে না কেউ। তবু নিমন্ত্রণ থাকে নরেনের। আজও সকালে দেখে গেছে সে, যা আছে বাড়ীতে, তার সাহায্যে কোনরূপে অন্যান্য সকলের পিত্তিরক্ষা হ'তে পারে, সে ভাগ বসালে আবার তাও যে হবে না!

মাকে নিমন্ত্রণের কথা জানিয়েই ব্যস্তভাবে বাড়ীর বাইরে চলে যায় নরেন,—কি জানি, একটু দেরী করলেই মা যদি তাকে খাওয়ার জন্য জেদ ধরেন!…কিন্তু ভুবনেশ্বরীই কি অবোঝ? মা-ভাইদের প্রাণ বাঁচাতে নরেনের এ-যে প্রাণ-দেওয়ার নিমন্ত্রণ, এই মর্ম্মদ্রাবী ছলনা কি বুঝতে ভুল হয় ভুবনেশ্বরীর?… একে ছেলের স্বভাব বরাবরই বৈরাগী ধরণের - সংসারের বাইরের দিকেই দৃষ্টি তার বেশি, তার ওপর এত বড় সাংসারিক দুঃখের চাপে যদি সংসার

ছেড়ে চলেই যায় নরেন! কেমন একটা আতঙ্কে ভুবনেশ্বরীর সর্ব্বদেহ শিউরে ওঠে। নিরুপায় জননীর প্রাণ আলোড়িত ক'রে তোলে এক সুতীব্র হাহাকার!

* * * *

ওদিকে আবার নরেনের সংসারের অপার দুঃখকষ্টের কথা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কানে গিয়ে উঠেছে! ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, নরেনের শুষ্কমুখ কল্পনা ক'রে। শিষ্যদের ডেকে বলেন, ওরে আমি ভিক্ষেয় বেরোব, নরেনের জন্যে আমি নিজে ভিক্ষে করবো। অত বড় একটা সম্পদ কি হেলায় নষ্ট হয়ে যাবে নাকি? শেষের দিকে ঠাকুরের চোখ ছলছল ক'রে ওঠে।

ভক্তরা ঠাকুরকে শান্ত করেন একথা ওকথা ব'লে। ঠাকুরও চিত্ত স্থির হ'লে ভেবে দেখেন, নরেন অনেক বড় বংশের ছেলে, হঠাৎ তার জন্যে কেউ ভিক্ষা করলে নরেনদের মান-মর্য্যাদা নষ্ট হবে। উদ্বেলিত কণ্ঠে ঠাকুর বলেন, —মা, মা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। তিনি উপযুক্ত লোক দিয়ে নরেনকে অশেষ বিশেষে সান্ত্বনা দিয়ে পাঠান।

৩৩

কিন্তু নির্ম্মম বিধাতার তূণ থেকে নরেনদের সংসারের ওপর তীর নিক্ষেপের তীব্রতা যেন বেড়েই উঠছিল ক্রমে ক্রমে। আজকাল নরেনের পায়ে আর যেমন তেমন একযোড়া স্যাণ্ডেলও জোটে না। অথচ তাকে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় অবিশ্রান্ত এদিক সেদিক হেঁটে বেড়াতে হয়।

খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে পায়ের তলায় ফোস্‌কাও পড়ে গিয়েছিল নরেনের!

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে নরেন বসে পড়েছে মনুমেণ্টের তলায়। ভাবছে মনে মনে আকাশ-পাতাল। দেখতে দেখতে দু'তিন জন বন্ধুও এসে জুটলো সেখানে। নরেনকে বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে দেখে তারা বললে, এমন মনমরা হয়ে বসে কেন রে নরেন? কি হয়েছে? নে, নে, গান গা' একখানা, মনটা তাজা হয়ে উঠবে।

আর একজন যোগ দিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঐ সেই সেই গানটা— "বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে।" ধর্ বেশ জুতসই ক'রে।

মেজাজ আর শান্ত রাখতে পারলো না নরেন। বাড়ীতে দেখে এসেছে অনাহারের নিষ্ঠুর প্রচণ্ডলীলা,—তার ওপর খর রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে—আর সব জায়গা থেকে শুধু নিরাশ হ'য়েই সংযত-স্বভাব নরেনের অন্তরেও জ্বল্‌ছিল ব্যথার তীব্র আগুন। ক্ষোভে, রাগে, অভিমানে ব'লে উঠ্‌লো সে—থাক্, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। আর দরদ দেখাতে হবে না।

—মানে?—দৃষ্টি তীব্র ক'রে চাইলো বন্ধুরা নরেনের দিকে।

'মানে আবার কি?'—নরেন আহতকণ্ঠেই ব'লে,—'ক্ষিধের তাড়নায় যার মা-ভাইয়ের মুখ শুকিয়ে যায় না,—অভাবের পীড়ন যে কত মর্ম্মান্তিক,—তা' জানবার মত দুর্য্যোগ জীবনে যাদের আসেনি,—টানা-পাখার তলায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব'সে তারাই আরামে চোখ বুজে সখ ক'রে ঐ রকম গান গাইতে পারে।—আমিও পারতুম বৈকি একদিন! কিন্তু আজ কঠোর সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে,—এ নিছক তামাসা। প্রাণের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে,—তার তাপে চারিদিকের বাতাস হয়ে উঠছে অগ্নিময়—উত্তপ্ত,—'কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস' আর অনুভব করবো কেমন করে বল?'

বন্ধুরা অবশ্য এরকম উত্তর নরেনের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেনি,—তাই তারা কিছু ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু কি ক'রে বুঝবে তারা, দারিদ্র্যের কি দারুণ কঠোর নিষ্পেষণে কি দুঃসহ জালায় জ্ব'লে নরেনের মুখে বেরিয়েছে ঐ কথাগুলো। নচেৎ যে নরেন্দ্রনাথ,—অন্তরে অন্তরে পুড়ে খাক হয়ে গেলেও—বাইরে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ ক'রে নিজেদের বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ করতে চাইতো না,—সে আজ এত বিচলিত হবে কেন?

কিন্তু আশার ক্ষীণরেখাও তো দেখা যায় না কোন দিকে; যত দিন যায়,—জমাট হয়ে আসে আঁধারের ঘনত্ব। এই আঁধারের মাঝে পথভ্রান্ত ক'রে 'শয়তান' যেন নরেনকে টেনে নামাতে চায় অধঃপতনের স্তরে।

প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারিণী সুন্দরী এক যুবতী সহসা একদিন নরেনের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠায়,—নরেন যদি তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতে স্বীকৃত হয়,—তাকে প্রণয়িনী ব'লে গ্রহণ ক'রে—তবে তার যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে—সে দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করতে পারে।

প্রস্তাব শুনে নরেনের সর্ব্বাঙ্গে যেন অসংখ্য বিষাক্ত কীট কিলবিল ক'রে ওঠে,—অন্তরে জেগে ওঠে অপার অবজ্ঞা,—অপরিমিত ঘৃণা;—সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দমনীয় ক্রোধও। উঃ, কি স্পর্দ্ধা—কোটি কোটি মুদ্রা-বিনিময়েও চরিত্রের যে নিষ্কলঙ্কতা ফিরে পাওয়া যায় না,—এক দুশ্চরিত্রা কিনা তার অভাবের সুযোগ নিয়ে সামান্য ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে তাই হরণ করতে চায়

কুহকিনীর মত? যুবতীর বার্তাবহকে কঠোর কণ্ঠে নরেন বলে,—ফের যদি আমার কাছে এই রকম ঘৃণ্য প্রস্তাব আসে, আমি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।

তবু কি নিস্তার আছে নরেনের?…জগতে যে কালিমাহীন হয়ে থাকতে চায়,—তারই গায়ে ধূলোকালি দিতে ছুটে আসে লোকে যেন জোর করে। যেন তার কলঙ্কহীন থাকাটা কেউ দেখতে পারছে না!

দিন কয়েক পরে নরেনের কয়েকজন বন্ধু—তারা ধনীরই সন্তান,—একদিন নরেনকে কৌশল ক'রে ডেকে নিয়ে যায় এক বাগানবাড়ীতে। নরেনকে দলে টানবার জন্যে তারা বলে, দারুণ দুঃখের সময় একটু করে মদ খেলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায় মনে। মদের পাত্রও তারা তুলে ধ'রে নরেনের মুখের কাছে।

ওয়াক্! বমি ক'রে ফেলে আর কি নরেন! প্রতিবাদের সুরে বলে, যাও! যাও! কি শত্রুতা ক'রেছি তোমাদের আমি!…সারা জীবন আমাকে দারিদ্র্যের তাড়না সহ্য করতে হয় তাও ভাল, তবু যা অন্যায় ব'লে জানি, তা করবো না।

কিন্তু এই বন্ধুগণ নরেনের প্রতিবাদের কোন মূল্যই দেয় না। বরং তারা আরও একটু অগ্রসর হয়। এরা এমন এক চরিত্রের যুবক, যারা মনে করে, তারা যা করছে, সব যুবকের কাছেই তা লোভনীয় এমন কি করণীয়ও বটে! দলে ভিড়বার আগে প্রথম প্রথম ওরকম প্রতিবাদ সবাই করে!

তারা একজন সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকেও নিয়ে এসেছিল বাগানবাড়ীতে। হঠাৎ একসময় নরেনের কাছে তাকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা মুহূর্তে স'রে যায় অন্তরালে। বেশ্যা হলেও সে নারী, নরেনের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে সে। চটুল চাহনি আর কামোদ্দীপক হাবভাবে পুরুষের চিত্ত যারা মদিরা-বিহ্বল ক'রে তোলে, তাদেরই দলের সে একজন। তবু চোখ তুলে চাইতে পারে না সে নরেনের দিকে।

নরেন বলে, এই জঘন্য বৃত্তি নিয়ে জীবনে সুখ কি পেয়েছ তুমি কিছু? পরে পাবে বলেও কি আশা কর? কি তোমার পরিণতি সেটা ভেবে দেখেছ কি? যৌবন গেলে কোথায় দাঁড়াবে তুমি? কি অবস্থা হবে তোমার? হাজার দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও দেহের শুচিতা রক্ষা নারীজীবনে কত বড় অমূল্য সম্পদ, তার স্বাদ কি পাওনি কোনদিনই?

মেয়েটি নরেনের সম্মুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লজ্জায়, ধিক্কারে এবং অনুতাপে তার সমগ্র চিত্ত কেঁদে ওঠে হু-হু ক'রে! দ্রুতপদে অন্তরালে

অবস্থিত ধনী যুবকগণের কাছে ফিরে গিয়ে রুদ্ধপ্রায়স্বরে ব'লে সে, ছিঃ, ছিঃ, ও-রকম মানুষের কাছেও কি আমাকে পাঠায়? সবাই কি তোমাদের মত লম্পট যে আমাদের দেখলেই ভুলবে? যারা সচ্চরিত্র, তারা যে আমাদের ঘৃণাই করে!...

নরেন ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো বটে, কিন্তু তার বন্ধুগণ আক্রোশে ফুলে উঠলো মনে মনে, নানা অপকৌশলে তারা রটিয়ে দিলে, নরেন বাগানে গিয়ে মদ খেয়েছে, বেশ্যা নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করেছে।

কতকগুলো লোক যেন হুজুগ পেয়ে গেল এই সংবাদে! নরেনের কলঙ্ক যেন তাদের উপভোগের জিনিষ। হাজার দুঃখের মধ্যেও নরেনের চারিত্রিক দৃঢ়তা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটা যেন সহ্য হচ্ছিল না তাদের। তাদের মুখে শুনে শুনে কেউ কেউ নরেনকে দেখতে পেলে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করতে লাগলো : কি হে নরেন, আজকাল যে মদে-বেশ্যায় ডুবে গেছ শুনছি!

সত্যের এই অপলাপে নরেন সমগ্র সংসারটার ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে! এবং ব্যবহারিক জগতের এই বর্ব্বরতা ও ভণ্ডামিকে প্রচণ্ড আঘাত দেবার জন্যেই ব'লে ওঠে দৃপ্তকণ্ঠে, 'বেশ করেছি, জগতে কে কা'র দুঃখের খবর নেয়? কে কা'কে কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে? আমার মনের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে আমি যদি মদ খেয়েই থাকি, যদি বেশ্যা নিয়ে আমোদই করি, তাতে পরের কি? আমার যা ভাল লেগেছে, করেছি, বেশ করেছি!'

কথাটা উঠলো গিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কানে : অত্যধিক দুঃখের চাপে নরেন নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতি-দুর্নীতি-জ্ঞান নেই তার আর। সে মদ খাচ্ছে বেশ্যাবাড়ী যাচ্ছে ইত্যাদি

উপেক্ষার হাসি খেলে গেল ঠাকুরের মুখে,—"কে, নরেন? ওরে, ও খাপ-খোলা তলোয়ার, সর্ব্বশুচি সদা-পবিত্র অগ্নি, নির্ম্মল সূর্য্যের আলোক! আমি জানি জীবনে ও কোনদিনই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না, আর নারীসঙ্গও ওর হবে না কোনদিন। ওর জন্যে তোদের কারো মাথাব্যথার দরকার নেই। তোরা সব নিজের নিজের চরকায় তেল দে।"

৩৪

"তা দেখুন, ব্যাপারটা আপোষেই নিষ্পত্তি ক'রে নিন্। ঘরের কথা বাইরে না যাওয়াই ভাল।" ব'ললে নরেন তার জ্ঞাতিবর্গকে। যেহেতু জ্ঞাতিবর্গ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে। পিতৃবিয়োগের পর নরেন সংসার নিয়ে বিব্রত, স্বার্থান্বেষী জ্ঞাতিরাও সেই সুযোগে তাকে আরও বিপন্ন ক'রে তুলতে উঠে পড়েই লেগেছে। দত্তবাটী ভাগাভাগি করতে হবে, এবং যেহেতু নরেনরা যে অংশে থাকে সেই অংশটাই ভাল, সেই হেতু ঐ ভাগটাই চাই জ্ঞাতিদের। এ নিয়ে তারা আদালতে যেতেও পেছ-পা নয়।

নরেন বিনীতভাবেই ব'লে, ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা যে অংশ ভোগ করছি, তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা বোধ হয় আইনে টিকবে না,— কিন্তু আপনারা মামলা-মোকর্দ্দমার কথা বাদ দিন, ওটা নিজেদের মধ্যে না হওয়াই সম্মানের।

কোন কথা শুনলো না কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ। তখন নরেনও গর্জে উঠলো সিংহের মত, 'আপনারা যদি আমার বিপদের সুযোগ নিয়ে আমাকে জব্দ করতে চান, তবে জেনে রাখুন, সবকিছু ঝক্কি মাথায় তুলে নিতে আমিও প্রস্তুত। তবু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবো না কোনদিন। বিপদ কখনো একা আসে না, তা আমি জানি।

অতঃপর মোকর্দ্দমাই বাধলো। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নরেনের পিতৃবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee) নরেনের অবস্থা বুঝে নিঃস্বার্থভাবে আদালতে পক্ষ গ্রহণ করলেন নরেনের। নরেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। কিন্তু একে সংসারের অচল অবস্থা, তায় বাধলো মোকর্দ্দমা মানেই বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ! মিঃ ব্যানার্জ্জী না হয় কিছু না নিলেন, কিন্তু আরও সব খরচও তো আছে!

আর্থিক সুবিধার জন্যে নরেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৌবাজার স্কুলে শিক্ষকতা করতে সুরু করে, কিন্তু সুবিধা হলো না দেখে কিছুদিন পরে সে কাজ ছেড়ে দেয়। এটর্ণী হবার জন্যে কিছুদিন সে এটর্ণী নিমাই বসুর কাছে শিক্ষানবিসীও করে: কিন্তু তাও ছেড়ে দিতে হয় অর্থাভাবেই। তবে ক'খানা ইংরাজী বইয়ের অনুবাদ ক'রে কিছু উপার্জ্জন হয় বটে তার। কিন্তু

তার সাহায্যে অচল সংসারকে চলার পথে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা করাও যে বিড়ম্বনা !

দুইদিকের চাপে নরেন ঘুরতে লাগলো ঘুড়ির নাটাইয়ের মত উপার্জ্জনের চেষ্টায়। সে ঘোরার যেন শেষ নেই ছেদ নেই, বিরাম নেই যেন অনন্তকাল ধরেই চলবে তার এই ঘোরার পালা। পথ হাঁটতে হাঁটতে পায়ের শির যেন ছিঁড়ে যায় নরেনের : অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখখানা কুঁচকে ওঠে, কিন্তু অকাতরে সহ্য ক'রে আবার হাঁটতে সুরু করে সে।

দুনিয়ার হাল-চাল, মানুষের প্রতি মানুষের বিরূপ আচরণ, দুর্জ্জনের প্রাদুর্ভাব, সজ্জনের লাঞ্ছনা দেখে দেখে চিত্ত তিক্ত, বিভ্রান্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নরেনের। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নীরস নিরর্থক ভোজবাজি,— যেন কার অব্যবস্থিত চিত্তের উদ্ভট নিষ্ঠুর খেয়াল ব'লেই ধারণা হয় তার। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে মনে পড়ে, অমনি তার তপ্ত প্রাণে হঠাৎ এক ঝলক শান্তির হাওয়া ব'য়ে যায়! সরল নিষ্কপট সৌম্য উদার ঠাকুরের মূর্ত্তি ঘন অন্ধকারে ভরা সংসারের বন্ধুর পথে যেন দিশারী হয়ে ওঠে নরেনের জীবনে। কিন্তু কি তার পথ, কোথায় তার মোড়, কোন্ মুখে ফিরবে তার গতি— সে যেন কিছুই ঠিক করতে পারে না অনেক ভেবেও। বাড়ী ফিরে এসে— সেখানকার দুরবস্থা দেখে তার চিত্ত আরও অস্থির হ'য়ে ওঠে! কিন্তু তবু দৃঢ় হ'তে হয় তাকে কঠোর সংযমে।

* * * * *

মোকর্দ্দমা চলছে। আইনের ছাত্র নরেন। প্রতিপক্ষের ব্যবহারাজীব বহু কূট জেরা ক'রেও হটাতে পারেন না তাকে। নরেনের বক্তব্য বিপক্ষ-পক্ষের ইংরেজ ব্যারিষ্টারও কাটতে পারেন না সহজে। হঠাৎ একদিন জেরার মুখে তিনি ব'লে ওঠেন নরেনকে উদ্দেশ ক'রে বিচারকের সম্মুখে He is a Chela,

নরেন তৎক্ষণাৎ দৃপ্তভাবে জবাব দেয়, Do you know Sir, what a Chela is ?

স্তব্ধ হয়ে যান ব্যারিষ্টার। বিচারক জজও নরেনের সপ্রতিভ উত্তর-প্রত্যুত্তরে ভারী খুসী হন মনে মনে, এবং নরেন আইনের ছাত্র জেনে তাকে বলেন,— "Young man, you will make a very good lawyer." অপর পক্ষের এটর্নিও নরেনকে একসময় ডেকে বলেন, জজসাহেবের সঙ্গে আমিও একমত। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।

এ মোকর্দ্দমা চলেছিল অনেকদিন। শেষ পর্য্যন্ত বিচারক নরেনদের অনুকূলেই রায় দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু দৈন্য-অভাব-নিপীড়িত সংসার নিয়ে সম্প্রতি যে ঝড়-ঝাপটা ব'য়ে যাচ্ছিল নরেনের মাথায়, তার নিবৃত্তি কোথায়?

ভেবে ভেবে নরেনের মাথারও যেন আর ঠিক থাকে না, গাছের যে ডাল ধরতে যায়, তাই যেন তাঁর দুরদৃষ্ট-ক্রমে মড়াৎ ক'রে ভেঙ্গে পড়ে! বিশ্ব-নিয়ন্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নরেনের আস্থা যেন ভেঙ্গেচুরে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়। 'সত্য-শিব-সুন্দর' ব'লে তাঁকে কল্পনা করতেও তার সমগ্র চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে।...বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলে পথহারা দিগভ্রান্ত পথিকের মতোই হতাশ হয়ে ওঠে সে!

আবার তারই মধ্যে চলে পড়াশোনা, মামলা-মোকর্দ্দমার তদ্বির, সংসার-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া-আসা, তাঁকে স্মরণ-মনন। আশ্চর্য্য এই শক্তি! যেমন বিপুল, তেমনি কল্পনাতীত!

আবার তার চেয়েও আশ্চর্য্য যে, সাকার-উপাসনার বিরোধী অদ্বৈতবাদী নরেনের অবচেতন চিত্তে ঠাকুরের প্রভাবে কখন কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে যে আবার কালী-দুর্গা-শিব' প্রভৃতিও অস্পষ্টভাবে উঁকি মেরে যায়, মনের সচেতন অবস্থায় তা ঠিক ধরতেও পারে না নরেন। অবশ্য অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধেই যে তার ধারণা এখনো ঠিক স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, তাও নয়।

* * * * *

সারারাত্রি চিন্তাভার-নিপীড়িত নরেন সেদিন সকালে সুপ্তিভঙ্গে ব'লে ওঠে,—নারায়ণ, নারায়ণ।

নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন ভুবনেশ্বরী। তীব্র অভিমানাহত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন তিনি, "চুপ কর্ হতভাগা! আর 'নারায়ণ, নারায়ণ' করিসনে। নারায়ণ তো তোর সবই করলেন! পেটে ভাত জুটছে না,—পরণে কাপড় নেই,—আবার ভদ্রাসনটুকুও বুঝিবা যায়! ওসব দেবদেবী কি আর আছে রে?"

আজন্ম দেবদেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণা ভুবনেশ্বরী। কত বড় দুর্ব্বিষহ জ্বালায় একথা ব'লে ওঠেন তা' চিন্তা করাও দুষ্কর! মাতা-পিতার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল মাতৃ-পিতৃ-অন্ত-প্রাণ সন্তান বাপমায়ের কাছ থেকে স্নেহ-মমতার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর আঘাত পেলে তার চিত্তের অবস্থা যা হয়, ভুবনেশ্বরীর মনের অবস্থাও হয়ে উঠেছিল ঠিক তাই!

মায়ের তিরস্কারে স্তব্ধ হয়ে ওঠে নরেন! তবে কি, মা যা বলেছেন তাই সত্য। মিথ্যা সাধকগণের যোগদৃষ্টি, মিথ্যা তাঁদের দিব্য-দর্শন, মিথ্যা গভীর

ঈশ্বরানুরাগী ভক্তবৃন্দের ভগবানের সন্ধানলাভ, মিথ্যা তাঁদের প্রত্যক্ষবাদ ?… সবই কি তবে কল্পনা-বিলাস ?…এ সংসারে মানুষের জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি তবে শুধুই ক্লেদ-পঙ্ক ঘেঁটে ঘেঁটে, স্বার্থের মোহে হিংসা-দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সাধনা ? অথবা ইন্দ্রিয় ও কামনার দাস হ'য়ে জীবনের দিনগুলি পশুর মতই কাটিয়ে দেওয়া ?…অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য—মহান্ পন্থা কি তবে মানুষের সত্যই নেই ?

বিচলিত হ'য়ে ওঠে নরেনের চিত্ত ! না, না, তা কখনোই সম্ভব নয়।…প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ লাভের পথ নিশ্চয়ই আছে ! জীবনে হাজার দুঃখ-কষ্ট আসুক,—অটলচিত্তে সে পথ খুঁজে বার করতে হবে। বীরের মত দুর্ব্বার বাধা অতিক্রম ক'রে সে পথে অগ্রসর হ'তে পারলে,—একদিন দেখা যাবে—ঈশ্বর তাঁর অপার করুণা নিয়ে বসে আছেন—সেই পথের শেষে।

সারাটা দিন নরেনের মনে সে চিন্তা জেগে থাকে অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত। কাজকর্ম্মের অনুসন্ধানে অবশ্য সে ঘুরে ফিরে বেড়ালো, যেমন অন্যদিন ঘোরে। পেটে আজ আর তার কিছু পড়েনি,—উপবাসে,—পথশ্রমে—সে ক্লান্ত অবসন্ন, তার ওপর আবার বৃষ্টিতেও ভিজে গেছে তার সর্ব্বাঙ্গ। বাড়ী ফিরবার পথে রাত্রি নেমে এলো। আর হাঁটতে না পেরে জড় পদার্থের মত নরেন বসে পড়লো পথের একস্থানে—সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার।

এই আচ্ছন্ন অবস্থায় তার চিত্তপটে ভেসে উঠ্‌লো—যেন একটির পর একটি ছবি। কল্পনার দৃষ্টিতে সে দেখলো—গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে এক-একটি ছবি বর্ণ-সুষমার বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ক'রে তুলছে চারিদিক। তমোময় অশিবের বিনাশ ক'রে ফুটে উঠছে শিবের শুভময় সুশুভ্র পরম দ্যুতি !…সম্মুখের ঘনীভূত অন্ধকারই যেন ধাপে ধাপে সিঁড়ি তৈরী ক'রে—উঠে গেছে বহু উচ্চে আলোকের দ্বারে।…কঠোর কুৎসিত কিসের যেন একটা মূর্ত্তি লুটিয়ে পড়ছে—সরল-সুন্দর-ঔজ্জ্বল্যময় অনিন্দ্য এক মূর্ত্তির পদপ্রান্তে একান্ত অপরাধীর মত !

চমকে উঠলো নরেন। আচ্ছন্ন-ভাব কেটে গেল তার, একান্ত বিহ্বলকণ্ঠে ব'লে উঠলো সে,—আছে, আছে। মিথ্যা নয়,—ভ্রান্তি নয় ;—একান্ত সত্য। এই পুঞ্জীভূত অসামঞ্জস্যের মধ্যেই পূর্ণ সামঞ্জস্যের নিয়ন্তারূপে দাঁড়িয়ে আছেন ষড়ৈশ্বর্য্যময় ত্রিগুণাতীত ভগবান !

কি এক দৈবশক্তি-প্রভাবে নরেনের দেহের ক্লান্তি যেন কোথায় সরে গেল। মনেপ্রাণে অনুভব করলো সে—অব্যক্ত আনন্দ,—এক অনাস্বাদিত দিব্য

আলোকের মধুর স্পর্শ। বাড়ী ফিরে রাত্রিটা পরম নিশ্চিন্তভাবেই ঘুমিয়ে পড়লো সে!···

কিন্তু অভাব তো আর মেটে না! নরেনের সব চেষ্টাই যেন কা'র অলক্ষ্য অমোঘ ইঙ্গিতে ব্যর্থ হয়ে যায়! অন্তরের মধ্যে জ্বলে ওঠে বীতস্পৃহার তীব্র বহ্নি: বৈরাগ্যের বিপুল তাড়না!

সাধারণ লোকের মত অর্থার্জ্জন ক'রে সংসারে কূপমণ্ডুক হবার জন্যেই কি তার জন্ম হয়েছে?—ভাবে সে মর্ম্মে মর্ম্মে,—কোটি-কোটি লোকের চিরাচরিত পথই তো ঐ।···কিন্তু বিশাল বিশ্ব-সংসারের বাইরে যে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে আছে,—সে পথের জন্যে কি কারো সৃষ্টি হয়নি? অর্থ—অর্থ—অর্থ! অর্থের জন্য তার জন্ম হ'লে বহু অর্থই জুটে যেতো এতদিন। কি প্রয়োজন তার অর্থের? ত্যাগধর্ম্মী মন, বিশ্বমানবের কল্যাণকামিতা,—এই শুধু পাথেয় ক'রে দৃঢ়চিত্তে বেরিয়ে যাবে সে সংসারের বাইরে—বিশ্বের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে—দিগ্‌দিগন্তের আহ্বানে।

ভাবতে ভাবতে চিত্ত তার প্রস্তুত হয়ে উঠলো সংসার-ত্যাগের জন্যে; সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মন ছুটে গেল অসীম-অনন্তের দিকে। এমন সময় হঠাৎ সে শুনলো, দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর এসেছেন কলকাতার কোন এক ভক্তের বাড়িতে।···ভালই হ'য়েছে,—নরেন স্থির করলে—গৃহত্যাগের আগে একবার ঠাকুরের চরণ দর্শন ক'রে যাবে। ঠাকুরই যে তার জীবনে কর্ণধাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছেন!···জোর ক'রে ঠেলে রাখলেই কি আর তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়?

* * * * *

"বেশ তো, সংসার ত্যাগ করিস, করবি।" নরেন পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে বললেন তিনি,—"তার আগে একবার দক্ষিণেশ্বরে চল্ না। দু'চারটে কথাবার্ত্তা কইবো দু'জনে।"

না ঠাকুর, নরেন উত্তর দিলে, নির্লিপ্ত কণ্ঠেই,—আর ঘরেও ফিরবো না, দক্ষিণেশ্বরেও যাবো না। আমি আমার পথ ঠিক ক'রে নিয়েছি।

ঠাকুর দেখলেন, তীব্র বৈরাগ্য এসেছে নরেনের হৃদয়ে। মনে মনে তিনি বললেন, "মা, মা, নরেনের মধ্যে কিছুটা মায়া ঢুকিয়ে দে। ওকে দিয়ে জগতের অনেক বড় বড় কাজ যে করাতে হবে মা!···পূর্ণ চৈতন্য এসে গেলে যে ওকে আর পাবো না!" প্রকাশ্যে এক অকৃত্রিম স্নেহের দাবীতেই বললেন,—'চল্, চল্, দক্ষিণেশ্বরেই চল, সেখান থেকেই যা হয় করবি।'

নরেনের সাধ্য কি আর ঠাকুরের কথা অবহেলা করে? ঠাকুরের পিছু পিছু সে-ও গিয়ে উঠলো গাড়ীতে। পথে দু'জনের অবশ্য আর কোন কথাবার্ত্তা হ'লো না।

দক্ষিণেশ্বরে পেঁাছে নরেনকে নিয়ে ভক্তগণের মধ্যে ব'সে—সহসা ঠাকুর ভাবে বিভোর হ'য়ে উঠলেন এবং নরেনকে সাগ্রহে বুকে জড়িয়ে ধ'রে গেয়ে উঠলেন,

কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই।
আমার মনে সন্দ হয় বুঝি তোমারে হারাই
তোমারে হা-রা-ই।

ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়লো ঠাকুরের চোখে। হায়, হায়, নরেনকে পেয়েও আবার হারাতে হবে নাকি! ঠাকুরের ভাবাবেগের স্পর্শে—নরেনেরও অন্তর অধীর হয়ে উঠলো—তারও চোখদুটি ভ'রে এল জলে। দু'টি সমান দরদী যেন উভয়ে উভয়ের প্রাণের বেদনা বুঝতে পেরেছে। কি মহিমময় সে দুঃখ!—দুটি প্রাণের গভীরে সে কি নিবিড় মিলন!

ভক্তরা কিন্তু অবাক হয়ে চাইলেন তাঁদের দিকে,—এ-আবার কি হ'লো?

'ও—আমাদের একটা হ'য়ে গেল!' অশ্রুসিক্ত চোখে স্মিতমুখে ব'ললেন ঠাকুর।…নরেন কিন্তু সত্যই তখন বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে—তার মনের সব চিন্তা যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেছে! সে যেন আর কিছু ভাবতেও পারছেনা!

রাত্রে সকলে চ'লে গেলে ঠাকুর আবার নরেনকে বুকের কাছে টেনে বললেন,—জানি আমি, তুমি মা'র কাজের জন্যে এসেছ,—সংসারে থাকতে পারবে না। তবু আমি যতদিন আছি,—ততদিন আমার জন্যও থাক।

আবার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো ঠাকুরের। কি প্রাণাকুল সে আকর্ষণ।… নিঃস্বার্থ ভালবাসার—আকুল হৃদয়ের কি-এ অপূর্ব্ব আবেগ! নরেনকে এতখানি আপন ভেবে যে ভালবাসা,—সে ভালবাসা তো মোহ নয়,—বিশ্বপ্রেমের মন্দাকিনী যে বইছে তারই মধ্যে!…নরেনের অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আপত্তির কোন ভাষাই আর যোগালো না। যেন কোন সম্মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলে সে ঠাকুরের মুখের দিকে দুটি চোখ স্থির করে।

* * * * *

পাত্রী পক্ষের গোপন অনুরোধে একদিন ভুবনেশ্বরী কথাটা পাড়লেন পুত্রের কাছে,—অবশ্য ভয়ে ভয়েই,—"দেখ, নরেন, তোর বাবা তোর বিয়ের যে সম্বন্ধ করেছিলেন,—সে পাত্রীটির তো এখনো বিয়ে হয়নি,—আর তাঁরা তোর আশা এখনো ছাড়েননি। যদি রাজী থাকিস্ বাছা—কথাবার্ত্তা পাকা ক'রে ফেলি

তবে। বড়লোক,—প্রচুর টাকা দেবে,—তাতে দুঃখ-কষ্টেরও অবসান হবে,—আর একজন পরমাত্মীয়ও হ'বেন আমাদের সহায়।

প্রখর হ'য়ে উঠলো নরেনের দৃষ্টি : তীব্র অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব'ললে সে,—কি বল্‌ছো মা, বিয়ে ক'রে পরের সাহায্য নিয়ে করবো দুঃখ-কষ্টের অবসান? বংশমর্য্যাদা, বাবার মর্য্যাদা, আত্মমর্য্যাদা সবই কি মেরে ফেলবো গলা টিপে জোর ক'রে? এর চেয়ে চিরকাল দুঃখকষ্ট থাকাই যে সম্মানের মা! তা'ছাড়া, —বিয়ে তো আমি করবোই না ব'লে দিয়েছি,—আবার সেকথা কেন?··· তোমাদের দুঃখ আমি মোচন করতে পারছি না,—এ আমার গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই,—কিন্তু আমাকে বলি দিয়েই কি তোমরা চাও দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি?

এতটুকু হ'য়ে গেলেন ভুবনেশ্বরী নরেনের উত্তরে। নিদারুণ দুঃখভারে নিপীড়িতা হ'লেও ভুবনেশ্বরীরও আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল প্রচুর। শুধু অনুরুদ্ধা হ'য়েই—আর সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়েই—প্রস্তাবটা তুলে ফেলেছিলেন তিনি। নরেনের শেষ কথাটায় কুণ্ঠিত হলেন তিনি মনপ্রাণে; ব'ললেন ব্যগ্রকণ্ঠে—না, না, বাবা, তাই কি আমি পারি?···আমি যে তোরই মা!

'সেই তো আমারও গৌরব মা!'—জননী কুণ্ঠিত হয়েছেন দেখে নরেন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ব'ললে,—"তোমার মত মা না পেলে কি আজও টিকে থাকতুম আমরা?"

গলাটা ধ'রে এলো নরেনের। ভুবনেশ্বরী তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—আচ্ছা বাবা, তোর ঠাকুর নাকি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। মা-কালীর সঙ্গে তাঁর নাকি কথাবার্ত্তাও হয়। মায়ের কাছে তিনি যা' চান্—তাই পান।··· তা'···তা' বল্‌না কেন একবার তাঁকে,—যদি মা'কে বলে—আমাদের সংসারের একটা সুরাহা ক'রে দিতে পারেন।

কথাটা কিন্তু নরেনের মনকে বিশেষ স্পর্শ করলো না। যেহেতু ঠাকুরের প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধা যতোই প্রগাঢ় হোক্,—ঠাকুরের ঐ-মা-টি তাঁর ভাববিহ্বল মস্তিষ্কের উদ্ভট খেয়াল,—না, ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমা সত্যই দেখা দেন ঠাকুরকে চিন্ময়ীরূপে,—সে সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ই ছিল নিরাকারবাদী নরেনের মনে। কাজেই মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলো।

* * * *

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন চরম সংকটও আসে,—যখন যে-কোন অবিশ্বাস্য পন্থাও আর অগ্রাহ্য করতে পারে না মানুষ। 'অকূল সমুদ্রে' ভাসমান ব্যক্তি একটা সামান্য খড়কুটোরও আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চায়।

একদিন তীব্র অভাবের তাড়না আর সহ্য ক'রতে না পেরে ছুটে এলো নরেন প্রায় পাগলের মত দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুরের কাছে। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ,—মাথার চুল উস্ক-খুস্ক—পরিধেয় মলিন,—চোখমুখ শুষ্ক—কিন্তু তারই মাঝে ফুটে উঠছে অসীম ব্যাকুলতা!—পথে ছুটে ছুটে কাঁটায় খোঁচায় পা দুটোও ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে তার।

এসেই একেবারে লুটিয়ে পড়লো ঠাকুরের পদপ্রান্তে, "কি করি বলুন, কোন মতেই তো কিছু করতে পারছি না। যে দিকে যা-কিছু আশা ছিল,—সব শেষ হ'য়ে গেছে। মা-ভাইদের শুক্‌নো মুখ আর যে দেখতে পারছি না! আপনার মায়ের কাছে ব'লে ক'য়ে আমাদের সংসারের দুঃখমোচনের একটা উপায় করে দিন্—নয় সব গেল।"

দরদর জল ঝরে পড়লো নরেনের চোখ দিয়ে।

'বোস্, বোস্।'—নরেনকে অধীর দেখে, ঠাকুর সান্ত্বনার সুরে বললেন,—"আগে ঠাণ্ডা হ'—তারপর অন্য কথা। অত অধীর হলে কি চলে রে?"

নরেনের ব্যথায়—ঠাকুরেরও গলার স্বর কেঁপে উঠলো সমবেদনায়। নরেন যে কত বড় হতাশায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে,—নরেন-অন্ত-প্রাণ কোমলহৃদয় ঠাকুরের বুঝতে কি তা' আর বাকী ছিল? নরেন একটু ঠাণ্ডা হ'লে তিনি বললেন,—তা দেখ, আমি তো মা'র কাছে কখনো কিছু চাইনে,—তবে তুই চেয়ে দেখতে পারিস্।···কিন্তু তুই যে আবার আমার মা'কে মানিস্ না। যা'কে মানি না, তার কাছে কি প্রার্থনা চলে বাপু?

নরেন কি বলবার জন্যে দৃষ্টি তুলে চাইলো ঠাকুরের দিকে। কিন্তু ঠাকুর আগেই বলে উঠলেন,—তা' যা, আজ মঙ্গলবার আছে,—মন্দিরের মধ্যে গিয়ে যা' তোর দরকার, মায়ের কাছে প্রার্থনা কর। যদি চাইতে পারিস্ অন্তর দিয়ে—মা তোর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

সাকার দেবদেবীর প্রতি নরেনের তো বিশেষ আস্থা ছিল না! তবে সে চাইবে কেমন ক'রে? ঠাকুর নিজে যদি চাইতেন তার জন্যে, সে ছিল আলাদা কথা, যেহেতু তাঁর বিশ্বাস আছে। যার বিশ্বাস নেই, হৃদয় দিয়ে চাওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব? নরেন ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

'যা না,'—ঠাকুর তাড়া দিয়ে একটু চড়া গলায়ই বললেন,—"দেরী করছিস্ কেন? আজ দিনটা ভাল আছে। মা তোকে নিরাশ করবেন না।"

শুধু অভাবের চাপে নয়, নিমেষে আরও যেন কা'র অভয় ইঙ্গিত পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো নরেন। দীর্ঘ সমুন্নতদেহ, আজানুলম্বিতবাহু, মহিমোজ্জ্বল ললাট, শিশু-স্বভাব,—সদানন্দ ঠাকুরের দিকে চেয়েও কেমন যেন একটা

পরিবর্ত্তন এসে গেল তার চিত্তে। ধীর পদক্ষেপেই ঢুকলো গিয়ে সে মায়ের মন্দিরের মধ্যে !

কিন্তু এ-কি ? চমকে উঠ্‌লো নরেন ! সম্মুখেই নানারত্নালঙ্কার-বিভূষিতা মায়ের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। শ্যামোজ্জ্বল রূপের আলোকপ্রবাহে যেন উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ছে চারিদিক। কে বলে প্রাণহীন পাষাণ-মূর্ত্তি ? প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—যেন অনন্ত কোটি প্রাণ খেলা করছে !—রূপ-রস-গন্ধময়ী অসীম লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি—যা ব্রহ্মেরই বিভাস—সেই বিশ্বপ্রকৃতিই যেন এই মূর্ত্তির দ্যুতির মধ্যে বিম্বিত হয়ে উঠছে দর্পণে ছায়ার মত।—চক্ষে বরাভয়—অধরে করুণা,—ললাটস্থ তৃতীয় নয়নে প্রলয়ঙ্কর কলুষবিনাশী অগ্নি,—বাম করে দুষ্টঘাতী শোণিত-রঞ্জিত সুশাণিত অসি, পদতলে নির্ব্বিকার—সচ্চিদানন্দ মহাকাল ;—গাঢ় অন্ধকারময় মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে—যোগীশ্বর আত্মহারা সাধক যেন শুভ্রজ্যোতিঃ চিরভাস্বর চৈতন্যে লীন হয়ে গেছেন !

মা, মা, মা !—নিরাকারবাদী নরেনের কণ্ঠ সহসা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো ভক্তিতে—মাথা আপনা থেকে নুয়ে পড়লো দেবী প্রতিমার সম্মুখে,—মা, মা, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

প্রার্থনা ক'রে পরিপূর্ণ মনে নরেন যখন ফিরে এলো ঠাকুরের কাছে,—তখনও জল টল্‌টল্‌ করছে তার চোখের কোণে। ঠাকুরের অন্তরের রহস্য ঠাকুরই জানেন !—অথবা নরেনকে প্রার্থনা করতে পাঠিয়েই তিনি জেনেছিলেন,—ফল কি হবে। তাই নরেন ফিরতেই একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি,—'মায়ের কাছে কি চাইলি রে নরেন ? বললি তো সব দুঃখ-কষ্টের কথা ?"

ঐ-যা ! দুঃখ-কষ্টের কোন কথা তো মাকে বলা হয়নি। এতক্ষণে নরেনের যেন সম্বিৎ ফিরে এলো ;—"না ঠাকুর, সে সব তো বলিনি কিছু।"

'বলিস্‌নি ?'—কৃত্রিম আশ্চর্য্যে চোখ দুটি বড় ক'রে বললেন ঠাকুর,—তবে কি বলেছিস্ ?

কি বলেছি ?—নরেন তখন চিত্ত স্থির ক'রে জানালো, সে কি চেয়েছে।

ঠাকুর ব'ললেন,—তুই একটা আস্ত বোকা। আসলে তোর যা চাই, তাই জানালি না ! আচ্ছা, যা, যা, আবার গিয়ে প্রার্থনা কর।

অভাবের পীড়নে নরেন কাতর। সে আবার ছুটলো মায়ের মন্দিরে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—মূর্ত্তির দিকে চাইতেই তার অন্তরে কি যে আলোড়ন জাগলো,—সে আবার মাথা নত ক'রে ভক্তির আবেগে ব'লে উঠলো,—মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

'কি-রে, এবার ঠিক ঠিক চেয়েছিস্ তো?'—অন্তর্যামী ঠাকুর নরেন ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন। মনে মনে তখন বুঝি বা হাসছেনই! নরেন পূর্ব্বের মতই চমকে উঠলো,—'কই, এবারও তো ব'লতে পারিনি অভাব-মোচনের কথা মায়ের কাছে! এবারও যে সেই আগের প্রার্থনাই করেছি!"

"না, বুদ্ধিশুদ্ধি তোর কিছু নেই।" মৃদু তিরস্কারের সুরে ঠাকুর বললেন,— আচ্ছা যা, বারবার তিনবার। আর একবার যা, এবার কথাগুলো মনে মনে আগে হতে একটু গুছিয়ে নিয়ে তার পর প্রার্থনা করিস্ঃ আমি বলছি,— মা তোর আশা পূর্ণ করবেনই।

নরেন আবার ছুটলো মন্দিরের মধ্যে। এবার সে রীতিমত প্রস্তুত ও সতর্ক হয়ে এসেছে। অর্থ-সম্পদ্ প্রার্থনার কথাগুলোও গুছিয়ে নিয়েছে একেবারে জিভের ডগায়। কিন্তু যেই মন্দিরে ঢুকলো, অমনি মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার ভাবান্তর এসে গেল,—এবং মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবার সে ব'লে উঠলো,— মা, মা, আমায় জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও—

প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের কাছে ফিরে আসতেই যেন স্বপ্নভঙ্গ হলো তার। —'না ঠাকুর!' বললে নরেন আশাহত কণ্ঠে—'তোমার লীলা তুমিই জান। এবারও কিন্তু আমি অভাবের কথা বলতে পারলাম না মায়ের কাছে।'

'পারলি না?' হাসলেন ঠাকুর।—মনে মনে বুঝলেন,—যে শাশ্বত-অনন্ত ও নিত্য ঐশ্বর্য্যের জন্য এসেছে,—সে কি কখনো ভাবতে পারে ক্ষণিকের অনিত্য সুখ-সম্পদের কথা? প্রকাশ্যে বললেন,—"তাহ'লে তোর কপালে আর সংসার-সুখ নেই।"

নরেন অধীরভাবে ব'লে উঠলো,—আমি চাই না ধন-সম্পদ,—চাই না সংসার-সুখ। আমার মা-ভাই-বোনেরা যাতে খেতে পরতে পায়,—আপনি তাই ক'রে দিন।

'আচ্ছা যা',—মুক্তকণ্ঠে বাক্‌সিদ্ধ ঠাকুর বলে উঠলেন,—'এখন থেকে তোদের সংসারে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব আর কোনদিন হবে না।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিসের যেন একটা শিহরণ খেলে গেল নরেনের সর্ব্বাঙ্গে। তার মাথা আপনা থেকে নত হয়ে পড়লো শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে।

৩৫

'আজ আবার দক্ষিণেশ্বরে যাবি-নাকি?'—জিজ্ঞাসা করলেন ভুবনেশ্বরী নরেনকে জামা-কাপড় পরতে দেখে।

নরেন উত্তর দিল,—ক'দিনই তো যাইনি মা, আজ তাঁকে দেখবার জন্যে মনটা চঞ্চল হচ্ছে।

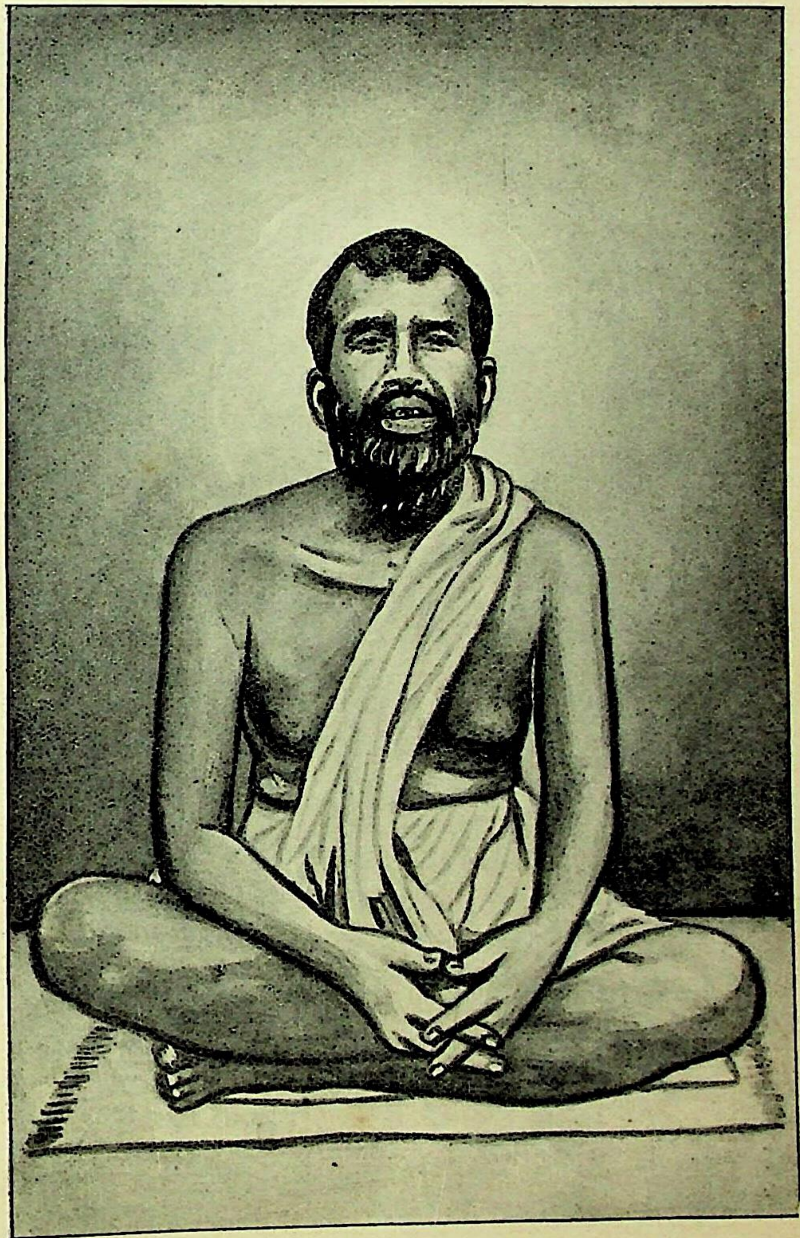
ঠাকুরের আশীর্ব্বাদের পর নরেনের সংসারে আর সে-রকম অভাব-অভিযোগ নেই। সত্য হয়েছে আজন্ম ব্রহ্মচারী পরমযোগী মহাপুরুষের শ্রীমুখের বাণী। কোন্ দিক দিয়ে কেমন ক'রে যে যোগাযোগ ঘটে গেল, কেউ বুঝলো না,—কিন্তু নরেনদের সংসার থেকে সত্যসত্যই তীব্র অভাবের হাহাকার দূর হয়ে গেল। উদ্বেগের স্থানে ফিরে এলো স্বস্তি—হতাশার স্থলে ফিরে এলো গভীর আশ্বাস।

ভুবনেশ্বরী বুঝেছেন—গুরু-বরণে ভুল করেনি নরেন। আর নরেনও পেয়েছে—কতকটা অভাব-মুক্ত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে নিরুদ্বেগে ঘন ঘন মেলামেশা করবার সুযোগ। ধ্যান-ধারণারও মাত্রা বেড়ে গেছে তার। ঠাকুরও সেই সুযোগে সুরু করেছেন—নিজের মনের মত ক'রে নরেনকে গড়ে তুলতে: নরেনের মনের সংস্কারগুলি দূর ক'রে সেখানে নিজের ভাবধারা প্রবাহিত করতে।

কিন্তু দার্শনিক মন নরেনের। ঠাকুরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠা ও প্রেমে তার হৃদয়ের দু'কূল প্লাবিত হয়ে উঠলেও—বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে কোন কিছু স্বীকার ক'রে নিতে রাজী নয় সে। কাজেই এখনো পর্য্যন্ত ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করবার মনোভাব দূর হয়নি তার।

পরমহংসদেব বুঝেন সবই; মনে মনে হাসেনও। ভাল লাগে তাঁর নরেনের এই পরীক্ষা। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি নরেনের মনের সন্দেহ নিরসন ক'রে তাকে নিবিড়ভাবে টেনে নেন আপনার দিকে।

কত ভক্ত, কত ঈশ্বরানুরাগী গৃহী আসেন ঠাকুরের কাছে প্রাণের পিপাসা নিবারণ করতে। একই জীবনে পৃথক পৃথকভাবে সাধনা ক'রে হিন্দু, ইস্‌লাম, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন ঠাকুর। দেখেছেন, সকল ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য একই। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসুর পক্ষে এমন শান্তির আশ্রয়স্থল আর কোথায়?



কতভাবেই না ভক্তেরা ঠাকুরের সেবা করেন—চেষ্টা করেন তাঁকে প্রীত করতে। নরেনও যায় ঠাকুরের সেবা করতে এগিয়ে। কিন্তু ঠাকুর তাকে তাড়াতাড়ি বাধা দেন,—থাক্, থাক্, তোর আর সেবা করতে হ'বে না। তোর ও-সবের দরকারও নেই। তুই আমার কাছে থাক্,—কথাবার্ত্তা বল্,—ব্যস, তাতেই আমার প্রীতি।

বিস্মিত হয়ে ওঠেন সকলে ঠাকুরের এই কথায়। বলেও ফেলেন কেউ কেউ,—ঠাকুর নরেনকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। নরেনকে ছ'দিন না দেখলে ওঁর প্রাণ অধীর হয়ে ওঠে!

'তা' হবে না কেন গো!'—ঠাকুর অম্লানবদনে উত্তর দেন,—"ওরই জন্যে তো আমার এই দেহে আসা।"—সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরের প্রতি ইঙ্গিতও করেন।

বিস্ময়-চকিত নেত্রে নরেন চায় ঠাকুরের দিকে। কি ব'লতে চা'ন ঠাকুর? নিজের কথায় কা'র কথা উল্লেখ করছেন তিনি। নরেনের দার্শনিক মন যেন একটা ধাঁধায় প'ড়ে বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

ঠাকুর ভক্তদের কাছে কত কথাই ব'লে যান। বলেন,—ভক্ত ছাড়া ভগবানকে চিনবে কে? কেই বা তৃপ্ত করবে তাঁকে অন্তর-সুধায়? কেই বা বিশ্বাস করবে তাঁকে?

নরেন তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে,—"ভক্তের ঐ বিশ্বাস অন্ধ; 'ভগবান ভগবান' ক'রে তার মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস এসে গেছে।"

'কি বললি?'—খর হয়ে উঠলো ঠাকুরের প্রশান্ত দৃষ্টি,—'অন্ধ বিশ্বাস?' সে আবার কি কথা রে? বিশ্বাস মাত্রেই তো অন্ধ। হয় বল 'বিশ্বাস',—না হয় বল 'জ্ঞান'। অন্ধবিশ্বাস, চোখওয়ালা বিশ্বাস—এসব আবার কেমন কথা?

—কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে নরেন। প্রতিবাদ করবার মত কথা খুঁজে পায় না সে। বেশ বুঝতে পারে,—এর উত্তর দেওয়া পুঁথিগত বিদ্যার কাজ নয়। পরের মুখে শোনা কথাও এখানে অচল। এর উত্তর দিতে হলে চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সমাগত ভক্তদের মধ্যে একমাত্র নরেনই ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতো,—আবার ঠাকুরের কথার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করতেও তার সমকক্ষ আর ছিল না কেউ।

ক্রমে ক্রমে নরেনের মনে জেগে উঠলো সাধনা করবার অদম্য স্পৃহা। একদিন তো পঞ্চবটী ও বিল্বতরুমূলে ব'সে সাধনা করবার জন্যে অনুমতিই চেয়ে বসলো সে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর সহাস্যে বললেন, 'আগে যে এ-সব মানতিস্ না: এখন যে বড় মানছিস্!' নরেনও মৃদু হেসে উত্তর দিলে,—'এখন যে আপনার

কাছে অনেক জানলুম, অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম!' প্রীত হ'য়ে বললেন ঠাকুর,—তা' পড়াশোনা সব ছেড়ে দিবি নাকি?

নরেন উত্তর দিলে,—যদি এমন ওষুধ পাই, যা খেলে যা শিখেছি তাও ভুলে যাই, তাহলে যেন বাঁচি! ঠাকুর বুঝলেন,—প্রকৃত সত্যের জন্য এবার আকুলতা জেগেছে নরেনের প্রাণে।

* * * * *

ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে একদিন বলছেন ভক্তদের,—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন—বৈষ্ণবধর্ম্মের এই হলো সারমর্ম্ম। দয়া চাই,—সর্ব্বজীবে দয়া—হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, ভাব-সমাধি ঘটলো তাঁর—কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে হঠাৎ যেন আচ্ছন্নভাবেই ব'লে উঠলেন,—জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট তুই,—তুই আবার জীবকে দয়া করবি কি? দয়া করবার তুই কে? দয়া নয়, দয়া নয়—বল সেবা,—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!

চমকে উঠলো নরেন। মুগ্ধ-তন্ময় হয়ে গেল সে—ঠাকুরের এই ব্যাখ্যায়। কে বুঝবে ঠাকুরের এ কথার অর্থ? কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি খুলে গেল নরেনের। সাকার-উপাসক ঠাকুরের মুখে একি কথা?…শিবজ্ঞানে জীবের সেবা,—এ যে বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির,—অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অন্তরের কোমল বৃত্তির এক অপূর্ব্ব অমৃতময় সংমিশ্রণ! তবে কি ঠাকুর অদ্বৈতবাদী? অথবা দ্বৈত-অদ্বৈত সাকার-নিরাকার সব কিছুর ঊর্দ্ধে,—না, সকল কিছুর সমন্বয়ে গঠিত নিষ্কাম সাধনার এক মহিমময় প্রোজ্জ্বল-মূর্ত্তি?

নরেনের মনে হলো, আজ জীবনে সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোকের সন্ধান পেয়েছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, রাজযোগ সবই যেন নিহিত রয়েছে ঠাকুরের ঐ সামান্য কথায়। আত্মার মধ্যে রয়েছেন পরমাত্মা, জীবকে যে শিবজ্ঞানে সেবা করতে পারে—চিদানন্দময় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা কি তার পক্ষে কঠিন?

যুক্তিতর্কবাদী নরেনের মন ডুবে গেল এক অনাস্বাদিত পুণ্য ভাবধারার মধ্যে।…

৩৬

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গলার মধ্যে হ'য়েছে তাঁর ক্যানসার (কর্কটরোগ)। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভক্তগণ সকলে মিলে চিকিৎসার্থ ঠাকুরকে নিয়ে এলেন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে।

—ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গৃহীও ছিল, গৃহত্যাগীও ছিল। নরেন ছিল যেন এর মাঝামাঝি। ঠিক গৃহীও নয়, আবার গৃহত্যাগীও নয়। ঠাকুরের উপযুক্ত

চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে ভক্তরা সকলে মিলে তাঁর পরিচর্য্যা করতে লাগলো প্রাণের সমগ্র নিষ্ঠা ঢেলে।

যে নরেনকে ঠাকুর সেবা করতে দিতেন না, এই অসুস্থ অবস্থায় সেই নরেনই হ'লো সেবকের অগ্রণী। বাড়ীর সংশ্রব তার একেবারে ছাড়লে চলে না,—তবে অধিকাংশ সময়ই সে প'ড়ে থাকে ঠাকুরের কাছে। আর এই অসুস্থ অবস্থাতেই ঠাকুরও তাকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মধ্যে পেয়ে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে চাইলেন—তাঁর সবকিছু আধ্যাত্ম-সম্পদের প্রভাবে। এত বড় আধার তো আর ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে অন্য কেউ ছিল না!

ঠাকুরের নিবিড় সংস্পর্শে এসে কিছুদিনের মধ্যে নরেনেরও মনের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ফিকে হয়ে আসতে লাগলো।···বিশ্বব্যাপী 'বিশ্বময়ের' প্রতিচ্ছবি অনন্ত অসীম বিশাল এই বিশ্ব।···নিরাকারবাদী ব্রহ্ম-উপাসক এই বিশ্বরূপী ব্রহ্মকে তার ধ্যান-ধারণার মধ্যে আপন অন্তরে উপলব্ধি ক'রে সাধনার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু যে যোগমার্গে ততদুর উঠতে পারেনি,—যার দৃষ্টির সীমা সংকীর্ণ—কেমন ক'রে এই ধারণাতীত অনন্ত অসীমকে ধ্যানে কিংবা ধারণায় নিয়ে আসতে পারে সে?

কাজেই মনের আধার-স্বরূপ তাকে নিতে হয় নিজের ধারণার, জ্ঞান বা দৃষ্টির সীমানুরূপ মূর্ত্তির কল্পনা ক'রে। কিন্তু সে তো প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করে সেই ব্রহ্মেরই। ক্রমে ক্রমে তার ধ্যান-ধারণার শক্তি যত বেড়ে যায়, দৃষ্টির সীমা যতই প্রসারিত হয়,—ততই মূর্ত্তি সরে যায় দূরে,—ক্রমশঃ আরো দূরে। পরে অসীম-অনন্তকে যখন সে পূর্ণভাবেই ধারণা করতে পারে—তখন কোন মূর্ত্তির আর দরকার হয় না তার।

সাকারবাদীর মূর্ত্তিপূজা,—আর নিরাকারবাদীর ব্রহ্মের উপাসনায় তবে আর তফাৎ কোথায়? একটা যেন আর একটার সোপান! দুটো পথই কি সেই একজনকে পাবার জন্যে নয়?

নরেনের মনের দ্বন্দ্ব যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। জ্ঞানী দার্শনিক থেকে একটু একটু ক'রে ভক্ত হতে সুরু করে সে। ক্রমশঃ উপলব্ধি তার আরও গভীর হ'য়ে আসে। শেষ পর্য্যন্ত বোঝে,—অদ্বৈততত্ত্বই চরম ও পরম সত্য কিন্তু দ্বৈতের সঙ্গেও মূলতঃ এর বিরোধ নেই; এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈদান্তিক না হয়েও যেন বেদান্তাদির মূর্ত্তভাষ্য।

নরেনকে স্নেহ করতেন ঠাকুর অন্তরের সব প্রীতিটুকু উজাড় ক'রেই। তা' বলে নরেনের দোষত্রুটিও তাঁর হেলার বস্তু ছিল না। বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখলেও নরেনকে তিরস্কার করতেন তিনি রূঢ়ভাবে।

এক টুক্‌রো কাগজে ঠাকুর একদিন লিখলেন, 'নরেন জগতে লোকশিক্ষা দেবে।' নরেন সেটা পড়েই প্রতিবাদ করে উঠলো, "না, না, পারবো না আমি।" "পারতেই হবে তোকে।" দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঠাকুর,—"তুই না পারিস্— তোর ঘাড় পারবে। জগদম্বা তোকে ঘাড়ে ধ'রে করিয়ে নেবেন।"

নরেনের মুখে আর কোনো কথা যোগাল না। ঠাকুর মনে মনে হাসতে লাগলেন।

৩৭

কাশীপুরের বাগান থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়ে পঞ্চবটী ও বিল্বতরুমূলে সাধনা করবার অনুমতি পেয়েছিল নরেন ঠাকুরের কাছে। প্রায় প্রতি রাত্রেই সে সেখানে গিয়ে চারিদিকে ধুনি জ্বালিয়ে মগ্ন হ'তো ধ্যানে। অনেক সময় সে দেখতো, ধুনির আগুনের পাশে নানা দেববেদীর সমাগম হয়েছে।

চম্‌কে উঠ্‌তো নরেন তাঁদের দেখে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো তার বরাভয়-দাতা ঠাকুরকে। মনে পড়তো তার—দক্ষিণেশ্বরের কল্যাণময়ী মায়ের মূর্ত্তি! এমনি ক'রে মনের বহু সন্দেহ ও চাঞ্চল্য এবং অশান্তিও দূর হয়ে যেতো তার। অন্তরের মাঝে একটা দৈবী প্রেরণাও অনুভব করতো সে।

আবার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্যও ঠাকুরকে সে পীড়াপীড়ি করতো প্রায়ই। পীড়াপীড়ির চাপে একদিন ঠাকুর বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।···আমি ভাল হ'য়ে উঠি, তারপর তোকে দেখিয়ে দেব তার পথ। তখন যা' চাইবি, তাই দেব।

'কিন্তু আপনি যদি আর সেরে না ওঠেন!' নরেনের কণ্ঠ যেন ভারী হ'য়ে উঠলো ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায়,—"তাহলে আমার কি হবে?"

"শালা বলে কি!" কতকটা আত্মগত ও অন্যমনস্কভাবে বললেন ঠাকুর। কিন্তু মুহূর্ত্তে কি যেন ভেবে তাঁর চোখমুখ প্রশান্ত হয়ে উঠলো। ধীর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, কি চাস্ তুই বল্।

"আমার সাধ হয়,"—সাগ্রহে নরেন উত্তর দিলে,—'শুকদেবের মত একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। শুধু দেহরক্ষার জন্যে মাঝে মাঝে কিছুটা নেমে আসি,—আবার সমাধিতে চলে যাই।'

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ!" তীব্র অসন্তোষ ও তিরস্কারের সহিত ব'লে উঠলেন ঠাকুর,—'তোর মত এতবড় একটা আধারের মুখে—এমনি ছোট কথা! কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি,—তোর ছায়ায় কত তাপী

লোক আশ্রয় পাবে,—তা না হ'য়ে কেবল নিজের মুক্তি-চিন্তা? ছিঃ, ছিঃ. এ-তো তুচ্ছ স্বার্থের কথা!

মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো ঠাকুরের। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন,—না'রে না,—নজর অত ছোট করিস্‌ না। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাবো তো ভাজাও খাবো, সিদ্ধও খাবো,—ঝোলেও খাবো—অম্বলেও খাবো। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণভাবেও উপলব্ধি করি,—আবার নানা মূর্ত্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর্—একাধারে ভক্ত আর জ্ঞানী দুই হ'।

প্রাণের কি ব্যাকুল আবেদনই না ছিল ঠাকুরের কথার মধ্যে!—নরেন ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো। তার বুঝতে বাকী থাকলো না যে,—ঠাকুর তার সমাধিলাভের বিরোধী নন্‌,—কিন্তু এইটিই তার একমাত্র লক্ষ্য হোক্‌,—এ-ও চান্‌ না তিনি মনে-প্রাণে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীব পড়ে আছে ঘোর অন্ধকারে,—তাদের চক্ষেও আলো দিতে হবে। শুধু নিজের মুক্তির জন্যেই তার অধীর হ'লে চলবে না। সংখ্যাতীত আর্ত্ত মানবের কল্যাণের জন্যও এগিয়ে যেতে হবে তাকে আত্মহারা হ'য়ে।

ঠাকুরের মৃদু তিরস্কারের মধ্যে নরেন দেখতে পেলো আজ তার ভবিষ্যৎ জীবনের গন্তব্যপথ।

*   *   *   *   *

ক্রমশঃ ঠাকুরের ভাবেই ভাবিত হয়ে উঠতে লাগলো নরেন। নিত্য নূতন নূতন ভক্ত, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ আসেন ঠাকুরের কাছে কাশীপুরের বাগানে। মূর্ত্তিপূজার বিরোধী নরেন পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের তর্কও করে,—আবার ভক্তদের সঙ্গে কোন কোনদিন খোল-করতাল নিয়ে—মেতেও ওঠে সংকীর্ত্তনে। অদূরে ব'সে আত্মভোলা ঠাকুর হাসেন আপন মনে নরেনের এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনে দেখে!

নরেন প্রভৃতি তরুণ ভক্তগণকে ঠাকুর মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে মাধুকরী করতে পাঠান। ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক ক'রে ভক্তরা ঠাকুরকে নিবেদন করে। নরেনই হয় সকলের অগ্রণী। একদিন ঠাকুর ছেলেদের গেরুয়া দান করে দীক্ষিত করেন সন্ন্যাস-ব্রতে: তারপর সহর্ষে বলেন, যা, এখন থেকে যেখানে সেখানে আহারাদি করলেও তোদের কোন দোষ হবে না।

অসুস্থ ঠাকুর,—গলায় তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা, কিন্তু ঠাকুর নির্ব্বিকার! তবু হাসি লেগেই আছে মুখে। তবু উপদেশ দিচ্ছেন অম্লানবদনে—সমাগত

দর্শনার্থিগণকে—অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ভক্তকে। অসন্তোষ নেই—বিরক্তি নেই, ঠাকুর যেন মনের মধ্যে আত্মস্থ হ'য়ে ভুলেই গেছেন দেহের কথা।

'ওরে-ও নরেন।' হাসতে হাসতে নরেনকে ডেকে ঠাকুর বললেন একদিন,—"আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলছে। আমি নাকি ভগবানের অবতার।"

'যে যা খুশী বলুক' পরিষ্কার গলায় উত্তর দিলে নরেন,—'আমি কিন্তু ওতে নেই। হাজার হাজার লোক আপনাকে ঈশ্বর বললেও,—আমার যতক্ষণ সত্য ব'লে ধারণা না হচ্ছে, আমি মানতে রাজী নই। আর আমি ঈশ্বরও চাই না। চাই শান্তি, সত্য, অনন্ত জ্ঞান। তা কিন্তু আপনার মধ্যেই আছে।'

প্রীতিমুগ্ধ ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন নরেনের কথায়। ভারী খুশী হলেন তিনি নরেনের সত্য-ভাষণের দৃঢ়তা দেখে।……

একদিন বুদ্ধদেবের লীলামাহাত্ম্য পড়তে পড়তে ভগবান তথাগতের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো নরেনের। কাউকে কিছু না ব'লে—এমন কি ঠাকুরকেও না জানিয়ে—তারক ও কালী নামে দুই গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে ক'রে সে উঠ্‌লো গিয়ে একেবারে বোধগয়ায়।

এখানে তো সকলে ভেবেই অস্থির! এমন অজ্ঞাতে কোথায় গেল তারা? গেলোই বা কেন? যাবেই বা কদ্দূর?

সব শুনে ঠাকুর বললেন,—যেখানেই যাক্, শীগ্‌গির ফিরবে এখানে। কেউ ভাবিসনে তোরা। শুনেছিস্ তো সেই ময়ূরের গল্প?…একজনের বাগানে রোজ একটা ময়ূর আসতো। বাগানের মালিক খাবারের সঙ্গে তাকে একটু ক'রে আফিং খাইয়ে দিত। শেষে ঐ আফিংয়ের টানে একটি দিনও ময়ূরের আর বাগানে না এলে চলতো না।…জানিস্, নরেনেরও ঠিক সেই অবস্থা। যে রস পেয়েছে এখানে,—তা' ছেড়ে যাবে কোথায়?…ফিরে এলো ব'লে! এই যে দাগ টানলেম, এর বেশি সে যাক্ দিকি?

মাটীতে একটা দাগ টেনে কৌতুকে শিশুর মত হেসে উঠলেন ঠাকুর।

নরেন যে রস পেয়েছে, তার ভাণ্ডারী তো তিনিই! আর প্রাণভরে সে রস পান ক'রে মেতে উঠতে পারে নরেনই।

অবশ্য তিনদিন পরে ঠাকুরের কথাই ফললো। নরেন ফিরে এলো কাশীপুরে সঙ্গীদের নিয়ে। নরেনের দিকে চেয়ে শুধু মৃদু হাসলেন ঠাকুর; কালী ও তারকের মুখে শুনলেন,—বোধিবৃক্ষমূলে প্রস্তরবেদীতে ব'সে ভগবান তথাগতের ধ্যান করতে করতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে নরেন। অনেক ক'রে তার চৈতন্য ফিরিয়ে আন্‌তে হয়।

ধ্যানের মধ্যে ভগবান তথাগতের দর্শন লাভ করে নরেন।

৩৮

কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধি তো কই একদিনও হয় না?—নরেন প্রায়ই ভাবে,—ঠাকুরকেও অস্থির ক'রে তোলে তার জন্যে। দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর সত্যসত্যই নরেন লাভ করলো নির্ব্বিকল্প সমাধি!—ধ্যান করতে করতে সহসা কাতর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো সে। চীৎকার ক'রে ডাকলো,—গোপালদা, গোপালদা!

পাশের ঘরে 'গোপালদা' ধ্যান করছিলেন। নরেনের চীৎকারে ধড়মড় ক'রে উঠে এসে বললেন,—কি হলো নরেন?

'আমার শরীর কই গোপালদা'?—কাতরকণ্ঠে নরেন বললে, 'আমার হাত কোথায় গেল,—পা কোথায়?—শুধু মাথাটা ছাড়া আর যে কিছুই নেই।'

বিস্ময়ের সীমা রইলো না গোপালদার।…নরেনের দেহে স্থানে স্থানে হস্তার্পণ ক'রে সে বললে,—কেন নরেন, এই তো হাত, এই তো তোমার পা।

কিন্তু তবু কিছু অনুভব করতে পারে না নরেন। সংবাদটা তখন গেল ওপরের কক্ষে ঠাকুরের কাছে। শুনে ঠাকুর বললেন,—বেশ হয়েছে, থাক কিছুক্ষণ ঐভাবে। ওর জন্যে আমাকে ভারী জ্বালিয়ে তুলেছিল ক'দিন।

নরেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে ঠাকুর প্রশান্ত হাস্যে বললেন,—কেমন,—মা তো আজ সব দেখিয়ে দিলেন?—কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্তই। চাবি থাকলো আমার হাতে। এখন তোকে কাজ করতে হবে। আমার কাজ শেষ হলে চাবি খুলবো।…কিন্তু সাবধান, শরীরের ওপর অযত্ন করবে না। সংশ্রব আর খাদ্য-অখাদ্য বিচারেও যথেষ্ট সতর্ক থাকবে।

সম্মোহিত নরেন ঠাকুরের প্রত্যেকটি উপদেশ নীরবে মাথা নত ক'রে শুনে গেল—শুধু বাহ্যকর্ণে নয়—অন্তঃকর্ণেও।

সমাধির মধ্যে কি দেখলো নরেন?…দেখলে, বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড জ্যোতিঃ-সমুদ্র—শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় ফেনপুঞ্জ মাথায় ক'রে জ্যোতিঃর তরঙ্গ নৃত্য করছে তার অনন্ত-বিস্তার বক্ষে,—আর তার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোতিঃর কেন্দ্রস্বরূপ ভাসমান রয়েছেন ব্রহ্মসত্তা। জরা নেই—মৃত্যু নেই—রোগ-শোক-

তাপ নেই,—অশান্তি নেই,—চারিদিক দিয়ে যেন অনন্ত জীবন, অসীম অবিচ্ছিন্ন শান্তি ঘিরে রয়েছে তাকে। আর উর্দ্ধলোক থেকে কে যেন ডাক দিয়ে বলছে,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থু

* * * * *

—বাগানের এক গাছের তলায় ধ্যানে বসেছে নরেন,—আর তার পাশে ভক্তবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু অসংখ্য বড় বড় মশার উপদ্রবে সেখানে কি এক পলকও চোখ বোজবার যো আছে!···কালো কালো রঙের মশা, যেখানে কামড়ায় সেই জায়গাটাই ফুলে ওঠে,—অসহ্য জ্বালা করে।

অনেকক্ষণ ধ'রে বিপুল চেষ্টা করেও গিরিশচন্দ্র কিন্তু কোনমতেই পারলেন না ধ্যানে নিমগ্ন হতে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকেন,—আবার তীব্র দংশনের জ্বালায় নিষ্ঠা ভেঙ্গে যায় তাঁর। তিক্তবিরক্ত হ'য়ে ঘনঘন গায়ের এদিক সেদিক চাপড় মারতে থাকেন তিনি।

কিন্তু এ-কি! হঠাৎ গিরিশচন্দ্র দেখেন এক সময় চোখ খুলে, নরেন বসে আছে অনড়-অচলভাবে,—দুই চোখ তার সম্পূর্ণ নিমীলিত। সর্ব্বাঙ্গ যেন কেউ কালো রঙের কম্বলে মুড়ে দিয়েছে! কিন্তু কম্বল নয়, কালো কালো অসংখ্য মশা তার গায়ে এমনি ঘনভাবে বসেছে যে, মশার চাপকেই ভ্রম হচ্ছে কম্বল ব'লে।

বিস্ময়ের সীমা রইলো না গিরিশচন্দ্রের। ধ্যান ছেড়ে তিনি বার বার ডাকতে লাগলেন নরেনকে। কিন্তু নরেন কি তখন আর বাহ্যজগতে আছে?···পা' ধরে টানাটানি করেও গিরিশচন্দ্র ধ্যান-তন্ময় নরেনের চৈতন্য আনতে পারলেন না। অধিকন্তু নরেনের সংজ্ঞাহীন দেহ ধ্যানের আসন থেকে লুটিয়ে পড়লো ধূলায়। সর্ব্বাঙ্গ তখন তার মৃতদেহের মতই কঠিন হয়ে উঠেছে!

অনেকক্ষণ পরে বাহ্য সংজ্ঞা ফিরে এলো নরেনের।—আকুল বিস্ময়ে স্থিরনেত্রে তখনো গিরিশচন্দ্র চেয়েছিলেন নরেনের দিকে। কিসের যেন ভাবাবেগে অধীর হ'য়ে ব'লে উঠলেন তিনি,—আমরা নয়—আমরা নয়,—তুই-ই পারবি,—তুই-ই পারবি। আমাদের যা কল্পনাতেও আসে না, তোর পক্ষে তা' সহজসাধ্যই বটে!

৭/১০৬

৩৯

মাঝে ঠাকুর একটু ভালোই ছিলেন,—কিন্তু ভক্তবৎসল আত্মভোলা মানুষ! নিজের রোগের কথা ভুলে নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে দর্শনার্থীদের বাসনা পূর্ণ করতে লাগলেন। ফলে গলক্ষত হঠাৎ বেড়ে গেল তাঁর।
ভক্তদের মুখে দেখা দিল গভীর বিষাদের ছায়া! ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলো সকলে। নরেনের তো শুধু পাগলই হতে বাকী! ঠাকুরের যন্ত্রণা কি নিজের দেহে নিয়ে ঠাকুরকে সুস্থ করা যায় না?—ব্যাকুল-চিত্ত নরেন সর্ব্বদাই একথা ভাবে,—আর ছট্‌ফট্ ক'রতে থাকে কি-যেন এক দুঃসহ প্রাণের জ্বালায়!···ঠাকুর যদি চলে যান,—তবে তার কি হবে?··· নরেন যেন আর ভাবতেও পারে না,—দুই চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে তার।

ঠাকুরের গলার যন্ত্রণা সেদিন খুবই বেড়ে উঠেছে!—নরেন আর স্থির থাকতে না পেরে সন্ধ্যার পর থেকে বাগানের চারিদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো,—আর কেবলই আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রতে লাগলো,—রাম, রাম, রাম! তার ধারণা,—এইভাবে সে ঠাকুরের আরোগ্যলাভের জন্য দৈবীকৃপা লাভ করবে।
বিরাম নেই,—ক্লান্তি নেই—নরেন চীৎকার করছে সারারাত্রি—রাম, রাম, রাম। নিস্তব্ধ নৈশপ্রকৃতির বুকে মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনি উঠছে,—রাম, রাম, রাম! রজনীর শেষ যামে তার সেই আর্ত্তকণ্ঠ কর্ণগোচর হ'লো ঠাকুরের। তিনি চঞ্চল হ'য়ে বললেন একজনকে,—'যা, যা, শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয় নরেনকে।'
কিন্তু নরেনকে থামায় কে?···অবশেষে একসঙ্গে কয়েকজন গিয়ে প্রায় জোর ক'রেই তাকে নিয়ে এলো ঠাকুরের কাছে।
"ও-আবার তুই কি ক'রছিস রে? ওতে হবে কি?"—ঠাকুর স্নেহার্দ্রস্বরে ব'ললেন, —"দেখ, তুই যেমন ক'রছিস,—একে একে অমন বারটা বছর আমার মাথার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি ক'রবি বাবা?"
নরেনের তখন উত্তর দেবারও যেন আর শক্তি নেই। ঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলো সে স্থিরনেত্রে। অন্তরের অসীম কাতরতা ফুটে উঠলো তার করুণ দৃষ্টির মধ্যে।···

* * * *

গলার বেদনায় ঠাকুর আর একবারেই কিছু খেতে পারছেন না। কঠিন কোন আহার্য্যের তো কথাই ওঠেনা,—তরল সুজির পায়স এমনকি দুধ পর্য্যন্ত

যেন গিলতে কষ্ট হয় তাঁর! কিছু খাবার সময় ঠাকুরের যন্ত্রণা-বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে—নরেনের মুখখানাও বিকৃত হয়ে ওঠে গভীর অন্তর্বেদনায়! ঠাকুরের গলার বেদনা যেন নিজের গলায় অনুভব করে নরেন!

খেতে গিয়ে ঢোক গিলতে পারেন না ঠাকুর, গলা দিয়ে কিছু নামাতেও পারেন না,—এদিকে নরেনের মনে হয়,—তার গলাতেই যেন কিছু আটকে গেছে—নিজের গলা দিয়ে সেও যেন কিছু নামাবার চেষ্টা করে। এক একবার তার মনে হয়,—আচ্ছা, ঠাকুরের গলার বেদনাটা নিজের গলায় নিয়ে কি ওকে যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়না ?

একদিন নরেন অধীর আগ্রহে বললে ঠাকুরকে কাতরকণ্ঠে—আপনার মায়ের কাছে তো আপনি কিছু চাইবেন না। কিন্তু যাতে সামান্য কিছু খেতে পারেন,—যন্ত্রণার একটু লাঘব হয়, এ প্রার্থনাও কি করতে দোষ আছে? টাকাকড়ি নয়, ধনসম্পত্তি নয়,—শুধু যাতে দুটো খেতে পারেন। না হয়, আমাদের নাম করেই বলুন মাকে,—বলুন যে ছেলেরা বলতে বল্‌ছে,—তাই বলছি, যাতে দুটো অন্ততঃ খেতে পারি, এমন কিছু করে দে মা!

চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো নরেনের! তার আকুলতা ঠাকুরকেও অভিভূত করে তুললো। 'আচ্ছা, আচ্ছা'—বললেন ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে,—"তোর যখন এত দুঃখ,—তখন বলবো মাকে। তোর কথা কি ঠেলতে পারি ?"

ভারী আনন্দিত হলো নরেন। ঠাকুর বললে কি মা তাঁর ছেলের বেদনা বুঝবে না ?...একশো বার বুঝবে বেটি!

নরেনের কিন্তু আর 'তর' সয় না।

দু তিনদিন পরেই সে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো ঠাকুরকে,—বুকখানি তার আশা ভরসায় দুলে দুলে উঠ্‌ছে,—'বলেছিলেন মাকে ?'

—"বলেছিলুম।"—ঠাকুরের কণ্ঠ ধীর!

আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো নরেন,—'মা কি বললেন ?'

'কি বললেন ?'—ঠাকুর মাথা নুইয়ে কি একটু ভাবলেন,—তারপর চোখ তুলে বললেন,—'মা দেখিয়ে দিলেন তোদের সকলকে। বললেন, 'এই এতগুলো মুখে খাচ্ছিস,—তবু তোর খাওয়ার সাধ মিটছেনা!' মায়ের কথায়—লজ্জা পেয়ে কিছু আর বলতে পারলাম না আমি।

নরেনের মুখেও আর কোন কথা ফুটলো না। ভুল ভেঙ্গেছে তার। ঠাকুরের অপার মহিমার কথা উপলব্ধি করে—তারও মাথা নুয়ে পড়লো প্রগাঢ় লজ্জায়।

* * * *

"রোগটা সাংঘাতিক তো বটেই, আবার ভীষণ ছোঁয়াচেও।"—বললেন একদিন ঠাকুরের চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—"সকলের যথেষ্ট সাবধানে থাকা উচিত।"

আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো সেবক-ভক্তেরা ডাক্তারের মন্তব্য শুনে। নরেনের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো ঠাকুরের বিচ্ছেদ-শঙ্কায়। হঠাৎ কি ভেবে সে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সুজির পায়েস—যাতে ক্ষতের রক্তপুঁযও মিশে গিয়েছিল,—খেয়ে ফেললে এক নিঃশ্বাসে অম্লানবদনে। পরে ব'ললে নির্ব্বিকার চিত্তে—'বিশ্বের ব্যথা-বেদনা নিজের দেহে নিয়েছেন ঠাকুর! তোরা কেউ কোন চিন্তা করিস্ না। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে সকলে সুস্থই থাকবি। আমি তো আজ অমৃতই পান করলাম!'

অবাক-বিস্ময়ে চক্ষুস্থির ক'রে চাইলো সকলে নরেনের দিকে।

ঠাকুর অবশ্য বুঝেছন, তাঁর আর দেরী নেই। এবারকার মত লীলা শেষ ক'রতে হবে তাঁকে। ব'ললেন নরেনকে ডেকে,—ওরে নরেন, আমি তো চলে যাচ্ছি,—তা আমার কাছে অষ্টসিদ্ধি আছে,—সাধনা ক'রতে ক'রতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কখনো কাজে লাগাইনি।...নিবি তুই?

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন,—কথাটা ভাবতেই অধীর হয়ে উঠলো নরেন। ছল ছল ক'রে উঠলো তার দুটি চোখ। একটু সামলে নিয়ে বললে,—ওর দ্বারা কি আমার ঈশ্বরলাভ হবে?

"না, তা—হবে না।"—কথা টেনে ব'ললেন ঠাকুর,—"তবে অলৌকিক অনেক কাণ্ড করতে পারবি।"

'চাইনে আমার তবে অমন অষ্টসিদ্ধি।'—উপেক্ষার সুরে জবাব দিলে নরেন।

মন ভ'রে উঠলো ঠাকুরের আনন্দে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে নরেন। ঠাকুর বলতেন,—নরেন ঈশ্বরকোটি পুরুষ, নিত্যসিদ্ধের থাক, ও যেদিন নিজেকে জানতে পারবে, সেদিন আর দেহ রাখবে না।...

"বোস্ তবে এইখানে, আমার সম্মুখে। স্নেহসিক্ত মৃদুকণ্ঠে আদেশ ক'রলেন ঠাকুর। যন্ত্রচালিতের মত নরেন পালন ক'রলো ঠাকুরের আদেশ।

এরপর নরেনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। অমনি নরেনের সর্ব্বদেহেও বিপুল শিহরণ জেগে উঠ্‌লো। মনে হলো—যেন পরমহংসদেবের শরীর থেকে সূক্ষ্ম তড়িৎ-স্পন্দনের মত একটা তেজোরশ্মি নির্গত হ'য়ে তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে!

সহসা নরেনও হারিয়ে ফেললো তার বাহ্যজ্ঞান।...কতক্ষণ এভাবে গেল,—

তা' সে কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু চেতনা ফিরে পেতেই দেখলো,—ঠাকুর কাঁদছেন,—তাঁর চোখে জল!

ঠাকুর কাঁদেন কেন?—অতি মাত্রায় আশ্চর্য্য ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো নরেন। জিজ্ঞাসা ক'রলো ঠাকুরকে,—ওকি! আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে?

কিসের যেন আবেগ ফুটে উঠলো ঠাকুরের কণ্ঠে,—"আজ আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে—ফকির হলাম। এই শক্তিতে তুই জগতের অনেক কাজ করতে পারবি। কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি—যেখান থেকে এসেছিস সেখানে।"

সত্যিই তবে হারাতে হলো ঠাকুরকে!—নরেন আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলো না। শিশুর মত কাঁদতে লাগলো আকুলভাবে।

* * * *

সারাদিন ধ'রে সমুজ্জল নির্ম্মল আলোকে বিশ্বকল্যাণ সাধন ক'রে জগৎ-সবিতা সূর্য্য এবার পাটে বস্‌ছেন। বিশ্বের ওপর দিয়ে নেমে আসছে যেন একটা পরিম্লান পাণ্ডুর ছায়া। উদয় থেকে অস্ত—প্রকট থেকে অপ্রকট—উদ্ভব থেকে অন্তর্দ্ধান—এইতো জগতের নিয়ম! আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান কাশীপুর বাগানের বুকে—গোষ্পদে বিম্বিত অনন্ত আকাশের মত সমগ্র বিশ্বের বেদনা যেন প্রতিবিম্বিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। ঠাকুর তো শুধু বাংলার নন—ঠাকুর ভারতের—তথা বিশ্বের এবং বিশ্বেরও অতীত সেই উর্দ্ধলোকের! ধর্ম্মজগতে এক শুভময় নবযুগের সূচনা হয়েছে—লোক-পাবন ঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাবে—তাঁর অনন্ত ভাবময় লীলাচাতুর্য্যে!

'নরেন!'—ঠাকুর ডাকলেন শয্যা থেকে মৃদুকণ্ঠে। নরেন তো তটস্থ হ'য়েই ছিল: ব্যগ্রভাবে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো—কিছু ব'লবেন?

"দেখ্‌, নরেন,"—প্রগাঢ় হয়ে উঠ্‌লো ঠাকুরের কণ্ঠস্বর—"আমার তো সময় হয়েছে···তোর হাতে এদের সকলকে আমি স'পে দিয়ে যাচ্ছি।" তিনি রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, তারক, লাটু প্রভৃতি তরুণ ভক্তগণের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রলেন।—"তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে শক্তিশালী। সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তোদের সকলকে বিশ্বকল্যাণ সাধন করতে হবে। এরা যাতে আর ঘরে ফিরে না যায়—তার ব্যবস্থা করিস্। প্রত্যেককে খুব ভালোবেসে—একস্থানে গিয়ে সাধন-ভজনে মন দেবার ব্যবস্থা করবি।"

নরেনের মর্ম্ম বেদনার কথা তখন আর প্রকাশের ভাষা পাচ্ছে না।···তার প্রাণ গুমরে কেঁদে উঠলো,—হায়, হায়, সবই এবার শেষ হলো।···তার প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ভালবাসার তো অন্তই ছিল না,—কিন্তু সেও যে ঠাকুরকে কি

গভীরভাবে ভালবেসেছিল—আজ ঠাকুরের বিদায়ের প্রাক্কালে তা যেন উপলব্ধি করতে পারলো পরিপূর্ণভাবে।

* * * *

মাত্র দু'দিন পরে—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট, রবিবার: অসংখ্য অজ্ঞানের জ্ঞানচক্ষুদাতা ঠাকুরের চোখ দুইটিও ধীরে ধীরে মুদে আসছে! শয্যা পার্শ্বে ভক্ত-শিষ্যগণ—বুকে প্রচণ্ড শোকভার নিয়ে স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করছে, এক মহা-মুহূর্ত্তের—বিশ্বের ব্যথা-বিজড়িত এক অবাঞ্ছিত বিদায়-ক্ষণের—এক পরম ভাস্বর মহাজীবনের মহাসমাধির!

নরেনও দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধভাবে। সহসা তার মন যেন বলে উঠলো,—'আচ্ছা, অনেকে তো ঠাকুরকে ভগবানের অবতার ব'লেছেন'—কিন্তু উনি নিজের মুখে তো সে রকম কিছু স্পষ্ট করে বলেননি কোনদিন! আজ যদি এই সময়—এই অন্তিমে একবার বলতেন,—ধর্ম্মস্থাপনের জন্যে যিনি যুগে যুগে ধরণীতে অবতরণ করেন,—তিনিই এসেছিলেন—রামকৃষ্ণদেহে: তা'হলেই আমার মনের সন্দেহ মিট্তো। তা'হলেই বুঝতাম, উনি সত্যিই ভগবানের অবতার।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—সেই চরম সন্ধিক্ষণে—সহসা ঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন নরেনের দিকে। "নরেন"—যেন গভীর অভিমান ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠে—"বলি, এখনো তোর মনের সন্দেহ গেল না রে? ওরে, সত্যি বলছি,—যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবার একদেহে রামকৃষ্ণ।—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!"

থর থর করে কেঁপে উঠলো নরেনের সর্ব্বদেহ। নিশ্চল হয়ে উঠলো তার আঁখির তারা! ঠাকুরের অন্তিম বাণীর রেশ তখনও যেন কানে বাজ্ছে তার! তখনও যেন তার প্রতিটি শব্দ রণিত হচ্ছে কক্ষের মধ্যে। অন্তর্য্যামী নারায়ণ না হ'লে কে জান্তে পারে, এমন ক'রে মানুষের অন্তরের গোপন কথা? কে আছে সন্দেহবাদী,—এর পরেও তুলতে পারে অবিশ্বাসের কথা? একদিকে নরেন যেমন নিজের সন্দেহে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো,—অন্যদিকে তেমনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে যা কামনা করেছিল তাই পেয়ে তার জীবন ভ'রে উঠ্লো এক অলৌকিক শক্তিতে।

গভীর রাত্রিতে ধীরে ধীরে ঠাকুর নিস্পন্দ হ'য়ে এলেন। অধরযুগ্মে ফুটে উঠলো তাঁর মৃদু হাস্য। একে একে তিন বার কালী নাম উচ্চারণ ক'রে স্থিরনেত্রে উর্দ্ধে চেয়ে মহাসমাধি লাভ করলেন মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

'ঠাকুর, ঠাকুর!'—আকুল কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে নরেন লুটিয়ে পড়লো

ঠাকুরের চরণে। অন্যান্য ভক্ত-শিষ্যেরাও কেঁদে উঠ লো উদ্বেলিত অন্তরে। কি মহান্—কত মর্ম্মান্তিক এই মহাপ্রয়াণ। কি পুণ্য—কত বেদনাময় এই লীলাবসান!

রবি অস্তমিত হ'লো বটে—কিন্তু তার রক্তরশ্মি আকাশের অন্তরালে দিক থেকে ছড়িয়ে পড়লো দিগ্‌দিগন্তে। আর সেই আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হ'য়ে আকাশে সমুদিত হ'লো শরতের রাকা চাঁদ! ঠাকুর নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর ভাব ও চিন্তাধারা—তাঁর জগৎকল্যাণময়ী ইচ্ছাশক্তি—মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলো নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। আমরা ঠাকুরকে হারিয়েও হারালাম না,—নরেন্দ্রনাথের মধ্যেই ফিরে পেলাম তাঁকে, রূপান্তরিতভাবে—অভিনব মূর্ত্তিতে। নরেন্দ্রনাথের মধ্যেই জেগে থাকলো তাঁর লোক-পাবনী মহাশক্তি।

৪০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লালীসংবরণের পর এক দারুণ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কাশীপুর বাগানের যাঁরা ভাড়া দিচ্ছিলেন,—তাঁরা আর ভাড়া টেনে যাবার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু ঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যেরা যায় কোথায়?... তাদের তো একটা আস্তানা চাই?—নির্দ্দিষ্ট স্থান না হ'লে সাধন-ভজন চ'লে কি করে?

কোন কোন গৃহী-ভক্ত ব'ললেন,—ওদের বয়স অল্প,—কলেজ ছেড়ে এসে সন্ন্যাস নিয়েছে। ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন—তখন নিরাশ্রয়ভাবে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ওরা বরং নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করুক। তারপর যা' হয় করবে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে বেড়ানোর চেয়ে সে হবে ঢের ভাল।

কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীরা কেউই রাজী হলো না তাতে। নরেন তো দারুণ উপেক্ষাভরেই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। 'সন্ন্যাসীর আবার ওসব চিন্তা কেন?'—ব'ললে সে দৃপ্তকণ্ঠে—'একবার যা ত্যাগ করেছি, আবার তার প্রলোভন কেন?'

তখন বলরামবাবু, সুরেন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ ঠাকুরের গৃহী-ভক্তেরা ব'ললেন,—'ওরা বরং কম ভাড়ায় একটা বাড়ী নিয়ে সেখানে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করুক। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না, কেউ ঘরে ফিরে যায়।'

অবশেষে তাঁদেরই কথামত—বিশেষ সুরেনবাবুর চেষ্টায়—একটা বাড়ী ভাড়া

নেওয়া হলো বরাহনগরে। বাড়ীখানা অনেক দিনের, পুরাণো—জীর্ণ এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ—প'ড়ো বাড়ীরই সামিল। তার ওপর আবার একটা অপবাদও আছে তার,—ঐ বাড়ীতে নাকি ভূত থাকে! তবে সুবিধা এই যে,—ভাড়াটা কম,—আর শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে একেবারে গঙ্গার কাছাকাছি।

'ব্যস্,—ঐ যথেষ্ট।'—সন্ন্যাসীরা খুশীমনে জবাব দিলে নির্ব্বিকার কণ্ঠে,—'সন্ন্যাসীর আবার ভূতের ভয় কি?···ভূতই যদি তাড়াতে না পারলাম,—তবে আর সাধন-ভজন করছি কি করতে?'

গুরুভ্রাতাদের কাছ থেকে ঠিক এই উত্তরই আশা করেছিল নরেন।···ঠাকুর তার ওপর যে ভার দিয়ে গেছেন,—তা পালনের দায়িত্ব যে তারই! গুরুভ্রাতারা যদি স্বেচ্ছায় সর্ব্ববিধ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে রাজী হয়,—সংসারের মোহ ঘৃণায় ঠেলে দেয় দূরে,—তবে তো তার কাজ অনেক সহজ হয়ে আসবে।

অতঃপর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঠ স্থাপিত হ'লো এই বাড়ীতে। ঠাকুরের দেহাবশেষ এনে মঠে স্থাপন ক'রে নিত্য-পূজাদির ব্যবস্থাও হ'লো তাঁর। সেইসঙ্গে যুবক সন্ন্যাসীদের নিয়ে গঠিত হলো মহান্ আদর্শে অনু-প্রাণিত—এক নবীন সঙ্ঘও। আর নরেন্দ্রনাথই হ'লো এর পরিচালক,—অধিনেতা,—এমন কি প্রাণ বললেও চলে।

সাংসারিক বিশৃঙ্খলা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয়নি,—কাজেই মাঝে মাঝে বাড়ী যেতে হয় নরেনকে; বৈরাগ্যের আহ্বান তার অন্তরে যতই তীব্র হোক্,—মা-ভাইদের জীবনকে সে হেলা করতে পারে না,—তবে প্রাণ প'ড়ে থাকে তার মঠের মধ্যেই। গুরুভ্রাতারাও ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে নরেনকে পেয়ে। নরেনের নির্দ্দেশমত চললেই ঠাকুর প্রীত হবেন,—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই মর্ম্মকেন্দ্রে,—কেউ কেউ আবার নরেনকেই মনে করে ঠাকুরের প্রতিনিধি।

কিন্তু তবু একটু মুস্কিল হয়েছিল একটা ব্যাপারে। তরুণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ—অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে ফিরে গিয়েছিল বাড়ীতে পড়াশোনা শেষ করতে। বহু বাধা দিয়েও তাদের রুখতে পারেনি নরেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হলো, সে যেন ঠাকুরের নির্দ্দেশ অবহেলা করছে।···মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তার। মঠত্যাগী ভক্তদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে,—অভিভাবকদের ভয় না ক'রে—দ্বারে করাঘাত করতে লাগলো সে দিনের পর দিন অটল ধৈর্য্যে।

—ভক্তরা আর কতক্ষণ স্থির থাকবে?···ঘরের বাইরে এলেই নরেন তাদের তীব্র ভাষায় ব'লে—সারাটা জীবন কি তোরা পরীক্ষা নিয়েই কাটাবি নাকি? এই কি

তোদের ঠাকুরের আদেশ পালন ? এই যদি করবি, তবে কেন দীক্ষা নিয়েছিলি সেই মহাপুরুষের কাছে ত্যাগের মন্ত্রে ? ওরে, ভোগ আর ত্যাগ—দুটো একসঙ্গে হয় না ! ঠাকুর তোদের জন্যে কি-না করে গেছেন !—তোরা পরমার্থ-পথের পথিক,—পরমপুরুষের আশীর্ব্বাদ আছে তোদের ওপর—এমন ক'রে সংসার-পঙ্কে আর পড়ে থাকবি কতদিন ?…

নরেনের পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় তাদের মধ্যেও ফিরে এলো পূর্ব্বের সেই বৈরাগ্যের প্রেরণা ! লজ্জায় ধিক্কারে—তারাও সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌লো। ঠাকুরের পুণ্য-নির্ম্মল সদানন্দ মূর্ত্তি স্মরণ ক'রে,—অনুতাপও জাগলো অন্তরে অন্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ ক'রে—সংসার-সুখ হেলায় ঠেলে, আবার ফিরে এলো তারা নরেনের পিছুপিছু বরাহনগর মঠে।

কিন্তু তবু কি নিস্তার আছে নরেনের ? অভিভাবকগণ মঠ পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে আবার ছেলেদের বাড়ী ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন ;—কিন্তু কিছু করতে না পেরে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন নরেনের ঘাড়ে,—'এই ছোকরাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া !—এরা সব দিব্যি বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করছিল,—এই ছোঁড়াই যত কুপরামর্শ দিয়ে আবার এখানে টেনে আনলে জোর ক'রে।

নরেন তাদের কথায় আদৌ রাগ বা দুঃখ করে না,—বরং হেসেই উড়িয়ে দেয় সে সকল কথা। ছেলেরাও বলে,—যারা একবার সংসার ছেড়েছে, সংসার তো তাদের কাছে বাঘের বাসা।

ব্যস, আর কি করবেন অভিভাবকরা ?—বাধ্য হয়েই বিড় বিড় ক'রে মনের জ্বালা ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে যান তাঁরা বাড়ী।

*   *   *   *

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই ছিলেন এই মঠের প্রাণস্বরূপ। ঠাকুর তাঁকে সুরেশবাবু ব'লে ডাকতেন। বরাহনগরের বাড়ীর ভাড়া দিতেন তিনিই। আবার যাতে সন্ন্যাসী-গুরুভাইদের কোন কষ্ট না হয়,—সেজন্য গোপাল নামে এক ব্যক্তিকেও নিযুক্ত ক'রে দেন মঠের কাজকর্ম্ম করতে। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন,—দেখ গোপাল, তোমার সংসারের যাবতীয় ভার আমি নিলাম। তুমি সন্ন্যাসীদের বরাত খাটবে। দু'একদিন বাদে বাদে তাদের খবর আমাকে দেবে। তাদের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হলে তক্ষুণি জানাবে আমাকে ; কিন্তু খুব গোপনে। যেন তারাও জানতে না পারে,—বুঝলে ?

গোপাল রামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে খুব ভক্তি করতো ঃ নরেনের ওপরও তার শ্রদ্ধা ছিল অগাধ,—কাজেই সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল এই কাজ পেয়ে।

এরপর মঠের মধ্যে তরুণ সন্ন্যাসীদের যে কঠোর তপস্যা সুরু হ'লো, ভাষায় তার সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া অসম্ভবই বটে।···আহার্য্য নেই, পরিধেয় নেই,—অর্থও নেই : অথচ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা করারও অভ্যাস নেই,—আবার কারো কোন দানও চায় না তারা। একমাত্র অন্তরের বল,—মাথার ওপর ভগবান,—এবং ঠাকুরের কৃপা !—এই তাদের সহায়।

কোনদিন ভাত জোটে,—কোনদিন জোটে না। আবার কোনদিন যদিই বা দুটো ভাত জুটলো,—কিন্তু নুন আর জুটলো না। আহারের পাত্র পর্য্যন্ত নেই—বাগানের জঙ্গল থেকে মানপাতা কেটে এনে,—তার ওপর ভাত ঢেলে, খাওয়া চলে সকলের। খাওয়ার পর গলা কুট্‌কুট্ করতে থাকে। তরি-তরকারীর বালাই তো নেইই,—শুধু নুন, তেলাকুচা-পাতা-সিদ্ধ—আর ভাত ! তাও কি জোটে সবদিন ?

তার ওপর আবার ঘর ঝাঁটদেওয়া, জলতোলা, বাসন মাজা,—রাঁধাবাড়াও আছে। একা গোপাল আর কত করবে ? অনেক সময় তাকে বাইরেও ঘুরতে হয়। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর একখানি ক'রে কৌপীন আছে বটে,—কিন্তু কাপড় কি চাদর একখানির বেশি আর নেই। যখন যে বাইরে যায়,—তখন সে সেই কাপড়-চাদর ব্যবহার করে। বাকী সময় ও-দুটো দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকে।

কিন্তু তবু কি কারো মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি আছে,—আছে কি কারো চোখে-মুখে বিন্দুমাত্রও বিষাদের ছায়া ?– অভাব-অভিযোগ-দুঃখকষ্ট যে কি,—সে বোধও যেন চলে গেছে সকলের অন্তর থেকে,···শুধু সাধন-ভজন,—শাস্ত্র-আলোচনা, নাম-সংকীর্ত্তন,—তপ-জপ—ধ্যান-ধারণা,—এই নিয়েই সদানন্দে কেটে যাচ্ছে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত। সারাদিন যে আহার জোটেনি,—আবার পরদিনও যে জোটবার কোন উপায় নেই, সে সব ভাবনা কেই-বা করে ? কারই-বা অবসর আছে. সে-সব চিন্তা করার ?

এই গভীর নিষ্ঠা—এই ঐকান্তিক সাধনা—নরেনকে উৎসাহিত ক'রে তোলে বিপুল আশায়।···এদের নিয়ে ঠাকুরের নির্দ্দেশ পালন করা তবে সুকঠিন হ'বে না তার পক্ষে !—আর এরাও পরম সম্পদ্ লাভ ক'রে অগ্রসর হতে পারবে বিশ্বের কল্যাণে।

দুলে ওঠে নরেনের বুক প্রচুর আনন্দে ! মাঝে মাঝে গুরুভাই শশীর দিকে চেয়েও তার আশা-ভরসার সীমা থাকে না !···হ্যাঁ, এমন একজন না-হলে কি আর চলতো এই মঠ ?—এই আত্মভোলা সাধন-ভজন-পূজা-অর্চ্চনা ?– যে যেদিকেই মেতে থাক,—শশী লক্ষ্য রাখতো,—ঠাকুরের ভোগরাগ দিয়ে কেমন

ক'রে ভক্তদেরও জোটে একমুঠো। খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করা থেকে রাঁধা-বাড়া— এমন কি সকলের খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত সব দিকে তার দৃষ্টি ছিল সর্ব্বদাই প্রখর। সেই ছিল যেন তার জপতপ-ধ্যান-ধারণা! অবশ্য অতগুলি গুরুভাইকে সাধন-ভজনে যে নিশ্চিন্ত ক'রে রাখতো,—তার সাধন-ভজন কি কম ছিল কারো চেয়ে?

যেদিন আহার্য্যের জোগাড় আর কোন-মতেই হ'য়ে উঠ্তো না, সেদিন গোপাল ছুটতো স্থরেনবাবুর কাছে। সংবাদ পেয়ে স্থরেনবাবুর সে কি ব্যাকুলতা! সেই দণ্ডেই তিনি গোপালের হাতে উপযুক্ত টাকা দিয়ে ব'লতেন,—'যা কিছু দরকার, সব কিনে নিয়ে যাও মঠে। কিন্তু সাবধান,—বলো না যে আমি টাকা দিয়েছি।'

গোপাল বুঝে নিত তাঁর সংকেত। জিনিষ পত্র কিনে মাথায় মোট চাপিয়ে সে যখন মঠে ফিরতো,—তখন উপবাসী—অথচ নির্ব্বিকার-চিত্ত সন্ন্যাসীরা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করতো,—'এসব কোথায় পেলে গোপাল?'

'আর বলেন কেন?'—চতুর গোপাল উত্তর ঠিক করেই রাখতো,—'রাস্তায় এক ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়লেন না,—বললেন,—সাধুসেবার জন্যে এসব নিয়ে যেতেই হবে। আমি কত আপত্তি করলাম,—কিন্তু কে শোনে সে সব কথা!'

সন্ন্যাসীরা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতো,—সবই ঠাকুরের মহিমা! কিন্তু অত সহজে ভোলান যেতো না নরেনকে। স্থরেনবাবুর মহত্ব মাঝে মাঝে তার কাছে প্রকট হয়ে পড়তো। শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠতো তার অন্তর। মনে মনে ব'লতো সে,— ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে স্থরেনবাবুর স্থান কি অনেকরই উচ্চে নয়?

৪১

'দেখ, মঠে বসে বসে আমাদের তো শুধু সাধন-ভজন করলে চলবে না।'—বললে নরেন্দ্রনাথ একদিন গুরুভ্রাতাদের,—'ঠাকুরের মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের কথা,—জগতের কল্যাণে মানুষের কর্ত্তব্য,—এসব সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে আমাদের কিছু কিছু প্রচার করতে হ'বে।'

"না, না"—উত্তর দিলে গুরুভ্রাতারা সমস্বরে—"নির্জ্জনে বসে ঈশ্বর-লাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরে যদি সম্ভব হয়,—ঠাকুরের মত এক জায়গায় ব'সে আমাদের নিজেদের দৃষ্টান্তে আমরা পরোক্ষভাবে লোকশিক্ষা দেব।"

'ও তোদের ভুল।'—প্রতিবাদ করে নরেন,—'নিজে যেটুকু জানবো,—তার কিছু কিছু অন্যকে না জানালে—লোকে আমাদের কাছে পেলো কি ?—লোকশিক্ষা দেওয়াও তো ঠাকুরেরই নির্দ্দেশ! অবশ্য পরকে জানাবার আগে ভাল ক'রে নিজেদের জানতে হ'বে। দীনহীন চণ্ডালের কুটিরে পর্য্যন্ত গিয়ে প্রচার করতে হবে সত্যের বাণী। তোরা আমার গুরুভাই,—তোরা প্রতিবন্ধক হ'লেও আমি কিন্তু মানবো না। জোর ক'রে তোদের টেনে নিয়ে যাব।'

গুরুভ্রাতারা আর উচ্চবাচ্য করবার সাহস করে না। এরপর থেকে মাঝে মাঝে লোক-সমাজে গিয়ে তারা কিছু কিছু কাজও করতে লাগলো নরেনের কথামত।

কিন্তু শীঘ্রই সন্ন্যাসীরা এমন কঠোর সাধনায় ব্রতী হ'লো যে,—তাদের দিকে চেয়ে নরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হ'য়ে পড়লো বিশেষভাবে। তাদের যেন—জীবনের ওপর কোন দরদই নেই! কেউ সারারাত্রি শ্মশানেই কাটিয়ে দিচ্ছে,—কেউ-বা চারিদিকে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে সারারাত,—কেউ বা মালাই জপ করছে চব্বিশ ঘণ্টা। কেউ-বা প্রতিজ্ঞা করছে—জীবন যায় যাক্ তবু আজ জগদম্বার কল্যাণীমূর্ত্তি না দেখে ক্ষান্ত হবে না। আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম—সবই যেন ভুলে গেছে তারা। ব্রহ্মানন্দরস-পানে চিত্তকে বিভোর করবার চিন্তায় যেন সকলে আত্মহারা—জগৎটা যেন তাদের কাছ থেকে সরে গেছে দূরে—বহুদূরে—একেবারে দৃষ্টির বাইরে।

ব্যাপার দেখে নরেন বললে,—"তোরা কি সবাই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি না-কি? ওরে তা-হয়না,—তা-হয়না!—রামকৃষ্ণ জগতে একটাই জন্মায়,—বিশ্বের কল্যাণে একবারই আসে। তোরা পিঁপড়ে, একটা চিনির দানা পেলেই তোদের পেট ভ'রে যায়,—অথচ তোরা চাইছিস গোটা চিনির পাহাড়টাই। সাধনা যদি করবি,—শরীরটাকে বজায় রাখ্,—শরীর গেলে—মনের শক্তিও যাবে যে!"

নেতৃত্বে ছিল নরেনের সহজাত অধিকার। কাজেই তার কল্যাণকর মৃদু ভর্ৎসনা শুনে কেউ বিন্দুমাত্রও অপ্রীত হলো না,—বরং নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো তারা। কিন্তু ক্রমেই তাদের মন ছট্ফট্ করতে লাগলো—নানাতীর্থ বা ভাল ভাল স্থান পর্য্যটনের জন্যে। কারো কারো বা নির্জ্জন-বাসের কল্পনাও বলবতী হয়ে উঠলো অন্তরের মধ্যে।

নরেন্দ্রনাথও অবশ্য অধীর হয়ে উঠেছিল পর্য্যটনের জন্যে। সংসারের শৃঙ্খলা যতক্ষণ সে স্থাপন করতে পারেনি,—ততক্ষণ অবশ্য এ অধীরতা তার জেগেও জাগতে পারেনি। কিন্তু এখন তার সংসারের অবস্থা আর অচল নয়, আর

তার সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলেও তার চলে। কিন্তু এক যায়,—এক আসে। এখন মা-ভাইয়ের সংসার ছাড়া—আবার একটা সংসারের মায়া চেপে ধরেছে তাকে—আর সে সংসারের পত্তন হয়েছে—'বরাহনগর মঠে তার পরম প্রীতির পাত্র গুরুভ্রাতাদের নিয়ে।'

তার মনে হয়,—হঠাৎ সে যদি কোথাও চলে যায়—তা'হলে যারা তারই মুখের দিকে চেয়ে, তারই সাহসে—তারই প্রীতি-স্নেহ-মমতায় নির্ভর ক'রে—সংসার ছেড়ে মঠে এসেছে,—তাদের দেখবে কে?—তা ছাড়া, একথাও তো অস্বীকার করা যায় না যে,—তাদের সম্বন্ধে তার একটা নৈতিক দায়িত্বও আছে!

কিন্তু হঠাৎ সেদিন কলকাতায় কোন কাজ সেরে মঠে ফিরেই নরেন্দ্রনাথ শুন্‌লো,—সারদা সহসা মঠ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।...সে কি? আশ্চর্য্য হলো নরেন। সারদা যে এখনও বালক! একলা এমন ক'রে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হলো সে? চিন্তিতস্বরে নরেন বললে রাখালকে,—'রাজা, তুই ওকে যেতে দিলি কেন? এখন কি মুস্কিলে পড়া গেল বল্ তো? কোথায় যেতে যেতে ছেলেমানুষ কোথায় গিয়ে যে উঠবে! এ আবার বেশ মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়েছি দেখছি! কোথায় যে তাকে খুঁজি—'

'এই যে, সারদা একটা চিঠি লিখে গেছে!'—এক চিরকুট কাগজ এনে নরেনের হাতে দিলে একজন গুরুভ্রাতা। সাগ্রহে পড়লো নরেন সে পত্র,—সারদা লিখেছে,—"হাঁটাপথে বৃন্দাবন যাচ্ছি। মঠে থাকলে আমার বাড়ীর লোক আবার আমাকে সংসারে টানবার চেষ্টা করবে। পরমহংসদেব বলে গেছেন,—"ওদের বিশ্বাস করিস্‌নে।"

"দেখছিস্ রাজা",—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে চাইলে নরেন রাখালের দিকে,—"বাড়ীর লোককে ভয় ক'রেই ছেলেটা অত দূরে চলে গেছে।"—মনে মনে বললে,—হুঁ, এই না হলে কি আর বৈরাগ্য?—না ঠাকুরের নির্দ্দেশ পালন?

একটু ইতস্ততঃ করে রাখাল বললে,—'আমারও কিন্তু মনে হচ্ছে—একবার তীর্থ-ভ্রমণে যাবো।'

'তা যাবে বৈকি?'—কৃত্রিম বিরক্তি ফুটে ওঠে নরেনের কণ্ঠে,—'এত ক'রে মঠ করলুম,—তা চুলোয় যাক্,—তোমরা সব মঠ ছেড়ে তীর্থভ্রমণ কর। ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালেই—ভগবান চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দেবেন আর কি!'

নিজের অন্তরের অধীরতা নরেন প্রকাশ করতো না কারো কাছে—পাছে তার অনুপস্থিতিতে মঠ ভেঙ্গে যায়! তাই পর্য্যটনের অদম্য ইচ্ছাকেও জোর ক'রে নিরুদ্ধ ক'রে রেখেছিল সে মর্ম্মের গোপনকেন্দ্রে।

কিন্তু কতদিন তা' সম্ভব? অসীম যাকে ডাক দিয়েছে, সীমার মাঝারে আবদ্ধ

থাকতে পারে সে কতদিন? বহু উর্দ্ধে—কোন্ দিব্য কল্পলোকের আলোক-প্রবাহ নেমে এসে যার সমগ্র চিত্তকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে;—নিম্নের সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমির ওপর বিচরণ করতে পারে সে কতদিন? মাঝে মাঝে প্রবল হৃদয়াবেগে অস্থির হয়ে ওঠে নরেন এবং এই অবস্থায় আর বেশিদিন নিজেকে সংযত রাখা কোনমতেই সম্ভব হয় না তার পক্ষে। পরিব্রাজকবেশে হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ে মঠ ছেড়ে—তীর্থের পথে।—

আর সেইদিন থেকেই 'নরেন্দ্রনাথ' পরিচয় লুপ্ত হয়ে ভারতবাসীর শ্রদ্ধাবিস্ময়-জড়িত দৃষ্টির সম্মুখে—এক অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠেন,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান "স্বামী বিবেকানন্দ"—যুগপ্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ—অসাধারণ প্রজ্ঞা-ধী-বাগ্মিতা-জ্ঞান-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসী—"মুক্তপুরুষ বিবেকানন্দ"।

৪২

মহাপুরুষদের ইচ্ছাশক্তির একটা অদম্য প্রভাব আছে। যে ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল স্বামিজীর অন্তরের মধ্যে—তার প্রভাব গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদেরও অন্তর। কিন্তু স্বামিজীকে অতিক্রম ক'রে হঠাৎ কিছু করা সম্ভব হয়নি এতদিন তাঁদের পক্ষে। এবার থেকে তাঁরাও মঠ ছেড়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেতে লাগলো তীর্থপর্য্যটনে এবং একে একে ভারতে দেখা দিলেন,—স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি নবযুগের তরুণ সন্ন্যাসী সমুজ্জল নবীন দীপ্তিতে!

বাইরের আকর্ষণ কিন্তু টলাতে পারলো না একমাত্র শশী মহারাজকেই! সন্ন্যাসীরা প্রথম প্রথম কিছুদিন তীর্থ-পর্য্যটন ক'রে মঠে ঘুরে আসেন,—আবার এক সময় বেরিয়ে পড়েন! শশী মহারাজ কিন্তু অটল-অচল;—মঠই তাঁর তীর্থ—মঠই তাঁর স্বর্গ! ঠাকুরের নিত্যসেবা ও পূজার্চ্চনা ক'রে তিনি মঠেই সাধন-ভজন করতে লাগলেন একাগ্র নিষ্ঠায়।

স্বামিজীও প্রথম প্রথম কিছুদিনের জন্য বাইরে ঘোরেন আবার ফিরে আসেন মঠে। বৈদ্যনাথ, সিমুলতলা প্রভৃতি জায়গাগুলি তিনি ভ্রমণ ক'রে এলেন—এমনি নাতিদীর্ঘ পর্য্যটনে। কিন্তু যখনই মঠ ত্যাগ করেন, তখনি বলেন,—আর মঠে ফিরছি না, এই শেষ।—অবশ্য সেকথা তিনি রক্ষা করতে পারেন না,—নানা কারণে। কতকটা গুরুভ্রাতাদের এবং কতকটা মঠের আকর্ষণের জন্যও বটে।

১৮৮৮ সালেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো সুদীর্ঘ পর্য্যটনের দৃঢ় সংকল্প। যার মধ্যে ছেদ থাকবে না,—বিরাম থাকবে না,—নিরলস অবিশ্রান্ত এগিয়ে যাবেন তিনি পদব্রজে ;—শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই নয়,—অন্তর-দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন ভারতের প্রতিটি তীর্থ—প্রত্যেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান—কীর্ত্তি যাদের অক্ষয় হয়ে আছে মহাকালের বুকে।

অনন্ত দেবমহিমা-বিজড়িত,—দেবাদিদেব বিশ্বনাথের প্রিয় নিলয়—ভারতের শ্রেষ্ঠতীর্থ—কাশীধাম। এই কাশীরই বীরেশ্বর শিবের কাছে মানত ক'রে ভুবনেশ্বরী পেয়েছিলেন তাঁর পরম কামনার ধন 'বিলেকে'। জানি না, তাই বুঝি স্বামিজী প্রথম আকৃষ্ট হলেন,—বরণা ও অসী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত—সেই পবিত্রতীর্থ বারাণসীর দিকে।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ,—প্রশান্ত আয়তনেত্র—উজ্জ্বল-গভীর দৃষ্টি—ললাটে প্রতিভার জ্যোতিঃ—পরণে গৈরিক বাস, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু—আর একখানি গীতা। তরুণ সন্ন্যাসী চলেছেন—ধীরপদক্ষেপে।—চলেছেন বুঝি ঐশ্বর্য্যের মোহ ত্যাগ ক'রে তরুণ রাজকুমার সিদ্ধার্থ,—বুঝি নবদ্বীপ ছেড়ে নবীন প্রেমিকসন্ন্যাসী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব !

*　　*　　*　　*

৺কাশীধামে বীরেশ্বর, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি শিব-বিগ্রহ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দেখে—চললেন তিনি সারনাথের স্তূপের দিকে। বৌদ্ধযুগের অন্যতম কীর্ত্তি এই সারনাথের মঠ। কিন্তু মঠের ভগ্নাবশেষ আজ ঘোর বনজঙ্গলে পূর্ণ। তবু দেখতে হবে ;—ঐ ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই যে আছে ভারতের অতীত সৌন্দর্য্যের নিদর্শন,—আছে ভবিষ্য ভারতের গন্তব্যপথের নিশানা !

সেদিন প্রাতঃকাল,—স্বামিজী যাচ্ছিলেন দুর্গাবাড়ীর মন্দিরের দিকে,—হঠাৎ একদল বানর পিছু ধরলো তাঁর। নিরীহ পথচারীদের ওপর এদের উপদ্রবের কথা জানা ছিল স্বামিজীর,—দ্রুত চলতে লাগলেন তিনি ;—বানরের দলের গতিও ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো। অগত্যা স্বামিজী দৌড়তে লাগলেন—বানরগুলোও দৌড়তে লাগলো তাঁর পিছু পিছু।

'থামো, থামো'।—হঠাৎ কার সাবধানী বাণী ভেসে এলো স্বামিজীর কানে,—'বন্দরকা সাম্‌নে মে খাড়া হোকে দাঁড়াও।'

চমকে উঠে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ। ঠিকই তো, বিপদের ভয়ে পালানোর চেয়ে বিপদের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোই যে উচিত ! তিনি সাহস ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই বানররাও হঠাৎ ভয় পেয়ে—ছুটলো বিপরীত দিকে। এমন সময়ে অদূরে দেখা দিলেন এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

'ক্যা বচ্চা, ছুটনে রহা কাঁহে ?'—স্বামিজীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন সন্ন্যাসী,—'বন্দর্‌কা সাম্‌নে মে ঔর কভি মৎ ছুটনা।'

স্বামিজী বুঝলেন,—এই সন্ন্যাসীই অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে শুধু সতর্কই করেননি,—তাঁর প্রাণও রক্ষা করেছেন অপমৃত্যুর হাত থেকে। তিনি শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করলেন,—বর্ষীয়স সন্ন্যাসীকে।

'আনন্দ্ রহো' প্রত্যভিবাদন ক'রে চলে গেলেন সন্ন্যাসী!

* * * *

কাশীধামেই থাকতেন তখন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে একদিন পরিচয় ঘটলো তাঁর তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বহু আলোচনা হলো দু'জনের মধ্যে। অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভূদেব-বাবু,—এই অল্পবয়স্ক নবীন সন্ন্যাসীর জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য ও মনীষা দেখে।—উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে মনে মনে স্বীকার করলেন তিনি,—এই যুবক কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হবে।

অতঃপর মৌনী মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন ক'রে—তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে স্বামিজী গেলেন—স্বামী ভাস্করানন্দের কাছে। ভাস্করানন্দ ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত এবং মহাযোগী। স্বীয় আশ্রমে তিনি প্রায় সময়ই থাকতেন উলঙ্গভাবে।

বিবেকানন্দ প্রণাম করলেন তাঁকে ভক্তিভরে। ভাস্করানন্দ তা'র কল্যাণ কামনা ক'রে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন তাঁ'র সঙ্গে। কথায় কথায় উঠলো,—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা। ভাস্করানন্দ মন্তব্য করলেন,—ও-দুটো বস্তু কেউ সম্পূর্ণভাবে হয়ত ত্যাগ করতে পারে না।

সে কি স্বামিজী!—দৃষ্টি খর ক'রে বিবেকানন্দ চাইলেন ভাস্করানন্দের দিকে,—'সন্ন্যাসধর্ম্মের মূল কথাইতো হলো ঐ। তা' না পারলে সন্ন্যাসী হয় কেমন করে?'

ভাস্করানন্দ হাসলেন,—উপেক্ষার হাসি!—তুম্ তো লেড়কা হ্যায়,—ক্যা জান্‌তা?

'আমি যে নিজের চোখে এমন লোক দেখেছি।'—দৃঢ়বিশ্বাসে বললেন বিবেকানন্দ।

ভাস্করানন্দ মানতে চান না। তখন বিপুল তর্ক বাধলো দু'জনের। জয়-পরাজয়ের কথা যাই হোক্,—তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—যাকে বালক ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ভাস্করানন্দ,—তাঁর বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য, বহুদর্শিতা প্রভৃতির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন তিনি!

* * * * *

কাশী থেকে বিবেকানন্দ গেলেন অযোধ্যা,—অযোধ্যা থেকে আগ্রা। পথের একমাত্র অবলম্বন ছিল ভিক্ষা,—বিশ্রামস্থান—ভগ্ন দেবালয়ে, ধর্ম্মশালায়—অথবা বৃক্ষতল—কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে। তবু চলেছেন অম্লান বদনে—নির্ব্বিকার চিত্তে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-বিশ্রাম সব জয় ক'রে অগ্রসর হয়েছেন জিতেন্দ্রিয় তরুণ সন্ন্যাসী প্রাণের অদম্য প্রেরণায়।

মোগলযুগের স্থাপত্যশিল্পের বিশ্ববিস্ময়কর নিদর্শন বক্ষে ধরে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রা মহানগরী—যমুনার তীরে। কালিন্দীর নীলজলে পড়েছে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য—তাজমহলের ছায়া। প্রেমিক সম্রাট্ সাজাহানের পত্নী-প্রেমের চির-অমর, চির-ভাস্বর স্মৃতি।···মুগ্ধ হলেন স্বামিজী তাজমহল দেখে। মর্ম্মর-গঠিত প্রাসাদের প্রতি কক্ষে যেন আজও মর্ম্মরিত হচ্ছে ;—

"চলে গেছে সাজাহান, প্রেম তার বর্ত্তমান
তাজমহলের বুকে,—বহি' অমরতা-ভার।"

এরপর আগ্রার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ দেখে স্বামিজী চললেন বৃন্দাবনের দিকে। ভিক্ষামাত্র-সম্বল নবীন পরিব্রাজক—তবু নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন সহজে কিছুই চান না কারো কাছে—নিজের প্রকৃত পরিচয়ও যথাসম্ভব গোপন ক'রে চলেন পথে পথে,—গোপন করেন তাঁর কথাবার্তায়।···ক্লান্ত পরিশ্রান্তদেহ, ধূলায় ধূসর অবসন্ন চরণ,—পৌঁছলেন তিনি বৃন্দাবনের কাছাকাছি। একটি কপর্দ্দকও নেই সঙ্গে। ক্ষুধার তো কথাই নেই—পিপাসায়ও গলা যেন শুকিয়ে আসছে!

হঠাৎ দেখলেন,—পথের ধারে এক বৃদ্ধ গাছের ছায়ায় বসে পরম নিশ্চিন্তে হুঁকো টান্‌ছে দিব্যি আরামে। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। তামাকের গন্ধে পর্য্যটন-ক্লান্ত স্বামিজীর বহু দিনের অভ্যস্ত ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। গাছের তলায় এসে হাত বাড়িয়ে চাইলেন তিনি কল্‌কেটা বৃদ্ধের কাছে।

সম্ভ্রমে চমকে উঠলো বৃদ্ধ।—'মহারাজ—হম্ ভঙ্গী হ্যায়।'—স্বামিজীর গায়ে সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ দেখে—দারুণ কুণ্ঠায় বললে সে।—

ভঙ্গী? তবে তো লোকটা মেথর!—কেমন যেন একটা ঘৃণায় মুহূর্ত্তে হাত গুটিয়ে নিলেন স্বামিজী,—এবং একটু নিরাশ হয়েই অগ্রসর হলেন গন্তব্যপথে।

কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি,—'তাইত, এ আমি কি করেছি? ভঙ্গী ব'লে লোকটিকে ঘৃণা ক'রে এলাম্। আমি না সন্ন্যাসী? আমার কাছে জীব আর শিব না সমান? প্রতি জীবে শিবজ্ঞানই না আমার ধর্ম্মের মূল কথা? তবু কিনা জাতিভেদের সংস্কার আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো!···ছিঃ ছিঃ, এখনও এই সংকীর্ণতা!

অন্তরের মধ্যে ভারী অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন তিনি,—এবং মনের সব দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে তদ্দণ্ডে প্রায় আধ মাইল পথ হেঁটে ফিরে এলেন আবার সেই বৃদ্ধের কাছে।

বৃদ্ধ তখনও সেখানে বসেছিল। স্বামিজীকে ফিরে আসতে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো সসম্ভ্রমে। কল্‌কের আগুন অবশ্য তখন নিভে গেছে।

'বেটা, জল্‌দি হাম্‌কো একঠো ছিলিম্ ভর্‌কে দো।'—স্বামিজী বসে পড়লেন সেখানে। বৃদ্ধ কিন্তু তবুও দারুণ কুণ্ঠায় এক পা পিছিয়ে গিয়ে ব'ললে,— সাধুজী, আপ্ মহারাজ হ্যায়,—হম্ ভঙ্গী—ছোটা—

'তোম্ হামারা গুরু হ্যায়।'—সাগ্রহে তার হাত ধরে ব'ললেন স্বামিজী,—'তোমরা হাতসে ছিলিম পিকে তব্ হাম্ উঠেগা।'

বৃদ্ধ আর কি করে ?·· এবার কোন আপত্তি না ক'রে—ভাল ক'রে তামাক সেজে কল্‌কেটা তুলে দিলে সে স্বামিজীর হাতে। অনেক দিন পরে স্বামিজী ধূমপান করতে লাগলেন আরামে।

* * * * *

বৃন্দাবনে দিন কয়েক থেকে স্বামিজী গেলেন গোবর্দ্ধন গিরি পরিভ্রমণ করতে। এখানে প্রতিজ্ঞা করলেন,—কারো কাছে ভিক্ষা চাইবেন না।—রাধারমণ জোটান—খাবেন,—নয় উপবাস দেবেন। পর্য্যটনের ফলে ক্রমেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়লো তাঁর শরীর,—তীব্র ক্ষুধায় সে ক্লান্তি যেন আরও বেড়ে গেল। তবু কারো কাছে কিছু চাইলেন না। রাধারমণের মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে ভ্রমণ করতে লাগলেন ক্লান্তচরণে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ কে পেছনে থেকে ডাকলো তাঁকে। তিনি গ্রাহ্য করলেন না,—এগিয়েই যেতে লাগলেন। লোকটাও দ্রুতপদে অনুসরণ করলো তাঁকে। স্বামিজী তখন ছুটতে সুরু করলেন তার নাগালের বাইরে যাবার জন্যে। কিন্তু লোকটিও নাছোড়বান্দা,—সেও প্রাণপণে ছুটে ধ'রে ফেললো স্বামিজীকে।

হাতে তার নানা খাদ্যসামগ্রী। স্বামিজীর সাম্‌নে সেগুলি ধ'রে সে ব'ললে,— মহারাজ, আপ্ ভুখামে হ্যায়,—মেহেরবাণী কর্‌কে—ইস্ খানা খাইয়ে। আপকোয়াস্তে হম্ লে আয়া।

টস্ টস্ ক'রে জল ঝ'রে পড়লো স্বামিজীর দুই প্রশান্ত নেত্রে,—রাধারমণ, তুমি আছ ; তুমি আছ। কোন্ মূর্খ তোমায় অবিশ্বাস করে!—"জীবন দেছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি !"—কথার কথা নয়,—চাই নির্ভর !

পরম আনন্দে স্বামিজী সেইসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলেন।

এরপর স্বামিজী এলেন রাধাকুণ্ডে। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি রাধা,—কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ রাধা,—বৃন্দাবনলীলার নিত্যসহচরী রাধা,—তাঁরই নামে এই কুণ্ড। পরম পবিত্র এর জল,—নিত্য আসে কত পুণ্যার্থী এখানে স্নান করতে—কতই না আগ্রহে!

স্বামিজীর কৌপীন মাত্র একখানি। তাই কেউ কোথাও নেই দেখে—তিনি নগ্ন হ'য়ে কৌপীনখানি আগে কেচে ফেললেন,—তারপর জলের ধারে ডাঙ্গায় রেখে স্নানের জন্যে নামলেন জলে। স্নান ক'রে ফিরে এসে দেখলেন,—কৌপীনটি সেখানে নেই। আশ্চর্য্য হ'য়ে এদিক-সেদিক চাইতেই তিনি দেখতে পেলেন,—এক বানর কৌপীনখানি গাছের ওপর নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে।

সন্ন্যাসীর একমাত্র কৌপীন নষ্ট হওয়ায়—অভিমানে ভ'রে উঠলো বিবেকানন্দের বুক। কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারাণীর দিকে চেয়ে বললেন তিনি অভিমানভরে,—বৈরাগীর একখানি মাত্র কৌপীন,—তা'ও কেড়ে নিলে রাধারাণী!···বেশ, চললাম আমি বনে,—লোকালয়ে আর যাবো না। দেখি, তুমি ভক্তের যোগক্ষেম বহন কর কি-না!

দ্রুত চললেন তিনি বনের দিকে নগ্নভাবেই। সহসা এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো তাঁর পথ আগলে,—হাতে তার কিছু খাদ্যদ্রব্য—আর একখানি নূতন গেরুয়া রঙে ছোপান কাপড়।—সাগ্রহে স্বামিজীর দিকে চেয়ে সে ব'ললে—'মহারাজ, আপনি এই কাপড়খানি, আর এই খাদ্যগুলি দয়া করে গ্রহণ করুন।'

বিস্ময়ে আকুল হ'য়ে উঠলেন বিবেকানন্দ। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো তাঁর। এদিকে লোকটি খাদ্য ও কাপড় দিয়ে—সহসা ঘন বনের অন্তরালে কোথায় যে অদৃশ্য হ'লো—আর দেখা গেল না!

কি-এক অপূর্ব্ব ভাবের বন্যায় প্লাবিত হ'য়ে উঠলো—স্বামিজীর সমগ্র অন্তর। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন তিনি,—কে বলে তুমি নেই,—কে বলে তুমি ঘুমিয়ে আছ?—কে বলে তুমি বধির?—ভগবান, তুমিই সত্য!

গাঢ়প্রেমের আবেগে আবার জল ঝরে পড়লো তাঁর দুইচোখ ছেপে।

৪৩

হাতরাস স্টেশন। বসে আছেন স্বামিজী একপাশে চুপ ক'রে;—অনাহারে পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত—অবসন্ন। হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়ালেন—এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাষ্টার শরৎগুপ্ত। স্বামিজীর দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি,—আহা, কি প্রশান্ত, সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি! এমন দেবদর্শন সাধু তো আর দেখিনি কখনো!

তন্ময়ভাব কাটলে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি স্বামিজীকে,—আপনি কি ক্ষুধার্ত্ত? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিছু আহার্য্য যদি অনুমতি করেন ত আনি।

'তা আনতে পার।'—স্বামিজী ব'ললেন ক্লিষ্টস্বরে,—'আমার ক্ষিধে পেয়েছে বটে।'

পরম আগ্রহে তৎক্ষণাৎ শরৎবাবু স্বামিজীর আহারের যোগাড় ক'রে দিলেন। তাঁর একান্ত অনুরোধে কয়েক দিন স্বামিজীর অবস্থিতিও ঘটে গেল সেখানে। শরৎবাবু সংসারী লোক,—রেলের কর্ম্মচারী। কিন্তু স্বামিজীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে—নানা বিষয়ের আলোচনায় অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হয়ে প'ড়লেন বৈরাগ্যের দিকে।

স্বামিজী সেখান থেকে বিদায় নেবার সময় শরৎবাবু ধ'রে বসলেন তাঁকে,—স্বামিজী, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন,—আমি যাব আপনার সঙ্গে।

'যাবে?'—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামিজী শরৎবাবুর দিকে,—'পারবে তুমি, এ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে? নিজের জন্যে নয়,—ভারতের কল্যাণের জন্যে—ভারতবাসীর দুঃখ-মোচনের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করতে?'

"আপনার আশীর্ব্বাদে।"—সতৃষ্ণনয়নে শরৎবাবু চাইলেন স্বামিজীর দিকে।

"ভাল কথা।"—বললেন স্বামিজী,—"যাও, এক্ষুণি তোমার রেলের কুলিদের কাছে অভিমান ত্যাগ ক'রে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে আন।"

নির্ব্বিকার চিত্তে পালন করলেন শরৎবাবু স্বামিজীর আদেশ। তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠায় পরম প্রীত হলেন স্বামিজী। মহানন্দেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন তিনি শরৎবাবুকে।

স্বীয় কার্য্যভার অপরের ওপর দিয়ে শরৎবাবু স্বামিজীর সঙ্গে চললেন হৃষীকেশ। সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে স্বামিজী তাঁর নাম দিলেন—স্বামী সদানন্দ।

হৃষীকেশ যাবার পথ কিছু দুর্গম! এদিকে সদানন্দ পথ চলায় অনভ্যস্ত। শিষ্যের কষ্ট বুঝে স্বামিজী সর্ব্বপ্রকারে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

পথের মাঝে কোন কোন ভয়াবহ স্থানে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন,—'ভয় হচ্ছে নাকি সদানন্দ ?'
'না, না, কিসের ভয় ?'—মৃদুহাস্যে উত্তর দেন সদানন্দ,—"আপনি থাকতে আমার আবার ভয় কিসের ?"
"বেশ, চল !"—শিষ্যকে নিয়ে অগ্রসর হন স্বামিজী ধীরে ধীরে।
হৃষীকেশে এসে গুরু-শিষ্যের দিন কাটতে থাকে ভজন-সাধন, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণায়। মাঝে মাঝে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে গল্প করেন স্বামিজী। চোখদু'টি তাঁর ছলছল ক'রে ওঠে ঠাকুরের প্রসঙ্গে। স্বামী সদানন্দও বিগলিত হ'য়ে পড়েন ; নিজেকেও তাঁর ধন্য মনে হয়,—সেই ঈশ্বরস্বরূপ স্বর্গত মহাপুরুষের মানস-সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ভেবে।
স্বামিজী বলেন,—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান,—এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রেখো সদানন্দ ! তিনি যা' করেন, সবই মঙ্গলের জন্যে। শুধু এইটুকুর ওপর বিশ্বাস রেখে চ'ললে—অভীষ্ট লাভ করবে জীবনে।"
সদানন্দ পরম অনুরাগভরে শুনে যান—গুরুর উপদেশ।
কিন্তু হৃষীকেশের জলবায়ু—কি গুরু, কি শিষ্য—কারো সহ্য হ'লো না। শরীর দু'জনেরই খারাপ হয়ে পড়লো কিছুদিনের মধ্যে। দু'জনেই অসুস্থ,—কে কা'র সেবা-শুশ্রূষা করে ! এদিকে—কোন-না কোন সূত্রে স্বামিজীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ভারী চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন—মঠের গুরুভ্রাতারা। তাঁরা বার বার পত্র লিখতে লাগলেন স্বামিজীকে,—সম্প্রতি মঠে ফিরবার জন্যে।
কয়েকটি বিশেষ কারণে মঠে স্বামিজীর উপস্থিতিও ছিল একান্ত আবশ্যক। কাজেই—দুইদিক বুঝে স্বামিজী শিষ্য সদানন্দকে নিয়ে পুনরায় হাতরাসে ফিরে এলেন। বললেন সদানন্দকে,—তুমি এখন হাতরাসেই থাক—আমি বরা'নগরে যাচ্ছি। শরীর সেরে—এখানকার যথারীতি ব্যবস্থা ক'রে তুমিও বরা'নগরে যাবে।
গুরুর আদেশ !—তা'ছাড়া, অসুস্থ অবস্থায় আর কি-ই বা করবেন সদানন্দ ?—সম্প্রতি হাতরাসেই থেকে গেলেন তিনি। স্বামিজী ফিরে এলেন বরাহনগর মঠে।
অনেকদিন বিচ্ছেদের পর স্বামিজীকে পেয়ে যেন আনন্দসিন্ধু উথলে উঠলো মঠের মধ্যে। দারুণ গ্রীষ্মের পর উত্তপ্ত ধরাবক্ষে নেমে এসেছে যেন বর্ষার সুশীতল বারিধারা ! ভজন-সাধন-সংকীর্ত্তন—পূজা-অর্চ্চনা দ্বিগুণভাবে চল্‌তে লাগলো মঠের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে নব উৎসাহে।
কয়েক মাস মঠে থেকে স্বামিজী মঠের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে ফেললেন। ইতিমধ্যে স্বামী সদানন্দও সব ত্যাগ ক'রে চলে এলেন বরাহনগর মঠে। মঠের সন্ন্যাসী-ভক্তগণ তাঁকে সাদরে বরণ করলেন নিজেদের মধ্যে ভাইয়ের মত।

৪৪

স্বামিজী এসেছেন গাজীপুরে। গাজীপুরের পওহারীবাবা অসাধারণ যোগী—মহাজ্ঞানী পুরুষ। শুধু হঠযোগী নন্,—রাজযোগীও। অনেকদিন থেকে স্বামিজীর সাধ,—পওহারীবাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

কিন্তু মৌনী ধ্যানী এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ বড় সহজ ছিল না। চারিদিকে উঁচু পাঁচীলে ঘেরা এক নির্জ্জন উদ্যানের গুহার মধ্যে বাস করতেন তিনি। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাঁকে কেউই দেখেনি। ভেতরে যে কি করেন,—কি খেয়ে থাকেন, তাও কারো জানা নেই। তবে মাসের পর মাস সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন,—এমন অনেক অলৌকিক কথা শোন যায় তাঁর সম্বন্ধে।

—কয়েক দিন ঘুরে ঘুরে—হয়ত মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ব্যাকুল কামনার জন্যেই স্বামিজীর ভাগ্যে ঘটলো তাঁর দর্শনলাভ।

দর্শন অর্থে—চোখে প্রত্যক্ষ দেখা নয়, গুহার দরজার পাশ থেকে মাত্র কথাবার্ত্তায় আলাপ। এক প্রচীরের এদিকে স্বামিজী—ওদিকে পওহারীবাবা—দু'জনেই দু'জনের দৃষ্টির অগোচর!

স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন,—তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে মহারাজ?

"গুরুকা ঘরমে নৌকা মাফিক পড়া রহো!"—উত্তর দিলেন পওহারীবাবা—"যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।"—বললেন তিনি কথায় কথায়। ভারী আনন্দিত হ'লেন স্বামিজী এই মহাযোগীর সঙ্গে বহু বিষয়ে এইভাবে আলাপ-আলোচনা ক'রে—তাঁর উপদেশ পেয়ে।

যোগমার্গে বিচরণ ক'রে—সত্যলাভে সিদ্ধ হয়েছেন পওহারীবাবা। সহসা স্বামিজীর ইচ্ছা হলো, তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবেন,—যোগশিক্ষার জন্যে। তা'হলে হয়ত একাসনে ব'সে ইচ্ছামত দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হ'য়ে থাকার শক্তি লাভ করবেন ভবিষ্যতে। পওহারীবাবাকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্যও একদিন ঘটলো তাঁর। মনের ইচ্ছা তিনি জানালেনও তাঁকে। পওহারী-বাবাও রাজী হ'লেন সানন্দে তাঁকে দীক্ষা দান করতে।

কিন্তু একি!···দীক্ষা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত ক'রতে যেমনি সেদিন তিনি পওহারী-বাবার গুহাভিমুখে পা বাড়িয়েছেন,—অমনি কে যেন তাঁকে পেছন থেকে টেনে ধ'রলো। পা যেন আর নড়ে না—সর্ব্বশরীর অবশ,—নিজের দেহটাকে যেন নিজেই বইতে পারছেন না। অন্তর থেকেও কে ব'লে উঠলো যেন,—কোথা যাও?

থমকে দাঁড়ালেন স্বামিজী। নানা চিন্তা এসে জুটলো তাঁর চিত্তের মধ্যে। কিন্তু বজ্রের মতই কঠিন তাঁর মনোবল! সব কিছু দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দুর্নিবার কামনায় উঠলেন গিয়ে—পওহারীবাবার গুহায়। দীক্ষা গ্রহণের শুভদিনও স্থির হ'য়ে গেল সেদিন।...

গভীর রাত্রি!—গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন স্বামিজী সহসা স্বপ্ন দেখলেন,—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সম্মুখে! কি পবিত্র,—সৌম্য, নির্ম্মল মূর্ত্তি—প্রশান্তনেত্রে কি গভীর স্নেহ,—কতই না করুণা! ললাটের দিব্যজ্যোতিঃতে যেন সারা কক্ষ আলোকিত হ'য়ে উঠেছে! কিন্তু তবু কি নিবিড় বিষাদের ছায়াই না মুখমণ্ডলে! কি গভীর বেদনায় ছলছল করেছে দু'টি পদ্ম-পলাশ আঁখি! বলছেন যেন অভিমানভরা ব্যথাহতকণ্ঠে,—ওরে, আমাকে ঠেলবি কোথায়? আমি যে তোর প্রাণের মধ্যে! আমি যে তোর কর্ম্মে—আমি যে তোর ধর্ম্মে—আমি যে তোর মর্ম্মে—আমি যে তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে!

আচম্বিতে দারুণ আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বামিজীর—'না, না, না' তোমার চরণ ছাড়া এ দাস কোথাও যাবে না'—স্বতোচ্ছ্বাসিত কাতরবাণী ফুটে উঠলো তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠে—জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ! আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর—ঘোর অবিশ্বাসী আমি!"—দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হলো তাঁর অন্তরে। সেই মুহূর্ত্তেই দীক্ষা-গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ ক'রে বার বার মাথা নোয়াতে লাগলেন তিনি ঠাকুরের চরণে!

এরপর পওহারীবাবার কাছে যেদিন বিদায় নিতে গেলেন,—সেদিন দেখলেন—তাঁর গুহায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একখানি ফটো রয়েছে। পওহারী-বাবা ঐ ফটো দেখিয়ে স্বামিজীকে বললেন,—"ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।"

গভীর বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলেন স্বামিজী,—পওহারীবাবার মুখেও সেই কথা!...ওঃ, কি মোহই না পেয়েছিল তাঁকে! অপরাধীর দৃষ্টিতেই চাইলেন তিনি ফটোটির দিকে।

দুই চক্ষু জলে ভ'রে এলো তাঁর ঠাকুরের ক্ষমা-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে! মনের মধ্যে যদিই-বা কিছু খুঁৎ ছিল—তাও মুছে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে পওহারী-বাবার কথায়।

* * * *

গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ হৃষীকেশে পীড়িত। সেখান থেকে তাঁকে বারাণসীতে আনাবার ব্যবস্থা ক'রে—নিজেও গাজীপুর থেকে,—বারাণসী

যাত্রা করলেন স্বামিজী। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি এবার সেখানে। স্বামী প্রেমানন্দের ওপর দিলেন অভেদানন্দ-স্বামীর দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষার ভার।

প্রমদাবাবুর উদ্যানবাটীতেই থাকেন তিনি। সব সময়ই প্রায় কাটে ধ্যান-ধারণায়, তপস্যা ও সাধন-ভজনে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন মন্দিরাদি দর্শন করতে। কত জ্ঞানপিপাসু লোক আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—পার্থিব-অপার্থিব নানা বিষয়ে চলে গভীর আলোচনা। বিস্ময়ে-শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে ওঠেন দর্শনার্থিগণ তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায়—সর্ব্বোপরি তাঁর উদার মহান্ অন্তরের পরিচয় পেয়ে।

দেখতে দেখতে অভেদানন্দ আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু ঠিক এই সময়ই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট গৃহীশিষ্য বলরামবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেলেন স্বামিজী। গুরুভ্রাতাদের ভালবাসতেন তিনি নিজের ভাইয়ের মত। কাজেই বলরামবাবুর মৃত্যুতে দারুণ ব্যথা পেয়ে কেঁদে ফেললেন তিনি।

"অপনি সন্ন্যাসী",—বললেন প্রমদাবাবু তাকে কাঁদতে দেখে,—"কারো মৃত্যু-শোকে আপনার কি এত বিচলত হওয়া উচিত ?"

"বলেন কি ?"—অশ্রুসিক্ত চোখে তীব্রদৃষ্টি ফুটে উঠলো স্বামিজীর,—"সন্ন্যাসী হয়েছি ব'লে কি—অন্তরটাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি!···সন্ন্যাসীরই তো উচিত,—নিজের সুখদুঃখে বিচলিত না হ'য়ে পরের জন্যে কাঁদা। হাজার হোক, সন্ন্যাসীও তো মানুষ! যে সন্ন্যাস মানুষের অন্তরের কোমল বৃত্তিকে দূর করবার উপদেশ দেয়—সে সন্ন্যাস আমার নয়। যে সন্ন্যাস—সাধারণ মানুষের চেয়েও অন্তরকে কোমল করে,—করে উদার-অনুভূতিশীল—আমি সেই সন্ন্যাসই গ্রহণ করেছি।"

প্রমদাবাবুর মুখে আর কথা যোগাল না।—আজ যেন সন্ন্যাসধর্ম্মের এক অভিনব ব্যাখ্যা শুন্‌লেন তিনি। মনে মনে স্বীকার করলেন,—শত দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত ভারতের বুকে—এইরূপ নিঃস্বার্থ-নিষ্কাম অভিনব সন্ন্যাসীরই আজ একান্ত প্রয়োজন।

স্বামিজী ফিরে এলেন কলকাতায়—বলরামবাবুর শোকতপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা-দানের জন্যে। দারুণ শোকের সময় স্বামিজীকে পেয়ে বলরামবাবুর সংসারের প্রতিটি ব্যক্তিই আশ্বস্ত হ'লেন। ক্ষতের মুখে প্রলেপের মত—স্বামিজীর সহানুভূতি—তাদের প্রাণে এনে দিল গভীর সান্ত্বনা—পরম আশা ও ভরসা।

এরপর মাত্র দু'মাস বরাহনগর মঠে থেকে স্বামিজী আবার বেরিয়ে পড়লেন পর্য্যটনে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। সদ্য তিব্বত-প্রত্যাগত স্বামী অখণ্ডানন্দের মুখে লামাদের বিচিত্র কাহিনী, কেদার-বদরীর অনন্ত-গম্ভীর-মহান্ সৌন্দর্য্য, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় শোভাসম্পদ্—ইত্যাদি বহু চিত্তাকর্ষী বস্তুর কথা শুনে এবার হিমালয়-প্রদেশ-পর্য্যটনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো স্বামিজীর অন্তরে। উচ্ছলিত আনন্দে বললেন তিনি অখণ্ডানন্দকে—"হ্যাঁ, তোর মত লোকই সঙ্গী হওয়ার যোগ্য। চল, এবার আমরা দু'জনেই যাই।"

অখণ্ডানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হ'লেন স্বামিজীর প্রস্তাবে। মঠ থেকে বিদায় নেবার সময় হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন গুরুভাইদের,—বুঝলি, এবার আর সহজে ফিরছি না; লোককে স্পর্শমাত্র তার মনের গতি বদলে দিতে পারবো, এমন শক্তি লাভ ক'রে তবে ফিরবো।

গুরুভাইরাও হেসে জবাব দিলেন,—আপনার পক্ষে সে আর অসম্ভব কি?

এরপর অখণ্ডানন্দস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী এলেন প্রথম ঘুসুড়ীতে। শ্রীশ্রীমা তখন এইখানেই ছিলেন। দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর আশীর্ব্বাদ হবে পরম পাথেয়। মা'র চরণ-সমীপে এসে উপস্থিত হ'তেই শ্রীশ্রীমা প্রাণভরে স্বামিজীকে আশীর্ব্বাদ করলেন। মা'র আশীর্ব্বাদ পেয়ে স্বামিজীর মনে হ'ল,—যেন একটা নূতন শক্তি সঞ্চার হয়েছে তাঁর অন্তরের মধ্যে।

শ্রীশ্রীমার কাছে বিদায় নিয়ে প্রথমে এলেন তাঁরা ভাগলপুর। এখানে জৈন-ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বামিজীর বহু আলোচনা হ'লো। স্বামিজী তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন,—মূলতঃ জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অন্যতম শাখা,—এবং বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবেই সংশ্লিষ্ট। আচার্য্যগণ বিশেষ প্রীত হলেন—ধর্ম্মতত্ত্বে স্বামিজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে।

ভাগলপুর থেকে বৈদ্যনাথধাম। এখানে এসে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা হলো স্বামিজীর। উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হ'লো কিছুক্ষণ—দেশ ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে।

সেখান থেকে চললেন আবার বারাণসী। এবার এখানে এসে পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্যে স্বামিজীর হৃদয় অধীর হ'য়ে উঠলো। প্রমদাবাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি বললেন,—'আবার যখন এখানে আস্‌বো, দেখবেন, একটা বোমার

মতোই ফেটে পড়েছি—লোক-সমাজের ওপর।"—অখণ্ডানন্দকে বললেন,—"এখন আর অন্য কোথাও নয়—চল, বরাবর হিমালয়ের দিকে।"

কিন্তু অখণ্ডানন্দ অনেক জেদাজেদ ক'রে স্বামিজীকে নিয়ে গেলেন অযোধ্যা নগরীতে—মোহন্ত জানকীবরশরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মোহন্ত ছিলেন একজন পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ,—সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞসাধক—অসাধারণ গুণী ও গুণগ্রাহী। সমাগত অতিথিদ্বয়কে তিনি অভ্যর্থনা ক'রলেন পরম সমাদরে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে—বিশেষ ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ে—মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি যা বললেন,—তা'তে অপার প্রীতিলাভ করলেন স্বামিজী। তাঁর মনে হলো,—আজ যেন একটা নূতন আলোকেরই সন্ধান পেয়েছেন তিনি। অখণ্ডানন্দকে বললেন,—তুই যে আমাকে এখানে এনেছিলি,—এতে ভারী খুসী হয়েছি। একজন প্রকৃত সাধু পুণ্যাত্মার দর্শনলাভ হ'লো এখানে এসে।

স্বামিজীর সংকল্প,—পায়ে হেঁটেই তিনি ঘুরবেন সারা ভারত,—দেখবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের আভ্যন্তরিক রূপ,—উপলব্ধি করবেন ভরতের আত্মার স্থিতিকেন্দ্র,—প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে বুঝবেন,—দরিদ্র ভারতবাসীর নানা সমস্যা-সংকুল জীবনের গভীর ব্যথা : তাই পায়ে হেঁটেই তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম ক'রে এলেন নৈনিতালে।

নৈনিতালে কয়েকদিন থেকে—দু'জনে যাত্রা করলেন বদরিকা আশ্রম দর্শনের উদ্দেশ্যে। দুর্গম পথ—কপর্দ্দকহীন-নিঃসম্বল দুই সন্ন্যাসী!—কোথায় খাবেন,—কোথায় শয়ন করবেন,—কে আশ্রয় দেবে,—এ সবের কোন স্থিরতা নেই,—চিন্তাও নেই!—অবিরাম চলেছেন—তীর্থপথের দুই নিরলস পথিক দিনের পর দিন দৃঢ়চিত্তে—ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অটল হ'য়ে।

লতা-গুল্ম-বিটপি-পরিশোভিত পার্ব্বত্য প্রদেশের মনোরম সৌন্দর্য্য,—কুলুকুলুতানে প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য তটিনী,—আকাশচুম্বী, গিরিরাজ হিমবানের মহা-মহিমান্বিত ধ্যান-গম্ভীর অপূর্ব্ব-সুন্দর ভাব-সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে দুই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী যেন ভুলে যান পথশ্রমের ক্লান্তি—ভুলে যান অনাহারের অবসাদ। নির্ঝর-শৈত্য-সেবিত মেদুর সমীরণ এনে দেয় তাঁদের প্রাণে এক অমিয় শান্তি—এক দুর্ল্লভ আনন্দ!

৪৬

ক্রমে তাঁরা আলমোড়ায় এসে পৌঁছলেন। এখানে পর্য্যটনরত গুরুভ্রাতা স্বামী কৃপানন্দ ও সারদানন্দও মিলিত হলেন তাঁদের সঙ্গে। সকলে মিলে বাস করতে লাগলেন সহৃদয় ধর্ম্মানুরাগী—লালা বদ্রীসার আশ্রয়ে। লালাজী পরম সমাদরেই গ্রহণ করলেন তাঁদের।

কয়েকদিন বেশ কাটছিল; কিন্তু সহসা একদিন একখানা টেলিগ্রাম এল স্বামিজীর নামে। টেলিগ্রামখানা বয়ে এনেছে তাঁর এক সহোদরার মৃত্যু-সংবাদ। কিছুক্ষণের জন্য স্বামিজী শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠলেন। ভগিনীর কথা ভাবতে ভাবতে—তাঁর চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠলো—দেশের নারীজাতির শোচনীয় দুর্দ্দশার চিত্র। কেমন ক'রে জাতির অর্দ্ধেক-শক্তি এই মাতৃজাতির কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে,—সহোদরার মৃত্যুর আঘাত যেন সে-বিষয়েও সচেতন ক'রে তুল্‌লো স্বামিজীকে।

কিন্তু স্বামিজী নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন, আত্মীয়বর্গ তাঁর সন্ধান পেয়েছেন।—সুতরাং আর লোকালয় নয়,—এবার দুর্গম গিরি-গুহাতেই আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দ, কৃপানন্দ ও সারদানন্দকে নিয়ে অগ্রসর হ'লেন তিনি গাড়োয়াল রাজ্যের অভিমুখে।

কিন্তু এখন থেকে তাঁর শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হতে লাগলো। তবু সঙ্গীদের নিয়ে ভিক্ষা সম্বল ক'রে,—যথারীতি ধ্যান ও ধর্ম্মালোচনা করতে করতে পৌঁছলেন এসে শ্রীনগরে। অলকনন্দার তীরে এক নির্জ্জন কুটিরে থেকে প্রায় মাসাধিক কাল সাধন-ভজন করলেন তাঁরা। মাধুকরী দ্বারা হ'তে লাগলো তাঁদের দিনাতিপাত।

তারপর রওনা হলেন টিহিরি। টিহিরি থেকে মুসুরীর মধ্য দিয়ে রাজপুর। এখানে মিলিত হলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে। এদিকে তখন অখণ্ডানন্দেরও শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। সর্দ্দিকাশি—বুকে বেদনা। দেরাদুনের আনন্দনারায়ণ নামে এক সহৃদয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অখণ্ডনন্দকে রেখে স্বামিজী তাঁর যথোচিৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি কিছু সুস্থ হ'লে—স্বামী কৃপানন্দের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিলেন এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাড়ী—স্বাস্থ্যলাভের জন্যে।

এরপর স্বামিজী অন্য গুরুভ্রাতাদের নিয়ে এলেন হৃষীকেশে—বাস করতে লাগলেন বিখ্যাত সাধু ধনুরাজ গিরির বাড়ীতে। মাধুকরী ক'রেই হ'তে লাগলো তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি। কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন স্বামিজী এখানে। কিন্তু হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বাধা পড়লো তাঁর একাগ্র সাধনায়। অবস্থা তাঁর ক্রমশঃই খারাপের দিকে যায়। বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন গুরুভ্রাতারা। হঠাৎ একদিন এমন হলো যে—ক্রমাগত ঘাম নির্গত হয়ে তাঁর সর্ব্বশরীর হ'য়ে গেলো হিমের মত শীতল,—নাড়ীর ক্রিয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে এল। অজ্ঞান—অচৈতন্য—আচ্ছন্ন অবস্থা,—দেখে মনে হচ্ছে, অন্তিমকাল উপস্থিত।

গভীর বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠলো গুরুভাইদের চোখে-মুখে।···এ-কি করলে পরমমঙ্গলময় হৃষীকেশ! এত বড় একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ কি লীন হ'য়ে যাবে অকালে—পথেঘাটে?···বহুক্রোশের মধ্যে কোথাও ডাক্তার-কবিরাজ নেই—নেই কোন সাহায্যকারী—নেই কোন উপায়! সকলে মিলে শোকভারাক্রান্তচিত্তে মনে মনে ডাকতে লাগলেন—সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, বিপদের বন্ধু শ্রীমধুসূদনকে। স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয়-সুন্দর-প্রশান্ত মূর্ত্তি।

সহসা কুটির-দ্বারে শোনা গেল যেন কা'র পায়ের শব্দ। চকিতে দেখলেন সকলে,—কুটিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন এক দিব্য মূর্ত্তি সাধু।—অন্তরে কা'র যেন অনুপ্রেরণা অনুভব ক'রে ডাকলেন তাঁরা সাধুকে একান্ত আগ্রহে কুটিরের মধ্যে। কুটিরে প্রবেশ ক'রে সাধু কিছুক্ষণের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন স্বামিজীর মুখের দিকে। তারপর নিজের ঝুলি থেকে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুল চূর্ণ নিয়ে একত্রে মেড়ে খাইয়ে দিলেন স্বামিজীকে।

কি আশ্চর্য্য,—কি অদ্ভুত ব্যাপার,—ঔষধ ক্রিয়া করলো মুহূর্ত্তে অমৃতের মত! একটু পরেই ধীরে ধরে চোখ খুললেন স্বামিজী। অতি ক্ষীণস্বরে—একজন গুরুভাইয়ের কানে কানে কি যেন বললেনও। আশার আনন্দে প্রাণ নেচে উঠলো গুরুভাইদের! ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হ'লো তাঁদের—জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ! জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ!

কিন্তু এ কি রহস্য?—চোখ ফেরাতেই তাঁরা আর দেখতে পেলেন না,—সেই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আগত সাধুবাবাকে।···কোথায় গেলেন তিনি? এত অল্পক্ষণের মধ্যে কোন মানুষের পক্ষে কি কোথাও অন্তর্দ্ধান করা সম্ভব? ব্যাকুল নেত্রে এদিক-সেদিক চাইলেন তাঁরা,—কিন্তু, কোথাও আর সে সাধুর চিহ্নমাত্রও নেই।

কে এসেছিলেন তবে এই সাধুর বেশে ?—নিতান্ত অতর্কিতে হঠাৎ আবিভূ ত হ'য়ে মৃত্যুমুখ থেকে স্বামিজীকে রক্ষা ক'রে গেলেন,—কে এই ত্রাণকর্ত্তা ?
'রাখে হরি মারে কে ? মারে হরি রাখে কে ?'—তবে কি তিনি সেই হরি ! আর্ত্তের বন্ধু সেই নারায়ণ এসেছিলেন ছদ্মবেশে ?

সুস্থ হয়ে স্বামিজী গুরুভ্রাতাদের ব'ললেন,—অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায়—তাঁর মানসচক্ষে ফুটে উঠেছিল যেন কা'র শুভ্রসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রূপ—চোখে তাঁর বরাভয়, সমুন্নত ললাটে করুণার দীপ্তি—মুখে আশার বাণী,—'জাগ্রত হও, অগ্রসর হও নির্ভয়ে,—বিধাতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এসেছ তুমি সংসারে !

এর পর থেকে গুরুভ্রাতারা প্রায়ই লক্ষ্য করতেন—স্বামিজীর আধ্যাত্মিক শক্তি যেনে বেড়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

৪৭

মীরাট। ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ী। হৃষীকেশ থেকে গুরুভ্রাতাদের নিয়ে এখানে এসে উঠলেন স্বামিজী। বড় প্রীত হ'লেন ত্রৈলোক্যবাবু তাঁকে পেয়ে। কিন্তু কয়েকদিন মাত্র সেখানে থেকে স্বামিজী চলে গেলেন শেঠজীর বাগানে। এখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ প্রভৃতি সকলেই ছিলেন,—আবার তাঁদের সঙ্গে এসে জুটলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দও।

বাগান যেন মঠ হ'য়ে উঠলো। কত লোক আসে ধর্ম্মকথা শুনতে স্বামিজীর কাছে। সাধন-ভজন চলে অবিরাম। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে স্বামিজী নানা সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্র এবং পুরাণ পাঠ ক'রে শোনান সকলকে। দিনগুলি সকলকে নিয়ে এখানে কাটে ভালোই। শরীরও ধীরে ধীরে সেরে উঠলো তাঁর মীরাটের জলবায়ুতে।

কাছাকাছি একটি সাধারণ পাঠাগার। স্বামিজী সেখান থেকে ননোবিধ পুস্তক আনিয়ে পড়তেন। কিন্তু এত অল্প সময়ে—এত বেশি বই পড়তেন যে, অবাক হয়ে যেতেন গ্রন্থাগারিক,—ভাবতেন, এত অল্প সময়ে কি এই সব কঠিন কঠিন বিষয়ের বই পড়ে ফেলা সম্ভব ?···নিশ্চয়ই তিনি কোন বই-ই ঠিকমত পড়েন না,—মাঝে মাঝে পাতা উল্‌টে দেখে যান মাত্র।

কথাটা তিনি একদিন ব'লেই ফেললেন স্বামিজীর কাছে। হাসলেন স্বামিজী,— "আপনার ধারণা ভুল,—আমি বইগুলি সম্পূর্ণই পড়েছি। আপনি ইচ্ছা করলে,—যে কোন বইয়ের যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু স্থির হয়ে যায় গ্রন্থাগারিকের—'কিভাবে পড়েন আপনি ?— আমি তো তার কিছুই বুঝতে পারছি না !'

"আমি একটি শব্দ পড়ি না",—উত্তর দেন স্বামিজী—'একসঙ্গে একটি বাক্যের ওপরই—আমার দৃষ্টি থাকে। এর জন্যে দরকার গভীর নিষ্ঠা—অবিচল মনঃসংযোগ।'

অপার শ্রদ্ধা-বিস্ময়-জড়িত নেত্রে চেয়ে থাকেন গ্রন্থাগারিক স্বামিজীর মুখের দিকে। তখনো ব্যাপারটা যেন অদ্ভুত লাগছে তাঁর !

* * * *

পরিব্রাজক বেশে ঘুরতে ঘুরতে বহু সর্ব্বত্যাগী সাধু-মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন স্বামিজী। তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসী-জীবনের কঠোর নির্জ্জন সাধনা যে তাঁদের নিজেদের জন্য নয়,—তাঁহাদের অর্জ্জিত পুণ্যবলে লোক-কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত—এই গূঢ় রহস্য অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন স্বামিজী সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বহুবিধ আলাপ-আলোচনা ক'রে।

মীরাটে থাকতে থাকতে তাঁদের মহান্ আদর্শ উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো স্বামিজীকে। নির্জ্জন সাধনার জন্য তিনিও অধীর হয়ে উঠলেন। গুরুভ্রাতাদের সকলকে ডেকে বললেন একদিন—"ভাই, এবার তোমরা আমায় মায়া থেকে মুক্তি দাও,—যে যার পথে চলে যাও,—আমিও নিজের পথ ধরি। গুরুভ্রাতাদের মায়াও মায়া ! সব মায়া ছেদন না করলে,—সেই মায়াতীত পুরুষকে পাওয়া যায় না !"

আর কোন কথা নয়।—মুহূর্ত্তে সকলের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে স্বামিজী চললেন এবার দিল্লী-অভিমুখে একাকী।

* * * *

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তাড়িঘাট ষ্টেশনে নেমেছেন স্বামিজী। দেখলেই মনে হচ্ছে,—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতর।…অথচ সঙ্গে কপর্দ্দকমাত্র নেই যে কিছু কিনে খাবেন !…চেয়ে খাওয়াও সম্পূর্ণ তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আবার জলও নাকি সেখানে কিনে খেতে হয় !

মুশাফিরখানার একপাশে ব'সে নীরবে ভাবতে লাগলেন তিনি—তাঁর জীবনের লক্ষ্যে পৌছবার কথা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন নিবিড় চিন্তার মধ্যে। চারিদিকে কত যাত্রীর কোলাহল, কত ফেরিওয়ালার চীৎকার,—গাড়ী যাতায়াতের বিকট শব্দ,—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই স্বামিজীর কোনদিকে। ডুবে

গেছেন তিনি আত্মহারা হয়ে আপন চিন্তায় অর্থাৎ ভারতের কল্যাণের ধ্যানে।

হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তি,—জাত বেনে—এক খাবারওয়ালার কাছে পুরি, মিষ্টি, কচুরী, ডাল-তরকারী কিনে—আবার দু'একটা পয়সা খরচ ক'রে একলোটা ঠাণ্ডাজলও যোগাড় ক'রে—স্বামিজীর কাছে এসে ব'ললে বিদ্রূপের স্বরে—"ওহে, গেরুয়া পরে তো মস্ত সন্ন্যাসী হ'য়েছো ; কিন্তু রোজগার তো একটি পয়সাও নেই,—কেবলই পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো ! তাই ক্ষিদে পেলে খেতেও পাও না,—তেষ্টা পেলে জলও জোটে না,—পয়সার অভাবে। কিন্তু এই দেখ—আমি রোজগার করি, তাই কেমন সব:ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি—আর এই দেখ কেমন ঠাণ্ডা জল—"

নিলর্জ্জ হৃদয়হীন পশু ! ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি কোন সহানুভূতি তো নেইই—উপরন্তু খাবার ও জল দেখিয়ে এই জঘন্য বিদ্রূপ ! মানুষ .কতটা নীচে নেমে গেলে—এই ব্যবহার সম্ভব, তা বুঝি ধারণারও অতীত !—খেতে খেতে লোকটা আবার ব'ললে—'কিন্তু রোজগার যদি করতে,—তবে আমার মতই পুরি-মিষ্টি-ঠাণ্ডাজল কিনে খেতে পারতে। এসব কি বাবা, মিনি-পয়সায় হয় ?'

হো-হো ক'রে তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলো সেই নরাকার পশু !

স্বামিজী কিন্তু নির্ব্বিকার—নির্ল্লজ লোকটার কোন কথা যেন কানেও ঢোকেনি তাঁর। একটি বিরক্তির রেখাও ফোটেনি তাঁর প্রশস্ত প্রশান্ত ললাটে।··· অবিচল মগ্ন আছেন তিনি আপন ধ্যানে !

কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—সহসা এক হালুইকর একথালা সদ্যপ্রস্তুত লুচি-মিষ্টান্ন, এক কুঁজো ঠাণ্ডাজল নিয়ে উপস্থিত হ'লো সেখানে। আকুল সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো সে—এদিকে-সেদিকে ! স্বামিজীর ওপর দৃষ্টি পড়তেই 'এই যে মহারাজ,'—সোৎসাহে, আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে ব'লে উঠলো সে,—'আসুন, আসুন, রোদে বসে কেন ?—এই ছায়ায় এসে বসুন। আমি আপনার জন্যে খাবার এনেছি। ঠাণ্ডাজলও এনেছি। দয়া ক'রে আহার করুন।'

—অবাক বিস্ময়ে তাকালেন স্বামিজী হালুইকরের দিকে—"ভাই, কে তুমি ? কোথায় থাক, কেমন ক'রে জান্‌লে আমার কথা ?"—স্বামিজীর স্বর জানি-না কা'র অনন্ত মহিমার কথা ভেবে গাঢ় হয়ে উঠলো।

'মহারাজ !'—হালুইকর উত্তর দিলে,—'এখানে আমার খাবারের দোকান আছে। খেয়ে দেয়ে আমি ঘুমুচ্ছিলুম,—হঠাৎ স্বপ্ন দেখলুম, রামজী বল্‌ছেন,—"ওরে, ষ্টেশনে আমার পরম ভক্ত সাধু উপবাসী পড়ে আছে,—যা যা শীগ্‌গির

খাবার তৈরী ক'রে তাকে খাইয়ে আয়। তোর কল্যাণ হবে।" প্রথমটা আমি অগ্রাহ্য করলুম,—কিন্তু চোক বুজতেই—আবার সেই স্বপ্ন! তখন আর দেরী না ক'রে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরী ক'রে—জল নিয়ে ছুটে আস্‌ছি আপনার কাছে। আপনি ছাড়া সাধু তো আর কেউ নেই এখানে। তা'হলে রামজী আমাকে আপনার কথাই ব'লেছেন।'

'নারায়ণ, নারায়ণ।'—দর দর ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো স্বামিজীর গণ্ড বেয়ে! কল্পনার নেত্রে ফুটে উঠ্‌লো তাঁর—ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেন দাঁড়িয়েছেন এসে সম্মুখে—বরাভয়দাতারূপে! সর্ব্বদেহে জেগে উঠলো কিসের এক পুলক শিহরণ! সেই অবাঙ-মানস-গোচর ঈশ্বরের, সেই নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম করুণার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অপার মহিমার গভীর স্পর্শ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করলেন তিনি অন্তরের মধ্যে। বাষ্পাকুলকণ্ঠে ব'লে উঠলেন,—'হে ব্যথার ব্যথী দীনার্ত্তের শরণ, কে বলে তুমি নেই?—তুমিই সত্য—তুমিই সত্য,—সত্যই তুমি!'

এদিকে তখন চারিপাশ থেকে বহু লোক বিস্ময়ে-শ্রদ্ধায় রোমাঞ্চিত দেহে—চেয়ে আছে স্বামিজীর দিকে স্থির-নিষ্পলক নেত্রে। নির্ল্লজ্জ বেনেও তখন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে—এই একান্ত কল্পনাতীত ব্যাপার দেখে। মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জায়—কুণ্ঠায় যেন মরে যাচ্ছে সে! বুঝেছে সে সর্ব্বত্যাগী নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য। কিন্তু ক্ষমা চাইবারও সাহস হচ্ছে না তার স্বামিজীর কাছে। অথচ ক্ষমা না চেয়েই বা স্বস্তি কোথায়? শেষ পর্য্যন্ত আর না পেরে অনুতপ্ত অধীর হৃদয়ে লুটিয়ে পড়লো সে স্বামিজীর চরণে,—'স্বামিজী, আমি বর্ব্বর, পশু, আমায় নিজগুণে ক্ষমা করুন।'

* * * *

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী,—কতদিকে যেতে যেতে কখন যে কোথায় নামেন,—কোথায় ওঠেন,—কোথায় বিশ্রাম করেন,—এর হিসাব রাখা বড়ই শক্ত। সব জায়গার নামও কারো মনে থাকা সম্ভব নয়। তবে তাড়িঘাটের মতই অমনি একটা স্টেশনই বটে,—স্বামিজী সেখানে নেমে বিশ্রাম করছেন,—প্ল্যাটফরমের একপাশে কি একটা গাছের তলায়।

ভিড় জমে গেছে তাঁর চারিপাশে। চারিদিক থেকে অজস্র প্রশ্ন বর্ষিত হচ্ছে স্বামিজীকে লক্ষ্য ক'রে। গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিত সুগৌর-সুঠাম তনু,—উজ্জ্বল গভীর দৃষ্টি—দিব্যজ্যোতিঃতে ভাস্বর স্বামিজীর দেব-দুর্ল্লভ মূর্ত্তি আকৃষ্ট করেছে সকলকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। সকলের প্রশ্নের উত্তরে ব'কে যাচ্ছেন তিনি অনর্গল,

—ধর্ম্ম-সমাজ, দেশ-জাতি-সংসার ইত্যাদি নানা বিষয়ে। কোন জিজ্ঞাসুই নিরাশ হচ্ছে না—যে কোন প্রশ্ন ক'রেও।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল। বেলা আটটা থেকে একটানা ব'কে চলেছেন স্বামিজী একটা পর্য্যন্ত। ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছেন তিনি, ক্ষুৎ-পিপাসাও কাতর ক'রে তুলেছে তাঁকে। কিন্তু তবু সমানে দিয়ে যাচ্ছেন সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর।

অদূরে দাঁড়িয়ে এক মুচি—অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল স্বামিজীকে। এতক্ষণ বোধ হয় সে কাছে আসতে সাহস করেনি,—কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলো না।—'স্বামিজী',—ধীরে ধীরে স্বামিজীর কাছে এসে কুণ্ঠিতকণ্ঠে ব'ললে সে,—'হাম্‌কো মালুম্ হোতা, আপ্‌কা ভুখ্‌ পিয়াস্ লাগা হ্যায়। হামরা দিল্ আপ্‌কা কুছ্ খিলানে চাহ্‌তা—লেকিন হাম মুচি হ্যায়,—উসিসে—

চকিত দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামিজী তার দিকে,—হ্যাঁ, সত্যিই আমার ক্ষিদে-তেষ্টা পেয়েছে,—তুমি আমাকে কিছু খেতে দিতে চাও?

'হাঁ—মহারাজ! লেকিন্ হাম্ মুচি—'

'তুমি দেবতা!'—স্বামিজী ব'লে উঠলেন উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে,—'যাও, তোমার যা সাধ যায়, নিয়ে এসো,—আমি খাবো।'

আদেশ পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেলো মুচি। ছুটে গেল সে তার বাসায়; নিয়ে এল ডাল—রুটি—আর জল। এনেছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে—বহু যত্নে—পরম নিষ্ঠায়। স্বামিজীও তার দেওয়া খাদ্য সানন্দে তার হাত থেকে নিয়ে আহার করলেন—পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে!

'একি ?'—সহসা পাশ থেকে দু'একজন ব'লে উঠ্‌লো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, যেন কিছু শ্লেষ ভ'রে—"আপনি হিন্দু-সন্ন্যাসী,—আপনি মুচির দেওয়া ডাল-রুটি খেলেন?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামিজী তাদের দিকে,—"আমি যা' খেয়েছি তা দেবভোগ্য।…মুচি!…বলি, তোমরা যে এতগুলি লোক পাঁচঘণ্টা ধ'রে আমাকে বকিয়ে চলেছ—কিন্তু কেউ ভেবেছিলে কি আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ?…কেউ বুঝেছিলে যে,—সাধু-সন্ন্যাসী হ'লেও তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে? আর ঐ মুচি—তার প্রাণ অনুভব করেছে—আমার প্রাণের ব্যথা—আমার ক্ষুধার জ্বালা। তাই জীবের মধ্যে শিবের সেবা করবার জন্যে সে আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছে। সে হলো ছোট—অস্পৃশ্য;—আর তোমরা উচ্চ, স্পৃশ্য? মুচি!…মুচি হ'লেও সে মানুষ,—কিন্তু তোমরা পশুরও অধম! তার হাতে আমি তো আমি—স্বয়ং নারায়ণও খেতে দ্বিধা করবেন না। তোমরা ওর পায়েরও যোগ্য নয়।"

লজ্জায়, কুণ্ঠায় ও ভয়ে চুপ ক'রে গেল সকলে—আর টুঁ শব্দটি বার হলো না কারো মুখে। কেউ কেউ আর সেখানে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সাহস করলো না।

স্বামিজী ব'ললেন আপন মনে,—মানুষ চেনে না কেউ,—শুধু জাতি-বিচার!… শুধু ছুঁৎ-অছুঁতের কথা। মানুষই যদি না হ'তে পারলি—জাতি নিয়ে হবে কি?

৪৮

রাজপুতানা—আলোয়ার রাজ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে উঠেছেন—বাজারের একটি দ্বিতল গৃহে। এক বাঙ্গালী ডাক্তার সৌম্যদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়েই এখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তাঁর।

কিন্তু সেখানে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুবিধা হ'তো না সকলের। তাই কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে এলেন শহরের মধ্যস্থলে পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাটীতে। বহুলোক স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পেলো এখানে। জ্ঞানী-অজ্ঞান, পণ্ডিত-মূর্খ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত,—কেউ বাকী নেই। হিন্দুর তো কথাই নেই,—মুসলমানেরাও আসতেন সমান আগ্রহে ধর্ম্মকথা শুনতে। যিনি যে মতেরই পোষক হোন্ না,—কোন দ্বিধা ছিল না কারো মনে।

ক্লান্তি নেই—বিরাম নেই—বিরক্তি নেই—স্বামিজী আলোচনা করতেন কতই-না বিভিন্ন বিষয়ে! তরুণ সন্ন্যাসীর উদাত্ত-মধুর কণ্ঠস্বর, অপূর্ব্ব বাচন-ভঙ্গী—বিষয়-বস্তুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—মুগ্ধ-অভিভূত ক'রে তুলতো দর্শনার্থিগণের প্রত্যেককে। যে যে-প্রশ্নই করুক, স্বামিজী তার উত্তর দিতেন—ধীর স্থির মর্ম্মগ্রাহীভাবে—যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা ক'রে।

"মহারাজ, আপ্‌কা শরীর কিস্ জাতিকা হ্যায়?" সহসা প্রশ্ন ক'রে বসলো একদিন একজন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই। কিন্তু বিরক্ত হ'লেন না স্বামিজী,—বল্‌লেন শান্ত ও সংযত কণ্ঠে,—"ইয়ে কায়স্থ শরীর হ্যায়।"

"আপ্ গেরুয়া পিহন্‌তে কেঁও।" প্রশ্ন উঠলো আবার অন্যদিক থেকে।

"ইয়ে ফকিরকে ভেক হ্যায়,—সফেদ কাপড় পিহন্‌নেসে গরীব লোক হামসে ভিখ্ মাঙ্গতে। লেকিন্ ম্যয় ত ফকির হুঁ। ভিখ্ কাঁহাসে দিউ। উস্ লিয়ে ম্যয় আপ্ গরীবোঁকা ভেক্ বনায়া।" গরীব লোক ভিক্ষা চাইবে,—স্বামিজী দিতে পারবেন না—এই সামর্থ্যের অভাব বাজবে স্বামিজীর বুকে,—তাই গেরুয়া প'রে তিনি নিজেকেই গরীব সাজিয়েছেন,—যাতে কোন গরীব তাঁকেও

গরীব জেনে কিছু না চায় তাঁর কাছে। প্রার্থী বা দাতা কাউকেই দুঃখ পেতে হ'বে না এতে।

কি দরদ-ভরা হৃদয়ের কথা! সন্ন্যাসিত্বের গর্ব্ব নেই,—গেরুয়ার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা নেই,—ধর্ম্মের বাগাড়ম্বর নেই!—কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর ব্যথার ব্যথী—নিষ্কাম যোগীর এই কথা বুঝিবা একান্ত তাঁরই যোগ্য!

জনৈক মৌলভী ইতিমধ্যে স্বামিজীর বিশেষ অনুরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি ব'ললেন একদিন পণ্ডিত শম্ভুনাথজীকে—"স্বামিজী যদি আমার বাড়ীতে একদিন 'ভক্ষা' করেন—আমি কৃতার্থ হবো। কিন্তু স্বামিজী কি পূর্ণ করবেন আমার প্রার্থনা?

"কেন, করবেন না?"—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন শম্ভুনাথজী মৌলভীর দিকে। মৌলভী ব'ললেন কুণ্ঠিত স্বরে—আমি মুসলমান,—বিধর্ম্মী, তাই। তবে আমি গোবর-গঙ্গাজল দিয়ে সব ধুইয়ে মুছিয়ে—হিন্দু-ব্রাহ্মণ দিয়ে রান্না করাব বিশেষ সদাচারে।

কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আহার্য্যগ্রহণকে "ভিক্ষা"ই বলতেন স্বামিজী। মৌলভীসাহেবের কথা শুনে হাসলেন শম্ভুনাথজী,—"কি ব'লছেন আপনি মৌলভীসাহেব! স্বামিজী তো যোগী-সন্ন্যাসী মানুষ,—তাঁর আবার জাত কি! —ধর্ম্মের গোঁড়ামিই বা তাঁর থাকবে কেন?" তাঁর চোখে হিন্দু-মুসলমান সবই তো এক!

স্বামিজীর কানে কথাটা উঠতেই,—মৌলভীসাহেবকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন তিনি,—"আজই যোগাড় করুন, মৌলভীসাহেব! মানুষ মানুষের হাতে খাবে—তার আবার গঙ্গাজল কেন? আমার ধর্ম্ম আমার কাছে বড় হতে পারে,—তা'বলে অন্যের ধর্ম্মই বা ছোট কিসে? আপনার মত ভক্তের হাতে খেতে পাওয়া তো পরম ভাগ্যের বিষয়।"

কৃতার্থ হ'লেন মৌলভীসাহেব মানব-প্রেমিক-সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দের উদার আচরণে। স্বামিজী পুলকিত কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌লেন,—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

* * * *

রাজ্যের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী স্বামিজীর সংবাদ পেয়ে তাঁকে পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন নিজের বাটিতে। স্বামিজীর সহিত আলাপ-আলোচনায় বিশেষ প্রীত হ'য়ে সংবাদ দিলেন তিনি মহারাজকে,—এখানে একজন মহাপণ্ডিত, প্রকৃত সাধুপুরুষ এসেছেন,—তাঁর সঙ্গে দেখা করলে সুখীই হবেন।

সংবাদ পেয়ে মহারাজা এলেন দেওয়ানজীর বাটীতে—তিনি ইংরেজী ভাবের ভাবুক,—দেশী অনেক কিছুই তাঁর কাছে কুসংস্কার।—কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেখতেই তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা জাগলো,—স্বামিজীকে প্রণাম ক'রে বসালেন তিনি নিজের সম্মুখে বিশেষ আদরে।

"স্বামিজী!"—প্রথমেই ব'ললেন মহারাজা,—"শুনেছি আপনি মহাপণ্ডিত লোক,—অনেক লেখাপড়া শিখেছেন,—অনায়াসে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করতে পারেন, কিন্তু তা' না ক'রে পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন কেন?"

"মহারাজ!" মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না ক'রে সুস্পষ্টকণ্ঠে ঘুরে প্রশ্ন করলেন স্বামিজী,—"আপনি রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রে—সর্ব্বদা সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খানা খেয়ে—আমোদ-প্রমোদ ক'রে বেড়ান কেন, ব'লতে পারেন?"

চমকে উঠলো মহারাজার পার্শ্বচরগণ—এই অকুণ্ঠ দৃঢ় ও সতেজ উত্তরে। কে—এই দুঃসাহসী সন্ন্যাসী!...ভয় হলো সকলের, এখনি হয়ত মহারাজা রাগের বশে একটা কঠোর আদেশই দিয়ে বসবেন!

কিন্তু না,—মহারাজাকে বিন্দুমাত্রও উষ্ণ হতে দেখা গেল না। বরঞ্চ ধীরভাবেই উত্তর দিলেন তিনি,—"আমার ভাল লাগে তাই করি।"

"আমারও তেমনি ফকিরি করতে ভালো লাগে, তাই করি।"—স্বামিজীর কণ্ঠে এতটুকু সংকোচ বা দুর্ব্বলতা নেই। মহারাজও নীরব! সভাসদগণের বুক কি-যেন শঙ্কায় ঢুই ঢুই করছে!...একটু পরে কি ভেবে মহারাজা আবার বল্‌লেন,—"কিন্তু সাধু মহারাজ,—আমার যে কাঠ-মাটি-পাথরে গড়া মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস নেই, আমার কি গতি হবে!" কথাটায় যেন একটু শ্লেষের আভাস,—"পরজন্মে আমি কি নীচ হয়ে জন্মাব?"

"যার যেমন বিশ্বাস!"—মহারাজার ভাব বুঝে কতকটা উপেক্ষাভরে নিস্পৃহকণ্ঠেই উত্তর দিলেন স্বামিজী। কিন্তু এরূপ উত্তরে দেওয়ানজী তুষ্ট হ'তে পারলেন না। স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় ইংরেজী ভাবের ভাবুক মহারাজার কিছুটা চৈতন্য হোক্,—দেওয়ানজীর ইচ্ছা তাই। তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামিজীর মুখের দিকে। সহসা দেওয়াল-বিলম্বিত একটি ফটোর দিকে দৃষ্টি পড়লো স্বামিজীর,—ও কার ছবি?

"মহামান্য মহারাজার।"—উত্তর দিলেন দেওয়ানজী।

"আনুন তো ছবিটি নামিয়ে।"

আদেশমাত্র একজন ফটোটি দেওয়াল থেকে খুলে স্বামিজীর হাতে দিলে সসম্ভ্রমে। কি অভিপ্রায় স্বামিজীর?—ভাবতে লাগলো সকলে। সহসা গম্ভীরস্বরে ব'ললেন স্বামিজী,—দেওয়ানজী, এই ফটোর ওপর থুথু ফেলুন তো!

সর্ব্বনাশ !—কি বলে এ স্পর্দ্ধিত সন্ন্যাসী ! ভয়ে শিউরে উঠলেন দেওয়ানজী,—"সে কি স্বামিজী, ও-যে আমাদের মহারাজার ফটো !—ওর ওপর কি থুথু ফেলা যায় ? এমন কথা বলাও যে দণ্ডনীয় অপরাধ !"

"কেন ?"—স্বামিজী অবিচল—নির্ব্বিকার,—"অপরাধ কেন ?—মহারাজার ফটো বটে, কিন্তু স্বয়ং মহারাজা তো নয় ! প্রকৃতপক্ষে কাগজ আর কালি। রক্ত-মাংসে গড়া মহারাজার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি !"

"তাঁরই তো প্রতিকৃতি ?"—সভয়ে মহারাজার দিকে একবার চেয়ে ত্রস্ত নীরস কণ্ঠে ব'ললেন দেওয়ানজী। স্বামিজী তখন ধীর স্বরে বললেন,—"তবেই দেখুন দেওয়ানজী, স্বয়ং মহারাজা নন,—তাঁর প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু তবু এটি মহারাজাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই এর অসম্মান আপনারা করতে পারেন না ; কারণ, তা' করলে—যাঁর ছবি, সেই মহারাজাকেই অপমান করা হয় ;—

...আর দেখুন মহারাজ !"

মহারাজার দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর,—"এই ফটো স্বয়ং আপনি না হলেও আপনারই ছায়া। তাই আপনার রাজ্যে এমন কারো শক্তি নেই,—যে এর অপমান করতে পারে। কারণ তারা বেশ জানে, সে অপমান করা হবে স্বয়ং মহারাজাকেই। তেমনি হিন্দু যে মাটি-কাঠ-পাথর দিয়ে মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজো করে—সে পূজো মূর্ত্তিকে নয়,—মূর্ত্তি যাঁর, তাঁকেই।—ফটোর মধ্যেও যেমন আপনিই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠেন আপনার প্রজাদের কাছে,—মূর্ত্তির মধ্যেও তেমনি হিন্দুর দেবতা নারায়ণই ভাস্বর হ'য়ে ওঠেন অনন্ত মহিমায় তাঁর পূজকদের চক্ষে। কোথাও কি কোন পূজক ব'লেছে,—'হে প্রস্তর, হে মাটি, আমি তোমার পূজো করছি ?' "

এতক্ষণে মহারাজার মনের মোহ দূর হলো। মূর্ত্তিপূজার রহস্য এমন সরল-সহজ অথচ হৃদয়স্পর্শী ক'রে কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয়নি কোনদিন। পরম ভক্তিতে তিনি প্রণাম করলেন স্বামিজীকে।—অন্যান্য সকলেও তখন চেয়েছিলেন শ্রদ্ধাভিভূত হ'য়ে স্বামিজীর দিকে চিত্রার্পিতের মত !

মহারাজার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী প্রায় একমাস কাল থেকে গেলেন আলোয়ারে।

এই সময় আলোয়ারের কয়েকজন যুবক স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিব্রাজক বেশের প্রথম চিত্র তোলা হয় এই আলোয়ারেই।

বিদায় নেবার সময় মহারাজা এসে স্বামিজীকে প্রণাম ক'রলেন—স্বামিজী, কৃপা ক'রে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

"ভগবান ছাড়া কৃপা করবার অধিকার আর কারো নেই মহারাজ!" স্বামিজী গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"আপনি তাঁর চরণেই শরণ নিন্—প্রাণভরে তাঁকেই ডাকুন—তিনিই আপনাকে কৃপা করবেন।"

৪৯

আলোয়ার থেকে জয়পুর। এখানে স্বামিজী থাকেন প্রায় পনেরো দিন। একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত ছিলেন এখানে। পাণিনিতে তাঁর অধিকার ছিল অসাধারণ। তাঁর কাছে একান্ত আগ্রহে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ ক'রলেন স্বামিজী।

অধ্যাপক পণ্ডিতজীর শিক্ষাদান-প্রণালী কিন্তু বেশ সরল ছিল না। কাজেই স্বামিজী একটি ভাষ্যের ব্যাখ্যা তিন-চারদিন ধ'রেও বুঝতে পারলেন না। বিরক্ত হ'য়ে পণ্ডিতজী ব'ললেন,—'আমার দ্বারা আপনাকে শিক্ষা দান করা অসম্ভব।' কথাটায় স্বামিজী কিছু লজ্জিত হলেন। কিন্তু সংকল্প তাঁর দৃঢ় হ'য়ে উঠলো। অবশেষে অতি অল্প সময়ে তিনি এমন সব সুকঠিন বিষয় আয়ত্ত ক'রে ফেললেন যে, অধ্যাপক মহাশয় তাঁর ব্যাখ্যাদি শুনে স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে!…মনে মনে ভাবলেন,—এ-ও কি সম্ভব! কিন্তু পরক্ষণেই কি-যেন ভাবের আবেগে প্রকাশ্যে ব'লে উঠলেন—আপনি যোগিপুরুষ, মন আপনার অধীন, আপনার পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে।

জয়পুর থেকে আজমীঢ় হ'য়ে স্বামিজী এলেন আবু পাহাড়ে। চলার পথে সর্ব্বদাই তিনি প্রতিটি স্থলের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত জানতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি-নিদর্শন প্রতিটি ভগ্নস্তূপ লক্ষ্য করেন—বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। তাঁর মনে হয়,—এগুলি তুচ্ছ ভগ্নস্তূপই নয়,—ভারতের অতীত কীর্ত্তির এক-একটি মৌন অথচ বাঙ্ময় সাক্ষী। বিশাল দেশ ভারতের মধ্যে কত ভিন্ন ধর্ম্মের—বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভাষাভাষী লোক,—কত তাদের দুঃখ—কি তাদের বেদনা,—কোথায় তাদের ব্যথা ইত্যাদি সমস্তই তিনি লক্ষ্য করেন শুধু বাইরের দৃষ্টি দিয়ে নয়,—অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও। ভারতের বন-পাহাড়-নদ-নদী-প্রান্তর মরু-ময়দান—সবই যেন বহুদিনের অকথিত কথা বলতে থাকে তাঁর কানে কানে।

আবু পাহাড়ের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় জৈনমন্দিরটি দেখে ভারী সন্তুষ্ট হন স্বামিজী। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্যের এই অতুলনীয় অবদান প্রাণে জাগিয়ে তোলে তাঁর এক অপূর্ব্ব ভাবের সাড়া! এখানকার বহু সুন্দর দৃশ্যও চিরসুন্দরের অনুরাগী স্বামিজীর চিত্তে এনে দেয় এক অব্যক্ত আনন্দ!

রাজপথ দিয়ে চলেছেন স্বামিজী ধীর পদক্ষেপে—অপূর্ব্ব-সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি—প্রাণ-প্রাচুর্য্য উথলে উঠ্‌ছে যেন সারা অঙ্গে ;—হঠাৎ দেখা হলো এক মুসলমান উকীল ভদ্রলোকের সঙ্গে।…হোক্ না মুসলমান,—যিনি প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী তার আবার হিন্দু-মুসলমান কি ? স্বামিজীকে দেখেই বিশেষ আকৃষ্ট হলেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামিজীকে নিয়ে গেলেন তিনি নিজের বাড়ীতে। রাখলেন পরম যত্নে এবং সমাদরে। তাঁরই চেষ্টায় কোটার প্রধানমন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং-এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো স্বামিজীর। এলেন আরও কত বিশিষ্ট ব্যক্তি খবর পেয়ে স্বামিজীকে দেখতে। খেতড়ির রাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলালকেও একদিন সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন উকীল ভদ্রলোক স্বামিজীর সহিত আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে।…

জগমোহনলাল এলেন অসীম কৌতূহল নিয়ে। ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত—গ্র্যাজুয়েট সাধু নাকি তিনি কখনো দেখেননি। এসেছেন সেই আগ্রহে। কষিত-কাঞ্চনসম উজ্জ্বল দেহ,—কৌপীন-পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ শুয়ে আছেন একটি খাটিয়ার ওপর—যেন মূর্ত্তিমতী প্রশান্তি—যেন মানব-জীবনের এক দিব্য নবীন সুন্দর প্রকাশ !

কিন্তু তবু সন্দেহ জাগে জগমোহনলালের,—শঠ-জুয়াচোরও তো হতে পারে ? এমন তো কতই ভেকধারী সন্ন্যাসী দেখা যায় ! একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রশ্ন করেন তিনি,—'আপনি হিন্দু-সন্ন্যাসী হ'য়ে মুসলমানের বাড়ীতে আছেন কেমন ক'রে ? মুসলমানের ছোঁয়া খাদ্যও হয়তো গ্রহণ করছেন ! এতে কি আপনার স্বধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না ?'

"স্বধর্ম্ম !"—হাসলেন স্বামিজী—উদার প্রশান্ত হাসি,—"আমি তো সন্ন্যাসী ! গৃহস্থের সাধারণ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কি আমার জন্যে ? সংসার ত্যাগ ক'রে আমি বেরিয়েছি যাঁর সন্ধানে, তাঁর তো কোন জাত-ধর্ম্ম নেই,—তবে আমারই বা থাকবে কেন ? হিন্দুও তাঁর, মুসলমানও তাঁর ; তবে আমারই বা বিভেদ-জ্ঞান কিসের ? না,—ধর্ম্মের হানি আমি কোথাও করিনি। তবে আমার ভয় হয়,—আপনাদের মত সবজান্তা ইংরেজী-ভাবাপন্ন লোকদের, যারা প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম আদৌ বোঝেন না,—শুধু বাইরের আচার দেখেই নাক সিটকান্। আমার কাছে বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ নেই—সকলের মধ্যে আমি দেখি সেই এক ব্রহ্মেরই বিকাশ। যত্র জীব তত্র শিব !"

স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন জগমোহনলাল এই অতি সহজ অথচ অত্যন্ত সতেজ ও অকাট্য উত্তর পেয়ে।…না, না, এতো ভেকধারী সন্ন্যাসীর মুখের কথা নয় !… এই দৃপ্ত কণ্ঠ,—এই অকুণ্ঠ-অনমনীয় সত্যানুরাগ,—এ-কি ভেক-সর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীর ?

পরম শ্রদ্ধায় স্বামিজীকে প্রণাম করলেন জগমোহন। আরও দুই-চারিটি আলাপ-আলোচনায় বুঝলেন,—শুধু প্রাচ্য-শাস্ত্রে নয়,—পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অসাধারণ অধিকার আছে স্বামিজীর।

খেতড়ির মহারাজা মঙ্গলসিংহ জগমোহনের মুখে শুনলেন স্বামিজীর সংবাদ। আকুল হ'য়ে উঠলেন তিনি তাঁকে দর্শন করার জন্যে। রাজার একান্ত আগ্রহে মুন্সী জগমোহনলাল স্বামিজীকে নিয়ে এলেন রাজভবনে। বহু সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন খেতড়ির রাজা,—আপ্যায়িত করলেন বহু সহৃদয় শিষ্ট আপ্যায়নে। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন বিনীত কণ্ঠে,—"স্বামিজী জীবনটা কি ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামিজী রাজার দিকে,—একটি প্রশ্নেই বুঝলেন,—রাজার অন্তরের কথা। ব'ললেন ধীরকণ্ঠে,—"মহারাজ, প্রতিকূল অবস্থা-চক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশের নামই জীবন।"

—"শিক্ষা কি, স্বামিজী ?"

স্বামিজী উত্তর দিলেন,—কতকগুলি চিন্তা বা ভাবকে দৃঢ় সংস্কারের আকারে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শিক্ষা। প্রতি স্নায়ু ও শিরায় এর কার্য্য প্রকাশ পায়।"

"আর সত্য কি স্বামিজী ?"—ভরসা পেয়ে আবার রাজা প্রশ্ন তুললেন।

রাজাকে জ্ঞান-পিপাসু বুঝে স্বামিজী সানন্দেই ব'ললেন,—"মহারাজ, পূর্ণসত্য এক ও অদ্বিতীয়। তবে আমরা সাধারণতঃ যেগুলিকে সত্য মনে করি,—সেগুলি আপেক্ষিক সত্য। একটি আর একটির অপেক্ষা রাখে। পূর্ণসত্য উপলব্ধি হ'লে—আপেক্ষিক সত্যের আর কোন মূল্য থাকে না।"

রাজার মনে হ'লো,—বহুদিন পরে আজ পেয়েছেন তিনি জীবনের প্রকৃত কর্ণধার। আজকের প্রভাত-সূর্য্য সত্যই নিয়ে এসেছে তাঁর জীবনে পরম সৌভাগ্য। বিপুল আগ্রহে ও গভীর অনুরাগে তিনি স্বামিজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন,—সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলালও ছাড়লেন না সে সুবর্ণ সুযোগ!

রাজগুরু বিবেকানন্দ! আর খেতড়ির রাজাও ছিলেন প্রকৃত জিজ্ঞাসু-ভক্ত। গুরু-শিষ্যে মিলন হলো অপূর্ব্ব। কোনরূপ রাজদম্ভ নেই রাজার অন্তরে—আছে গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি,—তাঁর উপদেশের প্রতি পরম নিষ্ঠা। প্রকৃতই ধর্ম্মের পিপাসা জেগেছিল এই রাজবংশাবতংসের মধ্যে। গুরুর যাতে কোন অসুবিধা না হয়,—রাজশিষ্য তার উপযুক্ত ব্যবস্থাই করলেন স্বামিজীর বাসের জন্যে। দিনের মধ্যে বহু সময়ই রাজা গুরুর কাছে থাকেন ; করেন স্বয়ং তাঁর পরিচর্য্যা—প্রগাঢ় অনুরাগে শোনেন তাঁর মুখের অমিয়বাণী স্থিরচিত্তে।

*   *   *   *

রাজা দরবারে বসেছেন ; পাত্রমিত্র,—বিশিষ্ট প্রজাবর্গ সকলে ব'সে আছেন তাঁর চারিপাশে যথাযোগ্য আসনে। সহসা দরবার-কক্ষে প্রবেশ ক'রলেন স্বামিজী। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো সকলে।—রাজা মঙ্গলসিংহ তো একেবারে সিংহাসন থেকে নেমে এসে- নিজের হাতে পাখা নিয়ে ব্যজন করতে লাগলেন গুরুকে।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন দেখে—স্বামিজী একদিন একান্তে ডেকে ব'ললেন রাজাকে,—দেখ তুমি রাজা, সভার মধ্যে তুমি ও-রকম ক'রো না। তা'তে তোমার রাজ-গরিমার হানি হয়,—প্রজাবর্গ তোমাকে ছোট মনে করে। দরবারে তুমি থাকবে—রাজার মতই। তাদেরও রাজা—আমারও রাজা!··· এটা একান্ত দরকার।

"কিন্তু আমি যে থাকতে পারি না গুরুদেব!"—গাঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন রাজা,— "আপনাকে দেখলেই মনে হয় সেবা ক'রে ধন্য হই! আপনি আমায় এ-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

"না, জেদ ক'রো না,"—স্বামিজীর কণ্ঠে দৃঢ়তার রেশ,—"তা' হলে আর যাবো না আমি দরবারে। যেখানে যা শোভা পায়, সেইখানে—তাই দরকার।"

রাজা এতক্ষণে বুঝলেন স্বামিজী কি বলতে চান। ব'ললেন,—আচ্ছা প্রভু, তাই হবে।

রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই সুযোগে স্বামিজী তাঁর কাছে পতঞ্জলি-মহাভাষ্য আদ্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে ফেললেন। অধ্যাপনা শেষে পণ্ডিতজী মহানন্দে বললেন স্বামিজীকে—"মহারাজ, আপ্‌কো মাফিক্ বিদ্যার্থী মিল্‌না মুস্কিল হ্যায়।"

স্বামিজীকে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ব'লেই প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল রাজার অন্তরে। এতাবৎ কাল রাজা ছিলেন অপুত্রক। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হ'লো,— গুরুজী যদি প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করেন,—তিনি নিশ্চয়ই পুত্রলাভ ক'রবেন। স্পন্দিত হৃদয়ে স্বামিজীর কাছে এসে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে করুণ চক্ষে— স্বামিজী, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন আমার একটি পুত্র হয়।

সকল প্রকার কামনা-সিদ্ধির মূলে চাই বিশ্বাস!—স্বামিজী দেখলেন,—রাজার সে বিশ্বাস আছে। এবং তা অটুট! মুক্তকণ্ঠে বললেন স্বামিজী,—আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার পুত্রলাভ হবে।

'সুধার পরশ' জাগালো মহারাজার বুকে,—যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের এ বাণী অব্যর্থ! আশার আনন্দে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন রাজা স্বামিজীর চরণে।

রাজা স্বামিজীকে বিশেষভাবেই অনুরোধ করেন একদিন, এক বাঈজীর গান শুন্‌তে। স্বামিজী কিন্তু উত্তর দেন,—কতকটা উপেক্ষা, কতকটা বা ঘৃণাভ'রেই

—থাক, ও-সব ব্যাপারে আর কাজ নেই।

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজশিষ্যের একান্ত আগ্রহে তাঁকে বস্‌তেই হলো গানের আসরে। রাজার নির্দ্দেশমত স্বামিজীকে অভিবাদন জানিয়ে বাঈজী সুরু করলো গাইতে,—

প্রভু তুম মেরো অওগুণ চিত না ধরো।
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো॥.........
এক মায়া, এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞান সে ভেদ হৈ—জ্ঞানী কাঁহে ভেদ করো॥

বাঈজীর সুললিত কণ্ঠে ভগবানের সেই ভজন-গানে যেন অমরার সুধা বর্ষিত হ'লো চারিদিকে। ভাবাবেগে গায়িকার চোখেও এলো জল! ভগবানের প্রেমে তার অন্তরও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো গাইতে গাইতে। গানের মধ্য দিয়ে গায়িকা যেন স্বামিজীর কাছেও করুণ আবেদন জানালে—'সমদরশী' হয়ে আমায় বাঈজী ব'লে তুমি ঘৃণা করো না স্বামিজী! দোষ ক্ষমা ক'রে আমায় কৃপা কর।

স্বামিজীও মুগ্ধ হ'লেন সে ভজন-গানে। বুঝলেন,—বাঈজী হ'লেও তার প্রাণে ঈশ্বর-প্রেমের সাড়া জেগেছে!...কিন্তু সত্যই ত,—সন্ন্যাসী হয়েও এখনো তাঁর এ-ভেদজ্ঞান—অপরকে এই হেয়-বোধ কেন? সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতিই না তাঁর ধর্ম্ম! মনের কুণ্ঠা দূরে ঠেলে স্বামিজী ব'ললেন পরম প্রীতিভরে,—মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি প্রথমে তোমায় ঘৃণা করেছিলুম,—কিন্তু ভগবান প্রেমময়! তোমায় সত্যিই কৃপা করেছেন।

সেদিন থেকে স্বামিজীর মনের বহুদিনের একটা মোহ দূর হ'য়ে যায়। সর্ব্বশ্রেণীর নারীর প্রতি এক মহান্ ভাবে তাঁর হৃদয় উদার হয়ে ওঠে!...

খেতড়ির রাজার ইচ্ছা, স্বামিজী তাঁর ওখানেই থাকুন। কিন্তু বিশাল ভারত যাঁকে ডাকছে,—তিনি কি এক জায়গায় গণ্ডীর মধ্যে প'ড়ে থাকতে পারেন?... রাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বিবেকানন্দ বেরিয়ে প'ড়লেন আবার পর্য্যটনে।

৫০

খেতড়ি থেকে প্রথমে এলেন আজমীঢ়,—আজমীঢ় থেকে চললেন গুজরাটের দিকে। মরুময় উষর প্রদেশ,—চারিদিকে বালুকারাশি ধূ-ধূ করছে,—বারিধির বক্ষে অগাধ জলরাশির মত! কোথাও গাছপালা নেই,—ছায়া নেই,—জলেরও অভাব! তবু চলেছেন কর্ম্মবীর স্বামিজী—তাঁর অন্তর-দেবতার আহ্বানে পথের সকল কষ্ট সহ্য ক'রে। গুজরাটের সমগ্র মরুদেশ পদব্রজেই অতিক্রম ক'রে আহমদা হ'য়ে এলেন তিনি লিম্বড়ি।

লিম্বড়ির রাজা স্বামিজীর আগমন-সংবাদ পেয়ে সাগ্রহে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। দেশ-ধর্ম্ম-সমাজ-সম্বন্ধে আলাপ-পরিচয় ক'রে পেলেন যেন এক নূতন বস্তু! মুগ্ধচিত্তে নতশিরে গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। কিন্তু স্বামিজী বেশিদিন থাকলেন না সেখানে,—রাজার কাছে অবিলম্বে বিদায় নিয়ে তিনি জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন ক'রে এলেন সোমনাথের মন্দির দর্শনে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে স্বামিজীর মন চলে গেল যেন সেই দূর অতীতে—ভারতের গৌরবময় দিনে। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর নাক দিয়ে,—হায়, কালের কি দুর্ব্বার প্রভাব!

সোমনাথ থেকে এলেন তিনি পোরবন্দরে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান—এই পোরবন্দর। পোরবন্দরের রাজপথে একদিন স্বামিজীকে ভিক্ষা ক'রতে দেখে,—ভারী আশ্চর্য্য ও ক্ষুণ্ণ হলেন লিম্বড়ির মহারাজা। তিনি ব্যাকুলভাবে ছুটে এলেন স্বামিজীর কাছে—পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ব'ললেন,—"আমরা থাকতে আপনি পথে পথে ভিক্ষা করবেন স্বামিজী?"

"আমি সন্ন্যাসী।"—হেসে উত্তর দিলেন বিবেকানন্দ,—"ভিক্ষায় আমার লজ্জা কি?…তোমারই বা লজ্জিত হবার কি আছে?"

কিন্তু মহারাজ শুনলেন না তাঁর কোন কথা,—গুরুজীকে তিনি জোর ক'রে নিয়ে গেলেন তাঁর স্থানীয় প্রাসাদে।

এর পর পোরবন্দরের দেওয়ানজীর সঙ্গে হ'লো স্বামিজীর আলাপ-পরিচয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে দেওয়ানজী সানন্দে পরিচিত ক'রে দিলেন তাঁকে—পোরবন্দরের মহারাজার সঙ্গে। মহারাজাও তাঁকে গ্রহণ করলেন পরম সমাদরে। রাজপ্রাসাদেরই একটি অংশ নির্দ্দিষ্ট হলো তাঁর বাসস্থানরূপে।

জীবনের একটি মুহূর্ত্তও স্বামিজীর কাছে অবহেলার নয়। পোরবন্দরের রাজসভায় বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। এই সুযোগে স্বামিজী নানা সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে ফেললেন—পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে।

হঠাৎ রাজপ্রাসাদে একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীত এসে উপস্থিত। কিছুদিন আগে থেকে তিনিও এদিকে পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই স্বামিজী যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌লেন,—"ঐ সারদা যে, তুমি হঠাৎ এখানে কেমন ক'রে? আমি এখানে আছি জান্‌লেই বা কার কাছে?"

প্রশান্ত হাস্তে ব'ললেন ত্রিগুণাতীত,—"ভাই, তুমি এখানে আছ, তা আমি জানতাম না। লোকমুখে শুন্‌লুম,—একজন ইংরাজী-জানা খুব বড় বাঙালী পরমহংস রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। তাঁকে দেখবার আগ্রহে এখানে এসেই,—দেখি, তিনি আর অন্য কেউ নন্‌,—আমাদেরই নরেন! সত্যি বলছি ভাই,—ভারী গৌরব বোধ হচ্ছে আমার! যে-সম্মান-খ্যাতি তুমি অর্জ্জন করেছ,—গুরুভ্রাতা-হিসাবে—আমাদের সত্যিই তা' গর্ব্বের বস্তু। তবে যখন দেখাই হ'য়ে গেল,—একটা কথা বলি; রাখবে?"

—"বল না, কি কথা?"

"কতকগুলি সাধু যাবেন হিঙ্গলাজতীর্থ। তাঁদের জন্যে যদি মহারাজার কাছে—কিছু অর্থ—"

কথা শেষ হ'লো না।...'না, না, না,—বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ব'লে উঠলেন স্বামিজী—"আমি কখনও কারো কাছে কিছু চাই না,—চাইতেও পারবো না। তোমারই বা এ হীনবুদ্ধি কেন?...রাজপ্রাসাদে আছি ব'লেই কি ভিক্ষে ক'রতে হবে রাজার কাছে? আমার কাছে পাতার কুটির আর অট্টালিকা সব সমান। স্বেচ্ছায় যদি কেউ কিছু দেয় ত সে আলাদা কথা।"

ত্রিগুণাতীতের মুখে আর কথা সরলো না। স্বামিজী তাঁকে দুই-একদিন নিজের কাছে রেখে বিদায় দিলেন। যাবার সময় ব'লে দিলেন বারবার—খবরদার, আমি যে এখানে আছি,—মঠে ফিরে গিয়ে একথা বলো না কাউকে। অখণ্ডানন্দকেও আমার খবর দিয়ো না।......

পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাং ছিলেন পোরবন্দরের রাজসভায় পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য। বেদের অনুবাদ করছিলেন তিনি এই সময়,—স্বামিজী নানাভাবে সাহায্য করেন তাঁকে এই সুমহান্‌ ও সুকঠিন কার্য্যের সাধনায়। সুপণ্ডিত শঙ্কর স্বামিজীর অদ্ভুত ধীশক্তি,—প্রজ্ঞালোকে দীপ্ত প্রগাঢ় অনুভূতি—ক্ষুরধার বুদ্ধি ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান! পরম শ্রদ্ধায় স্বামিজীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন,—স্বামিজী, আমার মনে হয়, আপনি এ দেশে বেশি কিছু করতে

পারবেন না। এখনও এদেশে আপনাকে চেনবার—আপনাকে বোঝবার লোকের একান্ত অভাব। আপনি যদি পাশ্চাত্যে যান,—সেদেশের লোক আপনাকে পেয়ে মেতে উঠ্‌বে। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখবেন,—তখন এখানকার লোকও আপনার কাছে আকুল হ'য়ে ছুটে আসছে!

শেষের দিকে ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে উঠলেন তিনি,—না, স্বামিজী, যেমন ক'রেই হোক্, আপনি যান সাগর-পারে। এতবড় প্রতিভা কি গুণগ্রাহী-অভাবে চাপা থাকবে? আপনার প্রতিভা যে বিশ্বজয়ী! পাশ্চাত্যে গেলে আপনার প্রতিভার জয় তো অনিবার্য্য,—উপরন্তু ভারতমাতার মুখও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে গৌরবের দীপ্তিতে।

একান্ত অন্তরের কথা। তাই কথাগুলি বিপুল আলোড়ন তুললো স্বামিজীর হৃদয়ে। তাই কি সত্য?—ভাবতে লাগলেন তিনি,—আমি পারবো পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধাকর্ষণ করতে,—সুদূর প্রতীচ্যে জ্বলে উঠ্‌বে ভারতের গৌরব-শিখা পূর্ণ-দীপ্তিতে আমার প্রতিভায়?...সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো অসম্ভবই বা কি? বরাভয়-দাতারূপে কে ঐ দাঁড়িয়ে আছেন সতত তাঁর সম্মুখে—কার শক্তি তাঁর মধ্যে? ঐ ঐ-যে তাঁর জীবন-দেবতা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ!

—পোরবন্দরে স্বামিজী ছিলেন প্রায় সাত-আট মাস। বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানী সাধুব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল তাঁর এখানে। ফলে, বিভিন্ন বিষয়ে বহুতর আলোচনায় তাঁরও চিন্তাশক্তি যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছিল,—অন্যেও তেমনি পেয়েছিল অনেক নূতন বস্তুর সন্ধান তাঁর কাছ থেকে।

পোরবন্দর ত্যাগ ক'রে আসেন তিনি দ্বারকায়। দ্বারকা থেকে মাণ্ডবী—মাণ্ডবী থেকে খাণ্ডোয়ায়। এই খাণ্ডোয়াতেই প্রথম শোনেন,—আমেরিকার চিকাগো শহরে—সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশনের আয়োজন চলছে।

পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাং উৎসাহিত করেছিলেন তাঁকে পাশ্চাত্য দেশে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রচারে। তাঁর কথায় স্বামিজীর মনের গোপনে যে কামনা জেগে উঠেছিল, চিকাগোর সংবাদ শুনে—তা' যেন আরও গভীর ও তীব্র হয়ে উঠলো। কিন্তু এখন তিনি যে উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—তা পূর্ণ হয়নি, আর পাশ্চাত্যে যাবো বললেই যাওয়া হয় না,—তার আয়োজন আছে। ওদিকে ধর্ম্মসভার অধিবেশন কখন হবে, তাও স্থিরীকৃত নয়; সুতরাং সম্প্রতি উদ্বেলিত চিত্তকে সংযত ক'রে—মন দিলেন তিনি তাঁর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য-সম্পাদনে।

৫৯

স্বামিজী এসেছেন বোম্বাই শহরে। প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার রামদাস ছবিলদার তাঁর পরিচয় পেয়ে সমাদরে তাঁকে স্থান দিলেন নিজের বাড়ীতে। এখানে স্বামিজী প্রায় সময়ই বেদের চর্চ্চা করতেন। তা'ছাড়া, কেমন ক'রে ভারতে আবার সেই অতীতের আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা করা যায়,—অনেক সময় সে-কথাও চিন্তা করতেন নির্জ্জনে বসে। ধ্যান-ধারণাও চলতো রীতিমত।

এখানে দৈবযোগে একদিন দেখা হলো স্বামিজীর গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে। স্বামিজী তাঁকে বলেন,—শোন কালী, আমার মধ্যে এখন এমন একটা অসীম দুর্ব্বার শক্তি জমে উঠেছে,—যাতে ভয় হয় আমি যেন ফেটে পড়বো।

স্বামিজীর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যান অভেদানন্দ। অন্তরে যাঁর প্রবল আত্মিক শক্তি জেগে উঠেছে,—এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃর অধিকারী তো সে-ই ! অন্যের মুখে কেমন ক'রে ফুটবে এই অপরিম্লান দিব্য নির্ম্মল দ্যুতি ?

বোম্বাই থেকে স্বামিজী পুণা যাত্রা করেন ট্রেনে চড়ে। ট্রেনের কামরায় তাঁর আলাপ-পরিচয় হয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। মহাত্মা তিলক তাঁর আন্তর সম্পদের সন্ধান পেয়ে তাঁকে পরম আদরে নিয়ে আসেন নিজের পুণার বাড়ীতে। সৎসঙ্গের প্রভাবে সেখানে প্রায় একমাসই আটকে পড়েন স্বামিজী।

অতঃপর আসেন তিনি বেলগাঁওয়ে। এখানের সাব-ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসর হরিপদ মিত্র তাঁকে দেখেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। দেবোপম প্রশান্তমূর্ত্তি,—উদার আকাশ-তলে দু'টি জ্যোতিষ্কের মত—প্রশস্ত ললাটের নীচে দুই আয়ত নেত্র—রাজোচিত গতিভঙ্গী—পরনে গেরুয়া—মাথায় উষ্ণীষ—পায়ে মহারাষ্ট্রীয় চটি—সব মিলে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-মহিমায় প্রতিভাত হয়ে ওঠেন স্বামিজী তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে।

এখানে স্বামিজী যে কয়দিন থাকেন, প্রায়ই হরিপদবাবুর সহিত তাঁর আলোচনা হতো—ধর্ম্মের নানা সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে—ভারতের অতীত কীর্ত্তি—বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, দর্শন-বিজ্ঞান, সত্য-জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ ইত্যাদি বিষয়ে।

জিজ্ঞাসু ভক্তের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন স্বামিজী সানন্দে এবং ধৈর্য্যভরে। স্বামিজীর অন্তরস্থ প্রজ্ঞালোক ও অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় পেয়ে—হরিপদবাবু

সস্ত্রীক তাঁর শিষ্য হবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠেন আগ্রহে। তাঁদের আগ্রহ স্বামিজীকে বিচলিত করে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের দীক্ষা দান করেন তিনি। হরিপদবাবুর মনে হয়,—তাঁদের 'স্বামী-স্ত্রীর' জীবন আজ ধন্য হলো!

গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ হরিপদবাবু স্বামিজীকে কিছু অর্থ দিতে গেলে, স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করেন,—"আমি তো কারো কাছে কিছু নিই না কোনদিন,—তবে তোমার কাছেই বা নেবো কেন? বিশেষ -কোনরূপ অর্থ আমি সঙ্গে রাখি না বা সঞ্চয় করি না। তবে নিতান্ত পক্ষে,—যারা ক্ষুণ্ণ হয়,—আমি তাদের কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয় কোন একটা জিনিষ নিয়ে—তাদের মন ও মান দুইই রক্ষা করি।"

কথাটা একবর্ণও বাড়িয়ে বলেননি স্বামিজী। বহু রাজা-মহারাজা, রাণী-মহারাণী পরম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়তেন পরিব্রাজক স্বামিজীর চরণে; স্বামিজী গ্রহণ করলে— অজস্র অর্থ ঢেলে দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতেন তাঁরা। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী যুগগুরু এই অভিনব সন্ন্যাসী—দুর্জ্জয় মনোবল মাত্র সম্বল ক'রে পর্য্যটন করতেন বিশাল ভারতবর্ষে—একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করতেন না কারো কাছে। একান্ত অনুরোধে—বড় জোর কোথাও এক জোড়া খড়ম—কোথাও-বা একখানা গেরুয়া কাপড়—এই রকম কিছু একটা নিয়ে তাঁদের সাধ পূর্ণ করতেন।

পর্য্যটন-রত স্বামিজীর সঙ্গে কোলাপুরের রাণীর সাক্ষাৎ হ'লে—মহারাণী বহুমূল্য উপহার দিয়ে প্রণাম করেন তাঁকে। কিন্তু স্বামিজী অটল—অচল! সন্ন্যাসী মানুষ—এসব বহুমূল্য উপহার নিয়ে করবো কি?...সত্যই ত, ভোগবিলাসের বহু ঊর্দ্ধে যাঁর স্থান,—কি দরকারই বা তাঁর মূল্যবান দ্রব্যে? অবশেষে মহারাণীর একান্ত অনুরোধে তিনি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলেন মাত্র একখানা গেরুয়া কাপড়,—তাও সম্প্রতি পরিধেয়খানা নিতান্ত জীর্ণ হয়ে পড়েছিল ব'লেই।

"সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয়, ততই ভালো।"—ব'ললেন স্বামিজী হরিপদবাবুকে—"তোমার অন্তরের বস্তু যত ইচ্ছা আমায় দিতে পার—কিন্তু বাইরের কোন জিনিষই নয়।"

হরিপদবাবু আর কি করেন? শেষ পর্য্যন্ত অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে একখানি-মাত্র বেতের ছড়ি নিতে রাজী করালেন স্বামিজীকে। গদগদকণ্ঠে বললেন, "স্বামিজী, যে 'অমূল্য রত্ন' আপনি আমায় দিয়েছেন,—ধর্ম্মের যে নতুন আলো এনে দিয়েছেন চক্ষে,—তার তুলনায়—আমার কিছুই নেই আপনাকে দেবার। এ শুধু আত্মপ্রসাদ মাত্র।"

হরিপদবাবুর বাড়ী থেকে শীঘ্রই বিদায় নিলেন স্বামিজী। উদ্দেশ্য এবার যাবেন রামেশ্বর পর্য্যন্ত। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র সাগরপারে লঙ্কায় যাবার জন্যে এখানে সেতু নির্ম্মাণ ক'রে দেবাদিদেব মহেশ্বরের আরাধনা করেছিলেন।

হরিপদবাবু স্বামিজীর সঙ্গে এলেন স্থানীয় ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে। স্বামিজীকে বিদায় দিতে তাঁর অন্তর যেন ব্যথায় মুচড়ে পড়ছিল। চোখ দুইটিও করছিল ছল ছল! তবু বাঁধন-হারা বৈরাগীকে কে বাঁধতে যাবে? স্বামিজীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে—রেলের একখানি টিকিট তাঁর হাতে দিলেন হরিপদবাবু। তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন,—জীবনে আজ পর্য্যন্ত পায়ে লুটিয়ে কাউকে ভক্তিভরে প্রণাম করিনি, স্বামিজী! আপনাকেই প্রথম। আমার সমগ্র আত্মা আজ যেন পবিত্র হলো!

৫২

আর্য্যাবর্ত্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে।

স্বামিজী এসেছেন মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ব্যাঙ্গালোরে। এখানে আলাপ-পরিচয় হলো মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে. শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে। তরুণ সন্ন্যাসীর অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি,—সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক ক্ষমতা—বেদ-বেদান্ত-দর্শন-উপনিষদ-গীতায় অভূতপূর্ব্ব অধিকার দেখেই ভাবলেন শেষাদ্রি আয়ার,—এই সন্ন্যাসী জগতের বুকে নিঃসন্দেহে এক নূতন দিনের সাড়া জাগিয়ে তুলবেন।

মহীশূর রাজ্যের মুসলমান সভাসদ আবদুল রহমানও শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত হন,—কোরাণে স্বামিজীর অদ্ভুত জ্ঞান-গোচরের পরিচয় পেয়ে। কোরাণের আধ্যাত্মিক ভাব—যা, মুসলমান হয়েও রহমানসাহেব ভাল বুঝতে পারেননি—স্বামিজী সরল ও প্রাঞ্জলভাবেই তার অর্থ বুঝিয়ে দেন তাঁকে। স্যার শেষাদ্রির বাড়ীতেই মহীশূরের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় স্বামিজীর। এর পর মহীশূরের রাজসভা।

স্যার শেষাদ্রির সঙ্গে—পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এসে যখন দাঁড়ালেন—মহারাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সম্মুখে, —তখন মহারাজার মনে হলো,—যেন কোন দেবদূত স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে দিঙমণ্ডল আলোকিত ক'রে নেমে এসেছেন মর্ত্ত্যে!—বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল,—ত্যাগের গৌরবে মহীয়ান্—তপস্যার প্রভাবে তেজোব্যঞ্জক-গম্ভীর—স্বামিজীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সভার মধ্যে যে দেখলো,—তারই

মনে হলো,—এ যেন জগতের এক অদ্বিতীয় বিস্ময়! এক অচিন্ত্য, অকল্পিত মহাশক্তির আধার!

বিশেষ প্রীতিলাভ করলেন মহারাজা স্বামিজীর সহিত নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে। আবার কোন কোন অযৌক্তিক প্রশ্নের রূঢ় সুস্পষ্ট উত্তর পেয়েও চমকে উঠলেন তিনি,—এ সন্ন্যাসী তো—সাধারণ সন্ন্যাসী নয়!……রাজা-মহারাজার সম্মুখে—যতোই অপ্রিয় হোক্—এমন নির্ভীক দৃঢ় উত্তর দেওয়ার মত সৎসাহস যার আছে,—তার স্থান নিশ্চয়ই বহু উর্দ্ধে!

সভা ভাঙ্গলে স্বামিজীকে নিভৃতে ডেকে আর একটু পরীক্ষা করবার জন্যে মহারাজা ব'ললেন,—"স্বামিজী, আপনার এতটা স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত নয়,—অন্ততঃ রাজসভায় আমার সাম্‌নে"—প্রচ্ছন্ন কৌতুকে তাঁর অধর রঞ্জিত হয়ে উঠলো—"আপনার একটু সম্ভ্রম রেখে বলা উচিত। হাজার হোক্, আমি একটা মহারাজা! আর যে রকম স্পষ্ট কথা বলেন আপনি,—তাতে রুষ্ট হয়ে কেউ কোনদিন আপনাকে হত্যাও ক'রে বসতে পারে!"

যেন আগুন ছুটলো স্বামিজীর দৃষ্টিতে! মহারাজা যে কতকটা তামাসা ক'রে—কিছুটা বা তাঁর কল্যাণের কথা ভেবে—কথাগুলি বল্‌লেন,—স্বামিজী প্রথমটা তা বুঝতে পারলেন না। দৃপ্তকণ্ঠে গর্জ্জে উঠলেন তিনি,—"কি, প্রাণের ভয়ে আমি সত্য ব'লতে কুণ্ঠিত হব? তা'হলে আমি কেমন যোগী? আপনি মহারাজা ব'লেই কি,—আপনার মধ্যে যে গুণ নেই,—ভয়ে ভয়ে সেই গুণেরও স্তুতিগান করবো? ওটা চাটুকাররা পারে,—কিন্তু আমি সন্ন্যাসী—আমি সর্ব্ব অবস্থাতেই নির্ভীক—সত্যাশ্রয়ী!"

স্তব্ধ হ'য়ে গেল সমগ্র রাজসভা স্বামিজীর উত্তরে।—একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিবর্ণও হয়ে উঠলো সকলের মুখ!—এবার বুঝি মহারাজের মুখ থেকে একটা কঠোর দণ্ডের আদেশই বের হয়ে পড়ে! প্রবলপ্রতাপ মহীশূরের মহারাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতখানি স্পর্দ্ধা!

কিন্তু মহারাজা হতবাক ক'রে দিলেন সকলকে বিপুল বিস্ময়ে—প্রশান্ত হাস্যে নম্রভাবেই ব'ললেন,—"স্বামিজী, আপনি প্রকৃত সন্ন্যাসী,—আপনিই সত্যের সাধক—ভারতের প্রাচীন ঋষির তপোবল আপনার বক্ষে—তাঁদের জ্ঞানের আলো আপনার চক্ষে,—ভবিষ্য-ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ধারকরূপে আপনিই দাঁড়াবেন একদিন সকলের সম্মুখে—প্রদীপ্ত মহিমায়! সে দিন বোধ হয় আর দূরে নয়।"

স্বামিজী যা'তে এখানে কিছুদিন থাকেন, তার ব্যবস্থা করতে বিশেষভাবেই ব'ললেন মহারাজা দেওয়ানজীকে।

মহারাজার প্রধান অমাত্য একদিন বিস্তর অনুরোধ ক'রে নিয়ে গেলেন স্বামিজীকে বাজারে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন চেক বই। উদ্দেশ্য—স্বামিজীকে বহুমূল্যবান উপহার কিনে দেবেন তাঁরই পছন্দমত। যত টাকার দরকার হবে, তত টাকারই চেক কাটবেন। হাজার-তু'হাজারেও কুণ্ঠা নেই!

কিন্তু দাতার তো' কুণ্ঠা নেই,—গ্রহীতার আগ্রহ কই?

বাজারে গিয়ে স্বামিজী ব'ললেন—বন্ধু, আমাকে কিছু দিয়ে আপনি যদি আনন্দই পান,—তা'হলে বেশ ভাল দেখে একটা চুরুট কিনে দিন। শুনেছি, এখানকার চুরুট খুব ভাল।

কথা শুনে অমাত্যের মুখে যেন আর কথা ফোটে না! স্বামিজী বলেন কি! এইজন্যেই তিনি চেক বই নিয়ে বেরিয়েছেন নাকি?...এ কোন্ নির্লিপ্ত—নিস্পৃহ মহাপুরুষ? কোন দ্রব্যে লোভ নেই—কোন-কিছুতে আকাঙ্ক্ষা নেই,—আত্মসুখ-ভোগ-বিলাসের বহু দূরে এ কোন্ বরেণ্য দেবতা নেমে এসেছেন ভারতের কল্যাণের জন্যে?—তবু অমাত্যমশায় আবার অনুরোধ করলেন স্বামিজীকে অন্য কিছু নিতে। কিন্তু না—স্বামিজীর মুখ থেকে একবার যা বেরিয়েছে, তার কি আর নড়চড় হতে পারে?

দেওয়ানজী এক টাকায় একটি চুরুট কিনে একান্ত কুণ্ঠাভরেই দিলেন স্বামিজীর হাতে। স্বামিজী তদ্দণ্ডেই তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন মহানন্দে!

* * * *

নিজের কক্ষে একদিন স্বামিজীকে ডেকে ব'ললেন মহীশূররাজ,—"স্বামিজী, আমি আপনার কিছু কাজ করতে চাই। বলুন,—আমার দ্বারা আপনার কি সাহায্য হতে পারে?"

ভারত ও ভারতবাসীর তুঃখ-তুর্দ্দশা-বর্ণনায় কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হ'য়ে উঠলেন স্বামিজী; পরে ব'ললেন,—"মহারাজ, আমি চাই ভারতের আমূল সংস্কার—তার আর্থিক কল্যাণ। আপনি আপনার প্রজাবর্গের শিক্ষা ও আর্থিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিন—এতেই আমি সন্তুষ্ট।"—তারপর কি যেন ভেবে আবার ব'ললেন,—"শুনুন মহারাজ! ভারতের আছে দর্শন ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা,—ভারতের আছে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা—আমি চাই পাশ্চাত্যকে তাই দান ক'রে—আমরা গ্রহণ ক'রবো তার আধুনিক বিজ্ঞান-সম্পদ্। তার জন্যে মনে-প্রাণে আমি নিজেকেও প্রস্তুত করছি।"

"শুনেছি, যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বিরাট অধিবেশন শীঘ্রই হ'বে। আমি ভারতের হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে সেখানে গিয়ে বেদান্ত-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচার করতে চাই। এ কার্য্যে আপনার শুভেচ্ছাই আমার কাম্য।"

পরম আনন্দে মহীশূররাজ উৎসাহিত করলেন স্বামিজীকে তাঁর মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে। প্রয়োজন হ'লে আর্থিক সাহায্য করতেও সম্মত হলেন তিনি সানন্দে। বিদায়কালে মহারাজা স্বামিজীকে কিছু অর্থ ও অন্যান্য উপহার দিতে চাইলে স্বামিজী ব'ললেন,—"পরিব্রাজক অবস্থায় কোন দ্রব্য বা অর্থ স্পর্শ বা সঞ্চয় করা আমার নীতি-বিরুদ্ধ মহারাজ! তবে আপনি আমাকে কোন ধাতুর তৈরী নয়—এমন একটা হুঁকো দিতে পারেন? ওটা আমার ভারী কাজে লাগবে। তামাক খেতে খুবই ভালবাসি কি-না!"

কৌতুকে ঈষৎ হাস্য ক'রলেন স্বামিজী। মহারাজা এই সর্ব্বপ্রলোভন-জয়ী তরুণ সন্ন্যাসীকে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। অগত্যা একটি চন্দন কাঠের হুঁকো কিনে এনে উপহার দিলেন তাঁকে। স্বামিজী প্রীতিভরে ব'ললেন,—এই আমার অনেক!

মহারাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন তাঁকে।

প্রধান অমাত্য একতাড়া নোট স্বামিজীর সম্মুখে নামিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে, স্বামিজী ব'ললেন,—"না, না, টাকা আপনি রাখুন, যদি একান্তই কিছু দিতে চান, কোচিন পর্য্যন্ত আমাকে একটি রেলের টিকিট কিনে দিন্।"

কি আর করেন অমাত্য মশায়? শেষ পর্য্যন্ত—স্বামিজীর কোচিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট কিনে দিয়েই মনের সাধ মেটাতে হলো তাঁকে।

৫৩

স্বামিজী যেখানেই যান, সেখানেই ছুটে আসে দলে দলে মানুষ তাঁকে দেখতে,—তাঁর অমৃতময় উপদেশ-বাণী শুনে জীবন ধন্য করতে। রাজা-জমিদার-ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—কুলি-মজুর, দীন-ভিক্ষুক, অট্টালিকাবাসী থেকে পর্ণকুটিরবাসী পর্য্যন্ত—কেউই বাদ যায় না।

কত লোক যে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ ক'রে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে,—কে তার হিসাব রাখে? যে পুণ্য চরণতলে মস্তক নত করেন দণ্ডধর নরপতি,—সেই চরণেই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে দরিদ্র কুটিরবাসী।

এত সম্মান—এত গৌরব—তবু ক্ষণেকের জন্যেও স্বামিজীর মনে অহমিকা নেই,—নেই ছোটবড়, উচ্চনীচ-ভেদাভেদ জ্ঞান। তাঁর কাছে সকলে সমান,—সমান তিনি সকলেরই কাছে।

তিনি বুঝেছিলেন,—হিন্দুকে উঠতে হ'বে হিন্দুর ভাবে ভাবিত হয়েই। সকল বস্তুই দেখতে হ'বে—হিন্দুর চক্ষে; সকল কথাই শুনতে হ'বে—হিন্দুর কর্ণে। সকল কিছু গ্রহণ করতে হবে হিন্দুর প্রাণে। যারা তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসতো,—তাদের তাই ব'লতেন তিনি,—"হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়,—ডুবে দেখ, গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান কর,—তখন বুঝবে কি অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র এই হিন্দুধর্ম্ম! দেশকে বোঝ—জাতিকে বোঝ, বৈদেশিক শিক্ষার মোহ ত্যাগ কর। বোঝ, জাতীয় জীবনের গতি কোন্ দিকে,—কি তার উদ্দেশ্য,—তা'হলেই তোমার সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। বুঝতে পারবে তুমি তোমার নিজেকে! খুঁজে পাবে তোমার আপন সত্তা। ...বুঝতে পারবে হিন্দুর মহানত্ব কোথায়?"

স্বামিজী একথাও বুঝেছিলেন যে,—আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপরই ভারতের প্রাণ গ'ড়ে উঠেছে! আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রভাবের তারতম্যের ওপরই তাই প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল ভারতের উন্নতি-অবনতি,—তার কল্যাণ-অকল্যাণ।

তাই জ্ঞানার্থীদের ব'লতেন তিনি,—উদ্বুদ্ধ হও, কুসংস্কার ত্যাগ কর—হিন্দুধর্ম্ম উদার—চন্দ্রালোকের মতই নিষ্কলুষ, শুভ্র-সুন্দর ও স্নিগ্ধ। ভ্রান্তির বশে অযথা নিজেদের মধ্যে ব্যবধান ডেকে এনোনা,—তাতে শক্তিহীন হ'বে তোমরাই; কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ হ'বে তোমাদেরই। যে ধর্ম্মের বাণী,—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা!'—যে ধর্ম্মে প্রতি আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার বিকাশ,—সে-ধর্ম্মে তুমি-আমি পৃথক ক'রে ভাববার সুযোগ কোথায়? কোথায় তার সংকীর্ণতা বা ভণ্ডামির স্থান?'

উদাত্ত-মধুর স্বরে—প্রাণের আবেগে যখন ব'লতেন তিনি তাঁর অন্তরের বাণী,—তখন মনে হতো, প্রাচীন ভারতের তপোবনে—কোন ঋষি যেন গেয়ে চলেছেন সামগান! ভারতের প্রাণপুরুষ যেন বাণীরূপে মূর্ত্ত হয়ে উঠতেন স্বামিজীর কণ্ঠে।

কোচিনে দু-চা'র দিন থেকে স্বামিজী অগ্রসর হলেন রামেশ্বর-অভিমুখে।

* * * *

রামেশ্বরের পথে প'ড়লো মাদুরা। নায়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দেখলেন স্বামিজী এখানে।—রামনাদের রাজা ভাস্করবর্ম্মা সেতু-পতি এখানেই গ্রহণ করলেন স্বামিজীর শিষ্যত্ব। পরম কৃতার্থচিত্তে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন তিনি গুরুকে তাঁর যথাশক্তি কোন উপহার দিয়ে।

স্বামিজী ব'ললেন,—"তোমার যতটুকু শক্তি,—প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, তাদের আর্থিক উন্নতি, কৃষি ও শিল্পের প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখো,—তবেই আমার ঢের পাওয়া হবে।"

ভাস্করবর্ম্মা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্বামিজীর দিকে চেয়ে থেকে পরম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে প'ড়লেন তাঁর পায়ে—বুঝলেন, সর্ব্বকামনাজয়ী এ-এক অদ্ভুত গুরু! বহু ভাগ্যেই পাওয়া যায় এঁর করুণা।

এরপর স্বামিজী পৌছলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। এখানে বিশ্ব-বিখ্যাত শিব-মন্দিরের বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে অন্তর তাঁর ভ'রে উঠলো পরম আনন্দে ; কল্পনার নেত্রে যেন ফুটে উঠলো তাঁর রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্রের পূজারত পুণ্যমূর্ত্তি। এখান থেকে যাত্রা করলেন তিনি—কন্যাকুমারীর অভিমুখে।

৫৪

সারা ভারতের পথে-পথে, নগরে-নগরে, তীর্থে-তীর্থে এমনিভাবে ঘুরে-ঘুরে কতই না অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভারতকে আবিষ্কার করলেন যেন নূতনভাবে। স্বচক্ষে দেখলেন,—কি নিদারুণ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে, কি মর্ম্মান্তিক অসহায় দুর্ব্বলতায়,—কি গভীর লাঞ্ছনা ও অক্ষমতায় শীর্ণ-বিশুষ্কমুখে ভারতের কোটি কোটি লোক তিলে তিলে পলে পলে—এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে।

অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই—নেই মানুষের অধিকার-বোধ,—নেই আত্ম-চৈতন্য,—যেন কোন প্রাণহীন যন্ত্র চলছে—শুধু কলের বশে। শিরে তুলে নিচ্ছে অকাতরে শতাব্দীর অভিশাপ-ভার—প্রবলের যথেচ্ছাচারে—প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে দুর্ব্বলের বুকের হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো

হয়ে; তবু মুখে নেই প্রতিবাদের ভাষা,—অন্তরে নেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা।

একদিকে গুরুর শিক্ষা-দীক্ষা-অনুযায়ী চলেছে—নির্জ্জনে-নিভৃতে সর্ব্বত্র যোগ-সাধনার দ্বারা আত্মশক্তি অর্জ্জন,—বেদ-বেদান্ত-দর্শন-উপনিষদ-সাহিত্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-সাংখ্যের অমৃতসিন্ধুমন্থন—অন্যদিকে চলেছে অজ্ঞানতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর—ভারতের কল্যাণ-চিন্তা। কেমন ক'রে কোটি কোটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোক উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে মানুষের মত;—কেমন ক'রে অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির, নিঃশ্বাস ফেলবে তারা?

এ-যে তাঁর ঠাকুরের আদেশ,—এ-যে তাঁর অন্তর-দেবতার নিগূঢ় নির্দ্দেশ,—তাঁকে দিতে হ'বে লোকশিক্ষা,—করতে হ'বে বিশ্বজনের কল্যাণ-সাধন।...কিন্তু কোথায় তার পথের রেখা?—কতদিনে কুয়াসা ভেদ ক'রে প্রকাশ পাবে—সহস্র-কিরণ দ্বিগুণতেজে!

মন্দিরে মন্দিরে চলে দেবতার পূজা ধর্ম্মের নামে! বাদ্যভাণ্ডে, নৃত্যে-গানে, আমোদে-প্রমোদে চলেছে মহা আড়ম্বর!—কিন্তু দেবতা কোথায়? পুরোহিত ও সেবায়েৎ-সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার বিষবাষ্পে দেবতা চ'লে গেছে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। বিগ্রহের মধ্যে প্রাণ নেই,—আছে কেবল তার বাহ্যিক রূপসজ্জা! ধর্ম্মের নামে চলেছে দিকে দিকে মানুষের ওপর নিষ্করুণ নিষ্পেষণ!

কত সুবিধাবাদীর পুষ্ট দেহে মেদবৃদ্ধি হচ্ছে এইভাবে; কিন্তু চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শীর্ণ মুখে—জীর্ণ শরীরে,—শতছিন্নবাসে কত বুভুক্ষু দেবতা দ্বারে দ্বারে,—কে চায় তাদের পানে?—জীবের মধ্যে শিব কেঁদে বেড়াচ্ছেন পথে পথে—কে রাখে তাদের সন্ধান? মন্দিরে যে দেবতা সে তো প্রাণহীন পুতুল! কে ক'রবে তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা? অনাহারে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে—অবশেষে গাছের তলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সে সব দেবতা,—তাদের বুকে প্রাণ না জাগালে কি—প্রাণ জাগতে পারে ঐ মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যে?

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

কিন্তু কই সে-ঈশ্বরের পূজা? জীবকে মেরে শিবকে পূজা,—এ-যে মর্ম্মান্তিক পরিহাস!

"জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

কিন্তু কোথায় গৃহহীনকে গৃহ দিয়ে—দেবতাকে ঘরে রাখবার প্রয়াস ?

"রৌদ্রে জলে আছে সবার সাথে !
ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে।"

দেশে তো আত্মসুখে বিভোর বহু ধনী, রাজা, মহারাজা রয়েছে—কিন্তু কা'র জেগেছে সে চৈতন্য ? কে দেখছে দিব্য দৃষ্টিতে চেয়ে—তাঁরই ধূলামাখা হাত ? এমনি কত কথাই ভেবে চলেন স্বামিজী ; চলার পথিকের পায়ের সঙ্গে সঙ্গে মনও চলে অবিরাম গতিতে। যে দেবতার সন্ধানে তিনি ঘুরে বেড়ান—সে-দেবতা তো পুরাণের স্বর্গাশ্রয়ী দেবতা নয়,—কোটি কোটি নিপীড়িত, দীন, বুভুক্ষু ভারতবাসীই ফুটে উঠছে তাঁর প্রজ্ঞালোকিত দৃষ্টির সম্মুখে দেবতার রূপে !

কে দেখেছে এমন অপরূপ সন্ন্যাসী। মানব-সেবার মধ্য দিয়ে কে ভেবেছে কবে—এইভাবে বিশ্বদেবতার সেবার কথা ? "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ"—গীতার এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত ক'রে—কে ছুটেছে আর্ত্ত মানবের কল্যাণের পেছনে ? নিজের বিশাল অন্তরে সকলের ঠাঁই ক'রে দিয়ে নিজের স্থানের কথা ভাবে না,—কবে কোথায় আর দেখা গেছে,—এমন নিষ্কাম যোগী—মুক্তপুরুষ ?

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ক'রে স্বামিজী হিন্দুধর্ম্মের অধিকতর অবনতি দেখলেন,—দেখলেন তার অপরিমেয় দুর্গতি। দেখলেন উচ্চবর্ণের পদতলে পিষ্ট—তথাকথিত নীচবর্ণের পরিম্লান পাণ্ডুর মুখচ্ছবি—এখানে যেন আরও করুণ—আরও বীভৎস ! কোটি কোটি দীন-দরিদ্রের দুঃখে ব্যথায় কেঁদে উঠলো তাঁর মহান্ দরদী প্রাণ ! বহু রাজা-মহারাজার সঙ্গে মিশেছেন তিনি,—কিন্তু তা' শুধু এই নিপীড়িত দুঃস্থ আর্ত্ত মানবেরই কল্যাণ-কামনায়। রাজৈশ্বর্য্য কিংবা রাজশক্তি কোনদিন তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি,—তবে তিনি একথা বেশ বুঝেছিলেন যে,—দেশের ধন-সম্পদ্ এদেরই হাতে। দীন-দরিদ্রের কল্যাণ সাধন করতে হ'লে—এদের সঙ্গে সংযোগ রাখতেই হ'বে। বিশেষ এদের মন্ত্রী-দেওয়ান প্রভৃতিকে তো অবহেলা করাই চলে না। যেহেতু তাঁরাই রাজা-মহারাজাদের—হস্ত—চক্ষু ও কর্ণ।

পাছে রাজপ্রাসাদে থাকলে—তাঁর সঙ্গে সাধারণ গরীব-দুঃখী লোকের সাক্ষাৎ করার অসুবিধা হয়—সেইজন্য তিনি যেখানেই থাকতেন, সেইখানেই কথা থাকতো,—তাঁর সঙ্গে যে কেউ দেখা করতে চাইবে,—সেই-ই আসতে পাবে অবাধে। রাজা-মহারাজাদের এ কথা না মেনে উপায় ছিল না। অসীম আত্মিকশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী সন্ন্যাসীকে অগ্রাহ্য করবে কে ?

* * * *

স্বামিজী চলেছেন কন্যাকুমারীর পথে।

হঠাৎ পথের মাঝে দেখা একদিন স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে।

ভারতের কল্যাণচিন্তায়—ভারতবাসীর দুঃখকষ্টের প্রতিকারের উপায়-নির্দ্ধারণে মন তখন তাঁর আকুল। নিজের চিন্তা তো নেই-ই; ঈশ্বরচিন্তাও যেন কোথায় তিরোহিত হয়েছে,—অথবা রূপান্তরিত হয়েছে ভারতের মঙ্গল-চিন্তায়। কথায় কথায় তিনি ব্যক্ত ক'রে ফেললেন অভেদানন্দের কাছে—তাঁর প্রাণের বেদনা। বলতে বলতে আবেগে গাঢ় হ'য়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠ—চোখের কোণেও জমে উঠলো জল!

পরম বিস্ময়ে আভেদানন্দ চাইলেন স্বামিজীর পানে,—'কিন্তু ভাই, তোমার এই বিহ্বলতা কেন?'—যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই ব'লে উঠলেন তিনি—আমরা সন্ন্যাসী,—কে কোথায় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে,—কে শিক্ষা পাচ্ছে না,—কে নিপীড়িত হচ্ছে,—এ সব নিয়ে আমাদের চিন্তার কি দরকার? এ সব সাংসারিক মায়ায় আবদ্ধ হ'লে আমাদের ধর্ম্ম-সাধনার ব্যাঘাতই হবে যে! আমরা যোগী, সন্ন্যাসী,—আমাদের কামনা ঈশ্বরলাভ। ভারত বা ভারতবাসীর দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কতটুকু?

গম্ভীর ও আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো স্বামিজীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল। মনে হ'লো,—তাঁরা সারা অন্তর যেন বিস্ফোরণের পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরির মত ফুলে ফুলে উঠছে! অন্তরের উদ্দীপনা প্রকাশ পেলো তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠে,—"জানি না, তোমরা ধর্ম্ম ব'লতে কি বোঝ!…রসই যদি না থাকলো,—শুধু শুষ্কখোলা চুষে কি লাভ? ধর্ম্ম ত শুধু নিজে সাধন করলেই চলবে না, দেশবাসীকেও উদ্বুদ্ধ ক'রতে হ'বে ধর্ম্ম-সাধনায়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের তবেই হ'বে উন্নতি। কিন্তু ঠাকুর কি বলতেন না,—খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না? আমার কাছে তো ভাই ধর্ম্ম মানে,—দরিদ্র-অসহায়-নিঃসম্বল দুঃস্থ মানুষের সেবা করা,—তাদের নির্জ্জীব বুকে প্রাণ জাগিয়ে তোলা—তাদের জীর্ণ দেহে শক্তি দেওয়া—যুগযুগব্যাপী নির্য্যাতনে জীর্ণ তাদের পঙ্গু চিত্তের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করা। ধর্ম্ম বলতে আর অন্য কিছু বুঝি না আমি। যাঁর আশীষ-বাণীকে আমি বাস্তব রূপ দেবার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—সেই জীবত্রাতা ঠাকুরের মন্ত্রের মূলেও বুঝি-বা আছে এই কথাই। দিকে দিকে মানুষই যদি ম'রে, প'চে, হেজে যায়,—মঠ-মন্দির নিয়ে কি হবে ভাই?

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন অভেদানন্দ ধর্ম্মের এই নবতম ব্যাখ্যা শুনে! তাঁর মনে হলো,—স্বামিজীর কথাগুলির মধ্যে যেন সেই পরম কারুণিক প্রেমময়ের দুঃখহারা বাঁশরীর সুর ভেসে আসছে। বিবেকানন্দের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ! দুটি ফুটন্ত পদ্ম যেন ভাসছে—জলের তরঙ্গে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললেন তিনি,—'তুমি যে ধর্ম্মের কথা ব'লছো,—সে ধর্ম্ম আমাদের ঢের আছে। অভাব শুধু—অন্নের, বস্ত্রের আর শিক্ষার। আচ্ছা ভাই, যাও তুমি নিজের গন্তব্যপথে,—আমার যেটুকু শক্তি আছে, তাই দিয়ে আমি এই নূতন ধর্ম্মই প্রচার করবো সারা ভারতে।'

আর মুহূর্ত্ত না দাঁড়িয়ে তিনি এগিয়ে চ'ললেন সুমুখে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে তাঁর গমনের দিকে চেয়ে থেকে অভেদানন্দও ধরলেন নিজের গন্তব্যপথ।

৫৫

—কন্যাকুমারী।

জনশ্রুতি এই যে,—এখানে দেবী ভগবতী কুমারীরূপে সাধনা করেন—তাঁর চিরারাধ্য দেবতা মহেশ্বরের মিলন-আশায়। দেবাদিদেবও তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কঠোর সাধনায় বিচলিত হ'য়ে এখানে এসে মিলিত হ'তে চা'ন দেবীর সঙ্গে। কিন্তু পাছে, শঙ্কর ঐখানেই আবদ্ধ হ'য়ে অন্য সব কিছু ভুলে যান,—এই আশঙ্কায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নাকি—কি যেন একটা গোলযোগ সৃষ্টি ক'রে বাধা দেন তাঁদের মিলনে। ...

কাজেই মহেশ্বরের সঙ্গে দেবীর মিলন আর হ'লো না। তিনি কুমারীই রয়ে গেলেন। ফলে, স্থানটার নাম হ'য়ে গেল কন্যাকুমারী,—আর দেবীর কুমারী মূর্ত্তিই পূজিত হ'তে লাগলো এখানে সেই থেকে। অবশ্য এই কিংবদন্তীর মূলে কিছু সত্য আছে কি-না—বলা সুকঠিন।

স্বামিজী কন্যাকুমারীতে এসে সেখানকার পরম রমণীয়—মৌন-শান্ত—গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতায় মুগ্ধ হ'লেন একান্তভাবে। দেবীরপ্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির-সোপানে—ভারত মহাসাগরের তরঙ্গরাশি আছড়ে পড়ছে উত্তাল হ'য়ে। সম্মুখে অসীম সিন্ধু—পশ্চাতে উষ্ণ মরু উত্তুঙ্গ পর্বত—সুনিবিড় বিশাল অরণ্য; দূরে-দূরান্তরে অসংখ্য জনপদ। এই একস্থানে ব'সেই স্বামিজী যেন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবেই উপলব্ধি করলেন তাঁর অন্তরের মধ্যে।

একখানি পাথরের ওপর ব'সে ভাবতে ভাবতে স্বামিজীর হঠাৎ একবার মনে হলো,—আর কেন? এবার যোগস্থ হ'য়ে দেহত্যাগ করি। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গভীরে কে যেন ব'লে উঠলো—তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে? চেয়ে দেখ, তোমার প্রিয় জন্মভূমির পানে,—কি দুর্দ্দশার মধ্যে প'ড়ে আছে সে! শত দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত—পরাধীনতার পেষণে জর্জ্জরিত—তোমার মাতৃভূমির কথা ভুলে এরই মধ্যে দেহত্যাগ করবে তুমি? তা'হলে এসেছিলে কেন জগতে? কোটি কোটি লোকের অন্তরের ব্যথা অনুভব করেছ তুমি আপন অন্তরে,—স্মরণ কর—তাদের শীর্ণ-শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। ভেবে দেখ, এখনো তোমার কত কাজ বাকী!

চমকে উঠলেন স্বামিজী,—তাইত, আমার কাজ যে সত্যিই এখনও অনেক বাকী! জন্মভূমির কল্যাণে কি করেছি আমি?—এইত সবে সুরু,—অতীতের গৌরবময় ভারতকে—এমনি পঙ্কিলতার মধ্যে ফেলে রেখে চ'লে যাবো আমি? না-না, তা হয় না। মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নির্জ্জীবের মত প'ড়ে আছে যারা,—তাদের বুকে জাগাতে হ'বে প্রাণ,—গ'ড়ে তুলতে হ'বে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে—নিষ্কাম স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক সেবকরূপে। দূর করতে হ'বে দেশের দুঃখ—দেশের কলঙ্ক-কালিমা।

প্রস্তরাসন হ'তে চকিতে উঠে প'ড়লেন তিনি। দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির সোপান-তলে মাথা নত ক'রে প্রণাম ক'রে আবার নেমে দাঁড়ালেন কর্ম্মপথে। মন তখন তাঁর নবোৎসাহে—নবীন প্রেরণায় মেতে উঠেছে। 'ভারতের কল্যাণ —ভারতবাসীর কল্যাণ'—এই মূলমন্ত্র ঘন ঘন মন্দ্রিত হচ্ছে তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পর্য্যটনের পথ থেকে ফিরে দাঁড়ালেন ভারতের দিকে। যে ঐতিহাসিক পর্য্যটনে অনন্ত ত্যাগ—অসীম ধৈর্য্য—অপ্রমেয় সহিষ্ণুতা—সর্ব্বোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণকামনা নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন স্বামিজী ১৮৮৮ সালের শেষভাগে, তার অবসান হলো কন্যাকুমারীতে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

* * * *

রামনাদ হ'য়ে এলেন তিনি ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচারী। এখানে এসে মাদ্রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মন্মথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরিচয় হ'লো তাঁর। স্বামিজীর অসামান্য প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অপ্রমেয় জ্ঞান,—উদার মতবাদ—এখানের অনেককেই আকৃষ্ট করলো পরম শ্রদ্ধান্বিতভাবে।

প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠলো—ভারতের বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে তিনি যাবেন প্রতীচ্যে।

তাঁর অভিপ্রায় জেনে কয়েকজন গোঁড়া পণ্ডিত ব'ললেন—ম্লেচ্ছের দেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কোন সার্থকতা নেই,—আবশ্যকও নেই। বিশেষ ওদের সংস্পর্শে গেলে আমাদের জাতিনাশ হবে। কদাপি ন—কদাপি ন। এ অসঙ্গত প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

মন্মথবাবু কিন্তু বিশেষ উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন স্বামিজীর প্রস্তাবে। একান্ত আগ্রহে তিনি নিয়ে এলেন তাঁকে মাদ্রাজে।

স্বামিজী মাদ্রাজে পৌঁছতেই সেখানকার যুবকদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোক এলো স্বামিজীকে দেখতে। সার্থক হলো তাদের আগ্রহ—সার্থক হলো তাদের চক্ষু স্বামিজীকে দর্শন ক'রে। সন্ন্যাসী তারা অনেক দেখেছে—কিন্তু এমন দেবপ্রতিম—শুভ্র-সুন্দর-পুণ্যদর্শন সন্ন্যাসী যেন জীবনেও কোনদিন দেখেনি তারা।

ক্রমশঃ স্বামিজীর কাছে নানাদিক থেকে—নানা শ্রেণীর, নানা মতের লোকের সমাগম হ'তে লাগলো। চললো,—সাহিত্য-দর্শন, বেদ-বেদান্ত, ধর্ম্ম-সমাজ, স্মৃতি-শ্রুতি-সংহিতা,—কালিদাস-ভবভূতি-সেক্সপীয়র-বায়রণ,—দেশ-জাতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি কত অসংখ্য বিষয়েরই না আলোচনা! যে যা চাইলো,—সে তাই পেলো স্বামিজীর কাছে,—অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর—যতই দান করুন শেষ যেন হবে না কোনদিনই।

দেখতে দেখতে মাদ্রাজের বহু ব্যক্তি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। যুবকদের মধ্যেই তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো বেশি। আনন্দিত হ'লেন স্বামিজী এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে। যেহেতু—যুবসম্প্রদায়ই পারে নির্ভীকভাবে অসাধ্য সাধন করতে—পারে কঠিন দুর্গম বন্ধুর পথে ছুটে যেতে। স্বামিজী জানালেন শিষ্যদের,—হিন্দুধর্ম্মকে জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রচার করবার দিন এসে পড়েছে,—তাই তিনিও ব্যাকুল হয়েছেন ইউরোপ যাবার জন্যে। সর্ব্বাগ্রে অর্থ-সংগ্রহ করা দরকার,—পথের খরচ তো আছে।

স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝে—মাদ্রাজের যুবকগণ সাগ্রহ উৎসাহে ছুটলো অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায়। অবিলম্বে চাঁদা তুলে পাঁচশ' টাকা এনেও দিলে তারা স্বামিজীর হাতে। টাকাটা হাতে পেয়েই স্বামিজী কিন্তু প'ড়ে গেলেন এক দুর্বোধ্য সমস্যায়।...তাইত, এসব কি আমার নিজেরই খেয়াল: না, বিধাতার কোন ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে?...মা, মা, বিশ্বজননী, কি তোর ইচ্ছা?

অমনি তাঁর মনে হ'লো, যদি বিশ্বজননীরই ইচ্ছা হয়—তবে টাকা তো আপনাথেকেই আসবে—জননী নিজেই ব্যবস্থা করবেন তার। সংগ্রহের কি দরকার ?…টাকা পাঁচশ' শিষ্যদের ফিরিয়ে দিয়ে তিনি ব'ল্লেন—তোমরা এই টাকা সম্প্রতি গরীব-দুঃখীদের দান কর। সাগর-পারে যাওয়া আমার উচিত কি-না,—সে সম্বন্ধে আমি এখনো জগদম্বার কোন নির্দ্দেশ পাইনি। আগে আমাকে জানতে হ'বে—কি তাঁর অভিপ্রায়, কি-ই বা তাঁর আদেশ !

মুহূর্ত্তে স্বামিজী এক গভীর ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে প'ড়লেন। শিষ্যগণও অভিভূত হয়ে পড়লো তাঁর স্থির-গম্ভীর চোখমুখের দিকে চেয়ে—তারা আর বাক্য ব্যয় না ক'রে স্বামিজীর নির্দ্দেশই পালন করলো নির্ব্বিচার আনুগত্যে।

এরপর দিনের পর দিন চললো লোকশিক্ষা—আর নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণা। এদিকে হায়দরাবাদ ও সেকেন্দরাবাদের হিন্দুরা—স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্যে এক জনসভার আয়োজন ক'রে তাঁকে আহ্বান করলেন পরম সমাদরে। অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করলেন স্বামিজী—কে যেন ইঙ্গিতও করছে তাঁকে সেখানে যেতে। সুতরাং কোন দ্বিধা না ক'রে সাড়া দিলেন তিনি সে সাগ্রহ আহ্বানে।

উপযুক্ত ব্যবস্থায় স্বামিজী হায়দরাবাদ স্টেশনে পৌছতেই—সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, রাজসভাসদ, বহু বিশিষ্ট ধনী,—পণ্ডিত-জ্ঞানী, ব্যবসায়ী-আইনজীবী প্রভৃতি তাঁকে বহু সম্মানে জানালেন সম্বর্দ্ধনা। পরমহংসের বেশে দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে—স্বামিজী নামলেন একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হ'তে। শত শত সতৃষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তরুণ সন্ন্যাসীর বালসূর্য্যের মত দীপ্তিমান মুখমণ্ডলের ওপর।

রাজোচিত সম্মান পেলেন এখানে। রাজা শ্রীনিবাসরাও, মহারাজা রম্ভারাও, সামসুল-উলেমা সৈয়দ আলি, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর প্রমুখ নবাবগণ, ব্যাঙ্কার্স মতিলাল শেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত যাঁরাই ছিলেন হায়দরাবাদে—তাঁরাই নিজেদের ধন্য বোধ করলেন—স্বামিজীকে সম্মান জানিয়ে। চারিদিক হ'তে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগলো তাঁর গরিমাদীপ্ত শির লক্ষ্য ক'রে।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সকলের সম্মুখে তাঁর পাশ্চাত্য দেশে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন স্বামিজী। হায়দরাবাদ-অধিপতির শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশেদ জা—একান্ত আগ্রহে এক হাজার টাকা দিতে চাইলেন স্বামিজীকে—তাঁর অভিপ্রায়-সাধনে। মতিলাল শেঠ প্রমুখ ধনিগণও সানন্দে স্বামিজীর পাশ্চাত্য দেশে যাত্রার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে অঙ্গীকার করলেন।

কিন্তু বিনীত হাস্যে তাঁদের দান প্রত্যাখ্যান করলেন স্বামিজী। যেহেতু তিনি নিজেকে ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র অধিবাসীর প্রতিনিধি ব'লেই মনে করেন,—তাঁর ইচ্ছা নয়—রাজা-মহারাজার দান নিয়ে তিনি যাবেন পাশ্চাত্যে। দরিদ্রের যিনি প্রতিনিধি—তিনি কেন গ্রহণ করবেন ধনীর সাহায্য? যাওয়া যদি সম্ভবই হয় কোনদিন,—যাবেন তিনি দরিদ্রের অর্থে—তাদেরই কল্যাণে।

তবে একটা সৌজন্য বা শিষ্টাচার তো আছে! নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই তিনি ব'ললেন সকলকে,—আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; কিন্তু এখনও সময় হয়নি। দরকার হয়, পরে আপনাদের জানাবো।

স্বামিজীর অনন্যসুলভ গুণরাশি, তাঁর অখণ্ড আত্মবিশ্বাস, দুর্জ্জয় মনোবল,—সকল ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে প্রাগাঢ় অভিজ্ঞতা—যুগপৎ শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে তুললো হায়দরাবাদবাসীকে। কয়েক দিন ধ'রে তাঁরই কথা আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠলো সেখানে।

৫৬

স্বামিজী আবার ফিরে এসেছেন মাদ্রাজে। মার্চ্চ-এপ্রিল (১৮৯৩)—দু'মাস মাদ্রাজের যুবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁদা তুলে বেড়াতে লাগলো—স্বামিজীর আমেরিকা-যাত্রার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যে। মাদ্রাজের দ্বারে দ্বারে তো তারা ঘুরতে লাগলোই—অধিকন্তু অনেকে ছুটলো আবার মহীশূর, হায়দরাবাদ, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে।

স্বামিজী দেখলেন,—তিনি কিছু না বলতেই যুবকগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়েই আরম্ভ করেছে অর্থসংগ্রহ করতে। তবে কি এর মধ্যে মায়েরই কোন ইঙ্গিত আছে?...যাই হোক্, তিনি আর বাধা দিলেন না যুবকদের কাজে। অবশ্য তিনি যে সাধারণ ব্যক্তির দান ছাড়া—রাজা-মহারাজার বা ধনীর দান নেবেন না—এ কথা আগে থেকেই জেনেছিল যুবকগণ।

কিন্তু ঠাকুরের নির্দ্দেশ কি?—ভাবতেই মনে পড়লো স্বামিজীর শ্রীশ্রীমায়ের কথা। শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই প্রতিনিধি।...তাঁর নির্দ্দেশ সেই কল্পলোকবাসী ঠাকুরেরই নির্দ্দেশ।...স্বামিজী অনেকক্ষণ ধ'রে গভীর চিন্তা করলেন। তারপর একখানি পত্রে—শ্রীশ্রীমাকে লিখে জানালেন তাঁর অন্তরের কথা,—চেয়ে পাঠালেন তাঁর নির্দ্দেশ এবং তাঁর আশীর্ব্বাদও।

অনেক দিন পরে—পুত্রপ্রতিম 'নরেনের' পত্র পেয়ে অপার স্নেহে উথলে উঠলো শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর। ঠাকুর যে বড় ভালবাসতেন নরেনকে! নরেন যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঠাকুরেরই অভীপ্সিত কাজে। শ্রীশ্রীমা লিখলেন,—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তাতে বুঝেছি ঠাকুর তোমার কাজে সর্ব্বদাই প্রীতি পোষণ করেন—তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন,—আমার আশীর্ব্বাদও সব সময় হ'বে তোমার পরম পাথেয়,—চলার পথে তোমার রক্ষাকবচ।

আঃ—পরম আশ্বাসে ভ'রে উঠলো স্বামিজীর বুক! আর চিন্তা কি?....মায়ের নির্দ্দেশ পাওয়া গেছে। তবে তো তাঁকে যেতেই হ'বে আমেরিকা। নবীন উৎসাহ—নব সজীবতা এসে পড়লো স্বামিজীর প্রাণে। তদ্দণ্ডেই শিষ্যদের ডেকে সানন্দে জানালেন তিনি,—তাঁর শেষ সিদ্ধান্তের কথা,—হ্যাঁ, পাশ্চাত্যে গিয়ে যোগ দেবেন তিনি চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায়।

যুব-সম্প্রদায়ের উৎসাহও বেড়ে গেল দশগুণ!...বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই—আলস্য নেই—তারা নানাদিক থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ ক'রে এনে দিলে স্বামিজীর হাতে। স্বামিজীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো আশা-ভরসার দীপ্তিতে!...এ নিশ্চয়ই মায়ের ইচ্ছা,—নয় ত কোথা থেকে পেলে এই সব তরুণ যুবক এত শক্তি—এত প্রেরণা—এই দুর্নিবার আগ্রহ?

অতঃপর স্বামিজীর আমেরিকা-যাত্রার আয়োজন চ'লতে লাগলো প্রচুর উদ্যমে। যুব-শিষ্যদের যেন আহার-নিদ্রারও সময় নেই। কিন্তু সহসা খেতড়ির মহারাজার সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলাল এসে—স্রোতের উদ্দামতার মুখে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে—স্বামিজী পুত্রবর দিয়েছিলেন পরম স্নেহাস্পদ শিষ্য খেতড়ির মহারাজাকে। আজীবন ব্রহ্মচারী—নিষ্কাম যোগী—সত্যসন্ধ মহাপুরুষের সে আন্তরিক বাণী নিষ্ফল হয়নি,—মহারাজা পুত্রলাভ করেছেন। বিপুল সমারোহে রাজ্যমধ্যে চল্‌ছে তার অন্নপ্রাশন-উৎসবের রাজসিক আয়োজন—প্রজাদের ঘরে ঘরেও যেন আনন্দস্রোত ছুটে চলেছে সহস্র তরঙ্গ তুলে।

কিন্তু যাঁর বরে সম্ভব হয়েছে এই শুভদিনের সমাগম,—তাঁর উপস্থিতি ভিন্ন উৎসবের সার্থকতা কোথায়?...তাই মহারাজা অসীম ব্যস্ততায় পাঠিয়েছেন জগমোহনকে—মাদ্রাজ থেকে স্বামিজীকে খেতড়িতে নিয়ে যেতে,—কি জানি, দেরী হ'লে পাছে স্বামিজী চ'লে যান সাগরপারে!

"কিন্তু আমেরিকা-যাত্রার আয়োজন যে প্রায় সম্পূর্ণ।"—ব'ললেন স্বামিজী জগমোহনের মুখে সব কথা শুনে,—"এ সময় আর আমায় বাধা দিয়ো না।

মহৎ কোন কাজে দেরী না করাই ভাল। আমি এখান থেকেই কুমারকে আশীর্ব্বাদ করছি সর্ব্বান্তঃকরণে।"

"তা হবে না স্বামিজী!"—গভীর অনুনয় ফুটে উঠ্‌লো জগমোহনের দৃষ্টিতে,—কণ্ঠ আকুল হয়ে উঠলো তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনায়,—"আপনি দু-একদিনের জন্যেও না গেলে—মহারাজা বড়ই ব্যথা পাবেন অন্তরে!···আনন্দোৎসবের আনন্দ পরিণত হ'বে নিরানন্দে। আমি বরং কথা দিচ্ছি,—আপনি এখানকার কাজ শেষ ক'রেই চলুন,—আমরা আপনাকে বোম্বাই থেকে তুলে দেবো জাহাজে।"

কি আর করেন স্বামিজী?—জগমোহনের কাতর চোখমুখের দিকে চেয়ে,—আর মহারাজার ক্ষোভের কথা ভেবে—জগমোহনের কথামতই সব ব্যবস্থা ক'রে বিদায় নিলেন মাদ্রাজ থেকে।

* * * *

স্বামিজীকে নিয়ে যখন জগমোহনলাল রাজধানীতে পৌছিলেন,—তখন চারিদিকে যে-হর্ষ-কোলাহল প'ড়ে গেল,—তা যেন কুমারের অন্নপ্রাশনের আনন্দকেও গেল ছাপিয়ে।···স্বয়ং মহারাজার উপস্থিতিতে রাজগুরু স্বামী বিবেকানন্দকে কত বিপুলভাবেই যে সম্বর্দ্ধনা জানানো হ'লো,—লেখনীর এমন কোন শক্তি নেই—তা' বর্ণনা করে!

স্বামিজী রাজগুরু,—তাই খেতড়ির প্রত্যেকটি প্রজার চক্ষে তিনি যেন রাজার চেয়েও মহনীয়—রাজার চেয়েও বরণীয় হয়ে উঠেছেন। অবশ্য রাজাও আছেন তাঁর যথাযোগ্য সম্মানের স্থানে। এমন শ্রদ্ধাশীল প্রজাদের পেয়ে বিশেষ গৌরবই বোধ করেন মহারাজা। কয়েকটা দিন স্বামিজীর কাটলো এখানে নানা উৎসবের মধ্যেই প্রচুর আনন্দে।

অতঃপর অন্নপ্রাশনের দিন কুমারকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ ক'রে—স্বামিজী যাত্রা করলেন বোম্বাইয়ের উদ্দেশে। মহারাজা রাজধানীর থেকে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে এসে—তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন। জগমোহন এলেন স্বামিজীর সঙ্গে বোম্বাই পর্যন্ত।

বোম্বাই বাজারে জগমোহনকে পাগড়ী, আলখাল্লা প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র এবং বিদেশ-যাত্রায় অবশ্য-প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ কিনতে দেখে স্বামিজী হাঁ-হাঁ ক'রে উঠ্‌লেন,—'ওকি, ওকি, ওসব কিন্‌ছো কেন?···যেমন-তেমন একটা গেরুয়া কাপড়—আর—'

'থাক্,'—বাধা দিলেন জগমোহন মৃদু হেসে, গম্ভীরভাবে—'আপনাকে কিছু ব'লতে হ'বে না। আপনার যা' প্রয়োজন তা' আমি জানি। মহারাজার আদেশও অমান্য করবার সহাস আমার নেই। আপনি রাজগুরু,—রাজগুরুর যোগ্য বেশেই আপনাকে যেতে হবে।'

এই স্নেহের দাবী স্বামিজী অবহেলা করতে পারলেন না। জগমোহন নিজের মনের মত ক'রে স্বামিজীর পোশাক-পরিচ্ছদ করিয়ে দিয়ে প্রচুর অর্থও দিলেন তাঁর হাতে,—ব'ললেন,—"শিষ্যের ভক্তি-অর্ঘ্য গুরুর নিতে কোন দোষ নেই, এ-তো আর আপনার নিজের জন্যে নয়—বিদেশে দরকার হ'তে পারে দেশেরই কল্যাণে।"

'পেনিনসুলার' নামক ষ্টিমারের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিটও কিনে এনে স্বামিজীর হাতে দিলেন জগমোহনলাল।

বোম্বাই-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাজ যুব-সম্প্রদায়ের নেতা আলাসিঙ্গা পেরুমল। জগমোহনের সঙ্গে স্বামিজী সেখানে পৌছতেই ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন তিনি স্বামিজীকে সষ্টাঙ্গে।

গেরুয়া রঙের রেশমী পরিচ্ছদ এবং পাগড়ী পরিধান ক'রে—স্বামিজী ধীরে ধীরে উঠ্‌লেন গিয়ে জাহাজের সিঁড়িতে। আলাসিঙ্গা ও জগমোহন দু'জনেই গেলেন তাঁর সঙ্গে সিড়ি পর্য্যন্ত। সামান্য রেশমী আলখাল্লা ও পাগড়ীতেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ তরুণ সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠেছিল যেন রাজ-রাজেন্দ্রের মহিমা!

একটু পরে জাহাজের ঘণ্টা পড়লো। সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন জগমোহন ও আলাসিঙ্গা! সে বিদায়-দৃশ্য—কি করুণ—কি মহিমময়! চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো জগমোহনের,—কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো আলাসিঙ্গার! স্বামিজীর চোখদু'টিও ভ'রে এলো জলে!

বেদান্তবাদী সর্ব্ব-বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী: কিন্তু স্বামিজীর বুকে ছিল সদাজাগ্রত একটি মানুষের প্রাণ! স্বদেশ, স্বজন ছেড়ে—সাগরপারে সুদূর বিদেশে সঙ্গীহীন যাত্রার প্রাক্কালে—তাঁর সমগ্র হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠ্‌লো কি-যেন-এক অব্যক্ত ব্যথায়। মনে পড়লো তাঁর জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা ঠাকুরকে, পরম স্নেহমমতাময়ী আদ্যাশক্তি-রূপিনী শ্রীশ্রীমাকে,—স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ভুবনেশ্বরীকে। মনে পড়লো বহুদিন-ছেড়ে-আসা বরাহনগরের প্রিয় মঠ,—প্রিয় গুরুভ্রাতাগণ এবং তাদের অকৃত্রিম সারল্য ও প্রীতির কথা। ভারতের প্রতিটি প্রিয় স্থান,—প্রতিটি প্রিয় মানুষ—চোখের ওপর ফুটে উঠ্‌লো যেন তাঁর অনন্ত প্রশ্ন—অনন্ত ভাষা এবং অপরিমেয় প্রীতি নিয়ে।

মাথার ওপর অসীম অনন্ত আকাশ,—নিম্নে অতলস্পর্শী অগাধ জলরাশি,—আত্মার মধ্যে পরমাত্মার মহান্ প্রেরণা,—অন্তরে ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণেচ্ছা,—সঙ্গী নেই, সহায় নেই,—সেরূপ কোন সম্বলও নেই; নিতান্ত অপরিচিতের দেশে, নিতান্ত মনোবলের ওপর নির্ভর ক'রেই সুরু হলো স্বামিজীর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক যাত্রা।

১৮৯৩ সালের সেই শুভদিন—৩১শে মে, তাই শুধু জাতির বা ভারতের ইতিহাসে নয়—বিশ্বের ইতিহাসেও অমর হ'য়ে আছে; আর—অমর হ'য়ে আছে মাদ্রাজের সেই দেশ-প্রেমিক যুব-সম্প্রদায়—যাদের 'মহান্' অক্লান্ত প্রচেষ্টা সম্ভব ক'রে তুলেছে—ভারতের বুকে এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনের শুভ আগমন!···অসীম মহাসিন্ধু ফেনিল উচ্ছ্বাসে অশ্রান্ত গর্জ্জন করছে!—সুনীল জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে অর্ণবযান—চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে—কোথাও কূল নেই—কিনারা নেই—শুধু জল আর জল;—অনন্ত বিশাল বিশ্ব—যেন সীমাহীন জলরাশিতেই পরিপূর্ণ!

প্রথম প্রথম জাহাজের মধ্যে স্বামিজীর অসুবিধা হ'তে লাগলো খুবই। দণ্ড-কমণ্ডলু আর দু'চারখানা পুঁথি ছাড়া—অন্য কোন লট্‌বহর ছিল না তাঁর সঙ্গে কোনদিনই। কিন্তু আজ আরও বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ, বাক্সপত্র-কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে তিনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বিব্রতও হ'য়ে উঠ্‌লেন দারুণ।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রী এবং কাপ্তেনসাহেব বুঝতে পারলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর অসুবিধা। এই বালার্করুচি-সন্নিভ প্রসন্নবদন,—গৈরিক বস্ত্র-পরিহিত সন্ন্যাসীর প্রতি কয়েকজন জার্ম্মাণ যাত্রী শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লেন বিশেষভাবে। সকলে মিলেই তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন নানাকাজে। ফলে, তিনি তাঁর নূতন জীবনযাত্রায় অনেকটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন দু'চার দিনের মধ্যেই। যাত্রীদের সঙ্গে প্রায়ই গল্পগুজব ক'রে সময় কাট্‌তে লাগলো তাঁর···জাহাজ চলেছে ভারত মহাসাগর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অভিমুখে। মালয় উপদ্বীপের পেনাং-সিঙ্গাপুর হ'য়ে—জাহাজ নোঙ্গর করলো এসে হংকং বন্দরে। হংকং দেখে ভারী সন্তুষ্ট হ'লেন স্বামিজী।—জাহাজ এখানে তিন

দিন থাকবে। স্বামিজী অবহেলা করলেন না এই সুযোগ। জাহাজ থেকে নেমে দক্ষিণ-চীনের রাজধানী ক্যান্টন দেখে এলেন এই সময়ের মধ্যে।

চীনদেশের সভ্যতা ভারতের আর্য্যযুগের সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। কিন্তু হ'লে কি হবে? চীনের অবস্থা দেখে তিনি বুঝলেন,—ভারত এবং চীন—এ-দু'টি দেশ সভ্যতার দিক দিয়ে অতি প্রাচীন হ'লেও—শুধু দরিদ্রতার জন্যই—অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। বিদেশী শোষণে জর্জ্জরিত এ-দু'টি দেশের জনসাধারণ নিজেদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে এতই বিব্রত যে—এদের আর কোন উচ্চ চিন্তা—কোন উন্নতির প্রয়াস করবার অবসরই যেন নেই। দরিদ্রতার জন্যেই এরা আত্মোন্নতি,—আত্মমর্য্যাদা ভুলে প্রতিনিয়ত আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে ডেকে আনছে নিজেদের অধঃপতন—এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে।

জাপানের বন্দরে পৌছে—চারিদিকে চেয়ে স্বামিজী কিন্তু মুগ্ধ হ'লেন গভীর-ভাবে। এখানে নেমে একে একে দেখলেন তিনি—নাগাসাকি, ওসাকা, কোবি, ইয়াকোহামা, কিয়োটো, টোকিয়ো প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর নগর এবং বন্দর। প্রত্যেকটি শহর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,—রাস্তাগুলিও চমৎকার,—ঘর-বাড়ী সবই যেন যত্ন ক'রে সাজানো।

আবার জাপানের চেয়ে জাপানীদের দেখে তাঁর যেন আরও ভালো লাগলো! কেমন সব দেশপ্রেমিক, সাহসী,—কর্ম্মকুশল,—শিল্পানুরাগী। যন্ত্রশিল্পেও প্রত্যেকটি জাপানী ওস্তাদ! দেশের কল্যাণের জন্যে—জাতীয় উন্নতির কামনায় ব্যক্তিগত স্বার্থকে দূরে রেখে—চলেছে সকলে সমষ্টির পেছনে। অন্তরের উচ্ছ্বাস দমন করতে না পেরে—স্বামিজী লিখলেন মাদ্রাজের যুবক শিষ্যদের—

"তোমরা কি করছো! সারা জীবন কেবল বাজে বক্‌ছো। এস, এদের দেখে যাও; তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে—তোমাদের জাতি যায়! হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ তোমরা।—হাজার হাজার বছর ধ'রে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার ক'রে শক্তি ক্ষয় করছো, শতশত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে দ'লে পিষে নষ্ট হ'য়ে গেছে!

"কি আছে তোমাদের বল দেখি? আর তোমরা এখন করছোই বা কি?… ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এককণা মাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম—তোমরা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ,—আর তোমাদের

প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির ওপর প'ড়ে আছে। না হয়, বড় জোর একটা দুষ্ট উকিল হ'বার মতলব করছো। আবার প্রত্যেক ছেলের আশপাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও, ব'লে উচ্চ চীৎকার করছে! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে? তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো না?

"এসো, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো?—তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তা'হলে এস, আমরা ভাল হ'বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না,—অতিপ্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদে কাঁদুক,—পেছনে চেয়ো না, সাম্‌নে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান,—মনে রেখো—মানুষ চাই—পশু নয়।...যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'বে—তাদের ক্ষুধার্ত্ত বদনে অন্ন দান করবে—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ক'রবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে,—তাদের মানুষ করবার জন্যে আমরণ চেষ্টা ক'রবে!"......

ইয়োকোহামা থেকে জাহাজ চললো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপর দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। গভীর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামিজী চারিদিকে দেখতে লাগলেন,—দুর্ব্বোধ্য রহস্যপূর্ণ—মহান-গম্ভীর এক অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক দৃশ্য! দেখতে দেখতে জাহাজ এসে নোঙ্গর করলো—কানাডার বঙ্কুভার বন্দরে।

এখান থেকে চিকাগো—রেলে তিনদিনের পথ। স্বামিজী এসেছেন—এই শহরে যে ধর্ম্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হ'বে—প্রধানতঃ তারই দুর্ব্বার আকর্ষণে। বন্দরের এদিক সেদিক একটু ঘুরেফিরে দেখে তিনি যথাসময়ে উঠলেন ট্রেনে—পৌছলেন এসে তাঁর গন্তব্যস্থান—চিকাগো শহরে।

কিন্তু অপরিচিত বিদেশী সন্ন্যাসী এখানে পৌছতেই প'ড়লেন মহাবিপদে! মার্কিন জাতির মধ্যে শাদাকালোর ভেদ যে এত বেশি, সে ধারণাও তাঁর ছিল না কোনদিন। এশিয়াবাসী কালো-চামড়ার মানুষদের তারা যে পশুর মতই ঘৃণা করে,—এই রূঢ় সত্য আজ প্রকট হ'য়ে উঠ্‌লো স্বামিজীর চোখের সম্মুখে।

একে ভারতীয়—তায় মাথায় পাগ্‌ড়ি—গায়ে আলখেল্লা—পরণে গৈরিক বাস,—স্বামিজীর প্রতি এনে দিলে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ চিকাগোর লোকদের

অন্তরে। কেউ তাঁর সঙ্গে কোন কথাই বলে না,—কেউ পথ পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেয় না তাঁকে—বরং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে অস্থির ক'রে তুললো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টা এবং নানান্ অপমানজনক কথায়। বিদেশী পেয়ে কুলীমজুরেরাও তাঁকে ঠকিয়ে চার আনার জায়গায় আদায় ক'রে নিলে চার টাকা।

ছেলেরা তো একটা মজাই পেয়ে গেল! আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা যেমন পাগল দেখতে পেলে তাকে উত্ত্যক্ত ক'রে আরো পাগল ক'রে তোলে, মার্কিনী ছেলেমেয়েরা তেমনি স্বামিজীর পেছনে পেছনে হাততালি দিয়ে ছুটতে লাগলো প্রচুর রঙ্গভরে। তফাৎ এই যে—আমাদের ছেলেরা হাততালি দেয় পাগলের পেছনে—মার্কিনের শিশুরা হাততালি দিতে লাগলো,—একান্তসুস্থমস্তিষ্ক অগাধ প্রজ্ঞাবান্ স্বামিজীর পশ্চাতে। অতি উৎসাহে কেউ কেউ আবার স্বামিজীর গায়ে ঢিল ছুঁড়তেও ইতস্ততঃ ক'রলো না।

শেষ পর্য্যন্ত—স্বামিজী কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে বাঁচলেন রাস্তার উপদ্রব থেকে। কিন্তু হোটেলেই কি জায়গা পেলেন সহজে? কালো চামড়ার এবং অদ্ভুত বেশবিন্যাসের জন্যে বহু ধাক্কা খেতে হলো সেখানেও। কিন্তু তবু কি দুঃখের শেষ আছে? মার্কিনী হোটেলের খাদ্য-সরবরাহের মূল্য দেবার শক্তি একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর কোথায়? অবিলম্বেই বিবেকানন্দ বুঝলেন, অফুরন্ত বিলাস-বৈভবের লীলাস্থল—ব্যয়বহুল যুক্তরাষ্ট্রে নিঃসম্বল ভারতীয় সন্ন্যাসীর এভাবে আগমন শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়,—বিশেষ বিড়ম্বনাই বটে! কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে প্রাণের তাড়নায় তিনি এসেছেন,—আর এসেছেন মহান্ এক উদ্দেশ্য নিয়ে! সুতরাং দেখতে হ'বে তাঁকে প্রাণপণে এই অকুল পাথারে কূল কোথাও মেলে কি-না!

* * * *

বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও স্বামিজী প্রায় বার দিন কাটিয়ে ফেললেন চিকাগোতে। প্রত্যেক দিন ঘুরে ঘুরে তিনি সেখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে বেড়ালেন। তাঁর মনে হলো, পৃথিবীর যা' কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু, সবই সমাবিষ্ট হয়েছে এখানে। প্রতীচ্যের বৈভব-সম্ভার এবং সভ্যতা সত্যই ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনারও অতীত!

অত্যন্ত ব্যয়বহুলতায় স্বামিজীর সঙ্গে যে অর্থ ছিল, তা' ক্রমেই নিঃশেষ হ'তে লাগলো। এদিকে আবার মহাসভার অধিবেশনেরও তখন তিনমাস দেরী। বিশেষ ভাবনায় প'ড়লেন স্বামিজী! আজ তিনি বুঝলেন—সমুদ্র অতিক্রম

করা জাহাজে ক'রেই সম্ভব, ক্ষুদ্র ভেলায় চ'ড়ে সাগরে পাড়ি দিতে যাওয়া বাতুলতাই বটে! এক-একবার তাঁর মনে হ'তে লাগলো, মাদ্রাজের যুবকদের কথায় হঠাৎ এমনভাবে এখানে আসা উচিত হয়নি; যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা ক'রেই অগ্রসর হ'তে হ'তো তাঁকে।

কিন্তু সহজে দমবার পাত্র তো তিনি নন্! দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আবার সবলতা জাগিয়ে তুললো তাঁর অন্তরে। তিনি শুনলেন—চিকাগোর চেয়ে বোষ্টন নগরে খরচপত্র অনেক কম। তা'ছাড়া বোষ্টন শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীর একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সেখানে গেলে হয়ত তিনি কোন গুণগ্রাহীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

বোষ্টনের পথে—ট্রেনের কামরায় ভাগ্যক্রমে স্বামিজীর আলাপ-পরিচয় হ'লো এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে। বোষ্টনেরই কাছাকাছি কোন গ্রামে তাঁর বাড়ী। স্বামিজীকে আদর ক'রে নিয়ে এলেন তিনি আপন আলয়ে। অবশ্য এর মধ্যে কিছু রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল বৃদ্ধার মনে। প্রাচ্যবাসী কেমন অদ্ভুত জীব, তা' তিনি দেখাবেন বন্ধুবান্ধবদের; আর যে ধর্ম্মের প্রচারের জন্যে এসেছেন স্বামিজী, তার সম্বন্ধেও জানবেন কিছু কিছু স্বামিজীর কাছে! তবু এতে স্বামিজীর বিশেষ উপকারই হ'লো। চিকাগোয় রোজ যে এক পাউণ্ড ক'রে হোটেল খরচ পড়ছিল,—সেটা বেঁচে গেল তাঁর। আশেপাশের বহু নরনারীর সঙ্গে পরিচয়ও হ'তে লাগলো এখানে ক্রমে ক্রমে।

কিন্তু খরচের কি অন্ত আছে? সম্মুখে শীত আসছে—স্বামিজী যে পোশাকে এসেছেন,—তার দ্বারায় শীত নিবারণ অসম্ভব! চাই গরম পোশাক। বৃদ্ধার বাড়ীতে যে সব মহিলা বেড়াতে আসতেন, তাঁরা ব'ললেন—স্বামিজী, আপনি পাদ্রীদের মত কালো রঙের লম্বা জামা করিয়ে ফেলুন,—পথে-ঘাটে চলতেও ভাল, শীতও কাটবে। আপনার গেরুয়া আলখাল্লা যখন বক্তৃতা দেবেন, তখন পরবেন।

যুক্তিটা অবশ্যই গ্রহণীয়! কিন্তু টাকা? ঐ রকম একটা পোশাক করাতে খরচ যে তিনশ' টাকারও বেশি!···আবার না হলেও তো চলে না। অগত্যা তাঁকে যেতেই হ'লো দর্জ্জির দোকানে।

কিন্তু ক্রমশঃই তিনি অধীর হ'য়ে উঠলেন অর্থের চিন্তায়। এমন কি মনের অস্থিরতায় একদিন লিখেই ফেললেন এক মাদ্রাজী শিষ্যকে,—যদি সম্ভব হয়, এখানে আরও তিনমাস থাকার মত টাকা যোগাড় ক'রে পাঠাও; তা' না হ'লে অন্ততঃ সেখানে ফিরে যাবার মত খরচাও পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রো। অবশ্য আমি ঘোর আশাবাদী, সহজে ছাড়বো না,—পরম কারুণিক ভগবানের

আশ্বাসবাণীও আমি যেন মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাচ্ছি। তাঁর কৃপায় কি আলোক দেখা দেবে না গভীর অন্ধকারে ?…দেখি, শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় !

…এই সময় সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর পরিচয় হ'লো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক জি. এইচ. রাইট সাহেবের সঙ্গে। স্বামিজীর বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞান-প্রতিভা ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠলেন রাইট সাহেব। ব'ললেন প্রীতিবিহ্বল কণ্ঠে—চিকাগো ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেওয়া আপনার ন্যায় ব্যক্তিরই উচিত স্বামিজী !

"কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত মিঃ রাইট,"—ঈষৎ কুণ্ঠার হাসি হেসে জবাব দিলেন স্বামিজী,—"আমার এমন কি নিদর্শন আছে যে,—অতবড় ধর্ম্মসভায় কর্ত্তৃপক্ষ আমায় যোগ দিতে দেবেন ? তা'ছাড়া, শুনেছি নাকি হিন্দুধর্ম্মকে আমন্ত্রণ করাও হয়নি।"

পরম আশ্চর্য্যে চাইলেন রাইট সাহেব স্বামিজীর দিকে—"স্বামিজী,"—ব'ললেন তিনি গাঢ়কণ্ঠে—"আপনার মত লোককে নিদর্শন দেখাতে বলা,—আর সূর্য্যের কিরণ দেবার কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা—একই কথা। হিন্দুধর্ম্মকে আমন্ত্রণ না করার কথাটা যদি সত্য হয়—তবে তো আপনার বেশি ক'রে যাওয়া উচিত,—তাদের চোখে দৃষ্টি দেবার জন্যে।"

মিঃ রাইট তদ্দণ্ডেই একখানা পরিচয়পত্র লিখে স্বামিজীর হাতে দিলেন। ব'ললেন,—"প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-সভার সভাপতি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনি এখানা তাঁকে দেবেন।"

পরিচয়ে লিখলেন, এই হিন্দু তরুণ সন্ন্যাসী, এমন একজন জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকের জ্ঞানবিদ্যা একত্র করলেও এঁর সমান হ'বে না।

অর্থের অভাবে নানা অসুবিধার মধ্যে দিন গেলেও—কেমন ক'রে কোন্ দিক্ দিয়ে যে যোগাযোগ ঘ'টে যাচ্ছিল,—সম্মুখের বাধা স'রে যাচ্ছিল একে একে, তা' ভাবতে গিয়ে স্বামিজী নিজেই উঠছিলেন বিভ্রান্ত হ'য়ে। জীবনতরীর কর্ণধার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে তাঁর সমগ্র প্রাণ ভ'রে উঠছিল পরিপূর্ণ আশায়—অনন্ত উৎসাহে !

কিন্তু কথায় আছে—'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। মহৎ কাজের বিঘ্ন নাকি অনেক ! তাই স্বামিজীর লক্ষ্যপথেও বাধা-বিঘ্ন যেন প্রায়ই উঠ্‌তো মাথা-চাড়া দিয়ে। বোষ্টন থেকে ফিরে চিকাগোয় পৌঁছে তিনি দেখলেন, রাইট সাহেবের পরিচয়পত্রখানি কোথায় খোয়া গেছে। অনেক খুঁজেও সেটি পাওয়া গেল না। মূল্যবান্ এই পত্রখানি হারিয়ে গভীর দুঃখে এবং দুশ্চিন্তায় ভ'রে উঠলো

স্বামিজীর মন। ঐ পত্রেই লেখা ছিল—মহাসভার কার্য্যালয়ের ঠিকানা।... বিরাট শহর চিকাগো,—বিনা ঠিকানায় এখানে কোন স্থানের সন্ধান করা নিতান্তই মূঢ়তা! ধর্ম্মসভার কার্য্যালয়ের ঠিকানাই বা জানবে কে? সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁরাই হয়ত দিতে পারেন তার উদ্দেশ। কিন্তু তাঁদেরই বা সন্ধান দেয় কে? মহামুস্কিলেই প'ড়লেন স্বামিজী। পথে পথে ঘুরতে লাগলেন তিনি দিশেহারার মত।

শীতের রাত্রি! শীতও প'ড়ে গেছে দারুণ,—চারিদিক রাশি রাশি বরফে আচ্ছন্ন। অর্থাভাবে খাওয়াও হয়নি সারাদিন। শীতের প্রকোপে কন্‌কন্ ক'রে খ'সে যাচ্ছে হাত-পা—ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে সর্ব্বাঙ্গ।...এদিকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রিও হ'য়ে গেলো অনেকখানি। সর্ব্বরকমে বিপন্ন হ'য়ে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে প'ড়লেন স্বামিজী একটা হোটেলে।

কিন্তু হোটেলওয়ালা ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিলে তাঁকে নিগ্রো মনে ক'রে। হতাশ হ'য়ে আবার পথে এসে দাঁড়ালেন স্বামিজী;—ক্লান্ত-দেহ, অবশ চরণ, আর একটি পা-ও চলবার শক্তি নেই তাঁর। অসহ্য ঠাণ্ডায় দেহের সমস্ত রক্তও যেন হিম হ'য়ে গেছে—বরফের মতই জমাট কঠিন হ'য়ে উঠেছে সারা দেহ।

আর না পেরে স্বামিজী এক মাল-গুদামের কাছে ভাঙ্গা একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকে প'ড়লেন।...দুর্ব্বার শীতের রাত্রে সেই হ'লো তাঁর রাত্রির আশ্রয়। তবু কি দুর্জ্জয় মনোবল,—অনন্তশক্তি জগদীশ্বরের ওপর কি গভীর বিশ্বাস,—উদ্দেশ্যসাধনের পথে বিন্দুমাত্রও অনুৎসাহিত হ'লেন না তিনি। গুঁড়ি-সুঁড়ি মেরে—সেই বাক্সের মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন সারারাত্রি। মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হ'তে লাগলো শুধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সকল জ্বালা-জুড়ানো উদার প্রশান্ত মূর্ত্তি,—কানে বাজতে লাগলো তাঁর অভয়-বাণী,—'নরেন লোকশিক্ষা দেবে।'

সকালে উঠে বিবেকানন্দ ঘুরতে লাগলেন দ্বারে দ্বারে,—কিছু আহার্য্য ভিক্ষার আশায়। দুঃখকষ্ট যতই আসুক, বাঁচতে হ'বে তাঁকে একমুঠো খেয়ে—নিজের জন্যে নয়—পরের কল্যাণেই,—দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের জন্যে। কিন্তু হায়—আমাদের দেশে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া যেমন গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম ব'লেই গণ্য,—ওদেশে সেরূপ নয়! তার ওপর স্বামিজী বিদেশী—ভারতীয়। তাঁর দিকে চায় কে? কাজেই ভিক্ষা তো মিললোই না, উপরন্তু অপার ঘৃণায় অনেকে দ্বার থেকে তাড়িয়ে দিলে তাঁকে।...

অবসন্ন হ'য়ে ব'সে প'ড়লেন তিনি পথের ধারে। চারপাশের লোকজনকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন গভীর দুঃখে,—"ওগো,—ভিক্ষা কেউ দাও বা

না দাও—ধর্ম্ম-মহাসভার কার্য্যালয়ের পথটাও অন্ততঃ দেখিয়ে দাও দয়া ক'রে।"

সহসা—স্বামিজীর সম্মুখস্থ একখানি প্রাসাদোপম বাড়ীর দরজা খুলে গেল,—বেরিয়ে এলেন এক কুসুম-শুভ্র সৌন্দর্য্যময়ী নারী—করুণার দীপ্তিতে ঝলমল করছে যেন তাঁর প্রশান্ত আনন! ব'ললেন মধুর কণ্ঠে স্বামিজীকে লক্ষ্য ক'রে,—"মশায়, আপনি কি ধর্ম্ম-মহাসভায় প্রতিনিধি হ'য়ে এসেছেন?

দগ্ধ মরুর বক্ষে সহসা বৃষ্টিধারা বর্ষিত হ'লো। এমন সহানুভূতি-মাখা, এমন স্নিগ্ধ-মধুর স্বর এখানে এসে অবধি যেন আর শোনেননি স্বামিজী।…পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি মহিলার মুখের দিকে; শ্রদ্ধা ঘনিয়ে উঠ্‌লো তাঁর দুই বাষ্পাকুল চোখে,—"হাঁ, মা,"—গাঢ়স্বরে ব'ললেন তিনি,—"আমি ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি হ'য়েই এসেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কার্য্যালয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলে দুর্গতি ভোগ করছি।"

"আচ্ছা, আসুন আপনি আমার বাড়ীতে।"—পরম আদরে নারী তাঁকে আহ্বান করলেন। স্বামিজী কৃতজ্ঞচিত্তে চ'ললেন তাঁর পিছু পিছু।

এই মহিলা চিকাগোর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিঃ জর্জ্জ ডব্লিউ. হেলের পত্নী। বাড়ীর মধ্যে গিয়েই তিনি ভৃত্যদের আদেশ করলেন স্বামিজীর পরিচর্য্যা ক'রতে। স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাঁকে ভোজন করালেন পরম স্নেহে—গভীর মমতায়। বিশ্রামের পর স্বামিজী কিছু সুস্থ হ'লে—মিসেস হেল তাঁকে নিয়ে স্বয়ং গেলেন মহাসভার কার্য্যালয়ে। যথারীতি পরিচয়াদির পর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিনি সসম্মানে নির্ব্বাচিত হ'লেন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে। অবিলম্বে প্রাচ্যের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বামিজীর বাসস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

এর পর সাফল্য সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্রও দ্বিধা থাকলো না স্বামিজীর মনে। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো যে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান মঙ্গল-হস্ত বিস্তার ক'রে তাঁকে রক্ষা ক'রে চলেছেন। যে মহান্ উদ্দেশ্যে এসেছেন তিনি,—সেই করুণাময়ের ইচ্ছায় হয়ত তা' পূর্ণও হ'তে পারে একদিন।…

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা,—সে এক বিরাট অভাবনীয় ব্যাপার! সভার অধিবেশন হয়েছে—চিকাগোর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিল্প-প্রাসাদের (Art Institute) সুবিস্তৃত হলে (Hall of Columbus)। খ্রীষ্ট, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, য়িহুদী, কংফুছোর, শিন্তো, মহম্মদীয় ও পারসী—সমগ্র বিশ্বের এই সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়েছেন সেখানে—আপন আপন ধর্ম্মের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে।

বিশাল বিশ্বের একশত কুড়ি কোটি নরনারীর প্রতিনিধিরূপে আসন গ্রহণ করেছেন—ছয়-সাত হাজার মহা-মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। সকলের মধ্যস্থলে বহু সম্মানিত উচ্চ আসনে বসেছেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাধিনায়ক কার্ডিনাল গিবন্স। প্রধানতঃ এই সম্প্রদায়েরই প্রচেষ্টায় হয়েছে—ধর্ম্মালোচনার এই বিরাট সভার অচিন্তনীয় আয়োজন।

কার্ডিনাল গিবন্সের দক্ষিণে ও বামে প্রতীচ্যের শত শত আর্কবিশপ, ধর্ম্ম-যাজক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এবং প্রাচ্য দেশ হ'তে আগত প্রতিনিধিগণ। ভারত থেকে এসেছেন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপ মজুমদার, বোম্বায়ের নাগরকার, জৈন সমাজের বীরচাঁদ গান্ধী, থিয়সফির প্রতিনিধি অ্যানি বেশান্ত ও চক্রবর্ত্তী। হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ।....সিংহল থেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল।

বিবেকানন্দই সকলের বয়োকনিষ্ঠ। বয়স তখন তাঁর মাত্র ত্রিশ বৎসর। আজীবন ব্রহ্মচারী যোগসিদ্ধ স্বামিজীর সুগৌর দেহে উজ্জ্বল লোহিত রঙের রেশমী আংরাখা।...মাথায় গৈরিক রঙের প্রকাণ্ড রেশমী উষ্ণীষ—সেই সামান্য পোশাকে কি মহিমময়ই না দেখাচ্ছে তাঁকে!...চারিধার যেন ঝলমল ক'রে উঠছে তাঁর অঙ্গের দ্যুতিতে। প্রশান্ত সৌম্য আননের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য - আয়ত নেত্রের প্রজ্ঞা-দীপ্তদৃষ্টি—যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণী-শক্তিতে আকৃষ্ট করছে সমবেত সকলকে তাঁর দিকে।

প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হ'লো। সভাপতির নির্দ্দেশ মত একে একে বক্তারা উঠে তাঁদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁর যা' ব'লবার, ব'ল্লেন আবেগময় কণ্ঠে। মজুমদার মশায়ও ব'ললেন বেশ ভালোই—তবে চক্রবর্ত্তী ব'ললেন আরও সুন্দর। তাঁদের বক্তৃতার সময় করতালি প'ড়তে লাগলো মাঝে মাঝে। অবশ্য

তাঁদের বক্তব্য বিষয় তাঁরা আগে থেকেই গুছিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সভার মাঝে।

—কিন্তু স্বামিজী?…তাঁর প্রস্তুতিও ছিল না, আর কি ব'লবেন,—তা' ভাবেননিও একবার। ভাববার অবসরও পাননি। তা'ছাড়া মজুমদার এবং চক্রবর্ত্তী পেয়েছেন সুগমপন্থায় সহজ প্রবেশাধিকার। আর নিঃসহায় কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী স্বামিজীকে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়েছে আপন শক্তিতে। তবে প্রথমে স্বামিজী কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলেন—এখন দেখলেন, তার চেয়ে অনেক সুকঠিন।….নীরব নিশ্চলভাবে এক জায়গায় ব'সে তিনি ধ্যান ক'রতে লাগলেন,—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে—স্মরণ করতে লাগলেন বাক্যের অধীশ্বরী দেবী ভারতীকে। অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের বরাভয় ও নির্দ্দেশের।

এদিকে সভাপতি ডাঃ ব্যারোজ কয়েকজন ধর্ম্মবেত্তার বক্তৃতার পর আহ্বান ক'রলেন স্বামিজীকে,—স্বামিজী ঘাড় নেড়ে জানালেন,—এখন নয়!

সভাপতি আহ্বান করলেন তখন অন্য বক্তাকে। দু'তিন জনের পর আবার আহ্বান এলো স্বামিজীর; পূর্ব্ববৎ স্বামিজী উত্তর দিলেন—এখন নয়।….তিনি তখনও ধ্যানমগ্ন।

এরপর আরও দু'তিনবার আহ্বান ক'রে সভাপতি যখন সেই একই উত্তর পেলেন স্বামিজীর কাছ থেকে—তখন ভাবলেন, স্বামিজীর হয়ত সাহস হচ্ছে না এত বড় একটি সভায় বক্তৃতা দেবার। অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে স্বামিজীকে আবার আহ্বান ক'রে সভাপতি জানালেন,—এবার স্বামিজী না উঠলে তাঁর পক্ষে তাঁকে সময় দেওয়া অসম্ভব।

স্বামিজী বুঝলেন, আর নয়—এবার উঠতেই হবে তাঁকে। এদিকে অন্তরও তখন তাঁর ভ'রে উঠেছে পরম উপলব্ধিতে—সেই অচিন্ত্য, অনন্ত-শক্তির গভীর অনুপ্রেরণায়। মনে মনে তাঁর চরণের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বামিজী। তরুণ প্রাচ্য সন্ন্যাসীর গৈরিক-পরিহিত শান্ত-সুন্দর অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট হ'লো সহস্র সহস্র নরনারীর সাগ্রহ দৃষ্টি। সকলকে ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন জানিয়ে উদাত্ত-মধুর স্বরে আরম্ভ ক'রলেন তিনি,— "Sisters and Brothers of America!"—হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!…

যেইমাত্র এই কয়টি কথা বলা, অমনি চতুর্দ্দিক থেকে সহস্র সহস্র নরনারী বিপুল শব্দে সুরু করলো করতালি দিতে—চারিদিক থেকে উঠলো পরম উল্লাসের গভীর কল-গুঞ্জন—যেন অগাধ বারিধিবক্ষ আন্দোলিত

হ'য়ে উঠলো সহসা প্রবল বায়ুর তাড়নে! সেই করতালির উচ্চ নিনাদ আর সমবেত কণ্ঠের গভীর উল্লাসধ্বনি কিছুতেই আর থামতে চায় না!

স্বামিজী তো অবাক!—কিসের এত উল্লাস, কেন এই বিপুল উচ্ছ্বাস! এখনও পর্য্যন্ত শুধু সম্বোধন ক'রে ছুটি কথা বলা ছাড়া তিনি কিছুই বলেননি, অথচ কিসে এত লোককে মাতিয়ে তুললো প্রবল উল্লাসে?…কিন্তু কি ক'রে জানবেন তিনি, তাঁর ঐ ছু'টি কথার মধ্যে কত স্বর্গীয় সুধাই না প'ড়েছে ঝ'রে! কত বিশ্বজনীনত্ব, কি নিবিড় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বের সহিত কি প্রগাঢ় একাত্মতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে ঐ সামান্য ছু'টি কথার মধ্যে!

আবহমান কাল ধ'রে—Ladies and Gentlemen!…এই সম্বোধনই শুধু শুনে আসছে আমেরিকার নরনারী। নিতান্ত মামুলী—অন্তরের সহিত সংস্রবশূন্য—নিছক কেতা-তুরস্ত ভদ্রতা বা শিষ্টাচার ছাড়া সে আর কি!… কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে মর্ম্ম স্পর্শ করার শক্তি তার কোথায়!

কিন্তু "হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-ভগিনীগণ!"—এর মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা,—কি গভীর প্রাণের সংযোগ!…কে এই বিদেশী সন্ন্যাসী—স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মর্ত্ত্যে—কোন্ এ নর-দেবতা?—যে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না ক'রে একান্ত অকপট প্রাণে, অকুণ্ঠিতকণ্ঠে—এক অতি-অপরিচিত, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বুকে দাঁড়িয়ে তত্রস্থ কোটি কোটি অধিবাসীকে সম্বোধন ক'রতে পারে পরমাত্মীয়রূপে?—

মুহূর্ত্তে, মাত্র ছ'টি কথায় স্বামিজীর আসন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল আমেরিকা-বাসীর অন্তরের গভীরে।....

সভার নিয়ামকদের চেষ্টায় গোলমাল থামলে—স্বামিজী সুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরাজীতে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অপূর্ব্ব বাচন-ভঙ্গিমায়, অনর্গল গতিতে, অতি সংক্ষিপ্তই এক বক্তৃতা দিলেন তিনি সেদিন,—কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই কত অকথিত কথা যে তিনি শোনালেন, কত অজানাকে যে তিনি জানালেন,—ইতিহাস চিরকাল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং দেবেও অনন্তকাল ধ'রে।

সকলকে অতিক্রম ক'রে স্বামিজীর জয়ধ্বনিতেই ভ'রে উঠলো আকাশ-বাতাস। মাত্র পাচ মিনিটের মধ্যেই যেন অর্দ্ধেক পৃথিবী তাঁর অসীম শক্তির কাছে মাথা নত ক'রলো। এই কয়েকদিন আগেও চিকাগোর রাস্তায় রাস্তায়—কপর্দ্দকশূন্য যে সন্ন্যাসী লাঞ্ছিত হয়েছেন নানাভাবে,—সুসভ্য মার্কিন জাতি মানুষ ব'লেও গণ্য করেনি যাঁকে,—আজকার বক্তৃতার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে প'ড়লো দিকে-দিকে,—তাঁর প্রতিচ্ছবি পরদিন সকালেই ছাপা।

হ'য়ে বেরুলো কাগজে-কাগজে—দেওয়ালে-দেওয়ালে বিলম্বিত হ'লো প্রাচীরপত্রে।

এরপর যে কয়েকদিন অধিবেশন হ'লো, সবদিনই সেই এক অবস্থা। স্বামিজীর বাণীর প্রতিটি অক্ষর যেন মাতিয়ে তোলে প্রত্যেকটি নর-নারীর প্রাণ। বিপুল শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে সকলে ভাবে, কি অসাধারণ প্রতিভা, কি অগাধ পাণ্ডিত্য! কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে স্বামিজীর জয়গীতি! সকলেরই মুখে সেই এক নাম—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রতিমুহূর্ত্তে হাজার হাজার লোক স্বামিজীকে শুধু একবার দেখবার জন্যে ছুটে আসে অপার আগ্রহে!

স্বামিজীর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও ছিল না। কারো প্রাণে কোন আঘাত লাগে এমন একটি কথাও বলেননি তিনি;—অপর বক্তাদের মধ্যে আপন আপন ধর্ম্মকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হয়েছে,—কিন্তু উদার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বামিজী—সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন, অথচ তারস্বরে ঘোষণা করেছেন—আপন-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বেদান্তের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায়, পরমহংসদেবের পরম উপদেশের বিশ্লেষণে—উপেক্ষিত হিন্দুধর্ম্মকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন তিনি গরিমার স্বর্ণ-সিংহাসনে। সাকার-নিরাকার-ভেদে হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার করলেন তিনি এক সর্ব্বজনমর্ম্মগ্রাহী অকাট্য বিশ্লেষণ!....

* * * *

প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে স্বামিজী বলেন,—"সকল ধর্ম্মের গন্তব্য স্থান এক।... খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করতে হ'বে না; যে যেখানে আছে, সে সেইখানেই থাক্‌বে। কিন্তু প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না ক'রে উদারচিত্তে অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে হ'বে ও ক্রমশঃ উন্নত হ'তে হ'বে। উন্নতি বা বিকাশের নিয়মই এই।"

"যত মত তত পথ।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের চরণতলে ব'সে স্বামিজী শিখেছিলেন এই সমুদার বিশ্বজনীন মূল মন্ত্র। যে যে-পথেই যাক্—যাবে সকলে সেই একই জায়গায়,—পাবে সেই একই বস্তু। তফাৎ শুধু পথের—অথবা যানের।...গুরুর শিক্ষা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন স্বামিজী জগৎ-সমক্ষে, চিকাগো মহাসভায়।

স্বামিজী বলেন,—মনুষ্যমাত্রই আত্মা,—সুতরাং স্বরূপতঃ মনুষ্য ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ নাই।...সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত এবং বিশ্বপ্রসবিনী-শক্তি (Cosmic Energy) মোটের উপর হ্রাসবৃদ্ধিহীন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটি সমান্তরাল রেখার ন্যায় পাশাপাশি চলেছে।

তিনি আরও বলেন,—ধর্ম্ম কেবল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—অনুভূতি-সাপেক্ষ।…ধর্ম্মমহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখিয়ে থাকে—তবে তা' এই যে,—পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ কোন ধর্ম্মেরই নিজস্ব নয় এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই উন্নতচরিত্রের নরনারীর আবির্ভাব হয়েছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্নেও ভাবেন যে,—সকল ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হবে—শুধু তাঁর ধর্ম্মই টিকবে, তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁকে করুণার পাত্র ব'লে বিবেচনা করি।….অন্যের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্ম্মের পতাকা-শীর্ষে লিখিত হবে,—'সমর নহে—সহায়তা !…বিনাশ নহে—বরণ !…দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি !'

স্বামিজীর বক্তৃতায় আমেরিকার নরনারীর বহুদিনের ভুলভ্রান্তি কেটে যায়। ভারত ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাদের মনে,—তা' লুপ্ত হ'য়ে যায় চিরতরে। তারা বেশ বুঝতে পারে,—হিন্দুধর্ম্ম উদার—হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন ! বিশ্বভ্রাতৃত্ব—বিশ্বপ্রেম একান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে। হিন্দুধর্ম্ম কোন ধর্ম্মকে ঘৃণা করে না, বরং দু'হাত বাড়িয়ে অন্য ধর্ম্মের যা' কিছু ভাল জিনিষ বরণ ক'রতে চায় উদারভাবে। বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছে হিন্দুর বেদান্ত-ধর্ম্ম। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা !"—যেখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম মানুষমাত্রকেই ব'লেছে পাপী,—সেখানে হিন্দুধর্ম্মই আহ্বান করেছে প্রতিটি মানুষকে অমৃতের পুত্র ব'লে।

খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগীদের কণ্ঠে কিন্তু বেজে উঠ্‌লো কিছুটা নৈরাশ্যের সুর—স্বামিজীর বক্তৃতায়। পরস্পর বলাবলি ক'রতে লাগলেন তাঁরা,—'যে ভারতে জন্ম হ'য়েছে স্বামী বিবেকানন্দের,—সেই ভারতবাসীর কল্যাণে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ক'রতে পাদ্রী পাঠানো মূঢ়তা ছাড়া আর কি ?'

নিউ ইয়র্কের 'হেরাল্ড' পত্রিকাও লিখলেন,—'স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে মনে হয়,—সুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাঠানো নির্ব্বুদ্ধিতা। ধর্ম্মজগতে অন্যের কাছ থেকে কিছুই নেবার নেই ভারতের। বরং ভারতই মুক্তহস্তে দান ক'রতে পারে অপরকে। ধর্ম্মসভায় আগত ধর্ম্মবেত্তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এমনিভাবে কত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি, কত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা—কত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান—মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো স্বামিজীর প্রশংসায় এবং জয়গানে ! আমেরিকার নানা পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্বামিজীর কৃতিত্বের কথা ছড়িয়ে প'ড়লো সমগ্র বিশ্বে।

কিন্তু পরশ্রীকাতর নিন্দকের অভাব কোথায় ? দ্বেষ-হিংসা-কুটিল অন্তর যাদের, যশস্বী ব্যক্তিদের হেয় ক'রবার চেষ্টাই তো তাদের কাজ ! সেই সুদূর

বিদেশে—যেখানে লক্ষ লক্ষ বিদেশী নরনারী স্বামিজীর জয়গান ক'রতে সুরু করেছে,—সেইখানেই একজন ভারতবাসী—তিনিও ধর্ম্মসভার অন্যতম প্রতিনিধি,—স্বামিজীর কুৎসা রটনা ক'রতে লাগলেন শতমুখে।

তিনি তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে যত্রতত্র ব'লে বেড়াতে লাগলেন,—বিবেকানন্দের প্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান ভারত-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম নয়। হিন্দুরা পৌত্তলিক, জড় মূর্ত্তির উপাসক। বিবেকানন্দ হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার যে ব্যাখ্যা করেছেন,—তা' নিতান্ত অসঙ্গত! ধর্ম্মালোচনায় তাঁর অধিকারই বা কোথায়?—তিনি অতি নীচ বংশোদ্ভূত, জাতি ও সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যক্তি। তাঁর মত লোকের কথা ভারতে কেই বা শোনে?—কেই বা গ্রাহ্য করে?…তাঁকে সভাস্থলে প্রবেশের অধিকার না দেওয়াই উচিত ছিল ধর্ম্মমহাসভার।

কিন্তু মেঘের পক্ষে সূর্য্যকে ঢেকে রাখা কতক্ষণ সম্ভব?…কাপড় চাপা দিয়ে আগুনকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা যে করে সে তো মূঢ়!…তবু অপপ্রচারেরও তো একটা শক্তি আছে!…প্রথম প্রথম বিরোধী-পক্ষের কথা ধর্ম্মসভার উদ্যোক্তাগণকেও যেন একটু বিচলিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ?… অবিলম্বেই তাঁদের ভ্রম দূর হ'য়ে গেল। একটু চিন্তা ক'রতেই তারা বুঝলেন, কঠোর সাধনায় বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন ক'রে সর্ব্বজাতির উচ্চে উঠেছেন যিনি,—সেই যোগিপুরুষের আবার জাতিই বা কি, আর জাতিচ্যুতিই বা কি?…ঐ জ্বলন্ত পাবকসম প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্মান পুরুষ জন্মেছেন নীচ বংশে—এও কি সম্ভব?…যাঁর অসাধারণ প্রতিভা—ক্ষুরধার যুক্তি—অগাধ পাণ্ডিত্য—অনন্ত জ্ঞান—অতুলনীয় প্রজ্ঞা—বিশ্বের মানব-সমাজকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর দিকে—জগৎ-সবিতা সূর্য্যের মত;—তিনি সমাজচ্যুত, না সমাজের শিরোমণি? প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মধ্যে কালিমা আছে,—একথা বিশ্বাস করবে কে?…

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা স্বামিজীকে অপদস্থ ক'রতে নেমে গেল আরও নীচের ধাপে। কতকগুলি হাস্যলাস্যময়ী কলুষিত চরিত্রের সুন্দরী তরুণীকে পাঠিয়ে দিলে তারা স্বামিজীর মতিভ্রম ঘটাতে।…

কিন্তু সেই চিরব্রহ্মচর্য্যশীল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের সর্ব্বান্তর-ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলো না তারা। নিদাঘ মধ্যাহ্নের প্রখর তপনের দিকে চেয়ে চোখ যেমন ঝলসে যায়,—তেমনি হ'লো তাদেরও অবস্থা! তাদের অনুতপ্ত চিত্তে জাগলো গভীর অনুশোচনা। মনে হ'লো,—যাবজ্জীবন যে পাপ করেছে তারা—তার সবচেয়ে বেশি পাপ হয়েছে আজ এই দেবোপম মানুষের মতিভ্রম ঘটাতে এসে!…যিনি সেই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তির ছায়া দেখতেন

প্রতি নারীর মধ্যে,—স্বামিজী সেই পরমহংসদেবেরই প্রিয়তম মানস-সন্তান; তরুণীরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এলেও স্বামিজী তাদের কোনরূপ ঘৃণা বা অপমান করলেন না। বরং তাদের মাতৃসম্বোধন ক'রে—বিদায় দিলেন মধুর ভাষণে; চোখের জল ফেলতে ফেলতে—স্বামিজীর কাছে যুক্তকরে ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল তারা স্ব স্ব স্থানে।

৫৯

এর পর যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহর থেকে বক্তৃতা দেবার সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগলো স্বামিজীর কাছে। ডলারের দেশ আমেরিকা। ধনপতি কুবের যেন তাঁর ধনভাণ্ডার নিয়ে ব'সে আছেন সেখানে! ব্যবসায়ের কত পন্থাই যে আছে সেখানে, আমাদের দেশের লোক তার কিই-বা খবর রাখবে?

বক্তৃতা নিয়েও সেখানে চলে বিপুল ব্যবসায়। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও আছে তার। ভাল বক্তার বক্তৃতা শুনতে আসে অসংখ্য নরনারী,—শ্রোতারা যথেষ্ট ব্যয়ও করে।—উচ্চ মূল্যে টিকিট কিনে প্রবেশ করে তারা সভার মধ্যে। টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে বক্তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়—বাকী থাকে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে।

বিপুল আগ্রহে এক বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠান স্বামিজীর কাছে এসে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্যে রাজী ক'রে তুললো অনেক কষ্টে। স্বামিজী ভাবলেন,—যদি কয়েকটা বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর টাকা পাওয়া যায় তো মন্দ কি?—ভারতের জনকল্যাণে সে টাকা ব্যয় হ'তে পারবে। আমেরিকার টাকা ব'য়ে নিয়ে যাবেন তিনি দেশের জন্যে—দশের মঙ্গলে। চিকাগো থেকে স্বামিজী আইওয়া সিটি, ডিস্‌ময়েনিস, ইণ্ডিয়ানাপোলিশ, সেণ্টলুই, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বোষ্টন প্রভৃতি বড় বড় শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন,—প্রচার ক'রলেন ভারতের বেদান্ত-ধর্ম্ম—ঘোষণা ক'রলেন হিন্দুধর্ম্মের মহানত্ব কোথায়?—বিশ্বের সকল ধর্ম্মের লোককে ডেকে দেখালেন প্রকৃত ধর্ম্মের পথ।

সর্ব্বত্রই বিরাট জনতা—সর্ব্বত্রই বিপুল উৎসাহ,—স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা করবেন! সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র—নরনারী নির্ব্বিশেষে,—উন্মুখ হ'য়ে আছে যেন স্বামিজীর মুখের একটি কথা শোনার জন্য।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা অবশ্য তাঁর পিছনে লেগেই ছিলেন,—যেহেতু স্বামিজীর বক্তৃতায় তাঁদের স্বার্থের হানি হচ্ছিল বিশেষভাবে। স্বামিজী একদিন এক সভায় ব'ললেন খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ ক'রে,—মূর্ত্তিপূজক দরিদ্র পাপী ভারতবাসীর আত্মার

উদ্ধারের জন্যে তোমরা তো লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে ধর্ম্মযাজক পাঠাচ্ছো সেখানে,—কিন্তু ভারতবাসীর দেহে জীবনটা রক্ষা পায়,—এজন্য কিছু কি করেছ কোনদিন ? তোমরা ভারতের নগরে নগরে গ'ড়ে তুলছো গির্জ্জা,—ধর্ম্মের প্রচারের জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম আমাদের যথেষ্ট আছে,—আমরা চাইছি রুটি—তোমরা দিচ্ছ পাথর। 'হিদেন' দুর্ভিক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরেছিল না খেয়ে, তখন তোমরা করেছিলে কিছু তাদের বাঁচাবার জন্যে ? জীবনই যদি না থাকে—ধর্ম্ম নিয়ে কি হবে ?

অত্যন্ত রূঢ় হ'লেও মর্ম্মস্পর্শী এই জলন্ত সত্যকে অস্বীকার ক'রবে কে ? একটি কণ্ঠও উত্থিত হ'লো না স্বামিজীর কথার প্রতিবাদে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে—সাধারণ শ্রেণীর সংকীর্ণচিত্ত ধর্ম্মযাজকেরাই স্বামিজীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ক'রতো,—অথবা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রবার চেষ্টা ক'রতো অশেষ-বিশেষে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে যাঁরা ছিলেন উদারমনা, চিন্তাশীল ও পণ্ডিতব্যক্তি—তাঁরা স্বামিজীর বাণীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সত্যের আলোক। জড়বাদী পাশ্চাত্য—অদ্বৈতের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে অনেক কিছু যে শিক্ষা ক'রতে পারে,—একথা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন অন্তরে অন্তরে।

কাজেই স্বামিজীর প্রতি তাঁদের অন্তরে জেগে উঠেছিল পরম শ্রদ্ধানুরাগ ! এমন কি পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যাঁরা প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ,—চৈতন্যের উপাসক স্বামিজীকে তাঁরাও দেখতেন উচ্চ দৃষ্টিতে। খ্রীষ্টীয় সমাজের সংকীর্ণ-চিত্ততায় বিরক্ত হ'য়ে একদিন তাঁদেরই মধ্যে একজন ব'ললেন স্বামিজীকে,—স্বামিজী, আপনি কেন ঐ সব কুৎসা সহ্য করেছেন ? আপনি তো কাগজে কাগজে ওর বিরুদ্ধে আলোচনা করতে পারেন ? আপনার কথা কে না প্রচার করবে ?

'কি দরকার ?'—স্বামিজী উত্তর দিলেন নিস্পৃহ কণ্ঠে,—'স্বার্থরক্ষার জন্য সন্ন্যাসীর নিজের কি কিছু বলা উচিত ?…তা'ছাড়া, সত্য কতদিন গুপ্ত থাকে ? আমি যা' নই হীনচিত্ত লোকের কথায় আমি কি তাই হ'য়ে যেতে পারি কখনো ? অসম্ভব !

স্বামিজীর এই দৃঢ়তা—মিথ্যার প্রতি গভীর উপেক্ষা এবং অবহেলা দেখে—অবাক হ'য়ে গেলেন ভদ্রলোক। বুঝলেন তিনি,—বেদান্তবাদী এই হিন্দু সন্ন্যাসীর সত্যনিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস পর্ব্বতের মতই অটল।

এর পরও একদিন কোন ভক্ত ও গুণগ্রাহী স্বামিজীর কুৎসা শুনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। একান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে অনুরোধ করলেন তিনি স্বামিজীকে—আপনাকে প্রতিবাদ করতেই হ'বে স্বামিজী !…এ অসহ্য !

ধীর-প্রশান্তকণ্ঠে স্বামিজী ব'ললেন,—রাগ করছো কেন? নিন্দক ও নিন্দিত,—প্রশংসক ও প্রশংসিতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কোন ভেদ আছে?
বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন অনুরাগী-ভক্ত এই অপ্রত্যাশিত অথচ সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার মত সারগর্ভ উত্তরে। আত্মায় আত্মায় যিনি দেখছেন পরমাত্মাকে—অদ্বৈতবাদের যিনি মূর্ত্তবিগ্রহ—এ-তো সেই স্বামী বিবেকানন্দেরই উপযুক্ত কথা! জড়বাদী পাশ্চাত্যের কেউ কি একথা কল্পনাও ক'রতে পারে কোনদিন?

৬০

যুক্তরাষ্ট্রের দূর-দূরান্তর নগরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন স্বামিজী।…সম্মান সমাদরও যেমন জুটছে, আবার কোন কোন স্থানে নিগ্রহও ভোগ ক'রতে হচ্ছে তেমনি। গেরুয়া-বস্ত্র-পরিহিত…ভারতীয় সন্ন্যাসী,—হাতে সম্বলের মধ্যে এক গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ,—নিতান্ত সহজভাবে ঘুরে বেড়ান তিনি নানাস্থানে। কত জায়গায় কত বিচিত্র ধরণের মানুষের সম্মুখে যে প'ড়তে হয় তাঁকে!—কত অপ্রীতিকর ব্যবহার যে পেতে হয় শুধু তাঁর সন্ন্যাসী বেশের জন্যে—কত অবিশ্বাসী যে মাথা তুলে দাঁড়ায় তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে—তা' তিনি জানেন ভাল ক'রে।
সেদিন একটা বড় শহরে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্রাম ক'রছেন স্বামিজী,—সহসা একজন ধনী ব্যক্তি এসে ব'ললেন,—স্বামিজী, আপনি যে সব কথা প্রচার ক'রছেন,—ওর কোন অর্থ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি যে যোগ বা যোগ-শক্তির কথা ব'লছেন,—আমার তো তা' আজগুবী ব'লে মনে হচ্ছে। আত্মা-পরমাত্মা, চৈতন্যসত্তা এসবও আমি বুঝতে পারি না কিছু।
স্বামিজী বুঝলেন—জড়বাদী পাশ্চাত্য ধনীর সন্দেহ হয়েছে ভারতীয় ধর্ম্মের ওপর। তিনি তাঁকে একটি কথাও না ব'লে শুধু চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। প্রশান্ত নয়ন,—একান্ত স্বাভাবিক দৃষ্টি—তার মধ্যে কোন তীব্রতা নেই—নেই কোন ক্ষোভ বা আক্রোশের ভাব;—কিন্তু তবু সেই ধনী ভদ্র-লোকের মনে হ'তে লাগলো,—যেন স্বামিজীর দৃষ্টি তাঁর অন্তর ভেদ ক'রে মর্ম্মের পরতে পরতে যা' কিছু আছে,—সবই জেনে ফেলছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমগ্র অন্তরও যেন কি-এক বিপুল আলোড়নে আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে!—মনে হ'চ্ছে কে যেন তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌ছে—আর সেই আচ্ছন্নতার মাঝে জেগে উঠ্‌ছে এক তীব্র অস্বস্তির জ্বালা তাঁর সারাপ্রাণে!

অধৈর্য্য হ'য়ে অস্থির কণ্ঠে ব'লে উঠলেন তিনি,—"একি, একি স্বামিজী, এ আপনি কি করছেন?—আমার প্রাণ যে জ্বলে যাচ্ছে!"—ব'লতে ব'লতে তিনি স্বামিজীর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অবিলম্বে স'রে গিয়ে দাঁড়ালেন অনেকখানি দূরে! সারা মুখে চোখে তাঁর কি যেন আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠেছে তখন!

এসব শক্তি-প্রকাশের কোনদিনই পক্ষপাতী ছিলেন না স্বামিজী। বরং এগুলিকে তিনি তুচ্ছ বা যোগীর পক্ষে অযোগ্যই মনে করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইলেও—তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দৃঢ়কণ্ঠে। অলৌকিকত্ব দেখিয়ে লোকের তাক-লাগানো ব্রহ্মানন্দ-রসপিয়াসীর পক্ষে অনুচিত,—এ কথা জানতেন তিনি মনে-প্রাণে। তবু—সেই দূর বিদেশে সেরূপ সন্দেহবাদী অবিশ্বাসীর সম্মুখে প'ড়ে—কদাচিৎ তাঁকে নিতেও হ'তো যোগ-শক্তির আশ্রয়।

* * * *

স্বামিজী নেমেছেন একটা স্টেশনে। নিকটবর্ত্তী শহরে সেদিন বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু স্টেশনে নামতেই তিনি প'ড়লেন বিব্রত হয়ে!—নিগ্রো মনে ক'রে—শ্বেতাঙ্গেরা অশেষ-বিশেষে জ্বালাতন করতে লাগলো তাঁকে। কেউ বিদ্রূপ করলো,—কেউ হাতের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কেউ-বা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাঁকে: তিনি সামলে উঠলেন অনেক কষ্টে।

সভার উদ্যোক্তাদের—স্টেশন থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে স্টেশনে পৌছতে একটু দেরী হ'য়ে গিয়েছিল তাঁদের। ব্যস্তভাবে স্টেশনে পৌছতেই স্বামিজীর দুর্দ্দশা দেখে—বিস্ময়ের অবধি থাকলো না তাঁদের। মাথা তাঁদের নুয়ে প'ড়লো অপরিমেয় লজ্জায়—দারুণ ক্ষোভে।

গলায় ফুলের মালা দিয়ে স্বামিজীকে বরণ ক'রে—তাঁরা দেরীর জন্যে বার বার ক্ষমা চাইলেন স্বামিজীর কাছে। ব'ললেন অপরাধীর মত,—আচ্ছা স্বামিজী, আপনি নিজের নাম কেন বলেননি এদের কাছে—আপনার নাম শুনলে কেউ যে সাহসই করতো না—আপনাকে লাঞ্ছনা ক'রতে। বরং সকলে পায়ের ধূলো নিতে ছুটে আসতো সসম্ভ্রমে। চোখে না দেখুক,—স্বামী বিবেকানন্দকে আজ যুক্তরাষ্ট্রের অতি সাধারণ লোকও যে জানে!

কোন অনুযোগ ক'রলেন না স্বামিজী। বরং ব'ললেন প্রশান্তহাস্যে—"নিজের নামের দোহাই দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে—আমি দেখতে চাই, মানুষ

মানুষকে ঘৃণা করছে না।—তা' সে শাদা-চামড়াই হোক্,—আর কাল-চামড়াই হোক্।"

সভার উদ্যোক্তাগণের মাথা আবার নুয়ে প'ড়লো প্রগাঢ় লজ্জায়।…

সভায় বক্তৃতা দিয়ে স্বামিজী যেমনি বাইরে এসেছেন,—অমনি এক নিগ্রো কুলী সাগ্রহে এবং পরমানন্দে তাঁর করমর্দ্দন ক'রে ব'লে উঠলো,—"আমাদের মধ্যে যে আপনার মত মহাসম্মানিত এত বড় লোকের জন্ম হ'য়েছে,—এজন্যে সত্যিই আমি গৌরববোধ করছি এবং আমাদের জাতিকেও ধন্য মনে করেছি।" স্বামিজী বুঝলেন,—লোকটি আনন্দে ও গৌরবে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তাঁকে স্বজাতীয় ভেবে।…কিন্তু তিনি তার ভুল ধারণা দূর করতে চাইলেন না। কি জানি, লোকটি তাতে ব্যথা পেতে পারে।—বরং তার স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বজাতির গৌরববোধ ইত্যাদি দেখে ভারী প্রীত হ'লেন স্বামিজী। তিনি সমান আনন্দেই সেই নিগ্রো কুলীর করমর্দ্দন ক'রে ব'লে উঠলেন,—ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ! তুমি যে আমার কৃতিত্বে গৌরববোধ ক'রছ,—এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।…

*　　*　　*　　*

আরও তিন-চার মাইল দূরে সেদিন একটা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামিজী। আমেরিকার দুর্দ্দান্ত কাউবয়রা আছে সেখানে—শ্রোতাদের মধ্যে।

কথায় কথায় স্বামিজী ব'লেছিলেন একদিন,—যে ব্যক্তি বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অন্তরকে যুক্ত করতে পারে,—তার কাছে বাইরের প্রভাব ম্লান হ'য়ে যায়।

এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর মুখে একথা শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল কাউবয়রা। একটা উঁচু কাঠের মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামিজীর বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে। উদ্দেশ্য—স্বামিজীকে পরীক্ষা করা।

বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামিজী যখন আবেগে প্রায় আত্মহারা হ'য়ে উঠেছেন,—এমন সময় তাঁর মাথার ওপর এবং দুই কানের পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ ক'রে ছুটে গেল কয়েকটা বন্দুকের গুলী। এই গুলী অবশ্য ছুঁড়েছিল কাউবয়রাই। কিন্তু স্বামিজীর ভ্রূক্ষেপ নেই—কোন্ দিকে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তিনি যেন সম্পূর্ণ অচেতন—মন তাঁর একান্তভাবে বক্তৃতার ভাবের মধ্যেই সমাহিত!

এই অদ্ভুত-অসাধারণ ক্ষমতা দেখে দুর্দ্দান্ত কাউবয়দেরও বিস্ময়ের সীমা রইলো না! অন্তর তাদের উথলে উঠলো পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায়। নিজেদের ব্যবহারের

জন্য অনুতপ্ত হলো তারা,—স্বামিজীর কাছে এসে মাথা নত ক'রে ক্ষমা চাইলো সর্ব্বান্তঃকরণে।

* * * *

প্রথম প্রথম এক-একটি বক্তৃতার জন্যে বক্তৃতা কোম্পানীর কাছ থেকে স্বামিজী পেতেন ৯০০ ডলার—মানে ২,৭০০৲ টাকা। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন সাশ্চর্য্যে—টাকার অঙ্ক কমে আসছে দিনের পর দিন,—অথচ শ্রোতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। এরপর যেদিনই স্বামিজীকে দেওয়া হ'লো মাত্র ১০০ ডলার, অর্থাৎ ৬০০৲ টাকা, সেইদিনই আজীবন সত্যাশ্রয়ী স্বামিজী অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন মনে মনে। তিনি বেশ বুঝলেন,—প্রতিষ্ঠান তাঁকে এবার ফাঁকি দিতে সুরু করেছে। নচেৎ লোক বেশি হয়—অথচ অর্থের পরিমাণ কমে কেন?…ভারতে প্রচুর অর্থ নিয়ে যাবন দেশের কল্যাণে,—তাই সম্মত হয়েছিলেন তিনি বক্তৃতা দিতে,—কিন্তু এমনিভাবে তিনি নিজের—সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও—মর্য্যাদা নষ্ট করবেন কেন? কেনই-বা প্রশ্রয় দেবেন এই প্রবঞ্চনার?

বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যা-কিছু সংস্রব ছিল—এক কথায় ত্যাগ করিলেন তিনি দৃপ্ত অনমনীয়ভাবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যেরা তাঁকে অনেক বোঝালেন,—কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ স্বামিজীকে টলাবে কে?

সদস্যদের বুঝতে বাকী থাকলো না,—আর সব কিছু হ'তে পারে—কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করা যায় না……

স্বামিজী এবার যাত্রা করলেন নিউইয়র্কে।

৬১

—"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।"

জগৎময় যাঁর বাণী ছুটেছে বিদ্যুৎগতিতে,—তাঁর বিজয়বার্ত্তা কি ভারতে—তাঁর নিজের দেশে—পৌছতে বাকী আছে তখনো? সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়—সেই বিজয়বার্ত্তা তখন আমেরিকার কাগজগুলির মারফতে সাগর পার হ'য়ে বিপুল উল্লাসের আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে—ভারতের বড় বড় নগরে,—সর্ব্বত্রই চলেছে স্বামিজীকে অভিনন্দন পাঠাবার জন্যে সভা-সম্মেলনের আয়োজন।

মাদ্রাজ ও কলকাতার ত কথাই নেই,—স্বামিজীর জয়বার্ত্তা পেয়ে—অপার আনন্দে এবং অপ্রমেয় গৌরবে যেন উথলে উঠেছে এ দু'টি জায়গা! মাদ্রাজী যুবকগণের চেষ্টায় মাদ্রাজ থেকেই স্বামিজী গিয়েছিলেন সাগর-পারে।—

সেই নিঃসহায় কপর্দ্দকশূন্য ভারতীয় সন্ন্যাসী আজ বিশ্বের বরণীয়। তাঁর ধর্ম্মবিজয় আজ পাশ্চাত্যের জড়বাদী জাতিগুলিকে করেছে শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত! নবীন-আলোক-ধারায় পরিস্নাত!...মাদ্রাজের বুক যে ফুলে উঠবে গৌরবে—এ আর বিচিত্র কি?

মাদ্রাজে রাজা স্যার রামস্বামী মধুলিয়ার এবং স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে এক বিরাট অভিনন্দন-সভার আয়োজন হলো। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক যোগ দিলেন সে সভায়। সভার শেষে যথারীতি অভিনন্দন-পত্র পাঠানো হ'লো স্বামিজীকে তারাযোগে।

রামনাদ থেকে মহারাজা ভাস্কর সেতুপতি, খেতড়ির রাজা বাহাদুর রীতিমত দরবার ক'রে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দিলেন স্বামিজীকে। তা'ছাড়া, ব্যাঙ্গালোর, কুম্ভকোণ্‌ক প্রভৃতি আরও কত কত জায়গা থেকে যে স্বামিজীকে অভিনন্দন জানানো হ'লো,—তার সংখ্যা নির্ণয় করাও সুকঠিন।

আর কলকাতা?...এখানকার কথা তো বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। সভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য লুটিয়ে পড়েছে যে তরুণ প্রাচ্য সন্ন্যাসীর পায়ের তলে,—তুলে দিয়েছে তার শিরে বিজয়মুকুট: সেই সন্ন্যাসী বাঙালীর ঘরের ছেলে—কলকাতা সিমুলিয়ার দত্তবংশের সন্তান। ভুবনেশ্বরীর আদরের 'বিলে'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহের মানস-সন্তান 'নরেন'। কত ঝড়-ঝাপটা মাথায় ক'রে—কত দুর্ব্বার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে—মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে—সাত সাগর পেরিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তুলে ধরেছেন তিনি উপেক্ষিত হিন্দুধর্ম্মের শিরে—বিশ্ববিজয়ের গৌরব-পতাকা!

হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ—হিন্দুর বেদান্ত—আজ বিজয়মাল্য অর্জ্জন করেছে সুদূর পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দেরই অসাধারণ প্রতিভায়।…এ অসাধ্য-সাধন আর কে করেছে—কবে? কেই-বা ভেবেছিল,—এমন একদিন আসবে—যেদিন ভারতের এক পুরুষসিংহ পাশ্চাত্যে গিয়ে সমগ্র বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে—পরাধীন ভরতের দিকে?

সেদিন—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর—কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও টাউন হলে সমবেত হ'য়ে—বিরাট এক সভার আয়োজন করলেন স্বামিজীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন রাজা প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায়। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশপ্রেমিক বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়—'ইণ্ডিয়ান মিরর,' 'ইণ্ডিয়ান নেশন' প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকগণ এবং পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সভায় সমবেত হ'য়ে স্বামিজীর গুণাবলী কীর্ত্তন করলেন শতমুখে। প্রত্যেকের কণ্ঠ উদ্বেল হ'য়ে উঠলো অপার আনন্দে,—অপরিমেয় গৌরবে!

অভিনন্দন-পত্রে বহু কথার মধ্যে লেখা হ'লো—"যাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনি হিন্দুধর্ম্মের গৌরবধ্বজা উড্ডীন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ কষ্ট সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন… পবিত্র আর্য্যধর্ম্মকে আপনি যেভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তজ্জন্য আপনি বিশেষভাবে আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র।"

"আপনার স্বদেশীয়গণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্ম্মিগণ মনে করেন যে,—তাঁহারা যদি আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান,—তাহা হইলে তাঁহারা কর্ত্তব্যহানিজনিত গুরুতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইবেন।…ভগবান আপনার সহায় হউন।"

সভায় অসংখ্য ব্যক্তির সমবেতকণ্ঠে ঘন ঘন ধ্বনিত হ'তে লাগলো,—জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জয়! জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়! জয় হিন্দুধর্ম্মের জয়! সভা থেকে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি জন হেনরী ব্যারোজ সাহেবকেও শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে এক পত্র লেখা হ'লো।

সর্ব্বশেষে ভুবনেশ্বরীর কথা।…যে তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর—প্রদীপ্ত জ্ঞানসূর্য্যের কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্ব,—ভুবনেশ্বরী গর্ভে ধরেছেন

তাঁকে ;—পালন করেছেন তাঁর মাতৃহৃদয়ের সবটুকু পীযূষ ঢেলে দিয়ে! অন্তরের মণি-কোঠায় একান্ত সংগোপনে পোষণ করেছেন তিনি দিনের পর দিন তাঁরই কল্যাণ-কামনা। স্বামিজীর বিজয়বার্ত্তা নিয়ে কলকাতার বুকে যে আলোড়ন জাগলো,—তার বহুগুণ জাগলো ভুবনেশ্বরীর বুকে। পুত্র তার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হ'লেও বিপুল গৌরবে এবং আনন্দে তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগলো,—বিশ্বের স্বামী বিবেকানন্দ—পাশ্চাত্য-বিজয়ী বিবেকানন্দ তাঁরই বহু সাধনার—বহু সাধের 'বিলে'—তাঁরই একান্ত আদরের 'নরেন'।

স্বামিজীর মেজো এবং ছোট ভাই মহেন্দ্র এবং ভূপেন্দ্র ; এঁদের তরুণ প্রাণের আনন্দ এবং গর্ব্বেরও কি আর সীমা আছে? বিশ্বখ্যাত বিবেকানন্দ যে তাঁদেরই স্নেহময় জ্যেষ্ঠ সহোদর নরেন্দ্রনাথ। দাদা রাজা হোন, সন্ন্যাসী হোন, দূরে বা নিকটে যেখানেই থাকুন,—তবু তিনি তাঁদেরই দাদা। একই রক্ত বইছে প্রত্যেকের ধমনীতে! স্বামিজীর বিপুল খ্যাতি এক সহজাত আকর্ষণে তাদের ছু'টি তরুণ প্রাণকেও উচ্ছ্বসিত ক'রে তুললো!

* * * * * *

কলকাতা সভার অভিনন্দন-পত্রখানি পেয়ে স্বামিজী যে উত্তর দিলেন রাজা প্যারীমোহনকে,—তার মধ্যে লিখলেন,—"আমার সামান্য কার্য্যের সহৃদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি,—কোন ব্যক্তি বা জাতি অন্যান্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না···আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভেদনীতির ফলে কি অবস্থা হইয়াছে,—আমরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।'···

"আদান-প্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায়—তাহা হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে—তাহা গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।···সম্প্রসারণই জীবন—সংকোচই মৃত্যু—প্রেমই জীবন —ঘৃণাই মৃত্যু!···আমরা সেইদিন হইতেই মরিতেছি,—যেদিন হইতে আমরা অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম। সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এ মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না। যে অপরকে স্বাধীনতা দিবার জন্য প্রস্তুত নহে,—সে কি স্বাধীনতা লাভের যোগ্য?···আসুন, আমরা মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই! আমাদের অতীত মহৎ ছিল—আমি বিশ্বাস করি —ভবিষ্যৎ মহত্তর হইবে। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ রাখুন।"···

কিন্তু মহাপুরুষগণের চলার পথ এ-জগতে কোন দিনই সর্ব্বত্র কুসুমাস্তীর্ণ নয় ;—কণ্টকাকীর্ণ বহু স্থান দিয়েও চলতে হয় তাঁদের। তাঁদের মাথায় সব সময় প্রশংসার শুভ্রলাজ বা পুষ্পমাল্যই নিক্ষিপ্ত হয় না,—কুৎসার তীক্ষ্ণ শরও নিক্ষিপ্ত হয় তাঁদের ওপর নানাদিক থেকে।

তাই বিশ্ববন্দিত স্বামিজীরও কুৎসা রটনা করতে অনেকের জিহ্বা কুণ্ঠিত হয়নি,—তা' কি ওদেশে,—কি তাঁর নিজের দেশে। ভারতে যে সব পাদ্রীসাহেব ছিল,—স্বামিজীর তথা হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসায় ও জয়বার্ত্তায় গাত্রদাহ উপস্থিত হ'লো তাদের। আবার তাদের সঙ্গে যোগ দিলে—গোঁড়া হিন্দুর দল,—যাদের মতে সাগর-পারে গেলে জাতি-ধর্ম্ম সব চ'লে যায় একেবারে রসাতলে! তারা সকলে মিলে মেতে উঠলো স্বামিজীর কার্য্যের কুৎসাপূর্ণ আলোচনায়।

হিংসার সেই তীব্র বিষোদ্গারণ সহ্য হ'লো না স্বামিজীর ভক্ত বা অনুরাগীদের। তারা পত্র লিখে জানালো সব কথা স্বামিজীকে। স্বামিজী তাদের লিখলেন সান্ত্বনা দিয়ে,—

—"আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাহাই বলুক না কেন—তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের গুরুত্ব সহস্রগুণে বেশী।...চরিত্রবল, পুণ্যবল, সত্যের বল,—এগুলি থাকিলে ভয় কি? যতক্ষণ আমার এসব আছে,—ততক্ষণ তোমাদের কোন চিন্তা নাই। যদি কেহ আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করে, নিশ্চয় জানিও তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে,—ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী।"

স্বামিজীর আহার এবং আচার-বিচার সম্বন্ধেও অনেকে অনেক কুৎসা রটনা ক'রছিল। এমন কি এ-সব নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং মফঃস্বলেও প্রচারপত্র বিলি করতে ছাড়েনি তারা। মানুষের উচ্চ নিষ্কলুষ হৃদয় ও মহৎ কার্য্যের জন্য প্রশংসাবোধ না ক'রে—যারা শুধু বাইরের আচারটাকেই দেখে বড় ক'রে—তারাই জোট পাকিয়েছিল এই সব দলে। এই সব আচার-সর্ব্বস্ব হিন্দুরা একদিন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরুদ্ধেও কুৎসা রটাতে কুণ্ঠিত হয়নি। স্বামিজীর বিরোধীদলের মুখপত্র ছিল তখনকার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। কাগজখানি স্বামিজীর কাজের জন্যে গৌরববোধ না ক'রে,—তাঁকে হেয় করবারই চেষ্টা করতো অশেষ-বিশেষে।

আহার এবং আচার-বিচার সম্বন্ধে কুৎসার কথা কোন ভক্ত স্বামিজীকে লিখলে, তিনি উত্তর দেন,—কেউ যদি এখানে আমাকে গোঁড়া হিন্দুর মত খাওয়া-দাওয়া এবং আচার-বিচার ক'রে চলবার পরামর্শ দেয়, তবে তাকে ব'লো,—সে যেন একজন রাঁধুনি বামুন—আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে।

…এক কড়ার সাহায্য নেই—উপদেশ দেবার বেলায় বাহাদুর!…আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি জানি ভাল ক'রে।…কারও নির্দ্দেশ মেনে চলতে আমি বাধ্য নই।"

* * *

—বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ত্যাগ করার পর নিউইয়র্কে এসে অবধিই চলছিল এইভাবে পত্রাদির আদান-প্রদান। এখানে এসেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন স্বামিজী।.. তাঁর মুখে বেদান্তের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনে—নিউইয়র্কের বহু শিক্ষিত অভিজাত নর-নারী—স্বামিজীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে উঠেছেন গভীরভাবেই। অনেকে শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন তাঁর।

তাঁদের একান্ত অনুরোধে স্বামিজী বেদান্তের ক্লাস খুলেছেন নিউইয়র্কে। শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগিগণ যথারীতি সেখানে এসে স্বামিজীর চরণতলে ব'সে শিক্ষা ক'রছে ভারতের অধ্যাত্মবাদ।—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!…ভারতীয় সন্ন্যাসীর পাদমূলে ব'সে ঘোরতর শিক্ষা ও সভ্যতাগর্ব্বী পাশ্চাত্য ছাত্রছাত্রীগণ নিরভিমানচিত্তে শিক্ষা ক'রছে ধর্ম্মতত্ত্ব;—অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে যেন আলোর দিকে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তারা!

স্বামিজী সাধারণতঃ শিক্ষা দিতেন—রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। তিনি ভক্ত ও শিষ্যদের এই কথাই বোঝাতে চাইতেন বিশেষভাবে,—ধর্ম্ম একটি বিশ্বাসমাত্র নয়—গভীর অনুভূতির বিষয়। শিষ্যদের ধ্যান ও যোগাভ্যাসের ওপরও জোর দিতেন তিনি।…

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নদনদীসকল ভিন্ন ভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে ব'য়ে যায়, রুচির বৈচিত্র্যের জন্যে সরল—কুটিল নানাপথগামী মনুষ্যেরও তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।

এই শ্লোকটি আজীবন বিশেষ প্রিয় ছিল স্বামিজীর। প্রায় প্রত্যহই এটি আবৃত্তি করতেন মনে মনে। শিষ্যশিষ্যাদেরও তিনি উপদেশ দিতেন, শ্লোকটি প্রত্যহ আবৃত্তি করার অভ্যাস করতে।…এমন কি—ধর্ম্মসভার প্রথম দিনের বক্তৃতার মধ্যেও শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন প্রগাঢ়কণ্ঠে। সেদিনের সেই স্বল্পপরিসর, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মর্ম্মগত ব্যাপক সুরের প্রতিধ্বনি তুলেই ব'লতেন তিনি ছাত্রছাত্রীদের,—"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা—নিষ্ঠুর হিংস্রতায় মানব সভ্যতা উৎসন্ন দিয়েছে। হে আমার প্রিয় শিষ্যশিষ্যাগণ, তোমরা চিরতরে তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াও।…আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি,—

ওদের মৃত্যুকাল আসন্ন!"—বলতে বলতে আবেগে উচ্ছল হ'য়ে উঠতো তাঁর কণ্ঠস্বর!

আচার্য্যের প্রত্যেকটি উপদেশই শিক্ষার্থীরা শুনে যেতেন বর্ণে বর্ণে—মনে প্রাণে।…

এরই মাঝে স্বামিজী সংযোগ রেখে চলতেন ভারতীয় শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তদের সঙ্গে।…সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলতেন—তাঁর কার্য্যের ফলে ভারতের অন্তর্জগতে কোন প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে কিনা—তার ওপর। স্বামিজীর প্রতি নানাদিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে দেখে কয়েকজন শিষ্য—বিদেশে তাঁর অনিষ্টের আশঙ্কা ক'রে—তাঁকে ভারতে ফিরে যেতে এক অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করেন। উত্তরে স্বামিজী তাদের লেখেন,—

"বৎসগণ, আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। যদি তোমরা বাস্তবিক আমার সন্তান হও, কিছুতে ভয় পাইও না,—কোন কিছু অপেক্ষা রাখিও না। সিংহের মত কাজ করিয়া যাও। ভারতকে জাগাইতে হইবে,—সমগ্র জগৎকে জাগাইতে হইবে।"

"সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর—আমরাই মহৎকর্ম্ম করিব,—এই গরীব আমরা,—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে,—কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।"

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর,—পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র—কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে!"…

স্বামিজীকে কেউ কেউ ছদ্মবেশী রাজনৈতিক প্রচারক ব'লেও অপবাদ দেবার চেষ্টা করে। সে সংবাদও কোন ভক্তের পত্রের মারফতে স্বামিজীর কানে আসে। স্বামিজী তাকে উত্তর দেন,—

"আমার বন্ধুগণকে বলবে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন,—তাঁদের কথায় আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ। আমি যদি ঢিল খেয়ে পাটকেল ছুঁড়ি,—তবে তাঁদের সঙ্গে আমার পার্থক্য রইল কি?…সত্য নিজেকে নিজেই প্রতিষ্ঠা করবে, আমার জন্য তাঁদের সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না।"

অধ্যাপনা, বক্তৃতাদান, প্রবন্ধরচনা প্রভৃতি নানা কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই এমনি অসংখ্য পত্রেরও উত্তর দিতে হ'তো স্বামিজীকে প্রায় প্রতিদিনই।

শিষ্যশিষ্যাদের শিক্ষা দেবার জন্যে স্বামিজী যে সকল বক্তৃতা দিতেন,—তারই

ওপর ভিত্তি ক'রে—স্বামিজী এই সময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাজযোগ' এবং 'পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য' রচনা করেন। পুস্তক-রচনার সময় স্বামিজী ব'লে যেতেন মুখে মুখে,—আর তাঁর এক শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডো লিখতেন ক্ষিপ্রহস্তে। মাঝে মাঝে স্বামিজী ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়তেন,—সেই ভাব-সমাহিত অবস্থায় তাঁর চিত্তভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতো যেন কোন্ ঊর্দ্ধলোকের অমৃতধারায়,—স্বামিজীর মুখ দিয়ে সে ধারা প্রবাহিত হ'য়ে ফুটে উঠ্তো মিস ওয়াল্ডোর কলমের মুখে—বাণীরূপে।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর যারা অনুরাগী এবং শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন,—তাঁদের মধ্যে মিসেস্ ওলী বুল, ডাক্তার এলান ডে, মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট, ডাঃ স্ট্রীট, ম্যাডাম মেরী লুই এবং হার লিঁও ল্যান্সবর্গ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিসেস্ বুল ছিলেন নরওয়েবাসী জনৈক বিখ্যাত বেহালাবাদক ও জাতীয়তাবাদী মিঃ বুলের পত্নী। ম্যাডাম মেরী আমেরিকা-বাসিনী বিদুষী ফরাসী নারী। ইনি ছিলেন ঘোর জড়বাদী এবং সোসালিষ্ট নেত্রী।

জড়-জগতের ঊর্দ্ধেও যে এক অধ্যাত্ম-জগৎ আছে,—ভারতের মুনিঋষিগণ যুগ-যুগ ধ'রে কঠোর সাধনা ক'রে পেয়েছেন যার সন্ধান,—যে জগতের সম্পদের কাছে পার্থিব অনিত্যজগতের যাবতীয় সম্পদই তুচ্ছ,—এত দিন ধ'রে প্রতীচ্য সেই জগৎ সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ অচেতন—সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ!...যুগযুগান্তরের যবনিকা সরিয়ে দিয়ে স্বামিজী তারই বার্ত্তা প্রচার করেছেন পাশ্চাত্যবাসীর কাছে। তাই বহু বড় বড় ধর্ম্মযাজকও স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন—ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন আলোকের সন্ধান পাবার আগ্রহে।

বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড এবং সুবিখ্যাতা গায়িকা কালভেও স্বামিজীর দার্শনিক জ্ঞান-গরিমায় বিশেষভাবে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠেন তাঁর প্রতি। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিকোলা তেসলা স্বামিজীর মুখে সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ স্বীকার করেন অকুণ্ঠিতচিত্তেই।

*　　*　　*

নিজের প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্যে স্বামিজী মেরী লুই এবং হার লিঁও ল্যান্সবর্গকে প্রকাশ্যে দীক্ষিত করলেন সন্ন্যাস-মন্ত্রে। দীক্ষাদানের পর তিনি যথাক্রমে তাঁদের নাম দিলেন—স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ। কি যে সঞ্জীবনী ছিল স্বামিজীর মন্ত্রে—নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী অভয়ানন্দ ও কৃপানন্দের

মনে হ'লো, তাঁদের সমগ্র মনপ্রাণ পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে এক নূতন ভাবে। প্রাণ ঢেলে তাঁরা সাহায্য ক'রতে লাগলেন স্বামিজীকে নানাভাবে।

কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামিজী বড়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে সমুদ্রতীরে শৈলাবাসে যাবার জন্যে অনুরোধ ক'রতে লাগলো একান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে।

তখন গরমও প'ড়ে গেছে। তাই প্রস্তাবটা স্বামিজীর ভাল লাগলো।···

স্বামিজীর অনুমতি পেয়ে শিষ্যেরা তাঁর বাসের ব্যবস্থা করলো সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যস্থিত সহস্র দ্বীপোদ্যান নামক দ্বীপের এক নির্জ্জন মনোরম কুঞ্জকুটিরে। স্থানটি দ্বীপের মধ্যস্থলে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত—চতুর্দ্দিকে জলরাশি—দূরে-অদূরে আরও অনেক দ্বীপ। দশ-বারোজন শিক্ষার্থী নিয়ে স্বামিজী যাত্রা ক'রলেন সেই শৈলাবাসে।

স্বামিজীর অবস্থানের জন্যে স্থানটি অবিলম্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বহুলোকের। অনেকে মাঝে মাঝে এখানে এসে—সাগ্রহে গ্রহণ করতো স্বামিজীর উপদেশ। বেদান্তসূত্র, যোগদর্শন, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতির যথারীতি অধ্যাপনা ও আলোচনা চলতে লাগলো এখানেও।

এখানেই স্বামিজী রচনা করেন,—তাঁর বিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin)।

"Where seek'st thou ?
That freedom, friend, this world.
Not that can give,
In books and temples
Vain thy search."

"হে বন্ধু, কোথা মুক্তি অন্বেষিছ তুমি ?
হেথা নয়—হেথা নয়—শাস্ত্রে বা মন্দিরে
বৃথা তুমি কর অন্বেষণ,—
'মুক্তি তব আপন অন্তরে।' "

স্বামিজীর উপদেশাবলী দিয়ে মিস্ ওয়াল্ডো 'দেববাণী' নামে একটি গ্রন্থও সংকলন করেন এখানে। সমুদ্রের বাতাসে স্বামিজীর শরীরটাও ভাল হ'য়ে ওঠে কিছুদিনের মধ্যে।

দ্বীপের কুটির থেকে নিউইয়র্কে ফিরে স্বামিজী এক বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে এলেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী। ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি সুন্দরী প্যারী অনন্ত সম্পদ-সৌন্দর্য্য নিয়ে মুগ্ধ করলো স্বামিজীকে। স্বামিজী সেখানকার যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখে—অবশেষে পৌছলেন এসে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে।

স্বামিজী ভেবেছিলেন,—বৃটিশেরই শাসিত পরাধীন ভারতের এক সন্ন্যাসী হয়ত কোন সম্মান বা সমর্থনই পাবে না লণ্ডনে।···উপেক্ষা-অবহেলা অথবা লাঞ্ছনাই জুটবে হয়ত তাঁর কপালে।—কিন্তু লণ্ডনে পৌছবার অব্যবহিত পরেই তাঁর সে সন্দেহ স'রে গেল মন থেকে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই পরম সম্মানে এবং সমাদরেই অভ্যর্থনা করলেন স্বামিজীকে লণ্ডনের মধ্যে।

অবিলম্বেই স্বামিজীর লণ্ডন আগমনের সংবাদ প্রচারিত হ'য়ে পড়লো চতুর্দ্দিকে। দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো দিনের পর দিন। বহু জায়গা থেকে সাদর আহ্বান আসতে লাগলো বক্তৃতা দেবার জন্যে। এখানেও তিনি বেদান্ত এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ বক্তৃতা দিয়ে সুধী ও শিক্ষিত-সমাজের এমন কি সাধারণ নরনারীরও হৃদয় জয় ক'রে ফেললেন। আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যুগযুগান্তের জড়বাদ যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে যেতে লাগলো স্বামিজীর ভাষণে!

স্বামিজীর অন্যতম অনুরাগী ভক্ত মিঃ ই. টি. স্টার্ডি সাহেবই ছিলেন এখানে তাঁর সকল কার্য্যের সহায় ও পরমবন্ধু।···তাঁর আগ্রহে এবং চেষ্টায় অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হ'লো স্বামিজীর। এখানেও স্বামিজী ক্লাস খুলে বহু জ্ঞানার্থীকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। বড় বড় কাগজের সম্পাদকগণও স্বামিজীর কাছে এসে একান্ত আগ্রহে শুনতে লাগলেন তাঁর উপদেশাবলী।

পিকাডিলিস্থ 'প্রিন্সেস হলেও' একদিন অনেকের অনুরোধে স্বামিজী একটি বক্তৃতা দিলেন "আত্মজ্ঞান" সম্বন্ধে। এই বক্তৃতায় তাঁর যশোরাশি অধিকতর ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়লো—নানাদিকে।···পত্রিকার সম্পাদকগণ বিপুল আগ্রহে বড় বড় শিরোনামা দিয়ে প্রকাশ করলেন—সেই অমৃতের উৎস-স্বরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা তাঁদের কাগজে।

কিন্তু অন্যের একান্ত অজ্ঞাতসারে—অথচ প্রত্যেকের চেয়ে অধিকতর আগ্রহে ও নিষ্ঠায় এবং অনুরাগে যিনি স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি শুন্‌তেন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে, তাঁর

নাম মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল।…আজীবন ভোগবিলাসের মধ্যে পালিতা এই ধনী ইংরাজ-দুহিতার অন্তরে—শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মের প্রতি ছিল একটি সহজাত আকর্ষণ। প্রগাঢ় শিক্ষানুরাগের ফলে তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে ব্রতী হয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এই বিদুষী তরুণী প্রায়ই বিদ্বান্ এবং বিদুষীদের সংসর্গে কালযাপন করতেন। বিশ্বের বহুবিধ ধর্ম্মমত এবং চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'বার আগ্রহ ছিল তাঁর সমধিক। ভোগবিলাসের মধ্যে পালিতা হ'লেও তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন বিলাস-ব্যসন তুচ্ছ ক'রে অবিরত ছুটে যেতো জ্ঞানালোকের সন্ধানে।

ভারতের খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলার সমপর্য্যায়ভুক্তা মিস্ মার্গারেট দর্শনশাস্ত্রের প্রতিও ছিলেন মনেপ্রাণে অনুরাগিনী। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলিও ছিল গভীর দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ। বক্তৃতাগুলি শুনতে শুনতে মিস্ মার্গারেটের জড়বাদের প্রভাবপুষ্ট চিত্তের ওপর যেন একটি নূতন আলোকের প্রবাহ ছুটে যেতো,—অমনি যেন তড়িৎ-স্পর্শে চমকে উঠতেন তিনি, ভাবতেন—ধর্ম্মের এমন অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তো কই এর পূর্ব্বে আর কেউ করেনি!…কেউই তো দেয়নি কোন দিন জড়-জগতের উর্দ্ধে নিত্য-আলোকময় এক অধ্যাত্ম-জগতের সন্ধান?

—স্বামিজীর বক্তব্যের মর্ম্মার্থ মার্গারেট অবশ্য বুঝতে পারতেন না যথাযথভাবে। তবে সেগুলিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে—গভীরভাবেই পর্য্যালোচনা করতেন অন্তরে অন্তরে। বুঝতেও চেষ্টা করতেন সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিশ্লেষণের সাহায্যে। একলব্যের গুরুবরণের মত স্বামিজীকে মনে মনে গুরুর আসনে বসিয়ে—পূজোও করতেন তিনি ভক্তিভরে। কিন্তু তাঁর চিত্তরাজ্যে যে আলোড়ন সুরু হয়েছিল, তা' সম্প্রতি কারো ধরবার উপায় ছিল না বাইরে থেকে,—তিনিও তাঁর অন্তরের কথা এখন চেপেই রাখতেন হৃদয়ের গোপনতম স্থানে। অবশ্য স্বামিজীর ক্লাসগুলিতে নিয়মিত যোগ দেওয়ার ফলে নিষ্ঠাবতী ছাত্রীরূপে তাঁর পরিচয় রীতিমত গ'ড়ে উঠেছিল স্বামিজীর সঙ্গে।

স্বামিজী এখানে মনে সন্দেহ নিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ইংলণ্ড আগমনের ফল—সন্তোষজনক হ'লো প্রায় সবদিক দিয়েই। বড় বড় ইংরাজ মনীষী, বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ—বহু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান,—অসংখ্য অভিজাত ও শিক্ষিত নরনারী স্বামিজীর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ধন্যবোধ করলেন নিজেদের। যিনি একবার আসতেন তাঁর কাছে,—তিনিই ফিরে যেতেন শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে স্বামিজীর প্রতি উচ্চ ধারণা নিয়ে।

স্বামিজী একটি জিনিষ লক্ষ্য করলেন এখানে। আমেরিকার লোক পরম আগ্রহে অবিলম্বে কোন নূতন ভাব গ্রহণ করে বটে,—কিন্তু তার প্রভাব তাদের মধ্যে কতদিন থাকবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। আর ইংলণ্ডের লোক যদিও কোন নূতন ভাবধারা গ্রহণ করতে প্রথমটা বহু ইতস্ততঃ করে—তবু যদি একবার গ্রহণ ক'রে, তবে জীবনেও ত্যাগ করে না তাকে। ইংরাজ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য স্বামিজীকে অধিকতর উৎসাহিত ক'রে তুললো—ইংলণ্ডে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে।

কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন,—এখন আর অগ্রসর না হওয়াই ভাল। যে বীজ এখানে বপন করা হ'লো, সময় লাগবে তার অঙ্কুরোদ্গম হ'তে। কাজেই কিছুদিন পরে আবার একবার এখানে আসাই সমীচীন।

—তা'ছাড়া আমেরিকার লোকও তাঁকে পত্রের পর পত্র লিখছিলেন—সেখানে ফিরতে। বোষ্টনের এক ধনশালিনী মহিলা শীতের সময় নানাভাবে সাহায্য করতেও অঙ্গীকার করেছিলেন স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে। সব দিক বুঝে—ইংলণ্ড থেকে সম্প্রতি বিদায় নিয়ে—স্বামিজী আবার ফিরলেন নিউইয়র্কে। তখন ডিসেম্বর মাস প'ড়ে গেছে। ইংলণ্ডের জলবায়ুতে স্বামিজীর স্বাস্থ্যও গ'ড়ে উঠেছিল নূতনভাবে।

স্বামিজীর অনুপস্থিতির সময়, আমেরিকায় বেদান্তের প্রচারকার্য্য চালাচ্ছিলেন নবদীক্ষিত পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ ও কৃপানন্দ। মিস্ ওয়াল্ডোও তাঁদের সাহায্য ক'রছিলেন বিশেষভাবে।

স্বামিজী এদের কার্য্যে প্রীত হ'লেন বিশেষভাবে ;—অভয়ানন্দ ও কৃপানন্দের দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি,—এরা প্রতীচ্যের ভাবধারায় আজীবন পুষ্ট,—কিন্তু কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছেন তিনি এদের জীবনে! যাঁর অপার করুণা দিয়েছেন তাঁকে এই চিন্তাতীত শক্তি,—মনে মনে মাথা নত করলেন তিনি তাঁর চরণের উদ্দেশে। নিজেও তিনি নবীন উদ্যমে আবার যোগ দিলেন বেদান্ত-ধর্ম্ম-প্রচারে।

এবার তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে। এই বক্তৃতার সমষ্টিই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কর্ম্মযোগ'—বিশ্বসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব অতুলনীয় অবদান। সমগ্র জগতের আদর্শ-কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীমুখে এর সর্ব্বত্র যেন ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত চিত্তে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সেই তো কর্ম্মসাধন!

এই সময় সম্ভ্রান্ত ধনী ও অভিজাতবংশীয়া শিক্ষিতা কোন মার্কিন তরুণী প্রাণের একান্ত আগ্রহে এবং কামনায় স্বামিজীকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামিজী ধীর নম্রকণ্ঠে উত্তর দেন,—"ভদ্রে, আমি যে সন্ন্যাসী! জগতের সকল নারীই যে আমার মা!"

তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর এই জিতেন্দ্রিয়তা এবং ত্যাগধর্ম্মী হৃদয়ের এই প্রশস্ততা প্রস্তাবকারিণী মার্কিন তরুণীর হৃদয় বিপুল শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে!

···ডিসেম্বরের শেষভাগে স্বামিজী বোষ্টনে গিয়ে মিসেস ওলী বুলের অতিথিরূপে অবস্থান করতে লাগলেন সেখানে। কোন স্থানেই কোন অবস্থাতেই স্বীয় আরব্ধ কার্য্যের সম্পাদনে বিরত থাকতেন না তিনি। সর্ব্বত্রই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসতেন তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী হ'য়ে। ওলী বুলের গৃহেই একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত দর্শনাধ্যাপক মিঃ উইলিয়ম জেমসের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয়। এই পরিচয় দুই মনীষীকে পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ক'রে তোলে।

জানুয়ারী মাসে আবার ফিরে এলেন স্বামিজী নিউইয়র্কে। প্রতি রবিবার বক্তৃতা দিতে লাগলেন হার্ডম্যান হলে। বক্তৃতা দিয়ে কোন অর্থ আর কারো কাছে গ্রহণ করতেন না তিনি। তবুও কতদিক থেকে কত লোকই না ছুটে আসতো তাঁর প্রয়োজন যোগাতে বিপুল আগ্রহে!

নিজের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার অভ্যাস কোনদিনই ছিল না স্বামিজীর। কিন্তু অবিলম্বে এমন এক সুযোগ ঘ'টে গেল,—যাতে তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতাই লিপিবদ্ধ হ'তে লাগলো এবার থেকে।···এর জন্যে মিঃ জে. জে. গুডউইন নামক এক সাহেবের কাছে আমাদের ঋণ নিঃসন্দেহে অপরিশোধ্য। আজ পর্য্যন্ত যে স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি বিশ্বমানবের মনের ক্ষুধার শান্তি করছে, মিঃ গুডউইনের উদার সহযোগিতাই তার প্রধান কারণ।

ইংলণ্ড থেকে নিউইয়র্কে এসে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে মিঃ গুডউইন একান্ত অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন তাঁর। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি তিনি যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন সাঙ্কেতিক লিখন-প্রণালীর সাহায্যে। দেখতে দেখতে তিনি স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত হ'য়ে ওঠেন। এমন কি স্বামিজীর কার্য্যে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত ছুটে বেড়াতেও তাঁর মনে কোনরূপ দ্বিধা জাগতো না কোনদিন।

স্বামিজীও দেখতে লাগলেন তাঁকে পরম প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে। তাঁর কার্য্যের এবং উদার অন্তরের মূল্য বুঝে তিনি তাঁকে সম্মানও দিতেন যথেষ্ট। পরম আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতেন তিনি,—**My faithful Goodwin.**

নিউইয়র্কে একটি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ী স্থায়ী বেদান্তসভা প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বামিজী আসেন ডেট্রয়েটে। সর্ব্বত্রই তিনি বেদান্তের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপনের জন্যে কার্য্য করেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। ডেট্রয়েটে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় দু'সপ্তাহ এখানে থেকে—তাঁর কার্য্যভার স্বামী কৃপানন্দের ওপর দিয়ে তিনি আবার ফিরে যান বোষ্টনে।

বোষ্টন থেকে হার্ভার্ড। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রবৃন্দ ও অধ্যাপকগণের সমক্ষে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দান করেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতায় ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী যুগপৎ শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ একদিন অনুরোধ করেন একান্ত আগ্রহে,—স্বামিজী, আপনি এখানে প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ ক'রে,—আমাদের কৃতার্থ করুন।

প্রশান্ত হাস্যে উত্তর দেন স্বামিজী,—আমি যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—চাকরী করা কি আমার পক্ষে উচিত? আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

এদিকে তখন ইংলণ্ড থেকে আবার স্বামিজীর আমন্ত্রণ আসছে বারবার। আর একবার ইংলণ্ডে গিয়ে—সেখানে তাঁর আরব্ধ কার্য্যের ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তুলতে স্বামিজীরও আগ্রহ ছিল প্রচুর। কারণ নিউইয়র্কের মত লণ্ডনও পাশ্চাত্য জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রভূমি।

গুরুভ্রাতাদের কেউ একজন তাঁর কাছে এসে পড়লে ভাল হ'তো,—একথা প্রায়ই ভাবতেন স্বামিজী। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড থেকে স্বামী সারদানন্দকে আসতেও লিখেছিলেন নিউইয়র্কে; কিন্তু কি জানি কেন,—সারদানন্দ আসতে পারেননি। স্বামিজী আবার লিখলেন মঠের ঠিকানায় তাঁকে এক পত্র,—ইতিমধ্যে মঠ উঠে এসেছিল বরাহনগর থেকে আলমবাজারে।—"তুমি অবিলম্বে লণ্ডনে উপস্থিত হ'য়ে মিঃ ই. টি. স্টার্ডি সাহেবের বাড়ীতে আমার জন্যে অপেক্ষা কর। অন্যথা ক'রো না।"

শিষ্যা মিস ওয়াল্ডোকে স্বামিজী অভিহিতা করেছিলেন হরিদাসী নামে। আমেরিকা ত্যাগের পূর্ব্বে স্বামিজী ছাত্রছাত্রীদের রাজযোগ শিক্ষার ভার দিলেন তাঁর ওপর। তারপর অন্যতম ভক্ত মিঃ ফ্রান্সিস্ এইচ. লেগেটকে বেদান্ত-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত ক'রে পুনরায় তিনি যাত্রা করলেন ইংলণ্ডের উদ্দেশে।

অন্যান্য কার্য্যের ভার দিয়ে গেলেন স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ প্রভৃতির ওপর।

৬৩

স্বামিজীর নির্দ্দেশমত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল স্বামী সারদানন্দ পৌছলেন লণ্ডনে,—আতিথ্য গ্রহণ করলেন মিঃ ই. টি. স্টার্ডির বাড়ীতে।

এবার লণ্ডন পৌছে সারদানন্দকে পেয়ে স্বামিজীর কি আনন্দ,—'ওঃ, কতদিন তোদের দেখিনি রে! কতদিন ছেড়ে এসেছি স্বদেশ—জন্মভূমি! আজ তোকে দেখে কি আনন্দ যে হচ্ছে!' এরপর একে একে তিনি আলমবাজার মঠের কথা,—অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের কথা, দেশের দশের কত সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন সারদানন্দকে। অনেকদিন পরে স্বামিজীকে দেখে এবং ইউরোপে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পরিচয় পেয়ে—যুগপৎ আনন্দে এবং গৌরবে আপ্লুত হ'য়ে উঠলেন স্বামী সারদানন্দও।

স্বামিজী ব'ললেন তাঁকে,—সারদা, তোমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। সেখানে আমি অনেক রকম ব্যাপার স্থুরু ক'রে এসেছি,—তুমি গিয়ে সব দেখাশোনা করতে আরম্ভ কর,—নিজেও যতটুকু পারো করতে চেষ্টা ক'রো।

সারদানন্দ সানন্দেই সম্মত হ'লেন স্বামিজীর প্রস্তাবে। যথারীতি উপদেশ এবং উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট পত্রাদি দিয়ে স্বামিজী তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নিউইয়র্কে। ইংলণ্ডের কার্য্য স্বয়ং হাতে নিলেন স্বামিজী।

এবার তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' ইত্যাদি নানা বিষয়ে। গোমুখী-ধারার মতই তাঁর অমৃতময় অজস্র বাক্য-ধারায় যেন পুণ্যস্নাত হ'য়ে উঠলো সমগ্র শহর। বহুজনের বহুদিন ধরে সঞ্চিত চিত্তের মালিন্য যেন কোন্ স্বর্গীয় আলোক-স্পর্শে দূর হ'য়ে গেল চিরতরে!

সেদিন কোন একটি সভায় স্বামিজীর বক্তৃতা সবেমাত্র শেষ হ'য়েছে—এক অতিবৃদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে,—"স্বামিজী"—বললেন তিনি ধীরকণ্ঠে,—"আপনি যা' ব'লেছেন, তা অতি সুন্দর! সেজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি তো নূতন কিছু বলেননি!"

প্রশান্ত হাস্যে উত্তর দিলেন স্বামিজী,—বন্ধু, আমি যা ব'লেছি,—তা আর কিছুই নয়,—'সত্য'। এ সত্য হিমাদ্রির মত প্রাচীন,—মনুষ্যজাতির ন্যায় প্রাচীন,—এমন কি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার চেয়েও প্রাচীন। কিন্তু আমার কথা যদি আপনার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করতে পারে,—আর আপনি সেইভাবে জীবন যাপন করতে পারেন,—তবে কি যা' বলেছি,—তা ব'লে ভাল করিনি?

অমনি ঘন ঘন করতালির শব্দে এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কলগুঞ্জনে মুখর হ'য়ে উঠলো চারিদিক,—এক মহিলা এগিয়ে এসে ব'ললেন,—'আমি সারা জীবন গির্জ্জায় প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। কিন্তু স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে মনে হয়,—সবই প্রাণশূন্য! স্বামিজীই আমার প্রাণে নূতন আলোকসম্পাত করেছেন।'

মে মাসে স্বামিজী পণ্ডিত মোক্ষমূলরের কাছ থেকে এক সাদর আমন্ত্রণ লাভ করলেন। মহাবৈদান্তিক, মহামনীষী পণ্ডিত মোক্ষমূলর! সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান অগাধ,—পাণ্ডিত্য অসাধারণ! হিন্দুর বেদকে তিনিই বিপুল শ্রমে পরমযত্নে রক্ষা ক'রেছিলেন ধ্বংসের মুখ থেকে। এজন্য তিনি প্রতি হিন্দুর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বস্তুতঃ, প্রাচ্য শাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত পাশ্চাত্য অধিবাসীদের মধ্যে আর কোনদিনই উদ্ভব হয়নি।

স্বামিজী প্রকৃতই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন মনীষী মোক্ষমূলরের আমন্ত্রণ পেয়ে। পরম আনন্দে তিনি উপস্থিত হলেন তাঁর আলয়ে। পণ্ডিতবর তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন বিপুল সম্মানে এবং সমাদরে। বহুক্ষণ ধ'রে বহু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'লো দুই মনীষীর মধ্যে।

পণ্ডিত মোক্ষমূলর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে জানতেন বিশেষভাবে। স্বামিজীর আগমনের বাইশ বছর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র লণ্ডনে এসে—তাঁর বক্তৃতাবলীর সাহায্যে পরিচিত হ'য়েছিলেন ইংলণ্ডীয় সমাজের অনেকের কাছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে—জীবনের শেষভাগে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছিল,—একথাও অবিদিত ছিল না পণ্ডিত মোক্ষমূলরের। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধেও উঠলো দু' একটা কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উঠতে স্বামিজী ব'ললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,—"আজকাল হাজার হাজার লোক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজো ক'রছে।"

"সে আর আশ্চর্য্য কি?"—অধ্যাপক মোক্ষমূলরের চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো: "তাঁর মত লোককে যদি পূজো না ক'রবে—তবে আর ক'রবে কা'কে? তাঁর উপদেশাবলী আমি পড়েছি।···সে কি আর উপদেশ? জগতের সর্ব্বধর্ম্মের সারতত্ত্ব এবং নিখিল বিশ্বের জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন ক'রে—তিনি অমৃত বিলিয়েছেন মানব-সমাজকে।···আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি সেই মহাত্মাকে।"

মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলরের মুখে—গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রশস্তি শুনে বিপুল গৌরব-পুলকে বুক উথলে উঠ্‌লো স্বামিজীর! যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইংলণ্ডের যেখানে যখন ভ্রমণ করতেন,—সর্ব্বত্রই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীমা

সারদামণি দেবীর এবং জননী ভুবনেশ্বরীর মহানত্ব, স্নেহ-প্রীতি ও করুণার কথা সগৌরবে ব'লে বেড়াতেন স্বামিজী তাঁর অনুরাগীদের কাছে। তাঁর স্বদেশ—তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের কথা বলতে ব'লতেও দুই চোখ তাঁর ভ'রে আসতো জলে!

কোন বিদেশীর মুখে ঘুণাক্ষরেও ভারতের নিন্দা শুন্‌লে তিনি জ্ব'লে উঠতেন মনেপ্রাণে! এ-দেশের লোকের সুখ-সম্পদ্ দেখে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তো তাঁর,—আহা, এরা কেমন সুখে আছে,—আর আমার দেশবাসী,—হায়, হায়, কি দুঃখ-কষ্টেই না দিন যাচ্ছে তাদের!

স্বামিজী যাতে যথেষ্ট আরামে থাকতে পারেন,—এদেশের ভক্তশিষ্যেরা সর্ব্বদাই সে ব্যবস্থা করতেন পরম যত্নে। নিজের আরামের দিকে চেয়ে ও দেশবাসীর কথা স্মরণ ক'রে চিত্ত আকুল হ'য়ে উঠতো তাঁর।

প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত মোক্ষমূলরও স্বামিজীর অন্তরের পরিচয় পেলেন পরিপূর্ণ-ভাবেই। তাঁর বুঝতে বাকী থাকলো না,—স্বামিজী শুধু অগাধ জ্ঞানী এবং পণ্ডিতই নন;—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও অসাধারণ দেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক। এতে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের শ্রদ্ধা যেন আরও বেড়ে গেল স্বামিজীর ওপর।···

অতঃপর তিনি স্বয়ং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কলেজ এবং বলড়ুইন লাইব্রেরী দেখালেন ঘুরেঘুরে।

—বিদায়কালে পণ্ডিত মোক্ষমূলর স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে এলেন স্টেশন পর্য্যন্ত। স্বামিজী তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ললেন,—"আপনার এতদূর কষ্ট ক'রে না এলেই চ'লতো।"

মধুর প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠলো অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মুখে,—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শিষ্যের সঙ্গে তো আর রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হয় না!"—একটু থেমে আবার ব'ললেন—"আপনারা পরমহংসদেবকে জগতে প্রচার ক'রবার জন্যে কি ব্যবস্থা ক'রছেন? উপাদান পেলে আমি তাঁর একখানি বড় জীবনী লিখতে পারি।"

শুধু আনন্দিত নয়—কৃতার্থও হ'লেন স্বামিজী এ কথায়। ব'ললেন প্রীতকণ্ঠে: এ আমাদের পরম গৌরবের এবং সৌভাগ্যের কথা। আমি অবশ্যই ব্যবস্থা ক'রবো তার।······

এবারকার লণ্ডন আগমন ফলপ্রদ হ'লো আর একটি দিক দিয়ে। স্বামিজীর অন্যতম ভক্ত মিঃ ই. টি. স্টার্ডি, শিষ্যা মিস্ এইচ. মূলার, এবং একান্ত অনুরাগিনী ও ভক্তিমতী ছাত্রী মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল—একে একে স্বামিজীর কাছে এসে তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হ'লেন পরিপূর্ণ অন্তরে।

দুই-একদিন পরে মিঃ এবং মিসেস্ সেভিয়ার নামে এক ধর্ম্মানুরাগী প্রৌঢ় দম্পতিও স্বামিজীর কাছে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামিজীর মহান্ চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে এবং তাঁর মুখে অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মুগ্ধ হন মনেপ্রাণে ;—দু'জনেরই মনে হয়,—ঠিক এই উদার ধর্ম্মই এবং এমনি গুরুই তাঁরা যেন সারা জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়িয়েছেন !

এঁরা প্রবীণ, তাই স্বামিজী প্রথম দিন থেকেই এঁদের ডাকতে সুরু করেন,—'পিতাজী' এবং 'মা' ব'লে।

৬৪

কুমারী মার্গারেট কিন্তু এবার ছায়ার মতই স্বামিজীর অনুসরণ ক'রতে সুরু করলেন। প্রগাঢ় তাঁর অনুচিকীর্ষা—নিবিড় তাঁর অনুরাগ !

ক্লাসে স্বামিজী যে সব কথা বলেন,—সভায় যে বক্তৃতা দেন,—তার প্রত্যেকটি বাক্য—এমন কি প্রত্যেকটি শব্দ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করেন বুঝতে। কিন্তু এখনও অধিকাংশ কথারই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝে ওঠা সুকঠিন হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে। কিন্তু তবু কি যে আকর্ষণ, কি যে যাদু আছে ঐ কথাগুলির মধ্যে,—মার্গারেটের মনে তার শব্দে শব্দে বিপুল তরঙ্গ ওঠে। গানের ভাষা অনেক সময় বোঝা যায় না,—কিন্তু তার সুর যেন কি এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি ক'রে মনকে টেনে নিয়ে যায়—কোন্ সুদূরে—এক অজানা আনন্দলোকে। ....মার্গারেটেরও হয়েছে তাই। স্বামিজীর বাণী তাঁর সম্যক বোধগম্য না হলেও—তাঁরই মধ্যেই যেন কোন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় লোকের বার্ত্তা ধ্বনিত হয় তাঁর কানে কানে !

স্বামিজীর মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনতে শুনতেও মার্গারেটের মনে হয়,—তিনি শুনছেন যেন কোন্ এক কল্পলোকের কথা। বিবেকানন্দের ভারতকে—মনের মধ্যে যথাযথভাবে ধারণা করা একান্ত শক্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর পক্ষে। কখনো কখনো তিনি লক্ষ্য করেন,—স্বদেশের কথা ব'লতে ব'লতে সর্ব্বত্যাগী মায়ামোহমুক্ত সন্ন্যাসী উছলিত হ'য়ে উঠ্ছেন প্রবল ভাবের আবেগে। চোখ দু'টি তাঁর ছল ছল ক'রে উঠছে গভীর স্বদেশপ্রেমে,—সময়ে সময়ে আবার দীপ্তও হ'য়ে উঠেছে যেন কিসের উত্তেজনায় ! কি এ সন্ন্যাস ? যাতে মানুষ সম্পূর্ণ নিজেকে ভুলে গিয়ে আকুল হয়ে ওঠে দেশের জন্যে—জাতির কল্যাণে—বিশ্বের হিতসাধনায় ?

কুমারী মার্গারেটের শিক্ষাদীক্ষা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাচার্য্যগণের কাছে।...এতদিন ধরে যে শিক্ষা তিনি অর্জ্জন ক'রেছেন—ভারতীয় সন্ন্যাসীর বাণীর সঙ্গে সেরূপ যেন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পান না তার। কোথায় যেন বিরাট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে।—কোথাও যেন একটি আরেকটির সম্পূর্ণ প্রতিকূল না হলেও অনুকূল নয়। খাদ্য থেকেই সঞ্চিত খাদ্যরস দেহপুষ্টির সাধন করে—তা ব'লে খাদ্য আর খাদ্যরস এক জিনিষ নয়। 'রসায়ন' তাদের মধ্যে কল্পনাতীত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। মার্গারেট খাদ্য চিনেছেন,—কিন্তু স্বামিজী ব'লছেন খাদ্যরস বা খাদ্যপ্রাণের কথা।...

জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছেন কুমারী নোবল তাঁর শিক্ষাচার্য্যদের কাছে,—তার মূল কথা ছিল বিশ্বাস। বিশ্বাস কর—এবং অগ্রসর হও। বিশ্বাসই দেবে তোমাকে পথের সন্ধান,—বিশ্বাসই নিয়ে যাবে তোমাকে পরমপিতার কাছে।

কিন্তু স্বামিজী শোনালেন তাঁকে সম্পূর্ণ নূতন, আরও ঘন—অধিকতর গভীর এক অশ্রুতপূর্ব্ব শাশ্বত বাণী,—আত্মোপলব্ধি; আত্মাকে উপলব্ধি কর, নিজেকে জানো।....নিজেকে না জানলে কোন জানাই সার্থক হবে না জীবনে। 'আত্মানাং বিদ্ধি'—ভারতীয় প্রজ্ঞার মূল কথা হলো এই।... আত্মার মধ্যেই বিরাজ করেন পরমাত্মা—তাঁর অনন্ত মহিমা নিয়ে,—আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলেই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে—সেই অদ্বয় পরমপুরুষকে। নচেৎ সবই মিথ্যা!

একই দীপশিখা হ'তে জ্বলে ওঠে কোটি কোটি দীপশিখা—শিখায় শিখায় সেই একই শক্তি। তেমনি প্রাণে প্রাণে চল্‌ছে সেই একই অনন্ত শক্তির লীলা। দেহ কি?....সে তো শুধু আত্মার বহিরাবরণ,—আত্মার প্রয়োজনেই দেহ, আত্মাই বার বার দেহান্তর গ্রহণ করে।—মন্দিরে থাকে দেব-বিগ্রহ,—দেবতাই তার প্রাণ—মন্দির শুধু বহিরাবরণ,—দেহ-মন্দিরে রয়েছে আত্মার সেই পরমাত্মারই বিভাস, তোমার দেহ তুমি নয়, তোমার আত্মাই 'আসল তুমি'। তোমার আসলকে তুমি জানতে চেষ্টা কর সর্ব্বাগ্রে—কঠোর সাধনায় দুশ্চর তপস্যায়।

গীতা বলেছেন—

নৈনং ছিন্দ্যন্তি শস্ত্রেণ নৈনং দহতি পাবক।
নচৈনং ক্লেদোয়ন্তাপঃ ন শোষয়তি মারুত॥

এই আত্মা অবিনশ্বর,—অক্ষয় অমর, এর বিনাশ নেই। অস্ত্রসস্ত্র তাকে ছেদন করতে পারে না,—আগুন তাকে পারে না দাহন করতে, জলে-উত্তাপে-

বায়ুতে সে লয় পায় না,—দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ নেই,—সাপের খোলসের মত তোমার জীর্ণদেহ পড়ে—আবার—আত্মা গ্রহণ করবে নবদেহ।—নরাণি গৃহ্ণন্তি 'নবানি দেহি।'

দেহবাদী—ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্যের কানে একি নূতন কথা। এই দেহই তোমার সব,—দেহের সুখবিলাস-সম্ভোগপুষ্টিই তোমার তুমি,—পাশ্চাত্ত্যের এই জড়বাদের ওপর কি এ নূতন আলোক-সম্পাত? এ কি প্রচণ্ড আঘাত?

তন্ময়—তদ্গতচিত্তে শুনে যেতেন মার্গারেট স্বামিজীর প্রত্যেকটি বাণী,—সহসা আলোড়ন জাগতো তাঁর অন্তরে। অন্তরের অন্তরেও কোন এক অতল তলে।—মাঝে মাঝে চৈতন্যের দীপ্তি জলে উঠতো যেন তাঁর চিত্তে,—মনে হ'তো আছে, আছে, দেহের বহু উর্দ্ধে—দেহাতীত এক অমূল্য বস্তু। কিন্তু আবার তাঁর জড়বাদী মনে সহসা সংশয়ের ছায়া পড়তো,—তিনি বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠতেন।

আবার জড় ও চৈতন্য সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী স্বামিজী যখন ব'লতেন—জগতের বিরাট এবং ক্ষুদ্র সকল বস্তুর অণু-পরমাণুতে সেই এক ব্রহ্মসত্তারই ক্রিয়া চ'লছে,—সেই এক ব্রহ্মশক্তিই পরিব্যাপ্ত রয়েছে,—আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, বৃক্ষে-লতায়, পর্ব্বতে-কন্দরে, বনে-মরুভূমিতে, এবং বৃহৎ থেকে অতি ক্ষুদ্র—চক্ষুর অগোচর প্রতিটি জীবের মধ্যে—তখনও কুমারী মার্গারেটের মন যেন সময়ে সময়ে সন্দিহান হ'য়ে উঠতো স্বামিজীর কথায়। সে জটিল রহস্য তিনি বুঝতে পারতেন না কোনমতেই। কিন্তু তবু তিনি স্বামিজীকে মন থেকে দূরে ঠেলতে পারতেন না একমুহূর্ত্তের জন্যেও। তাঁর নিজের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি দেখতেন,—স্বামিজী বহুপূর্ব্বেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর অন্তরের হৈমসিংহাসনে। নিজের জীবনকে গ'ড়ে তুলবার যেটুকু শক্তি ছিল তাঁর নিজের আয়ত্তে,—তাও যেন চলে গেছে কোন্ এক শুভমুহূর্ত্তে স্বামিজীর হাতে।

আর স্বামিজী?—তিনিও ক্রমে ক্রমে ভালবাসতে সুরু করেছেন মার্গারেটকে আপন কন্যার মত। তিনি বুঝতে পেরেছেন,—এক নূতন জীবনের উন্মেষ সুরু হয়েছে এই বিদেশিনী তরুণীর হৃদয়ে। তাঁর অন্তরের গভীর স্পর্শ লেগে মার্গারেট গ'ড়ে উঠছে ধীরে ধীরে তাঁর মানস-কন্যারূপে। স্বামিজী আশান্বিত হয়েছেন এতে খুব বেশী। এরকম একজন শিক্ষিতা, ধর্ম্মানুরাগিনী, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিসম্পন্না নারীকে যদি তিনি পান ভারতের জন্যে,—তবে এক নূতন আলোকের সম্পাত করতে পারবেন ভারতের নারী-সমাজে।

এবং একথাও ঠিক যে,—সে বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হ'য়ে উঠেছেন স্বামিজী। মার্গারেট অন্তরে অন্তরে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামিজীর চরণে,—যোগবল-সম্পন্ন পুরুষ স্বামিজী আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছেন সেকথা। স্বামিজী আশা রাখেন, এরপর তাঁকে যেদিকে যেভাবে চালাবেন,—মার্গারেটও চ'লবেন ঠিক সেইপথে। অদূর ভবিষ্যতে আসবেই সে শুভদিন। কিন্তু এখনও কিছু সময় নেবে প্রস্তুতির জন্যে।

মার্গারেটের মন কিন্তু মাঝে মাঝে অশান্ত-অধীর হ'য়ে ওঠে—অনন্ত আকুল জিজ্ঞাসায় এবং অতৃপ্ত পিপাসায়! প্রশ্নের পর প্রশ্নে তিনি অধীর ক'রে তোলেন স্বামিজীকে। স্বামিজী পরম স্নেহে বলেন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে, —শান্ত হও, শান্ত হও বৎসে! আমি এনে দেব তোমার অশান্ত পিপাসিত মনে শান্তি।...নিবৃত্তি এনে দেবো তোমার পরম অন্তর-ক্ষুধার।…ধীরে—ধীরে—বৎসে, তুমি শুধু একান্ত সংযমে—গভীর নিষ্ঠায় এগিয়ে চল কঠোর সাধনার দিকে।

* * * *

স্বামিজীকে বুঝতে গিয়ে মার্গারেট কিন্তু এখনও প'ড়ে যান রীতিমত ধাঁধাঁর মধ্যে। দিন যায়,—কিন্তু সন্ন্যাসীর অন্তরের প্রকৃত রূপ তাঁর কাছে থেকে যায় গভীর রহস্যাচ্ছন্নই!

একদিন—'ক্লাস' তখন শেষ হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বামিজী করছেন নানা দেশের নানা শহরের আলোচনা,—আলোচনা করছেন কত দেশ, কত জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস।

কথায় কথায় অবশ্যই উঠ্‌লো ভারতেরও প্রাচীন তীর্থ এবং বিখ্যাত শহর-সমূহের কথা; আলোচিত হ'লো উন্নতি-অবনতির ইতিহাস। সহসা মার্গারেট ব'লে উঠ্‌লেন,—লণ্ডনের তুল্য শহর কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় নেই। যেমন সুন্দর—তেমনি শিক্ষা-সভ্যতা ও শিল্প-সম্পদের কেন্দ্র।

মার্গারেট অবশ্য কথাটা ব'লেছিলেন নিতান্ত সাধারণভাবেই—নিছক স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার আবেগে। ভারতকে হীন করবার জন্য নয়।...কিন্তু কোথায় যেন আঘাত লাগলো স্বামিজীর অন্তরে, মুহূর্ত্তে দৃপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি,—"হ্যাঁ, নিশ্চয়, স্বীকার করি, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অতুলনীয় শহর তোমাদের লণ্ডন!"—ব'ললেন তিনি দৃপ্ত স্বরেই—"And you have blasted other cities to make this city of yours beautiful."…কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন,—তোমাদের এই শহরকে সুন্দর ক'রবার

জন্যে—তোমাদের আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে—কত দেশের কত নগর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে!

চমকে উঠ্‌লেন মার্গারেট—এই ক্ষুব্ধ, দৃপ্ত বাক্যে। স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী—স্বামিজীর আরক্তিম মুখমণ্ডলের দিকে দৃক্‌পাত ক'রে।

স্বামিজী তখনও ব'লছেন,—একটিকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্যে আরও পাঁচটিকে ধ্বংস করা—সৃষ্টি নয়,—কৃতিত্ব নয়,—নির্ম্মম পরিহাস!...হে আমার শিষ্য-শিষ্যাগণ,—তোমরা চিরদিন মনে রাখবে আমার একথা। এ সত্যের বাণী!

ব'লতে ব'লতে স্বামিজীর মুখমণ্ডল আবার প্রশান্ত হ'য়ে উঠলো;—যেন হঠাৎ আগুনে জল পড়লো! আবার অজস্র করুণায় ভ'রে উঠলো যেন তাঁর দুই চোখ!

* * * *

অদ্বৈতের প্রচারক স্বামিজী : কিন্তু তাঁর ধর্ম্মের বাণীর মধ্যে নিহিত থাকতো বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতিমূলক শান্তির বাণী,—ধর্ম্মের আলোক-বর্ত্তিকা দিয়ে তিনি প্রদর্শন করতেন প্রকৃত কর্ম্মের পথ। কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দের নিকট কর্ম্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মের কল্পনা ছিল বিড়ম্বনা মাত্র।

কি প্রচুর উৎসাহেই না তিনি ঘুরে বেড়াতেন তাঁর বাণী প্রচার ক'রে। ঝড়ের মত তাঁর অক্লান্ত—অ-বিরাম গতি দেখে পাশ্চাত্যের অনেকেই তাঁকে ব'লতো,—**Cyclonic Hindu.**

বক্তৃতার মধ্যে ইউরোপবাসীদের ডেকে বারবার ব'লতেন তিনি,—"দ্বেষ-হিংসা, হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তক্ষরণ বিস্তর হয়েছে; দুর্ব্বলকে পেষণ ক'রে প্রবলের পুষ্ট হ'বার অভিযান চলেছে অনেকদিন ধ'রে,—কিন্তু পৃথিবী তার মধ্যে কোনদিনই খুঁজে পায়নি কল্যাণের পথ! মানুষের অন্তরের কদর্য্যতা—শুধু কুৎসিতই ক'রে তুলেছে স্রষ্টার সযত্ন-রচিত পরম সুন্দর ধরিত্রীকে।...সারা পৃথিবী আজ খুঁজছে ত্রাণ-মন্ত্র! হিংসা নয়, দ্বেষ নয়,—অত্যাচার নয়, দম্ভ নয়, ব্যাকুল-উন্মুখ হ'য়ে আছে পৃথিবী প্রেমের জন্যে—প্রীতির আশায়! আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনের জন্যে নয়,—ন্যায় ও সত্যের বিজয়ের প্রতীক্ষায়"—

"প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিকণ্ঠ-নির্গলিত সামগানের মধ্যে নিহিত আছে সেই ত্রাণ-মন্ত্র। ভারত আজও বঞ্চিত হয়নি সে সম্পদ্ থেকে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত ভারতের আকাশে-বাতাসে আজিও ধ্বনিত

হচ্ছে সেই মহাবাণী। আজিও ভারতবর্ষ—বিশ্ববাসীকে সেই অমোঘ মন্ত্র দেবার শক্তি রাখে। ভারতের ঋগ্বেদের মধ্যে ভারতীয় ঋষিই বলতে পেরেছেন,—

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

তোমাদের সংকল্প এক হোক্‌,—হৃদয় এক হোক্‌, যাতে তোমরা সকলে এক হ'তে পারো,—তাই হোক্‌—তাই হোক্‌।"

"এরমধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষের স্থান কোথায়? সেই ভারতের বাণী বহন ক'রেই এসেছি আমি। হে আমার পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী ভাই-ভগিনীগণ—গ্রহণ কর সেই মন্ত্র—উদ্বুদ্ধ হও সেই মহান্‌ ব্রতে!"

স্থিরকর্ণে সমগ্র অন্তর সজাগ ক'রে শুনে যেতো সকলে স্বামিজীর বাণী। ভালভাবে বুঝুক না বুঝুক,—জড়বাদী মন তাদের স্বামিজীর প্রতিটি কথা স্বীকার ক'রে নিতে না পারুক,—তবু তারা মুগ্ধ-তন্ময় হ'য়ে যেতো যেন কোন্‌ অনাস্বাদিত অমৃতের হঠাৎ অস্বাদ পেয়ে! যেন কোন্‌ নূতন আলোকের স্পর্শে তাদের সুপ্তচিত্ত চকিতে জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌তো। কুমারী মার্গারেটের কানে বেজে উঠতো যেন কোন মঙ্গল-শঙ্খের আহ্বান,—ভেসে যেতো তাঁর সমগ্র চিত্ত যেন কোন এক জ্যোতির্ম্ময় লোকের অনন্ত আলোক-বন্যায়!

৬৫

জুলাই মাসের শেষাশেষি লণ্ডন থেকে বিদায় নিলেন স্বামিজী,—শিষ্যেরাও চ'ললেন তাঁর সঙ্গে। ক্যালে হ'য়ে তাঁরা পৌঁছলেন এসে প্যারী নগরী। সেখান থেকে জেনেভা।...

জেনেভা থেকে আল্পস পর্ব্বত বেশি দূর নয়। ভ্রমণ করতে করতে পর্ব্বতের কাছাকাছিই এসে পড়লেন স্বামিজী।...হিমাচ্ছন্ন আল্পসকে দেখে স্বামিজীর মনে পড়লো ভারতের গিরিরাজ হিমালয়ের কথা। এখানকার চতুর্দ্দিকে মনোরম পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখেও মুগ্ধ হ'লো স্বামিজীর কবিচিত্ত এক অপূর্ব্ব-মধুর প্রেরণায়।

সশিষ্য স্বামিজী অতঃপর এসে পৌঁছলেন সুইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী লুসার্ণে। লুসার্ণের হ্রদের ধারে বেড়াতে বেড়াতে স্বামিজী দেখলেন,—একটা দোকানে বেশ বড় বড় লালরঙের লঙ্কা রয়েছে।—লঙ্কা ছিল স্বামিজীর ভারী প্রিয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে এসে অবধি এমন লঙ্কা কোনদিনই পড়েনি তাঁর চোখে।

দোকান থেকে কতকগুলো লঙ্কা কিনে কাঁচাই সেগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন তিনি—"তোমার এর চেয়ে ঝাল আর কোন লঙ্কা আছে ?"—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি পরম হৃষ্টচিত্তে এবং ফুল্লমনে দোকানীকে। শিষ্যেরা তো স্বামিজীর কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক !...কৌতুকবোধ ক'রে মুখটিপে হাসতেও লাগলেন কেউ কেউ।

এরপর জার্ম্মানীর হাইডেলবার্গ হ'য়ে এলেন তাঁরা বার্লিনে। সুগঠিত-তনু বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি—জার্ম্মান পুরুষদের দেখে সত্যই মুগ্ধ হ'লেন স্বামিজী। জার্ম্মান তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধির পথে। বার্লিন মহানগরীর সুবিস্তৃত রাজপথ,—মনোরম কারুকার্য্যমণ্ডিত সু-উচ্চ হর্ম্ম্যাবলী এবং অশেষ শোভার আকর পুষ্পোদ্যানসমূহ দেখলেন স্বামিজী পরম আগ্রহে।

ইতিমধ্যে স্বামিজী কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্তি পল ডয়সনের একটি আমন্ত্রণলিপি পেয়েছিলেন। অধ্যাপক ডয়সন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন স্বামিজীকে, তাঁর গৃহে আগমনের জন্যে। তাই স্বামিজী অন্যত্র আর দেরি না ক'রে—সশিষ্য এসে উপস্থিত হ'লেন কিল শহরে।

স্বামিজীর আগমন সংবাদ পেয়েই মিঃ এবং মিসেস ডয়সন পরম সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন স্বামিজীকে তাঁদের গৃহে।...ডয়সনের পুস্তকাগারে ব'সে—জটিল বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগলো দুই মনীষীর মধ্যে।

অধ্যাপক ডয়সন ভারতের বেদ এবং উপনিষদের চর্চ্চা করতেন গভীর নিষ্ঠায়। উপনিষদের কতকগুলি শ্লোক স্বামিজীর কাছে আবৃত্তি করলেন তিনি মধুর কণ্ঠে। তারপর এলেন অধ্যাত্মবাদের আলোচনায়।..."আমার মনে হয়"—কথায় কথায় ব'ললেন ডয়সন গাঢ়কণ্ঠে—"আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ভারতই একদিন জগতের ধর্ম্মগুরুর আসন অধিকার করবে।"

পরম শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো অধ্যাপকের চোখে-মুখে। স্বামিজী প্রচুর আনন্দ লাভ করলেন—ভারতের প্রতি পণ্ডিত ডয়সনের এই গভীর অনুরাগে। সহসা ডয়সন কক্ষান্তরে গেলেন কি একটা কাজে। একটু পরে ফিরে এসে দেখেন,—স্বামিজী একখানি কবিতার বইয়ের পাতা কেবলই উলটিয়ে চলেছেন।

ডয়সন ডাকলেন স্বামিজীকে দু'তিনবার ; কিন্তু কোন উত্তরই পেলেন না স্বামিজীর কাছে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। সহসা যেন চমক ভাঙ্গলো স্বামিজীর—"ওঃ, আপনি ফিরে এসেছেন ? আমি জানতেই পারিনি। ক্ষমা করবেন,—এই বইখানি পড়ছিলাম মন দিয়ে।"

"পড়ছিলেন ?"—মৃদু হাসি ফুটলো ডয়সনের মুখে—"কই, পড়তে তো দেখিনি,"—ঈষৎ কৌতুকভরেই অবশ্য বললেন তিনি,—"দেখলুম, কেবলি পাতা ওলটাচ্ছেন।"

স্বামিজীও হাসলেন কৌতুকভরে,—"আচ্ছা, আপনি বইখানির যেখান থেকে হোক্, আমাকে প্রশ্ন করুন।"—সাম্‌নের টেবিলের ওপর বইটি নামিয়ে রেখে ব'ললেন তিনি,—"দেখুন, আমি উত্তর দিতে পারি কিনা।"

তবু সন্দেহ ডয়সনের মনে। আবার কৌতূহলও জাগলো তাঁর স্বামিজীর কথার সত্যতা নির্ণয় করতে। যেখান থেকে ইচ্ছা—সেইখান থেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন তিনি স্বামিজীকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতবাক হ'তে হ'লো অধ্যাপক ডয়সনকে অপার বিস্ময়ে। স্বামিজী প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন,—সম্পূর্ণ নির্ভুল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে ব'ললেন ডয়সন—"ক্ষমা করবেন আমায় স্বামিজী। আমি প্রথমটা সত্যই আস্থা রাখতে পারিনি আপনার কথায়। এখনও বুঝতে পারছি না,—এমন অসম্ভব সম্ভব হ'লো কেমন ক'রে ?···আমি বহুকাল ধ'রে অধ্যাপনা করছি,—অসংখ্য প্রতিভাবান্ শিক্ষার্থী এবং বহু পণ্ডিত মনীষীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে জীবনে, কিন্তু এমন শক্তি আর কারো মধ্যেই দেখিনি! এমন কি কল্পনাও করতে পারিনি যে কেউ এই শক্তির অধিকারী হতে পারে!"

একটু পরে আবার যেন কিছু দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে উঠলেন পণ্ডিত ডয়সন—"কিন্তু এখনও আমার মনে যেন খট্‌কা লাগছে স্বামিজী,—চারশো' পৃষ্ঠার একখানি বই, শুধু চোখ বুলিয়ে আধ ঘণ্টায় আয়ত্ত করা,—এ যে স্বপ্নের চেয়েও অলীক! আচ্ছা স্বামিজী,—কিছু মনে করবেন না,—বইখানি কি এর আগে কোথাও আপনার পড়া ছিল ?"

"না, মিঃ ডয়সন,"—স্বামিজী ব'ললেন শান্তকণ্ঠে,—"বিশ্বাস করুন, এই প্রথম আপনার এখানেই পড়লাম বইখানি। আমি আজীবন কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী,—অখণ্ড মনঃসংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই এ ক্ষমতা লাভ করেছি একান্ত স্বাভাবিকভাবেই। কঠোর সাধনায় এ শক্তি লাভ করতে পারে সকলেই।"

এবার সম্পূর্ণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন মিঃ ডয়সন স্বামিজীর কাছে। শ্রদ্ধাবিষ্টভরে স্বামিজীর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কি যেন ভাবতে লাগলেন তিনি। তখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তাঁর!

এরপর সশিষ্য স্বামিজী হামবার্গ হ'য়ে এলেন হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টারডামে। অধ্যাপক ডয়সন তিনদিন পরে এখানে এসে সঙ্গী হ'লেন স্বামিজীর। তারপর সকলে মিলে এলেন আবার লণ্ডনে।

৬৬

দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব্বের মত আসতে লাগলো স্বামিজীর কাছে। আবার ক্লাসে যোগ দিয়ে একান্ত আগ্রহে শুনতে লাগলো তাঁর অমৃত-মধুর উপদেশবাণী। বেদান্তের গূঢ়তত্ত্ব জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অধ্যাপক ডয়সনও আসেন প্রায়ই স্বামিজীর কাছে। মনীষী মোক্ষমূলরও পত্রের মারফৎ ভাবের আদান-প্রদান করেন স্বামিজীর সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের একটি হলঘরে মিঃ স্টার্ডির ব্যবস্থায় প্রায়ই চলতে থাকে স্বামিজীর বক্তৃতা।

স্বামিজীর গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিলেন লণ্ডনে। পাশ্চাত্ত্যের কার্য্যের স্থবিধার জন্যে স্বামিজী তাঁকেও গ'ড়ে তুলতে লাগলেন—যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়ে। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ লেখক মিঃ ফ্রেডারিক এচ. মায়ার্স, রেভারেণ্ড জন পেজ হপস্, ডাঃ স্টানটন কয়েট প্রভৃতি ইংলণ্ডের আরও অনেক মনীষী এবার স্বামিজীর সংস্পর্শে এসে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন তাঁর ভাবধারায়। স্বামিজী এ সময় যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন,—তার মধ্যে মায়া ও মুক্তি, ব্রহ্ম ও জগৎ, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব, আত্মার স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রবল প্রেরণার সঞ্চার করে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে।

অবস্থা লক্ষ্য ক'রে স্বামিজী ব'ললেন একদিন কথায় কথায়,—মাত্র বিশজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্থযোগ্য কর্ম্মী পেলে বিশ বৎসরের মধ্যেই আমি বেদান্তের ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে পারি সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডকে।

অক্টোবরের শেষভাগে স্বামিজীর মন টান্‌লো ভারতের দিকে। তাঁর কত সাধের প্রিয় জন্মভূমি—তাঁর সর্ব্বতীর্থের সারতীর্থ—তাঁর স্বর্গ—হায়, কতদিন এসেছেন তিনি তার স্নেহের অঙ্ক ছেড়ে—স্থদূর বিদেশে। এবার ফিরতে হ'বে তাঁকে!

অবিলম্বেই সকলে জানতে পারলো স্বামিজীর অভিপ্রায়ের কথা।···ভক্ত-শিষ্য এবং অনুরাগী সকলের অন্তরেই সহসা জেগে উঠ্‌লো একটা ব্যথা—সতিই কি তাদের ছেড়ে যাবেন স্বামিজী?···যেন কত আপনার জনই চ'লে যাবে—তাদের সান্নিধ্য ত্যাগ ক'রে!

শুধু কি পাণ্ডিত্যে আর জ্ঞানেই? চরিত্রের মহনীয়তায়, ঔদার্য্যে এবং ত্যাগশীলতায়ও স্বামিজী অধিকার করেছিলেন পাশ্চাত্ত্যবাসীর অন্তর। তিনি স্বদেশে ফিরবেন শুনে সেভিয়ার দম্পতিও ব'ললেন,—"আমরাও যা'ব স্বামিজীর সঙ্গে। স্বামিজীকে ছেড়ে আমরা আর কোনমতেই থাকতে পারবো না এদেশে,—তা হোক্ না,—এ আমাদের স্বদেশ! ভারতে গিয়ে আমরা স্বামিজীর অনুষ্ঠিত কার্য্যেই কাটিয়ে দেব জীবনের শেষ কয়েকটা দিন।"

স্বামিজীর সঙ্গে ভারতে যাবার জন্যে আর একজনও প্রস্তুত হ'য়ে উঠলেন পরম আগ্রহে। তিনি মিঃ গুডউইন,—যিনি সাংকেতিক লিপিকৌশলে স্বামিজীর বক্তৃতাবলি লিপিবদ্ধ করতে এসে—সমগ্র মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবেসেছিলেন স্বামিজীকে।—স্বামিজীও যাঁকে একান্ত আপনভাবে—পরম স্নেহে স্থান দিয়েছিলেন অন্তরের মাঝে।

তা'ছাড়া, কথা হ'লো,—মিস মূলার এবং কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল এখানে অবিরত প্রস্তুত থাকবেন—স্বামিজীর আহ্বানের অপেক্ষায়। স্বামিজী তাঁদের যখনই আহ্বান করবেন, তখনই তাঁরা রওনা হবেন ভারতের উদ্দেশে,—স্বামিজীর নির্দ্দেশমত স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করবেন তাঁরা সেখানে।

কিন্তু ইংলণ্ড ত্যাগের আয়োজন করতে করতেই ডিসেম্বর মাস এসে গেল। বিদায়-গ্রহণের দিন স্থির হ'লো ১৬ই ডিসেম্বর। পিকাডিলিতে বিরাট সভা ক'রে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হ'লো স্বামিজীকে। নিকটের তো কথাই নেই,—দূর-দূরান্তর থেকেও শত শত নরনারী এসে যোগ দিল সে সভায়। স্বামিজীকে আবার একটিবার দেখতে এবং তাঁর মুখের প্রাণস্পর্শী বাণী আবার শুনতে,—ছুটে এলো তারা যেন কি-এক দুর্ব্বার আকর্ষণে!

আকুল জিজ্ঞাসা ফুটে উঠ্‌লো সকলের চোখে,—"স্বামিজী, আবার কি আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হ'বে কোনদিন?"

"হ্যাঁ",—প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন স্বামিজী,—"নিশ্চয়ই হবে। আমি আবার আসবো তোমাদের কাছে।"

আশার পুলকে বুক দুলে উঠ্‌লো সকলের। জলও টলটল করতে লাগলো অনেকের চোখে।...

চতুর্দ্দিকে উচ্চ ও গাঢ়কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো 'স্বামিজীর জয়!'...

আরব্ধ কার্য্যের ভার স্বামিজী অর্পণ ক'রলেন স্বামী অভেদানন্দের ওপর। ইতিমধ্যে অভেদানন্দের কার্য্যাদ দেখে স্বামিজীর বিশ্বাস হ'য়েছিল তাঁর

যোগ্যতার ওপর। তা'ছাড়া, যে অচিন্ত্যনীয় ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে নিঃসম্বল তিনি সুদূর বিদেশে এসেও এতখানি সফলকাম হ'য়েছেন,—তারও ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

একে একে দীর্ঘ চারটি বৎসর কেটে গেছে তাঁর পাশ্চাত্ত্য দেশে।

বিদায়ের প্রাক্কালে স্বামিজীর একজন ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে,—"আচ্ছা, স্বামিজী, বহুদিন ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ, শৌর্য্য-বীর্য্য-বিলাস-সভ্যতা ইত্যাদির কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্ত্য দেশে থেকে,—এখন ভারতবর্ষ আপনার চোখে কেমন লাগবে?"

"কেমন লাগবে?"—স্বামিজীর চোখমুখে ফুটে উঠ্‌লো একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি,—"আগে আমি আমার জন্মভূমি ভারতকে গভীরভাবেই ভালবাসতাম সত্য, কিন্তু এখন সে ভালবাসার যেন আর অন্ত নেই—সীমা নেই। এখন ভারতের বায়ু, ভারতের জল—এমন কি তার প্রতিটি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র। ....স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী!"

৬৭

লণ্ডন ত্যাগ ক'রে সশিষ্য স্বামিজী ডোভার, ক্যালে ও মণ্টসেনিস অতিক্রম ক'রে এলেন মিলান নগরে। মিলানের তুষার-দৃশ্য এবং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর-গঠিত বিচিত্র কারুশিল্প-খচিত প্রাসাদাবলী বিশেষভাবেই মুগ্ধ করলো স্বামিজীকে।

মিলান থেকে রোম।...পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রাচীন মর্ম্মকেন্দ্র—সভ্যতার আদি ভূমি,—মনীষার লীলাস্থল রোম,—তার গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ ক'রে কিছুক্ষণের জন্যে যেন কল্পনার রাজ্যে চলে গেলেন স্বামিজী। রোম সম্রাট-গণের পুরাকীর্ত্তি—প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই মনে পড়লো তাঁর একে একে। কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত হ'য়ে উঠলেন তিনি ভাবের আবেগে।

এক সপ্তাহ ছিলেন তাঁরা রোমে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রতিদিনই দেখে বেড়ালেন সকলে। রোমের স্থাপত্য-শিল্পও মুগ্ধ করলো স্বামিজীকে। সব চেয়ে আনন্দিত হলেন তিনি ক্যাথলিকদের সঙ্ঘ-গঠন সৌকর্য্য এবং কর্ম্মকুশলতা দেখে,—"হ্যাঁ, এমনি না হ'লে কি কিছু একটা সুন্দরভাবে গ'ড়ে তোলা সম্ভব?"...

রোম থেকে তাঁরা এলেন নেপল্‌সে। নেপল্‌স থেকে জাহাজ ছাড়লো ৩০শে ডিসেম্বর। সশিষ্য স্বামিজী আবার ভাসলেন অনন্ত অকূল সমুদ্রের বুকে। এবার কিন্তু বিদেশ-যাত্রায় নয়,—ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পথে।...

বেশ প্রফুল্লমনেই আসছিলেন স্বামিজী। মাঝে মাঝে পাশা খেলে সময় গত করছিলেন তাঁরা। এডেন থেকে কলম্বো বন্দর—এই পথের মধ্যে ঘটলো কিন্তু এক অপ্রীতিকর ঘটনা। দু'জন বিদেশী যুবক—উভয়েই তারা খ্রীষ্টান মিশনারী—হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা স্থরু করলো স্বামিজীরই সম্মুখে।...বিদ্রূপের স্বরে বহু নিন্দাও করতে লাগলো তারা হিন্দুধর্ম্মের। হিন্দুজাতিকেও যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগলো অর্ব্বাচীন বর্ব্বরের মত।

আর সহ্য হ'লো না স্বামিজীর। দৃপ্ত সিংহের তেজে আসন ছেড়ে উঠে একজনের গলা টিপে ধ'রে গর্জ্জে উঠলেন তিনি,—"খবরদার, যদি আর একটি বারও আমার জাতি ও ধর্ম্মের নিন্দা কর,—তা'হলে তোমাদের দু'জনকেই টেনে ফেলে দেব সমুদ্রের জলে।"

স্বামিজীর শৌর্য্যদৃপ্ত, আরক্তিম গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে—যুবকদ্বয় শিউরে উঠ্‌লো দারুণ শঙ্কায়। চোখ-মুখের রক্তও যেন কোথায় স'রে গেল তাদের। থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললে তারা,—'এবারকার মত আমাদের ক্ষমা করুন,—আর কখনো এমন কাজ করবো না।' স্বামিজীর তখনকার ভাব দেখে তাঁর শিষ্যেরাও স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়লেন সন্ত্রস্ত সম্ভ্রমে!

কিন্তু এই স্বামিজীই আবার এডেন বন্দরে নেমে একজন ভারতীয় পান-ওয়ালাকে দেখতে পেয়েই মহানন্দে ছুটলেন তাঁর কাছে। রীতিমত গল্প-গুজবই জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে! আবার কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লেও ব'সলেন,—"ভেইয়া, তোমারা ছিলুমঠো একদফা ভর্ দেও।"

স্বামিজীর জ্যোতির্দীপ্ত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে পানওয়ালা তো সাহসই করলো না প্রথমে। স্বামিজী কিন্তু আবার ব'ললেন,—"জলদী ভেইয়া, জলদী।"

পানওয়ালা তখন আর কি করে? কলকেয় ক'রে তামাক সেজে—স্বামিজীর হাতে দিলে বিশেষ কুণ্ঠিতভাবেই। স্বামিজী তামাক টান্‌তে লাগলেন মহা আরামে।

ইতিমধ্যে শিষ্য-শিষ্যারাও এসে পড়েছিলেন সেখানে। গুরুজীর কাণ্ড দেখে তাঁরা তো অবাক! মিঃ সেভিয়ার কৌতুক ক'রে ব'ললেন—ওঃ, এই জন্যেই বুঝি আমাদের ফেলে চলে এলেন এখানে!

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্বামিজী হাসলেন প্রশান্ত হাসি। স্বামিজীর পরিচয় পেয়ে পানওয়ালাও অবশেষে লুটিয়ে পড়লো তাঁর চরণে।

* * * *

ইতিমধ্যে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল স্বামিজীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ। ইংলণ্ড ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে পত্রও দিয়েছিলেন স্বামিজী—মাদ্রাজের শিষ্যগণকে এবং আলমবাজারের মঠে গুরুভ্রাতাদের।

ভারতের বড় বড় শহরে সুরু হয়েছিল স্বামিজীকে বিপুলভাবে অভিনন্দন দেবার আয়োজন। পাশ্চাত্ত্যবিজয়ী বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বদেশ ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল ক'রে বিজয়-গৌরবে ফিরে আসছেন দেশে,—যা' কল্পনা করতেও কেউ পারেনি কোনদিন,...তাই সম্ভব ক'রেছেন তিনি তাঁর অসীম প্রভাবে—দুর্জ্জয় মনোবলে;—সম্ভব ক'রেছেন অপরিমেয় প্রজ্ঞায় ও অধ্যাত্ম-শক্তিতে—এ-কি ভারতের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়?

১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৭, জাহাজ এসে নোঙ্গর ক'রলো সিংহলের কলম্বো বন্দরে। নারিকেলকুঞ্জ-শোভিত—তমাল ও তালীবন-পরিবেষ্টিত সমুদ্রতীরের কি মনোহর শোভা! সুনীল জলধিবক্ষে—শুভ্রফেনপুঞ্জের কিরীট-শিরে শতশত তরঙ্গ উঠছে অশ্রান্ত গর্জ্জনে। একবার সমুদ্রের দিকে—একবার তীরের দিকে চাইলেন স্বামিজী। মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো তাঁর সমগ্রচিত্ত এক মধুর মহান্ দৃশ্যের পটভূমিকায় আর একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর দৃশ্যের প্রতিফলন দেখে!

পুণ্যভূমি ভারতের প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'তেই এক বিপুল পুলকের স্পর্শ লাগলো স্বামিজীর প্রাণে!—ঐ-ঐ—তাঁর প্রিয় সাধের জন্মভূমি ভারত—বহুদিন পরে তিনি ফিরে আসছেন তার কোলে!...আ!....কি মধুর!—তৃপ্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো স্বামিজীর মন। পরম স্বস্তিতে জুড়িয়ে গেল সমগ্র অন্তর!

জাহাজঘাটে শত শত ব্যক্তি এসেছিল স্বামিজীকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে।...মঠ থেকে একজন গুরুভ্রাতাও এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন কলম্বো বন্দরের জাহাজঘাটে।—"জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়! জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়; জয় পাশ্চাত্ত্যবিজয়ী—ভারতগৌরব বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জয়!" ইত্যাদি ধ্বনিতে মুহুর্মুহু মুখর হ'য়ে উঠলো সমুদ্রতীর—সঙ্গে সঙ্গে সুদূরের অনন্ত আকাশ। প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্‌লো তার দূরে—অদূরে!

হ্যারিসন নামে কলম্বোবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একজন সাহেবও জাহাজে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন স্বামিজীকে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই—আকুল আগ্রহে এসে স্বামিজীকে জানালো তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। স্বামিজী বুঝলেন,—প্রকৃতধর্ম্মের মূলকেন্দ্র ধ'রে নাড়া দিতে পারলে,—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই—অন্যান্য ধর্ম্মের ব্যক্তিদেরও হৃদয় জয় করতে পারে। মানবতাকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন

ধর্ম্মই গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে না—ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্বকে যে একই পর্য্যায়ে উন্নীত করতে পারে,—তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক,—তাঁরই বাণী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রেরণা যোগায় সকলের অন্তরে। কিন্তু যেখানে বিভেদ—যেখানে সংকীর্ণতা—সেইখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে,—আর শুধু ব্যতিক্রমই নয়, মানুষের পতনও হয়েছে সেখানে।

জাহাজ থেকে নেমে একখানি ষ্টীমলঞ্চে ক'রে তীরে গিয়ে অবতরণ করলেন স্বামিজী। অমনি স্বামিজীকে চারিপাশ হ'তে ঘিরে—সহস্র সহস্র কণ্ঠ আনন্দে পুনরায় কোলাহল ক'রে উঠলো—"জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়।"

তীরে অবতরণের পর কলম্বোর যে সুরম্য ভবনের মধ্যে প্রথম পদার্পণ করলেন, স্বামিজীর সম্মানার্থ তার নাম রাখা হ'লো 'বিবেকানন্দ-মন্দির'। ফ্লোরাল হলে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

মাননীয় পি. কুমারস্বামী দেশীয় প্রথায় স্বামিজীকে প্রণাম ক'রে—সিংহল-বাসীর পক্ষ থেকে একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করলেন ইংরাজীতে। অজস্র পুষ্পমাল্য স্বামিজীর শিরে বর্ষিত হ'তে লাগলো—নানাদিক থেকে। কুমার-স্বামী মহাশয়ও স্বহস্তে মাল্যভূষিত ক'রলেন স্বামিজীকে।

বিপুল অভিনন্দনের উত্তরে ব'ললেন স্বামিজী,—একজন ভিখারী সন্ন্যাসীকে আপনারা যেভাবে সম্বর্দ্ধনা জানালেন,—এতে ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রিয়তাই প্রকাশ পাচ্ছে সুস্পষ্টভাবে। আমি রাজা নই—ধনবান্ নই—যুদ্ধজয়ী সেনাপতিও নই,—তবু আপনারা আমাকে যে রাজোচিত সম্মান দেখালেন,—এর চেয়ে ধর্ম্মপ্রাণতার নিদর্শন আর কি হতে পারে? তবে এ সম্মান আমার নয়,—একে আমি একটি নীতির প্রতি সম্মান ব'লেই মনে করি। ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড,—হিন্দুকে বাঁচতে হ'লে—তাকে নিতেই হ'বে তার ধর্ম্মের আশ্রয়।

* * * *

এরপর কলম্বো হ'তে বহু লোকের সাগ্রহ অনুরোধে স্বামিজী এলেন কাণ্ডিতে। কাণ্ডি থেকে অনুরাধাপুর হ'য়ে এলেন জাফনায়। সর্ব্বত্রই তিনি অভিনন্দিত হলেন—বিপুলভাবে।…সর্ব্বত্রই তাঁর জয়রবে আকাশ-বাতাস মুখর হ'য়ে উঠলো।

জাফনায় প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোকের এক বিরাট জনতা অভিনন্দন জানালো স্বামিজীকে। ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি—স্বামিজীর কণ্ঠে পুষ্পমাল্য

অর্পণ ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাঁকে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়,—অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও স্বামিজীর পরিচয় জানতো না সিংহলবাসী। কিন্তু অংশুমালীর অংশু-সম্পাতে বিশ্ব যখন আলোক-স্নাত হ'য়ে ওঠে,—তখন তার উদয়ের বার্ত্তা পেতে বাকী থাকে কা'র !

৬৮

জাফনা থেকে ভারতবর্ষ জলপথে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। সশিষ্য স্বামিজী একখানা দেশী জাহাজে ক'রে যাত্রা করলেন ভারতের অভিমুখে। জাহাজ যতই ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো,—ততই তাঁর মনপ্রাণ নেচে উঠতে লাগলো—যেন বহুদিন পরে কোন প্রিয়তম বস্তু ফিরে পাওয়ার আনন্দে !

পথে পাম্বান দ্বীপ। দ্বীপটি ক্ষুদ্র এবং ভারতের অতি নিকটে। স্বামিজীর রাজশিষ্য রামনাদ-অধিপতি ভাস্কর-সেতুপতি স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত এখানে এসে অভ্যর্থনা জানালেন স্বামিজীকে। নিঃস্ব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরণে লুটিয়ে পড়লো—অগাধ ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর নৃপতির মুকুটমণ্ডিতশির পরম ভক্তিভরে। স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাগণ সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত চিত্তে ভাবতে লাগলেন,—ভারতীয় নীতির মহান্ বৈশিষ্ট্যের কথা। নৃপতির গরিমাদীপ্ত শির লুণ্ঠিত হয় যেখানে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পদতলে,—শুধু তাঁর আন্তর সম্পদের প্রভাবে,—সে কোন্ স্বর্গচ্যুত দেশ ?—অথবা স্বর্গই কি নেমে এসেছে নাকি সেখানে ?

পুষ্পরাজি-মণ্ডিত বিরাট চন্দ্রাতপতলে—সভার বিপুল আয়োজন ক'রে অভিনন্দন জানান হ'লো স্বামী বিবেকানন্দকে। পাম্বানবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম্ পিলে পাঠ করলেন অভিনন্দনপত্র। অভিনন্দনপত্রের একস্থলে বলা হ'লো—হে পাশ্চাত্যবিজয়ী হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-পতাকাবাহী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান বীরসন্ন্যাসী,—আপনি এবার নিদ্রিত ভারতকে তার বহুকালের অকালনিদ্রা হ'তে জাগিয়ে তুলুন।

অতঃপর রাজকীয় বিপুল সমারোহে—রাজোচিত ব্যবস্থায় মহারাজ ভাস্কর-সেতুপতি স্বামিজীকে নিয়ে রওনা হ'লেন রামনাদের দিকে—এ অঞ্চলটি হ্রদ-বহুল। স্থলপথ রাজশিবিকায় এবং জল-(হ্রদ)-পথ মহারাজার একখানি সুসজ্জিত মনোরম তরণীযোগে অতিক্রম ক'রে সশিষ্য স্বামিজী উপস্থিত হ'লেন

এসে—হ্রদের উপকূলে। স্বামিজীকে অভিনন্দন-জ্ঞাপনের বিপুল আয়োজন হ'য়েছিল সেখানে।

রামনাদে স্বামিজীকে যে সম্মান দেওয়া হ'লো—তার বিপুলত্ব কল্পনা করাও দুরূহ। সেদিনকার সেই সম্বর্দ্ধনা একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনারূপেই স্থান পেয়েছে—ভারতের জাতীয় জীবনে। সন্ন্যাসীগুরু এবং রাজশিষ্যের স্নেহ-ভক্তি আদান-প্রদানের মহিমময় দৃশ্য দেখে—শুধু দর্শকবৃন্দই নয়,—পাশ্চাত্যের ভক্তমণ্ডলীও অভিভূত হ'য়ে পড়লেন একান্তভাবে। স্বামিজীর কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত বাণী ন্যায় ও সত্যের আহ্বানরূপে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতই ক্রিয়া করলো প্রতিটি অন্তরে। দিকে দিকে গভীর নির্ঘোষে নিনাদিত হ'লো স্বামিজীর জয়ধ্বনি।

স্বামিজী উপাসনা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন এখানে। তাতে বলেন,—"মন্দিরে মন্দিরে শিব-বিগ্রহের আরাধনা সেইদিন হ'বে সার্থক,—যেদিন দীন-দরিদ্রের অন্তরে জীবরূপী যে শিব আছেন,—তাঁর অর্চ্চনা হ'বে।" স্বামিজীর বাণীর মর্ম্মার্থ উপলব্ধি ক'রে মহারাজ ভাস্কর সেতুপতি সহস্র সহস্র দীন-আতুরকে অন্নবস্ত্র দান করেন অকাতরে এবং মুক্তহস্তে।

পাশ্চাত্ত্য জয় ক'রে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে স্বামিজী ভারতভূমির যেখানে প্রথম পদার্পণ করেন—রামনাদ-অধিপতি কর্ত্তৃক একটি বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয় সেখানে। আজও সেই পুণ্য স্মৃতিস্তম্ভ স্বামিজীর বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তির কথা প্রচার করছে সগৌরবে।

এরপর স্বামিজী এলেন পরমকুড়ি,—পরমকুড়ি থেকে মনমদুরা। পরমকুড়ির হিন্দুগণ স্বামিজীকে অভিনন্দন জানিয়ে ব'ললেন,—"আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখে—আমাদের ভারতের সেই প্রাচীন ঋষিদের কথাই স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। তাঁদের মতই আপনি তপস্যা ও আত্মসংযমদ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি ক'রে মানবজাতির প্রকৃত আচার্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।"

মনমদুরার অভিনন্দনপত্রে বলা হলো,—যে সময় পাশ্চাত্য জড়বাদ ভারতীয় ধর্ম্মের ওপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল, ঠিক সেই সময় আপনার ন্যায় শক্তিমান আচার্য্যের অভ্যুদয়ে আবার নবপ্রাণ জেগে উঠবে ভারতের ধর্ম্মজগতে।"

সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় পরমকুড়ি ও মনমদুরার অধিবাসিগণকে পরম আনন্দ দান ক'রে স্বামিজী কুম্ভকোণম্ হ'য়ে যাত্রা করলেন মাদ্রাজের অভিমুখে।

৬৯

মাদ্রাজ চলেছেন স্বামিজী ট্রেনযোগে। প্রতি স্টেশনে গাড়ী থামবামাত্রই বিরাট জনতা আকুল আগ্রহে ছুটে আসে তাঁর কামরার পাশে...স্বামিজীকে একবারমাত্র দেখে—ধন্য মনে করে তাঁরা নিজেদের জীবন। শতশত কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে,—স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে।

কয়েকটা স্টেশন পরে একটা ছোট স্টেশন। এ-গাড়ী থামে না সেখানে। তবু বহু লোক এসে—গাড়ী থামাবার জন্যে অনুরোধ করে স্টেশন-মাস্টারকে। "তা কি সম্ভব?"—আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেন মাস্টার—"আমি কোন্ অধিকারে এখানে গাড়ী আটকিয়ে দেবো?—অন্যায় অনুরোধ ক'রো না তোমরা।"

লোকগুলি মানতে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত অন্য উপায় না দেখে—তারা শুয়ে পড়ে রেল লাইনের ওপর। যেন স্বামিজীকে একবার দেখবার জন্যে জীবনও দিতে পারে তারা অনায়াসে। গার্ডসাহেব ব্যাপারটা কিছুদূর থেকেই কতকটা আন্দাজ ক'রতে পেরেছিলেন। পাছে কতকগুলো লোকের জীবন অযথা নষ্ট হয়,—এই আশঙ্কায় গাড়ী থামিয়ে দিলেন তিনি স্টেশনে। একজন সন্ন্যাসীর প্রতি জনগণের এই বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে—তিনিও অভিভূত হ'লেন অপরিমেয় বিস্ময়ে।

গাড়ী থামতেই লোকগুলি উল্লাসে মত্ত হ'য়ে—রেল লাইন থেকে উঠে এলো স্বামিজীর কামরার পাশে। জীবনে আজ যেন পরম সৌভাগ্য লাভ ক'রলো তারা। বিপুল জয়ধ্বনি ক'রে স্বামিজীকে নিবেদন করলো তাদের অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য।

তাদের এই নিষ্ঠা,—এই আকুল কামনা—এই হৃদয়স্পর্শী ভাবপ্রবণতা স্বামিজীর অন্তরেও জাগালো পরম প্রীতি,—কে বলে ভারত ধর্ম্মভ্রষ্ট?—একজন ধর্ম্মবেত্তা সন্ন্যাসীর প্রতি এখনও যে-দেশের জনসাধারণ এত গভীরভাবে অনুরক্ত হ'তে পারে—তার মর্ম্মকেন্দ্রে ধর্ম্ম আপন গৌরবে জেগে আছেন নিঃসন্দেহে!...না, ভারত আবার উঠবে! আবার তাঁর জাতীয় জীবন গৌরবান্বিত হ'বে—ধর্ম্মের পুণ্য প্রভাবে!

স্বামিজীর সমগ্র চিত্ত নেচে উঠ্‌লো অপূর্ব্ব উল্লাসে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কয়েকটি কথায় জানালেন তিনি সকলকে তাঁর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

*　　*　　*　　*

স্বামিজী মাদ্রাজে পৌছতেই—সমগ্র শহরের বুকে সে-যে কি গভীর আলোড়ন জেগে উঠ্‌লো,—ভাষার এমন শক্তি নেই,—তা ব্যক্ত করে! মাদ্রাজ যেন মুহুর্মুহু উথলে উঠ্‌তে লাগলো হর্ষোল্লাসে! লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো,—স্বামিজীর জয়। শ্রদ্ধাপূত বহু বিশেষণে বিশেষিত ক'রেও স্বামিজীর অপার মহিমা যেন প্রকাশ করতে পারলো না মাদ্রাজবাসী!

স্টেশন থেকে স্বামিজীকে নিয়ে আসা হ'লো বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে। তাঁর যাত্রাপথে ইতিপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হয়েছিল কয়েকটি পুষ্পতোরণ।···সর্ব্বত্র তোপ-ধ্বনি ক'রে বিপুল সম্মান জানানো হ'লো তাঁকে। প্রত্যেকটি গৃহ পুষ্পসম্ভারে, লতায়-পাতায়, নারিকেল-পত্রে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিল—স্বামিজীকে বরণ করবার জন্যে। প্রায় প্রতি গৃহদ্বারে স্থাপিত হয়েছিল আম্রপল্লব-শোভিত মঙ্গল-কলস। অগণিত লোক পথের দুইপার্শ্বে—গৃহের অলিন্দে—জানালার ধারে—ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে মাথা নত ক'রে—স্বামিজীকে জানালো তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। চতুর্দ্দিক থেকে স্বামিজীর শিরে বর্ষিত হ'লো অজস্র পুষ্পমাল্য।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ,—কত রাজা, জমিদার স্বামিজীকে বরণ করলেন জয়মাল্য দিয়ে।··· বস্তুতঃ, মাদ্রাজে তাঁকে যে বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হ'লো,—একমাত্র লর্ড রিপণ ছাড়া আর কোন রাজপ্রতিনিধির ভাগ্যেও সেরূপ জোটেনি সেদিনকার ভারতে।

মাদ্রাজ থেকেই স্বামিজী যাত্রা করেন সাগরপারে। মাদ্রাজী যুবকগণের উৎসাহ, ত্যাগ ও উদ্যমের ফলেই তিনি ব্রতী হ'য়েছিলেন অসাধ্য-সাধনে।··· আজ স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য জয় ক'রে—সমুন্নত ললাটে ফিরে এসেছেন;—মাদ্রাজের এ-আনন্দ,—এই বিপুল গৌরবের কি তুলনা থাকতে পারে?

মাদ্রাজে যে আলোড়ন জাগলো,—আসমুদ্র-হিমাচল ভারত নেচে উঠ্‌লো তার তরঙ্গ-লাস্যে। মাদ্রাজ ভারতের নব অভ্যুত্থানের উৎস-স্বরূপ।···সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে মাদ্রাজই যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগ সাধন ক'রছে বহুকাল ধ'রে।

মূল অভিনন্দনপত্র ছাড়াও স্বামিজীকে এখানে নানা ভাষায় লিখিত বহু প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় কুড়িটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হ'লো।···'এসো শান্তির অগ্রদূত, এসো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সন্তান, নবভারতের স্রষ্টা—প্রাচ্যের

গৌরবরবি, প্রতীচ্যবিজয়ী বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, এসো নিদ্রিত ভারতের জাগ্রত প্রহরী',—ইত্যাদি নানা স্বতোস্ফুর্ত্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আন্তরিক সম্ভাষণে অভিহিত করা হ'লো তাঁকে। বহুভাবে—বহু বাক্যে স্বামিজীর কর্ম্মজীবনের বিরাট সাফল্য এবং তাঁর সুস্থ, সুদীর্ঘ জীবন কামনা করা হ'লো প্রতিটি অভিনন্দনপত্রের ছত্রেছত্রে।

মাদ্রাজের এই বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস এবং সুগভীর গৌরবানুভূতির দিকে চেয়ে স্বামিজীও বিচলিত হ'য়ে পড়লেন হৃদয়াবেগে! মাদ্রাজ যেন অমৃতস্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে প্রাণ-প্রাচুর্য্যে। পরিপূর্ণ অন্তরে কয়েকটি মর্ম্মগ্রাহী বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী এখানে। তারমধ্যে,—ভারতীয় জীবনে বেদান্তের নিয়োগ, ভারতের ভবিষ্যৎ, আমার সমরপন্থা ইত্যাদি বিশেষভাবেই আলোড়িত করলো সকলের অন্তর।

প্রায় নয়দিন মাদ্রাজে থেকে স্বামিজী স্টীমারে চ'ড়ে অগ্রসর হ'লেন কলকাতা অভিমুখে।·· স্টীমারঘাটে বিপুল জনতা তাঁকে বিদায়-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলো। অসংখ্য কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো—জয়তু স্বামিজী!

৭০

স্বামিজীর স্টীমার এসে থামলো খিদিরপুরে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল—স্বামিজীর প্রত্যাগমনের। দূর থেকে স্বামিজীর বালার্ক-কিরণ-নিভ ভাস্বরমূর্ত্তি দেখতে পেয়ে উল্লাসে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো সকলে—"জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়।···স্বাগত হে বাংলার বিশ্ববিজয়ী বীর সন্তান!"

দ্বারভাঙ্গাধিপতির নেতৃত্বে স্বামিজীকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য যথারীতি গঠিত হয়েছিল একটি অভ্যর্থনা-সমিতি! সমিতির সুব্যবস্থায় সশিষ্য স্বামিজী একখানি স্পেশাল ট্রেনযোগে—পৌছলেন এসে শিয়ালদহ স্টেশনে।

শিয়ালদহ তখন জনারণ্য! চারিদিকে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না! অসংখ্য জনকণ্ঠের সম্মিলিত কোলাহলে মহাসিন্ধুর বক্ষে উঠ্ছে তখন যেন গভীর কল-কল্লোল! প্রায় বিশ সহস্র লোক একযোগে মাথা নত ক'রে অভিনন্দন জানালো স্বামিজীকে।...কি সে-বিরাট মহিমময় দৃশ্য,—একজন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর জন্যে কি-সে চিত্তস্পর্শী হৃদয়-নিবেদন!

কি করেছেন এই সন্ন্যাসী ?···রাজ্য জয় ক'রেও ফেরেননি,—সৈন্যাপত্য নিয়ে শাণিত অস্ত্রমুখে লক্ষ লক্ষ বলি দিয়ে—যুদ্ধও জয় করেননি।···তবু—তবু জনচিত্তে এ-গভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস কেন ?···তার উত্তর দিচ্ছে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশ। এ পশুশক্তির জয় নয়,—এ জয় নৈতিক,—এ জয় মানবিকতার—এ জয় জগতের কল্যাণ সাধন করবে—যুগ-যুগান্ত ধ'রে !

স্বামিজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাগণকে দেখে—বিস্ময় আরও গভীর হ'য়ে উঠলো সকলের ! এতদিন যা' শুধু কানে শোনা ছিল,—আজ ফুটে উঠলো তা' অগণিত চক্ষুর ওপর একান্ত সুস্পষ্টভাবে। কি গভীর আলোড়ন অন্তরের মধ্যে জাগাতে পারলে সুশিক্ষিত সুসভ্য পাশ্চাত্ত্যবাসী—অবনত মস্তকে শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে—সকল সুখ-সম্পদের লীলাভূমি স্বদেশ ছেড়ে আসতে পারে বহু দিনের অবজ্ঞাত এই সুদূর ভারতে ?···অভিভূত চিত্তে ভাবতে চেষ্টা করলো সকলে—এই অসম্ভব-অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের গুরুত্ব।

কিন্তু কে এই সন্ন্যাসী ?···এই সেই নরেন,—একদিন পিতৃহীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে যে—লাঞ্ছিত—অনাদৃত,—তবু হয়নি একমুষ্টি উদরান্নের সংস্থান। জ্ঞাতিবর্গ যাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে চিরতরে। দুর্নিবার প্রতিকূলতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে—কোনরূপে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'য়েছে একদিন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভের আশায়।···কে জান্‌তো, এতবড় বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে—সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে ! কে সন্ধান পেয়েছিল, —নরেনের মধ্যে নিহিত আছে এই বিশ্বজয়ী বিরাট শক্তি ?

পেয়েছিলেন শুধু একজন,—যাঁর দিব্যদৃষ্টির নিকট জগতের কোন কিছুই অগোচর ছিল না।···যিনি সঞ্চার ক'রে গেছেন নরেনের বুকে—অসীম প্রেরণা, অনন্ত শক্তি !···তাই তো যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ব'লতে পেরেছিলেন মুক্তকণ্ঠে—"নরেন জগৎ মাতাবে।"—

পরিপূর্ণভাবে সফল হ'য়েছে গুরুর আশীর্ব্বাদ ;—বর্ণে বর্ণে সার্থক হ'য়েছে—বাক্‌সিদ্ধ পুরুষের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী।.

অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থায় একখানি ল্যাণ্ডো প্রস্তুত ছিল সেখানে। স্বামিজী ল্যাণ্ডোতো আরোহণ ক'রলেন। সেভিয়ার দম্পতিও গাড়ীতে উঠে বসলেন স্বামিজীর সঙ্গে,—স্বামিজীর গুরুভ্রাতারাও খিদিরপুর থেকে যোগ দিয়েছিলেন এই শোভাযাত্রায়। কিন্তু এ-যাবৎ পরস্পর কোন কথাবার্ত্তার সুযোগ ঘটেনি তাঁদের। ল্যাণ্ডো অগ্রসর হ'লো সার্কুলার রোড দিয়ে। কিন্তু খানিকটা না-যেতে যেতেই কোথা থেকে ছুটে এলো—স্কুল-কলেজের ছেলেরা ; গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে—মহানন্দে তারা নিজেরাই টানতে লাগলো সেই ল্যাণ্ডো।

চতুর্দ্দিক থেকে অজস্র পুষ্পমাল্য—রাশি রাশি পুষ্প এসে প'ড়তে লাগলো—স্বামিজীর শিরে। পথে পথে অজস্র কণ্ঠে দিক-বিদিক মুখর ক'রে উঠতে লাগলো স্বামিজীর জয়ধ্বনি।···কয়েকটি সুসজ্জিত পুষ্প-তোরণ অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চ'ললো স্বামিজীর ল্যাণ্ডো ধীরে ধীরে।

* * * *

বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাড়ীতে স্বামিজী মিলিত হলেন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে! সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে স্বামিজী এলেন আলমবাজারের মঠে। পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য-শিষ্যাগণের থাকবার বন্দোবস্ত হ'লো গোপাললাল শীলের কাশীপুরের বাগানে।

স্বামিজীকে একবারমাত্র দেখবার জন্যেই যে কত লোক আসতে লাগলো,—তার সংখ্যা নির্ণয় করাও শক্ত। স্বামিজী কখনো মঠে—কখনো কাশীপুরের বাগানে থাকতেন। বহু জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত এবং উপদেশ-প্রার্থী ব্যক্তিও আসতেন স্বামিজীর সান্নিধ্য-লাভের আশায়।···ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই,—নেই উপেক্ষা বা অবহেলা,—স্বামিজী দর্শন দিতেন প্রত্যেককেই। প্রত্যেকের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতেন অকুণ্ঠায় এবং প্রীতিভরে। যিনি আসতেন—তাঁরই মনে হতো,—আজ তাঁর জীবন ধন্য হ'লো।

পাশ্চাত্ত্যের বহু মনীষী বন্ধু এবং অনুরাগীও স্বামিজীকে পত্র লিখতেন আগ্রহভরে। এদের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রফেসর এভারেট, পাশ্চাত্ত্যের অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ প্রফেসর জেমস, প্রফেসর রাইট (গ্রীক ভাষার অধ্যাপক), ডাঃ জেমস প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে বিশেষভাবে। তা'ছাড়া, নানাদিক থেকে অসংখ্য অভিনন্দনপত্র এবং টেলিগ্রাম তো আছেই।

* * * *

মহানগরী কলিকাতার অধিবাসিগণের পক্ষ থেকে স্বামিজীকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হ'লো ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৭)। সভার অধিবেশন হ'লো শোভাবাজার রাজবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে।—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রহণ করলেন সভাপতির আসন। অভিভাষণের একস্থানে স্বামিজীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন তিনি,—এই পুরুষসিংহ ভারতের জাতীয় জীবনে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন। লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ এমন একজন মহাপুরুষ দেখতে পাওয়া যায়।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামিজী বহু কথার মধ্যে ব'ললেন,—"মানুষ নিজের মুক্তির প্রচেষ্টায় জগৎ-প্রণেতার সম্বন্ধও ত্যাগ করতে চায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মায়া কাটিয়ে—সংসার থেকে দূরে—অতি দূরে চ'লে যায়। কিন্তু একটি সুর সর্ব্বদাই তার কানে বাজতে থাকে,—

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

হে কলিকাতার নাগরিকগণ, আমি আজ তোমাদের কাছে সন্ন্যাসীরূপে আসিনি,—ধর্ম্মপ্রচারকরূপেও নয়।—আমি এসেছি আগেকার সেই বালকরূপে। সাধ হয়, নগরীর ধূলায় ব'সে সরল প্রাণে—তোমাদের সকলকে মনের কথা সব খুলে বলি।"

তারপর চিকাগো ধর্ম্মসভা থেকে সুরু ক'রে ইউরোপে অবস্থানকালের অন্যান্য বিষয় বর্ণনার পর তিনি ব'ললেন ভক্তি-উদ্বেলিত কণ্ঠে,—"আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য,—আমার জীবনের আদর্শ,—আমার ইষ্ট—আমার দেবতা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আমার মধ্যে যা' কিছু দোষযুক্ত—যা' কিছু দুর্ব্বল—সবই আমার। যা' কিছু জীবনপ্রদ—যা' কিছু পবিত্র,—সকলই তাঁর শক্তির খেলা। তাঁরই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। জগৎ এখনও সে মহামানবের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেনি।"

যুবকগণকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।...ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ে কাল কাটিয়ো না। শুভ মুহূর্ত্ত আগত!...আমিও একদিন বালক ছিলাম তোমাদেরই মত। তোমাদেরই মত খেলাধূলা ক'রে বেড়িয়েছি পথে পথে।...ওঠ, জাগো, জগৎ তোমাদের আহ্বান ক'রছে। অনন্ত কাজ প'ড়ে আছে তোমাদের জন্যে।....আমি তো এখনও কিছুই করতে পারিনি—তোমাদেরই সব করতে হ'বে।...আমি যদি এতদূর করতে পারি,—তোমরা আমার চেয়ে আরও কত বেশি করতে পার!....আমার দেশের ওপর আমি বিশ্বাস রাখি—বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকদের ওপর আমার বিশ্বাস অগাধ!"

স্বামিজীর পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে যারা তাঁর বিরুদ্ধে আলোচনায় শতমুখ হ'য়ে উঠেছিল,—আজ ক'লকাতার অভিনন্দন-সভায়,—তার সর্ব্ব-চিত্ত-সম্মোহিনী—অমৃত-মধুর বাণী শুনে,—এবং এত বড় কাজ ক'রেও তাঁর নিরভিমান হৃদয়বত্তা, বিনয় ও সৌজন্য দেখে,—সম্পূর্ণ বদলে গেল তাদের ধারণা। তারা আজ বেশ বুঝতে পারলো,—সূর্য্যকিরণ যেখানেই পতিত হোক্,—কলুষিত হয় না; বরং কলুষিত স্থানকেই পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে! অনেকে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিতও হ'য়ে উঠলো নিজেদের হীন অপপ্রচারের কথা স্মরণ ক'রে। অনেকের অন্তর

আবার স্বামিজীর অন্তরের বিশালতার পরিচয় পেয়ে ভ'রে উঠলো পরম শ্রদ্ধায়।
কয়েকদিন পরে 'সর্ব্বাবয়ব-বেদান্ত' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী স্টার থিয়েটারের হলে। এই বক্তৃতায় তিনি ব'ললেন,—বেদান্ত-প্রচারের দ্বারাই একদিন ভারতের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে।...

৭১

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি। বিরাট উৎসবের আয়োজন হ'য়েছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে।...কত ভক্ত, অনুরাগী, কত ধর্ম্মপিপাসু এসে যোগ দিয়েছেন সে পুণ্য অনুষ্ঠানে।—
বেলা প্রায় নয়টা কি দশটার সময় স্বামিজী এসে পৌছলেন কালীবাড়ীতে। গুরুভ্রাতারাও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। শিরে গৈরিক রঙের উষ্ণীষ,—গৈরিক বর্ণের সুদীর্ঘ আলখাল্লায় আবৃত সারাদেহ,—পদদ্বয় নগ্ন,—স্বামিজীর সেই অপূর্ব্ব বেশ মুগ্ধ-শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুললো সমাগত জনগণকে। বহুদিন স্বামিজী যোগ দেননি ঠাকুরের জন্মোৎসবে; এবারকার উৎসবে তাঁকে পেয়ে সকলের অন্তরে সে কি বিপুল আনন্দ! পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় শির নত ক'রে সকলেই অভিবাদন জানালো স্বামিজীকে।
কালীমন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য দর্শনার্থী। মধুবর্ষী নেত্রে স্বামিজী চাইলেন একবার সকলের দিকে—তারপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন কল্যাণময়ী বিশ্বপালিকা শ্রীশ্রীকালীমাতার পূর্ণপ্রাণময়ী প্রতিমার সম্মুখে।...শত শত শির অমনি নুয়ে পড়লো মন্দির-চত্বরে।
অতঃপর শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম ক'রে স্বামিজী প্রবেশ করলেন—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর বাসকক্ষে। সে কক্ষেও তখন অগণিত লোক। স্বামিজীকে দেখেই জয়ধ্বনি উঠলো সকলের কণ্ঠে,—জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ! জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ!
স্বামিজীর মনে হ'লো—ঠাকুর যেন কালীবাড়ীর সর্ব্বত্র অবস্থান করছেন সূক্ষ্মদেহে। চতুর্দ্দিকেই বিরাজ করছে তাঁরই অসীম পুণ্যময় প্রভাব। তিনি অন্তর্দ্ধান ক'রেও মূর্তিমন্ত হ'য়ে রয়েছেন যেন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে।

পঞ্চবটীতেও হ'য়েছিল বহু ভক্তের সমাগম। স্বামিজী তাঁর দুটি ইংরেজ শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শনে। ইংরাজ মহিলাদ্বয় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন,—যাঁর মানস-সন্তান তাদের বিশ্ববন্দিত আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ—সেই যুগ-পাবন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এখানে তাঁর ঐকান্তিক সাধনায়। পঞ্চবটীতে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হ'লো পরম ভক্ত নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে।

বহুদিন পরে উভয়ে উভয়কে পেয়ে সে-কি হর্ষোল্লাস! গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম ক'রে বললেন স্বামিজী,—জি. সি. সেই একদিন,—আর এই একদিন।

গিরিশচন্দ্রকে জি. সি. ব'লেই ডাকতেন স্বামিজী। ভক্তিও করতেন অগ্রজের মত। স্বামিজী আজ উঠেছেন বহু উচ্চে। তবুও গিরিশচন্দ্র দেখলেন,— নিরহঙ্কারে, বিনয়ে ও সারল্যে—'নরেন' সেই আগেকার নরেনই আছে।

"কিন্তু কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস?"—ব'ললেন গিরিশচন্দ্র মধুর হেসে আগ্রহভরে —"আরো দেখি, আরো দেখি।"

এরপর দু'জনে যেসব কথাবর্ত্তা হ'লো—তার মর্ম্ম তাঁরাই বোঝেন।

স্বামিজী চ'লে গেলে গিরিশচন্দ্র সকলকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন,—নরেন আমেরিকায় থাকতে দুষ্টলোক বহু কুৎসা রটনা করেছিল কাগজে কাগজে —তার নামে। কিন্তু আমি তখনই বলেছিলাম,—নরেনকে যদি নিজের চোখেও কোন অন্যায় করতে দেখি,—বুঝবো আমার চোখের দোষ আছে। চোখই উপড়ে ফেলবো তখন। ওরে, ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন,— ও-কি আর জলে মেশে!

* * * *

গোপাল শীলের কাশীপুরের বাগান। সমাগত দর্শনার্থিগণকে উপদেশ দিচ্ছেন স্বামিজী। প্রতিদিন এমন কত দর্শনার্থীই না আসে!...কথায় কথায় ব'ললেন স্বামিজী,—পরের কল্যাণের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করা সেবাধর্ম্মের পরম আদর্শ।

একটি যুবক এসে স্বামিজীকে প্রণাম ক'রে বসলো তাঁর সামনে।—"আমি অনেক কিছু করেছি স্বামিজী,"—ব'ললে সে বিনীতকণ্ঠে কোন ভূমিকা না ক'রেই—"কিন্তু সত্য যে কি, আজও ঠিক জানতে পারিনি।...তাই জীবনে শান্তিও পাইনি।"

যুবকদের প্রতিই স্বামিজীর লক্ষ্য ছিল সমধিক। দেশের যুবশক্তির ওপর অনেক আশা-ভরসা রাখতেন তিনি। তাই তাদের উৎসাহও দিতেন আগ্রহভরে। যুবকটিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি সস্নেহে,—"ভয় নেই

বৎস, আমারও মনের অবস্থা একদিন ঐরকমই ছিল। নিষ্ঠা নিয়ে চ'ললে সব ঠিক হ'য়ে যাবে সময়ে।…আচ্ছা, শান্তিলাভের আশায় তুমি কি কি করেছ বল দেখি ?"

যুবক উত্তর দিলে,—বড় বড় ধর্ম্ম-সংস্কারক ও পণ্ডিতদের উপদেশে আমি দেব-বিগ্রহের পূজা এবং জপতপ করেছি দিনের পর দিন নিবিষ্টচিত্তে। প্রত্যহই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে বসি চোখ বুজে; ধ্যানও করি অনেকক্ষণ। কিন্তু তবু শান্তি পাই না।

"পাবে, পাবে।"—স্বামিজীর স্বরে সেই আশ্বাসের ভাব,—"কিন্তু যা' ক'রছো, ঠিক তার উল্‌টোটি করতে হ'বে। দ্বার বন্ধ করলে চ'লবে না। দ্বার খোলা রেখে চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে …আশে পাশে দেখবে,—কত লোক তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় আছে। তাদের সাহায্য করবে।"… একটু থেমে ব'ললেন,—'যথাসাধ্য পরের উপকার কর, ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন দাও,—তৃষ্ণার্ত্তকে জল দাও—আর্ত্ত-পীড়িতের সেবা কর। তা'হলেই দেখবে মনে শান্তি আসবে।'

'কিন্তু স্বামিজী,'—যুবক উত্তর দিলে কুণ্ঠিতভাবে,—'রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে—যদি আমারই কোন বিপদ হয়?…রাত জাগতে গিয়ে—সময়ে অসময়ে খেয়ে—নানা অনিয়মে যদি আমি নিজেই শেষে—

'থাক্, থাক্, বুঝেছি!'—বিরক্তির সহিত বাধা দিলেন স্বামিজী,—'তোমার সে চিন্তা নেই। তুমি কোনদিনই পরের উপকারের জন্যে রাত জাগতে যাবে না,…কাজেই তোমার রোগে পড়বারও ভয় নেই। নিজের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে কেউ কি কখনো পরের হিত করতে পেরেছে বাপু?'

যুবক হতভম্বের মত চেয়ে রইলো স্বামিজীর মুখের দিকে। তার কণ্ঠে আর একটি কথাও যোগালো না।…

একদিন এক প্রবীণ অধ্যাপক এসে ব'ললেন স্বামিজীকে,—তুমি যে কেবল সেবা, দান আর পরোপকারের কথা বল,—ওসব তো মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। অথচ বেদান্তের মতে মুক্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য।

অধ্যাপকমশায় ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত। কাজেই স্বামিজী তাঁকে শ্রদ্ধাভরেই উত্তর দিলেন সবিনয়ে,—'কিন্তু মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়?—বেদান্ত কি ব'লছেন না যে, আত্মা চিরমুক্ত? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্যে চেষ্টা কিসের?'

নীরবে মাথা নত ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলেন অধ্যাপক। কিন্তু প্রতিবাদের কোন কথা খুঁজে পেলেন না।..

"আমি হীন, আমি তুচ্ছ, আমি নগণ্য, আমার দ্বারা আর কি হ'তে পারে ?"— বিনয়ের নামে এইসব হীনতা মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না স্বামিজী। তিনি ব'লতেন,—নিজের সম্বন্ধে এমনি ভাবতে ভাবতে সত্যিই তুচ্ছ-হীন হ'য়ে পড়ে মানুষ। শক্তি-যোগ্যতা ইত্যাদি থাকতেও তার দ্বারা আর কিছু হয় না।

তাই সেদিন এক বৈষ্ণব এসে যখন ব'ললেন,—'তৃণাদপি সুনীচেন—নিজেকে তৃণের চেয়ে তুচ্ছ নীচ জ্ঞান করতে না পারলে ধর্ম্মজীবনে মানুষের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।'—

তখন গর্জ্জে উঠলেন স্বামিজী,—'কি ? নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করবো।—কেন ? আত্মগ্লানিতে কি লাভ ? আমরা জ্যোতিঃর সন্তান, যে জ্যোতিঃতে বিশ্ব-জগৎ উদ্ভাসিত, আমরা তার মধ্যেই বেঁচে আছি,—চলাফেরা করছি সেই জ্যোতিঃতরঙ্গে। প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছেন, জীবাত্মারূপে পরমাত্মা। আমি যদি নিজেকে ছোট ভাবি, তবে কি আমার অন্তরস্থ পরমাত্মাকেই ছোট করা হয় না ?'

ব'লতে ব'লতে ভাবাবেগে অধীর হ'য়ে উঠলেন স্বামিজী ! বৈষ্ণবটির মুখে আর কথা নেই !···

মুক্তিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এক ব্যক্তি এসেছেন সেদিন স্বামিজীর কাছে। ব'ললেন বিনীতকণ্ঠে,—স্বামিজী, আপনি তো একজন মহাতপস্বী ; কি ক'রলে মানুষ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না, সে সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিলে কৃতার্থ হবো।

স্বামিজী ব'ললেন তাঁকে,—দেখুন, গিরিগুহায় যখন নির্জ্জনে তপস্যা করতাম, তখন মুক্তি দূরবর্ত্তী দেখে—প্রায়োপবেশন ক'রে প্রাণত্যাগ করতে সংকল্প জাগতো আমার অনেক সময়। কিন্তু এখন আর আমি মুক্তি চাই না। ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন বদ্ধ থাকবে,—ততদিন নিজের মুক্তি আমার কাম্য নয়।

হাঁ ক'রে চেয়ে থাকলেন ভদ্রলোক স্বামিজীর দিকে : যেন কিসের একটা ধাক্কা খেয়েছেন !···

শক্তি ! শক্তি ! শক্তি !

—সর্ব্বদাই ভাবতেন স্বামিজী,—স্বদেশ এবং স্বজাতির উন্নতি যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে জাগিয়ে তুলতে হ'বে দেশবাসীর বুকে অসীম শক্তি। একদিন তাই আত্মোন্নতিপ্রয়াসী কোন শিষ্য উপদেশের জন্যে এলে, ব'ললেন তাকে,—দেখ, সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে জাতির চেষ্টা

নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতিটা মরেছে! এই যেমন আমাদের জাত। হাজার বছর ধ'রে তোরা শুধু শুনছিস, তোরা কিছু নয়—তোরা অপদার্থ। শুনে শুনে আত্ম-বিশ্বাসও হারিয়েছিস তোরা।...আমার কিন্তু নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস।.. তোরাও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'লে, আমার মতই অসাধ্য সাধন করবি। আমি সেই আদর্শ দেখাতেই তোদের মধ্যে এসেছি।...এমন কোন অভাব, এমন কোন দৈন্য নেই,—যা' আত্মশক্তির স্ফুরণ দ্বারা দূর করা না যায়।...গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে গিয়ে তোরা ঘোষণা কর,—ওঠো, জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকো না; তোমাদের মধ্যে রয়েছে অমিত বিক্রম,—তাকে জাগাও। তোমরা কেউ হীন নও—কেউ তুচ্ছ নও!...

* * * *

কয়েকজন গুজরাটি পণ্ডিত এসেছেন স্বামিজীর কাছে। স্বামিজীর অসাধারণ খ্যাতি ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার কথা শুনেই—এসেছেন তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করবার সংকল্প নিয়েই।

পণ্ডিতরা সকলেই ছিলেন দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। অবিরত চর্চ্চার ফলে তাঁরা সংস্কৃত ভাষা ব'লে যেতেও পারতেন অনর্গল। সংস্কৃতেই তাঁরা আরম্ভ করলেন আলোচনার বিষয়—'পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি?

হিন্দী, বাংলা, ইংরেজি ঝড়ের মত ব'লতে পারলেও সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলার—বিশেষ কোন গুরুতর বিষয়ের বাদ-প্রতিবাদ করার—অভ্যাস সেরূপ ছিল না স্বামিজীর। তা'ছাড়া, এই কয়েক বৎসর তো বিদেশী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলতে হ'য়েছে তাঁকে। তবু দমে গেলেন না তিনি—বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর সংস্কৃত ভাষাতেই আরম্ভ করলেন পণ্ডিতদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। একস্থলে স্বামিজী 'স্বস্তি' বলতে গিয়ে ব'লে ফেললেন 'অস্তি'।...আর যায় কোথা? এই সামান্য ত্রুটির জন্যেই পণ্ডিতরা একেবারে দন্তে ফেটে পড়লেন, এবং হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন উপহাসের হাসি! স্বামিজী কিন্তু কিছুমাত্র রুক্ষ না হয়ে তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন নম্রকণ্ঠে—'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনং।'

মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন পণ্ডিতগণ স্বামিজীর বিনয় ও সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে। যাবার সময় অবশ্য অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করলেন তাঁরা সর্ব্বসমক্ষে,—ব্যাকরণ-শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকলেও শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ-প্রণিধানে স্বামিজীর

অধিকার অসাধারণ। তর্ক ও বিচারের ক্ষমতাও তাঁর অপূর্ব। তাঁর ভাষাও আমাদের ভাষার চেয়ে সরস ও মধুর।
পরে পরস্পর নিজেদের মধ্যে ব'ললেন—স্বামিজীর চোখের একটা মাদকতা শক্তি আছে। ঐ শক্তিতেই বোধ হয় উনি বিশ্ব জয় করেছেন!

৭২

—আমাদের সমাজ-দেহের ক্ষত কতই না গভীর! স্বামিজী শিউরে উঠতেন সেদিকে চেয়ে। তাঁর মনে হ'তো, ঐ পচা ক্ষতের থেকে অসংখ্য বিষাক্ত কীটাণু জন্মগ্রহণ ক'রে দংশন করছে দেশকে,—জর্জ্জরিত ক'রে তুলছে জাতিকে। তাই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের বাড়াবাড়ি দেখে স্বামিজী বিশেষভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। উত্তেজনাও জেগে উঠতো তাঁর অন্তরে অন্তরে,—উঃ, জাতিটা কি নির্ব্বোধ! নিজেরই দেহের কোন-না-কোন অঙ্গকে অচল রেখে—পঙ্গু ক'রে—এরা চায় আত্মোন্নতি! কি মূঢ়তা!
স্বামিজীর বক্তৃতার মধ্যে দেশের এই কালিমার কথা প্রায়ই তাই ফুটে উঠতো—এক গভীর মর্ম্মবেদনায়। ব্রাহ্মণগণের বংশানুক্রমিক বা কৌলিক গর্ব্ব, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এবং শিক্ষার দম্ভও তাঁর চিত্তকে বড় কম আলোড়িত, তিক্ত অথবা ক্ষুব্ধ করতো না।
একদিন একটি সভায় দেশের সমাজ-জাত ব্যাধি সম্বন্ধে ব'ললেন তিনি আবেগময় কণ্ঠে—"যদি বংশানুক্রমিক ভাব-সংক্রমণ-নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়,—তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় আর অর্থ ব্যয় না ক'রে অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় সমুদয় ব্যয় কর।…যারা বুদ্ধিমান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে না—শিক্ষকগণ তাদের জন্যই নিয়োজিত হোক্।"…
"জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না ক'রে—প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শেখাও ও শোনাও যে,—সবল-দুর্ব্বল, উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই সেই অনন্ত আত্মা রয়েছেন,—সুতরাং সকলেই মহৎ হ'তে পারে,—সকলেই সাধু হ'তে পারে।"
উচ্চবর্ণের অভিমানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েও তিনি বলেন,—"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছো?…তোমরা হচ্ছ দশহাজার বছরের মমি!…

যাদের চলমান শ্মশান ব'লে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘৃণা ক'রেছেন,—ভারতে যা-কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছো তোমরা।"...

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও,—আর নূতন ভারত বেরোক লাঙ্গল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে,—জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরোক মুদীর দোকান থেকে,—ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরোক কারখানা থেকে—হাট থেকে—বাজার থেকে। বেরোক ঝোপঝাড়-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত থেকে।...এরা সহস্র-সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে,—নীরবে সয়েছে; তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা!...সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি।...এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।"

"অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।... ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্য-আংটি ফেলে দাও—ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার,—আর তুমি যাও—হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে যাও।"—

দিকে দিকে জলদ-মন্দ্র স্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর অন্তরের এই মহাবাণী।—হৃদয়সিন্ধু মথিত-আলোড়িত ক'রে উঠ্‌লো যেন এক সুগভীর সাম্যের গান! আত্মবিস্মৃত জাতি স্তব্ধ-বিমূঢ় হ'য়ে ভাবতে লাগলো স্বামিজীর প্রতিটি কথার মর্ম্মার্থ: যে পথ ধ'রে চলছে সকলে,—সে পথ প্রকৃত-পক্ষে তাদের নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?—উন্নতির সোপানে—না, অধঃপতনের পঙ্কিল আবর্ত্তে?....

৭৩

"নিরন্ন দেশে শক্তি সঞ্চার করতে হ'লে শুধু বক্তৃতায় কিছু হ'বে না হে,"—ব'ললেন স্বামিজী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাগবাজারের বাড়ীতে ব'সে,—"সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে অন্নদানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।"

সহসা গো-রক্ষিণী সভার একজন হিন্দুস্থানী প্রচারক-সভ্য এসে দেখা ক'রলো স্বামিজীর সঙ্গে। নিজের পরিচয় দিয়ে একটি চাঁদার খাতা এগিয়ে দিলে সে স্বামিজীর সম্মুখে।

"আপনাদের সভার উদ্দেশ্য?"—খাতাটি দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন স্বামিজী ভ্রূকুটি ক'রে।

"আমরা স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন ক'রেছি,"—ব'ললে সভ্যটি একটু আত্মপ্রসাদের ভাবেই,—"দুর্ব্বল, রুগ্ন, জরাগ্রস্ত গো-মাতাদের আমরা সেখানে রেখে পালন করি। তাছাড়া, কসাইদের হাত থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থাও করি রীতিমত অর্থব্যয় ক'রে।"

"উদ্দেশ্য সৎ, সন্দেহ নেই।"—উত্তর দিলেন স্বামিজী—"কিন্তু আপনাদের খরচ-খরচা চলে কেমন করে?"

স্বামিজীকে প্রীত করবার উদ্দেশ্যেই বল্‌লে ভদ্রলোক—"এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাত্মারই দানে। তা ছাড়া, কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আমাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের দানের পরিমাণই বেশি।"

—"কিন্তু মধ্য-ভারতে শুন্‌ছি নাকি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে। প্রায় নয় লক্ষ লোক মারা গেছে অনাহারে। এই দুর্ভিক্ষ-নিবারণে কত টাকা সাহায্য করেছেন আপনারা?"

সভ্যটি কতকটা উপেক্ষা—কতকটা বা গর্ব্বভরেই উত্তর দিলে,—"দুর্ভিক্ষে-টুর্ভিক্ষে সাহায্য আমরা করি না। গো-মাতাদের রক্ষা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম।"

"আর মানুষ মরে গেলে তার মুখে এক মুঠো অন্ন দেওয়া বুঝি আপনাদের ধর্ম্ম নয়?"—প্রখর হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর দৃষ্টি,—বিরক্তি এবং কিছু রুক্ষতাও ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠে। সহসা যেন একটা চাবুক খেয়ে চমকে উঠলেন সভ্যটি; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—"মানুষ মরছে নিজের কর্ম্মফলে—নিজের পাপে—নিজের—"

"আর গো-মাতারা ?"—হঠাৎ বাধা দিলেন স্বামিজী, তাঁর কণ্ঠ আর একটু রুক্ষ শোনাল,—"তারা যে কসাইদের হাতে পড়েন,—সেও তো তাদের কর্ম্মফল !··· তবে আর তাদের বাঁচাবার কি দরকার ?"

কিছুটা অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লো এবার প্রচারক ভদ্রলোক,—"তা আপনি যা ব'লছেন,—সত্য,—তবে কিনা—শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।"

"হ্যাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা বুঝতে পারছি আমি।"—স্বামিজীর কথায় একটু শ্লেষ-বিদ্রূপেরই আভাস,—"তা' না হ'লে এমন সব ছেলে জন্মাবে কেন ?"

ব্যঙ্গটা কিন্তু বুঝতে পারলো না ভদ্রলোক। উত্তরও কিছু সহসা যোগাল না তার কণ্ঠে।

স্বামিজী আবার ব'ললেন,—"দেখ, যেখানে মানুষের মুখে অন্ন না দিয়ে—পশুপক্ষীদের বাঁচাবার বিরাট চেষ্টা হয়,—সেখানে আমার সহানুভূতি নেই। তা' ছাড়া, আমি তো সন্ন্যাসী,—আমার টাকা কোথায় ?···যদি ভিক্ষে-স্বরূপ কোথাও পিছু পাই,—আগে দেব ঐ দুর্ভিক্ষে—মানুষের দুঃখে—মানুষের দুর্দ্দশা-নিবারণে। তারপর কিছু বাঁচে ত তোমাদের দিতে পারি।"

ধীরে ধীরে মাথা নত ক'রে চলে গেল প্রচারক। স্বামিজী সকলের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—'এই জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে !'

* * * *

লোক-কল্যাণকর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান আর গুরুভ্রাতাদের তার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলাই এবার হ'লো স্বামিজীর প্রধান লক্ষ্য।···উঠে-পড়ে লেগে পড়লেন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনায়।

কিন্তু হঠাৎ শরীরটা খুবই খারাপ হ'য়ে পড়লো ! ক'লকাতার জলবায়ুতে স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না তাঁর। চিকিৎসকগণ উপদেশ দিলেন তাঁকে—বায়ু-পরিবর্ত্তনে।···কোন কাজই তো হ'বে না শরীর ভেঙ্গে পড়লে ! তাই চিকিৎসকদের নির্দ্দেশমত স্বামিজী যাত্রা করলেন দার্জ্জিলিং। সঙ্গে গেলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, জানানন্দ, ভক্তবর গিরিশচন্দ্র, গুডউইন সাহেব,—আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং আরও অনেকে। সেভিয়ার-দম্পতি পূর্ব্বেই গিয়েছিলেন সেখানে। দার্জ্জিলিং-বাসী মিঃ এস. এন. ব্যানার্জ্জি সমাদরে স্থান দিলেন তাঁদের আপন আলয়ে। বর্দ্ধমানের মহারাজার এক প্রাসাদেও রাজ-অনুরোধে কিছুদিন অবস্থান করলেন তাঁরা।

কিন্তু এখানেও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হ'লো না স্বামিজীর। চিকিৎসকগণ তাঁকে উপদেশ দিলেন সম্প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে। কিন্তু কর্ম্মযোগী—অক্লান্তকর্ম্মী বিবেকানন্দের পক্ষে সে কি কোনদিনই সম্ভব? কর্ম্মের আকুল-করা আহ্বান তাঁকে আবার টেনে আনলে দার্জ্জিলিং থেকে কলকাতায় —মাত্র দু'মাস পরে।

৭৪

অতঃপর আলমবাজার মঠে দু'তিনজন যুবককে সন্ন্যাস-ব্রতে নূতন দীক্ষা দান করলেন স্বামিজী। এই সময় স্বামিজীর বিশেষ অনুরাগী ভক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এবার উঠ্‌লো সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার কথা। স্বামিজী ব'ললেন,—আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হ'য়েছি,—যাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ ক'রে আমরা চলেছি সংসারের পথে,—সেই পরমপুরুষের নামেই প্রতিষ্ঠিত হ'বে এই সঙ্ঘ,—নাম হ'বে,—"রামকৃষ্ণ মিশন"।

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যা' ব'ললেন,—তার সারমর্ম্ম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বের কল্যাণে যে সকল সত্য উপদেশ দিয়ে গেছেন, এবং নিজের জীবনে যা' প্রতিপাদিত করেছেন,—তা' প্রচার করা এবং জনসাধারণকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই হবে—সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য।

সকল ধর্ম্মকেই এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের ভিন্ন রূপ বিবেচনা ক'রে—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন; এবং সাধারণ লোকের যাতে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও—করতে হ'বে এই সঙ্ঘকে।

শিল্প-কলাদির উন্নতি, এবং সে বিষয়ে সকলকে উৎসাহ দানও হ'বে সঙ্ঘের একটি অন্যতম লক্ষ্য।...যে সকল সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ সাধারণের শিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হবেন,—তাঁদের আচার্য্য-ব্রতপালনের যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুলতে ভারতের নগরে নগরে—মঠ ও আশ্রম স্থাপন করতে হ'বে। আচার্য্যেরা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে গিয়েও জনশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না এ সঙ্ঘের। জনকল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানই এর মুখ্যতম আদর্শ।...ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের জন্যে ব্রতধারী পাঠাতে হ'বে এবং সেই সকল স্থানেও

সঙ্ঘের শাখারূপে মঠ ও আশ্রমাদি স্থাপন ক'রে ভারতের মঠ ও আশ্রমের সঙ্গে যোগসূত্র সাধনের ব্যবস্থা করতে হ'বে।

এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি আছে,—অথবা যাঁরা বিশ্বাস করেন যে,—জগতের কল্যাণের জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হ'য়েছিল,—এই সঙ্ঘে প্রবেশ করবার অধিকার থাকবে তাঁদেরই।

ভক্তবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনুরাগী গৃহীভক্তগণ সানন্দে এবং পরম শ্রদ্ধাভরেই সমর্থন করলেন স্বামিজীর প্রস্তাব।…সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বামিজীই নির্ব্বাচিত হ'লেন সঙ্ঘের সভাপতি। স্থির হ'লো,—সম্প্রতি মিশন প্রতিষ্ঠিত হ'বে আলমবাজার মঠেই।

কিন্তু বিরুদ্ধ আলোচনা উঠ্‌লো সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিয়ে; এবং উঠ্‌লো তা' স্বামিজীর গুরুভ্রাতাদের দিক থেকেই। স্বামী যোগানন্দ ব'ললেন,—এইভাবে আমরা যদি নানা বন্ধনের মধ্যেই জড়িয়ে প'ড়লাম—তবে আর সন্ন্যাস হ'লে কি? ঠাকুরের উপদেশ কি ঠিক এই ছিল?

'তুই কি ক'রে জানলি যে এগুলি ঠাকুরের ভাব নয়?'—দৃষ্টি প্রখর ক'রে চাইলেন স্বামিজী যোগানন্দের দিকে,—"অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাস্।…কিন্তু তা হবে না; অন্ততঃ আমি তা হ'তে দেবো না। গণ্ডী ভেঙ্গেচূরে তাঁর ভাবরাশি ছড়িয়ে দেবো সারা বিশ্বে।…ওরে, গভীরভাবেই উপলব্ধি করতে হ'বে ঠাকুরের ভাব,—আর সেইমতই লোকশিক্ষা দিতে হ'বে আমাদের। বুঝলি?

কিন্তু ঠিক প্রীত হ'তে পারলেন না স্বামী যোগানন্দ।—কতকটা নিস্পৃহকণ্ঠেই ব'ললেন,—তা' তোমার যেমন ইচ্ছা! তোমার ইচ্ছামতই তো কাজ হ'বে,—আমরা তো তোমার অনুবর্ত্তীমাত্র!

স্বামিজী বুঝলেন,—এখনও দ্বিধা রয়েছে যোগানন্দের মনে, অভিমানও কিছু আছে তার সঙ্গে। "কথাটা কি জানিস?"—ব'ললেন স্বামিজী আশ্বাসের স্বরে,—সাধারণ ভক্তরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে—তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন্। তাঁর লীলা অদ্ভুত—ভাব অসংখ্য। তিনি ইচ্ছা ক'রলে—কটাক্ষে লক্ষ্য বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারতেন।…কিন্তু তবু যদি তা' না ক'রে আমার মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করতে চান,—আমি কি করতে পারি বল?"

শেষের দিকে স্বামিজীর চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌লো প্রগাঢ় প্রেমে।

কিন্তু তবু গুরুভ্রাতাদের মনের দ্বন্দ্ব মিটতে চায় না। একজন তো ব'লেই উঠ্‌লেন প্রকাশ্যে,—"সব ছেড়ে এলুম সাধন-ভজন ক'রে ভগবানকে পেতে।

এখন সভা কর, বক্তৃতা দাও,—ঘুরে ঘুরে প্রচার কর, এসবের সঙ্গে ঠাকুরের উপদেশের বা ভাবের ঐক্য কোন্‌খানে ?"

প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো স্বামিজীর দৃষ্টি,—"তোরা কি মনে করিস,—শ্রীরামকৃষ্ণকে তোরাই বুঝিস ? আর আমি কিছুই বুঝিনি ? জ্ঞানটা কি একটা নীরস শুষ্ক বস্তু—যে, তার চর্চ্চা ক'রতে গেলে অন্তরের কোমল প্রবৃত্তির গলা টিপে ধরতে হবে ?—জগৎ যাঁর,—জগতের সেবা ক'রলে কি তিনি দূরে স'রে যান কখনো ?—মুখে শুধু ভগবান, ভগবান ব'ললে ভগবান কি এসে প'ড়বে মুঠোর ভেতর ? পরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে,—সাংসারিক সর্ব্ববিধ কামনা থেকে যে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারে,—সেই তো মুক্তবন্ধন !······তার আবার বন্ধন কোথায় !······তোর কি ? কিছু তো তোর নিজের জন্যে নয় ?" সবই বিশ্বের কল্যাণে,—"জগদ্ধিতায় গোবিন্দায় !"—আর তারই নাম প্রকৃত সন্ন্যাস !······সকলকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের মুক্তি খুঁজলে কোনকালেই মুক্তি আসবে না,—জান্‌বি।

তবু কি যেন বল্‌তে গেলেন অপর এক গুরুভ্রাতা,—'কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ—'

"যাও।"—আচম্বিতে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন স্বামিজী,—"কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায় ?—কে দেখতে চায়,—তোমার শাস্ত্র কি বলছে ? আমি যদি আমার দেশের লোককে তমোকূপ থেকে তুলে মানুষ ক'রে গ'ড়তে পারি,—তা'হলে হাসতে হাসতে সহস্রবার রাজী আছি নরকে যেতে। আমি রামকৃষ্ণ কি কারো দাস নই ; শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না ক'রে পরের সেবা করতে প্রস্তুত,—তারই দাস আমি।"

উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো স্বামিজীর—আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো চোখ-মুখ ! মুহূর্ত্তে সে স্থান থেকে উঠে চ'লে গেলেন তিনি বিশ্রামঘরে।

গুরুভ্রাতারাও তখন যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন !···বুক কাঁপছে তাঁদের দুরু-দুরু ! না,—ভাল ক'রে বিচার-বিবেচনা না ক'রে স্বামিজীকে চটিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।—ভাবলেন তাঁরা মনে মনে,—ঠাকুরও কি না-ভেবেচিন্তে—তাঁদের সকলের ভার দিয়ে গেছেন—'নরেনের' হাতে ? ঘোর জড়বাদী প্রতীচ্যের গর্ব্বদৃপ্ত শির নত হ'য়েছে যাঁর চরণে,—ঠাকুরের অসীম-অনন্ত প্রভাব কি বিরাজ করছে না তাঁর অন্তরে ?—তবে ?

একটু পরে যোগানন্দ ধীরে ধীরে এসে জানালা দিয়ে দেখলেন উঁকি মেরে,—স্বামিজী গভীর ধ্যানমগ্ন। প্রশস্ত ললাটে খেলা করছে যেন এক প্রশান্ত দিব্য জ্যোতিঃ ! নিমীলিত নয়নতলে প্রজ্ঞা-উন্মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠছে

যেন সত্য-শিব-স্বন্দরের ছবি ! মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন যোগানন্দ সেই ভাব-সমাহিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে।……

সন্ধ্যার সময় স্বামিজী হাস্যকৌতুকে রঙ্গ-তামাসায় মেতে উঠলেন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে।—যেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানুষ! গুরুভ্রাতাদেরও বুকের ভার নেমে গেল তাঁর হাসিখুশি ভাব দেখে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিয়ে মনের মধ্যে তাদের যে তোলাপাড়া চ'লছিল,—তাও থেমে গেছে তখন বহু পরিমাণে।……

মিশনের কার্য্যালয় কিন্তু সম্প্রতি খোলা হ'লো বাগবাজারের বলরাম বস্থর বাটীতে।…সেদিনের প্রতিষ্ঠিত সেই 'মিশন' আজ বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রতিষ্ঠান-রূপে দিকে দিকে প্রচার করছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অপার মহিমা—স্বামী বিবেকানন্দের অমরবাণী। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিরাট বনস্পতি! সকলই সেই অদৃশ্য মহাশক্তির লীলা—তাঁরই দিব্য প্রকাশ!

* * *

বলরাম বস্থর বাড়ীতেই আসর ব'সেছে। আসর জমেছেও বেশ। স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র মহাপণ্ডিত সায়ানের ভাষ্যসহ বেদপাঠ ক'রছেন। মাঝে মাঝে তুরূহ বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন স্বামিজী সমবেত সকলকে।

সহসা প্রবেশ ক'রলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁকে দেখেই আসন ছেড়ে উঠে অভ্যর্থনা ক'রলেন স্বামিজী, হাসতে হাসতে ব'ললেন,—দেখ জি. সি., তুমিতো জীবনে কোনদিন বেদ-বেদান্ত কিছু ঘাঁটলে না,—চিরকালই 'কেষ্টবিষ্টু' নিয়ে কাটিয়ে দিলে।

"আমার আর ও-সব প'ড়ে কি হ'বে বল!"—গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন সরল বিশ্বাসে,—"আমার শক্তিও নেই,—সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদ-বেদান্তকে নমস্কার ক'রে ঠাকুরকে স্মরণ ক'রতে ক'রতে পাড়ি মারবো। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোকশিক্ষার দরকার ছিল,—তাই তোমাকে ও-সব পড়তে হ'য়েছে।"

ব'লতে ব'লতে তিনি বেদগ্রন্থকে প্রণাম ক'রে বার বার বলতে লাগলেন,—"জয় বেদরূপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়।"

গিরিশচন্দ্রের এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় পরম মুগ্ধ হ'লেন স্বামিজী।…ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে ভালবাসতেন খুবই। বলতেন—গিরিশ 'ভৈরবের অবতার'। ও যা ক'রছে করুক,—আর কিছু করতে হবে না ওকে।

"আচ্ছা নরেন, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"—কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে ব'ললেন গিরিশচন্দ্র গাঢ়কণ্ঠে—"বেদ-বেদান্ত তো তুমি ঢের পড়েছ। কিন্তু তাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ, আর ব্যাভিচারাদি পাপ নিবারণ করবার কোন উপায় আছে কি?··· কোথাও দুর্ব্বৃত্তের কবলে প'ড়ে কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম যাচ্ছে,—কোথাও শয়তান অসহায়া বিধবার সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিচ্ছে,—এ সবের প্রতিকার কি? সমাজ যে কলঙ্কে ভ'রে উঠলো ভাই!"

কথাগুলি স্বামিজীকেও ভাবিয়ে তুললো! চোখ দুটিও তাঁর ছলছল ক'রে উঠলো অপরের দুঃখ ও বেদনার কথায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব'ললেন তিনি,—দেখ জি. সি. আমার মনে হয়—যদি জগতের দুঃখ নিবারণের জন্যে—একটি জীবের দুঃখও কিছু লাঘব করতে পারি,—আমি হাজার বার গর্ভবাসের ক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত। শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে বল?···সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি তবে তো!

স্বামিজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো ব্যথার আবেগে।···গিরিশচন্দ্রও ছলছল চোখে তাঁর দিকে চেয়ে ভাবলেন মনে মনে,—এত বড় হৃদয় নাহ'লে কি তুমি জগৎ মাতাতে পারতে!

৭৫

—আলমোড়া!

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে বায়ু পরিবর্ত্তনে এখানে এসেছেন স্বামিজী—আলমোড়াবাসীর বিশেষ অনুরোধে। কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্যও এসেছেন সঙ্গে। মিঃ গুডউইন এবং মিস মূলার পূর্ব্বেই এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন এখানে। স্বামিজী পৌঁছতেই তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান হ'লো জনসাধারণের পক্ষ থেকে।

এখানের জলবায়ুতে কিছুদিনের মধ্যে স্বামিজীর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতিও হ'লো; তবে কিছু অশান্তিও জুটলো এখানে থাকতে থাকতে। ইতিপূর্ব্বে চিকাগো ধর্ম্মসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজ এসেছিলেন কলকাতা।—স্বামিজীর জন্মস্থান,—তার ওপর স্বামিজীর ইচ্ছা ও নির্দ্দেশক্রমে সম্মানও পেয়েছিলেন তিনি এখানে যথেষ্ট;—কিন্তু কতকগুলি দুষ্ট লোকের—বিশেষ ইংরেজ ও আমেরিকান পাদ্রীগণের প্ররোচনায়—দেশে ফিরে গিয়ে স্বামিজীর কুৎসা রাষ্ট্র করতে সুরু করেন তিনি কাগজে কাগজে।

স্বামিজীর বিদেশস্থ অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তগণ অন্তরে আঘাত পান এই অপপ্রচারে। পত্রযোগে তাঁরা লিখেন স্বামিজীকে সে সকল কথা গভীর দুঃখে। নগণ্য সাধারণ ব্যক্তি নয়,—ডাঃ ব্যারোজের মত গণ্যমান্য একজন পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তির এই হীন আচরণে ক্ষুব্ধ হন স্বামিজী একান্তভাবে। ভক্তদের কাউকে কাউকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন তিনি,—"ওদেশে আমার সম্মান যে দেখেছে—সেই ব'লবে ঐ সব কুৎসার মধ্যে সত্য কতটুকু—বা আদৌ আছে কিনা? কত রাজা-মহারাজাও মাথা নত করেছেন আমার পায়ে—সে দেশের লোক তা' বেশ জানে!···আমার একটি কথা লিখে নেবার জন্যে আগ্রহে অধীর হ'য়ে উঠতো হাজার হাজার ব্যক্তি। আমি রাস্তায় বার হ'লে ভিড় সামলাবার জন্যে রীতিমত পুলিশ মোতায়েন ক'রতে হ'তো: অসংখ্যকণ্ঠে উঠতো আমার জয়ধ্বনি!···সে সকল ব'লতে গেলে একটা বিরাট বইই হ'য়ে যাবে। সুতরাং থাক্ সেকথা!···কিন্তু কেউ যদি ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে এইরূপ হীন আচরণ করে—আমি কি করতে পারি?—তবে আমি জানি,—মিথ্যা কোনদিনই টিকবে না জগতে।"

"কিন্তু তোমরা আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না। মানুষ কে?—সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান আছেন অবিরত আমার সঙ্গে,—ঘুরছেন তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে রক্ষা ক'রে—আমি ইংলণ্ড-আমেরিকা যেখানে যাচ্ছি।···আমার কামনা এই যে,—আমি যেন সমগ্র দুঃখ-লাঞ্ছনা-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাই—যেন তাতে ক'রে সেই একমাত্র ভগবানের সেবা করতে পারি,—যিনি সকল জীবের সমষ্টিভূত নারায়ণ বা বিশ্বদেব;—সকল জাতির পাপীতাপী—সকল জাতির দীনদুঃখী তারাই আমার দেবতা,—আমার ভগবান! আমি যেন শুধু তাদেরই সেবা করতে পারি।

এক সত্যকে চাপা দিতে বহু মিথ্যার সৃষ্টি করতে হয়,—জানতো? তবু মিথ্যা মিথ্যাই থাকে,—সত্য একদিন আত্মপ্রকাশ করে দীপ্ত গৌরবে।"···

* * * *

সহসা স্বামিজী শুন্‌লেন—ভীষণ দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে মুর্শিদাবাদে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে গিয়ে—নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রেও—মহামারীর কবলে পতিত শতশত নরনারীর সেবা করছেন অকাতরে। প্রত্যহ অন্নদান করছেন তিনি চার-পাঁচ শত ক্ষুধার্ত্তের মুখে।

ভারী সন্তুষ্ট হলেন স্বামিজী এই সংবাদে। অখণ্ডানন্দের সাহায্যের জন্যে তিনি স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে পাঠালেন মুর্শিদাবাদে, এবং একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন ক'রে নানা জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে। অতঃপর দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের শুধু অন্ন নয়—বস্ত্রও দান করলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। সরকারপক্ষ থেকে প্রচুর ধন্যবাদ জানানো হ'লো স্বামী অখণ্ডানন্দকে—এই মহান্ সেবাব্রতের জন্যে।

আলমোড়ায় স্বামিজী কাজকর্ম্ম থেকে থাকতেন দূরে। যেহেতু—এখানে এসেছিলেন তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে। কিছু ফলও পেলেন এখানে। তবে পূর্ব্বের যে স্বাস্থ্য ছিল—তা' আর ফিরলো না। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবস্থা যাই হোক্,—তিনি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন কর্ম্মের প্রেরণায়।...

৭৬

—এবার উত্তর ভারত।

পাঞ্জাব ও কাশ্মীরবাসীদের অনুরোধে স্বামিজী আলমোড়া ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন উত্তর ভারতের নানাস্থানে প্রচার-উদ্দেশ্যে।

প্রথমে এলেন বেরিলী। বেরিলীতে আর্য্যসমাজের স্বামী অচ্যুতানন্দকে স্বামিজী বললেন,—"আর পাঁচ-ছয় বৎসরমাত্র জীবিত থাকবো আমি। আমার কাজ অনেক—এরই মধ্যে যত সারতে পারি!"

যোগদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ,—হয়ত তখন থেকেই জানতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের সীমা কতদূর।......বেরিলী থেকে এলেন আম্বালা। আম্বালা থেকে অমৃতসর। সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি হ'য়ে চ'ললেন কাশ্মীর-অভিমুখে।

মিসেস সেভিয়ার এ সময় স্বামিজীকে আটশত টাকা পাঠিয়ে দেন,—যদি কোন দরকারে লাগে। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী আর যেতে পারেন না স্বামিজীর সঙ্গে।...."এত টাকা নিয়ে কি করবো আমি—সন্ন্যাসী মানুষ? থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।"—স্বামিজী চারশ' টাকা ফিরিয়ে দেন মিসেস সেভিয়ারকে।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। স্বামিজী এখানে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন কাশ্মীর-প্রবাসী চিফ্ জাষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে। কাশ্মীরের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণও মহানন্দে এখানে এসে স্বামিজীর শিরে রাশি রাশি

পুষ্পবৃষ্টি ক'রে স্বামিজীর প্রতি তাঁদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর আরও কয়েক জায়গা ঘুরেফিরে—স্বামিজী জম্মু যাত্রা করলেন কাশ্মীর-রাজের নিমন্ত্রণে। স্টেশনে পৌঁছতেই—রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিপুল-ভাবে অভ্যর্থিত হ'লেন তিনি সম্মানিত রাজ-অতিথিরূপে।

মহারাজার সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হলো রাজ-প্রাসাদে। মহারাজা—তাঁর দুই ভ্রাতা এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী-সমভিব্যাহারে—স্বামিজীকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন নিবিড় শ্রদ্ধায় এবং সমাদরে।

অতঃপর বিশেষ হৃদ্যভাবেই বাক্যালাপ স্থরু হ'লো দু'জনের। মহারাজার সাগ্রহ প্রশ্নে সন্ন্যাসমার্গ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তাঁকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন স্বামিজী। কুসংস্কার-প্রসঙ্গে বললেন তিনি,—"ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে অন্ধের মত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়েই ভারতের লোক সাতশ' বছর ধ'রে পরের দাসত্ব ক'রছে। ব্যাভিচারাদি প্রকৃত পাপাচরণে কেউ সমাজচ্যুত হয় না। কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে একটু ত্রুটি হ'লেই সর্ব্বনাশ!…ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়ি আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করেছে আরও বেশি।"

সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে স্বামিজী ব'ললেন,—"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়েছিলেন। বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভারতের লোক তো ব্যবসায়-বাণিজ্য ক'রছে বহু কাল থেকেই; আর বহুদেশ না ঘুরলে প্রকৃত শিক্ষালাভও হয় না। তা'ছাড়া, সাগরপারে গেলে যদি পাপই হয়,—তবু বলবো যে, দেশের কল্যাণের জন্যে নিরয়গামী হওয়াও সৌভাগ্য ব'লে মনে করি আমি।

পরম প্রীত হ'লেন মহারাজা স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে। স্বামিজী বিদায় চাইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিতই বিদায় দেন তাঁকে। বারবার অনুরোধ জানান,—অতঃপর স্বামিজী যখনই কাশ্মীর আসবেন,—তখনই দয়া ক'রে যেন রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেন।……

জম্মু থেকে স্বামিজী এলেন শিয়ালকোট—সেখান থেকে লাহোর। স্বামিজীর দর্শনের আশায় বিপুল জন-সমাগম হ'লো লাহোরে। সনাতন ধর্ম্মসভার পরি-চালকগণ তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রবার ভার নিয়েছিলেন এখানে।…অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দিয়ে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই ভিড়ের মাঝে ছিলেন স্বামিজীর জনৈক সহপাঠী বাল্যবন্ধু মতিলাল বসু। এখানে তিনি না-কি সার্কাসের খেলা দেখাতে এসেছিলেন। ভারী ইচ্ছা হলো তাঁর স্বামিজীর সঙ্গে একবার দেখা করার।

—কিন্তু এ-তো আর সেই 'সেদিনের নরেন' নয়!…এখন যে ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে অনেক! বিশ্ব-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করা কি সোজা ব্যাপার!

তবু ভয়ে ভয়ে—দারুণ সংকোচে এসে দাঁড়ালেন মতিলাল স্বামিজীর সম্মুখে,—ধীরে ধীরে মুখ তুলে ব'ললেন কুণ্ঠিতস্বরে—'আপনাকে এখন কি ব'লে ডাকবো?'

মুহূর্ত্তে চিনতে পেরে স্বামিজী তাঁকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন আকুল আগ্রহে,—"কি ব'লে আবার ডাকবি রে? ভাই মতি, তুই কি পাগল হলি না-কি? ওরে, আমি যে সেই নরেনই আছি,—ডাকবি নরেন ব'লেই।"

ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়লো মতিলালের চোখে।…এত নিরহঙ্কার! দীনের দৈন্যের প্রতি এত সম্মান!…নইলে আর বড় হ'বে কেন?

বস্তুতঃ গৌরব-শিখরে উঠেও স্বামিজী অতীতকে ভুলে যেতেন না বা হেলা ক'রতেন না কোনদিনই। সুখের দিনে গভীর আন্তরিকভাবেই স্মরণ করতেন —বিগত দুঃখের দিনের কথা! যুক্তরাষ্ট্রে পরম সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার সময় তাই একদিন আত্মগত উচ্ছ্বাসে ব'লে উঠেছিলেন,—"I long—oh long for my rags, my shaven head, my sleep under the trees, and my food from begging."

*　　*　　*　　*

দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজও—ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও,—একজন মহাপুরুষ-জ্ঞানে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হ'লেন না। আর্য্যসমাজের মতে বেদের 'সংহিতা ভাগ' প্রামাণ্য —কিন্তু স্বামিজী বেদের 'উপনিষদ ভাগকেই' স্বীকার করতেন প্রামাণ্য ব'লে। আর্য্যসমাজ মূর্ত্তি-পূজার ঘোর বিরোধী,—কিন্তু স্বামিজী বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী হ'লেও—মূর্ত্তি-পূজাকেও ঈশ্বরলাভের সোপান ব'লে স্বীকার করতেন যথারীতি যুক্তি-সহযোগে।

—আর্য্যসমাজের মতেও অবশ্য ঈশ্বর নিরাকার,—সর্ব্বশক্তিমান্, প্রেম ও আনন্দময়। কিন্তু তবু অদ্বৈতবাদী যে 'নির্গুণ ব্রহ্মের' উপাসনা করেন,—তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ধারণা নেই আর্য্যসমাজীদের। আর্য্যসমাজ-মতে তাঁদের পন্থাই সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা,…কিন্তু স্বামিজী বলেন, আপন বিশ্বাসমতে

যে যে-পথ ধ'রে যেতে চায়,—সেই পথেই তার আত্মার পরি পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব।

এ-ছাড়া, কতকগুলি গোঁড়ামিও ছিল আর্য্যসমাজীদের,—স্বামিজী তাদের গোঁড়ামিগুলি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন যুক্তির দিক দিয়েই।…ফল যাই হোক্, স্বামিজীকে অবহেলাও ক'রতে পারেননি তাঁরা।

অনেক ধর্ম্মপিপাসুর সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় হয় এখানে। জনৈক ধর্ম্মপিপাসুকে তিনি দেখেন বিশেষ প্রীতির চক্ষে। একদিন তার প্রশংসা করছিলেন স্বামিজী মুক্তকণ্ঠে; পাশ থেকে একজন ব'লে উঠলো—কিন্তু স্বামিজী, সে আপনাকে মানে না।

"ক্ষতি কি?"—মৃদু হাসি ফুটে উঠলো স্বামিজীর মুখে,—"ভাল লোক হ'তে হ'লেই যে আমাকে মানতে হ'বে, এমন কি কথা আছে?"

অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো লোকটি স্বামিজীর দিকে। এমন মন্তব্য যেন সে জীবনেও শোনেনি!

স্বামিজীর অসাম্প্রদায়িকতা অনেকেরই প্রীতির এবং অনেকের বা অপ্রীতির কারণ হ'য়েছিল লাহোরে। সুবিখ্যাত গণিত অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর সঙ্গে স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এখানে। তীর্থরাম পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন স্বামিজীকে।

একদিন স্বামিজীকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন তীর্থরাম। স্বামিজী পরম আদরে গ্রহণ করেন সে উপহার: কিন্তু তদ্দণ্ডেই তীর্থরামের পকেটেই ঘড়িটি রেখে বলেন,—'বেশ তো বন্ধু, তোমার পকেটেই আমার ব্যবহার করা হবে।'

উত্তর ভারতের বহু স্থানে বহু হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন স্বামিজী,—তার অধিকাংশই ছিল হিন্দীতে,—দু'-একটি হয়তো ইংরাজিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—সে সব বক্তৃতা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার সুযোগ ঘটেনি।

লাহোরে থাকতে থাকতে স্বামিজীর স্বাস্থ্য কিন্তু আরও খারাপ হয়ে পড়লো। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি এলেন দেরাদুনে। খেতড়ির রাজা বহু অনুরোধে স্বামিজীকে নিয়ে গেলেন দেরাদুন থেকে নিজ রাজ্যে। পথে পড়লো সাহারানপুর, দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুর। প্রত্যেকটি স্থান দর্শন ক'রে অবশেষে স্বামিজী পৌছলেন জয়পুর,—জয়পুর থেকে রাজার ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে নব্বই মাইল দূরে খেতড়িতে।

* * * *

রাজগুরুর আগমনে মহাধূমধাম প'ড়ে গেল রাজধানীতে। প্রজাদের ঘরে ঘরে হলো উৎসবের আয়োজন। সভা ক'রে অভিনন্দনও দিলে তারা গুরু এবং শিষ্য উভয়কে। পর্ব্বতের চূড়ায় অবস্থিত এক মনোরম বাংলোয় নির্দ্দিষ্ট হলো স্বামিজীর বাসস্থান। এখানে ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়ি দেখে স্বামিজী ভারী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন অন্তরে অন্তরে। জনসাধারণের কুসংস্কারের মোহ দূর করবার উদ্দেশ্যে 'বেদান্তবাদ' ও 'ছুঁৎমার্গ' সম্বন্ধে দু'টি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী এখানে। মহারাজা প্রায় সময়ই স্বামিজীকে অনুসরণ করতে লাগলেন ছায়ার মত।

সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষা-বিস্তার,—দেশবাসীর অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান, সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি বহু বিষয়েই স্বামিজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন উত্তর-ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতনার বিভিন্ন স্থানে।

বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং ভেদাভেদ-প্রথা রহিত করবার উদ্দেশ্যে স্বামিজী আন্তর্জ্জাতিক ও অসবর্ণ বিবাহের অনুকূলেও মত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন্‌নি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে।

খেতড়ি থেকে স্বামিজী আবার এলেন জয়পুর,—জয়পুর থেকে যোধপুর।.... এখানে প্রধান অমাত্য রাজা স্যার প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। এখানেও প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলো তাঁকে ; সাগ্রহে গ্রহণ করতে লাগলো তাঁর সারগর্ভ উপদেশ।

অতঃপর ইন্দোরের অন্তর্গত খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হ'লেন স্বামিজী। কিন্তু সেখানে এসেই প'ড়লেন প্রবল জ্বরে। উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সেবা-পরিচর্য্যায় অবশ্য আরোগ্যলাভ করলেন আট-দশ দিনের মধ্যে।

বিদায়কালে,—হরিদাসবাবু পরম আগ্রহে স্বামিজীর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু স্বামিজী ব'ললেন,—"দেখ, চেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা বা গুরুগিরী করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গুরুগিরির অভিমান যাদের মধ্যে আছে,—তারা কি নিজের—কি দশের—কি দেশের—কা'রো কোন কল্যাণ করতে পারে না কোনদিনই। শুধু মনে রেখো,—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সর্ব্বশক্তিমত্তার বীজ আছে।...তাছাড়া, আত্মনির্ভরতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সাধনা আর নেই।"

এরপর গুজরাট, বরোদা, বোম্বাই প্রভৃতি বহু স্থান থেকেও শত শত সাদর নিমন্ত্রণ ও অসংখ্য টেলিগ্রাম এলো স্বামিজীর কাছে। কিন্তু অসুস্থ শরীরে

আর কতইবা পারেন তিনি ?···কাজেই প্রচার-কার্য্যে আরও ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা থাকলেও আর সম্ভব হ'লো না দুর্ব্বল শরীরে। খাণ্ডোয়া থেকে জব্বলপুর হ'য়ে ফিরলেন তিনি ক'লকাতা অভিমুখে।···

৭৭

—ক'লকাতায় ফিরে যথারীতি ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং নাম-সংকীর্ত্তনাদিতে মন দিলেন স্বামিজী। বহু দর্শনার্থীকে উপদেশ দানও চ'লতে লগেলো সেইসঙ্গে। আবার নানাদিক থেকে আগত অসংখ্য চিঠিপত্রের উত্তরও দিতে লাগলেন তারই মাঝে সময় ক'রে। দেশে-বিদেশে যাঁদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ আছে,—আবশ্যকীয় বিষয় জানিয়ে তাঁদের সকলকে তো পত্র লিখতেন প্রায়ই।—একটি মুহূর্ত্তের জন্যও যেন বিরাম ছিল না তাঁর।

* * * *

ওদিকে সাগরপারে একান্ত অধীর হৃদয়ে স্বামিজীর আহ্বানের অপেক্ষা করছিলেন কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল।

কথায় বলে, 'যাদৃশী ভাবনার্যস্য,'—সহসা তাঁর উদগ্র কামনাকে সার্থক ক'রে স্বামিজীর কাছ থেকে এলো এক পত্র। কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলে প'ড়লেন মার্গারেট। সে পত্র ব'য়ে এনেছে যেন কোন্ অমৃত-লোকের আহ্বান,—অবিলম্বে ভারতযাত্রা কর। ভারতের স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে—ভারতের কল্যাণে তোমায় 'আত্মবিলয়' ক'রেই আত্মনিয়োগ করতে হ'বে সর্ব্বতোভাবে।

কি ছিল সেই আহ্বানলিপির ছত্রে-ছত্রে—কথায়-কথায়—এমন কি বর্ণে-বর্ণেও —কুমারী মার্গারেটের আজীবনের সংস্কার—চিন্তার ধারা—চিত্তের অধীরতা —সন্দেহ-দ্বিধা সবই ওলট-পালট ক'রে কানে বাজতে লাগলো শুধু—সেই বিশ্বযাগের মহাসাগ্নিকের উদাত্ত কণ্ঠ-নাদিত মহামন্ত্র :—

'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

স্বামিজী লিখেছেন,—'ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমায় সাগ্রহে আহ্বান করছি,—কিন্তু তার আগে তোমায় জানিয়ে দিতে চাই,—যে গুরুভার তোমায় গ্রহণ ক'রতে হ'বে,—তার জন্যে পুরস্কার পাবে হয়ত দারুণ লাঞ্ছনা। যে সাধনায় তুমি আত্মসমর্পণ ক'রতে চেয়েছ,—তার বিনিময়ে আমি তোমায়

শোনাতে পারিবো না কোন আশার বাণী ;—কঠোর পরিশ্রম, বিনিদ্র রজনী—অনশন, অর্দ্ধাশন—তীব্র বেদনা—হয়ত এই তুমি পাবে।—এই তোমায় দিতে পারি।

আরো লিখেছেন,—দারিদ্র্য, অধঃপতন, আবর্জ্জনা, ছিন্নবসন-পরিহিত নরনারী দেখবার যদি সাধ থাকে,—তবে এসো।…আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য করতে পারি না।

শেষে লিখেছেন—আমার দিক থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তি—সমস্ত স্নেহ দিয়ে তোমায় অবিরত ঘিরে রাখবো ; মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকবো তোমার পাশে—**I will stand by you unto death, whether you work for India or not ; whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of the elephant come out but they never go back. Even so are the words of a man.**

বেদান্ত তুমি গ্রহণ কর বা না কর, ভারতের জন্যে কাজ কর বা না কর—আমি তোমায় রক্ষা করবো আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। হাতীর দাঁত একবার বার হ'লে আর ভেতরে ঢোকে না ;….আমার কথাও ঠিক তেমনি।….এ-তো স্বামিজীর আহ্বান নয়,—এ আহ্বান এসেছে যেন ভারতের আত্মার অন্তস্তমস্থল থেকে,—ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীক স্বামিজীর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে।

কুমারী মার্গারেট সেই দণ্ডেই যাত্রা করলেন ভারতের অভিমুখে। স্বদেশ বা স্বজাতি সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকলো না তাঁর, থাকলো না কোন আকর্ষণ! স্বামিজীর আহ্বান—তাঁকে সব ভুলিয়ে আত্মহারা ক'রে টান্‌লো ভারতের দিকে। তাঁর এই যাত্রার দিনটি ভারতের ইতিহাসে সত্যই এক যুগান্তরের সূচনা করেছে।…পূর্ব্ব ও পশ্চিম যেন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করবার জন্যে বাহু প্রসারিত করেছে এক উদার বিশ্বমানবিক চেতনায়।

* * * *

২৮শে জানুয়ারী (১৮৯৮) মার্গারেট এসে পৌছলেন ভারতে। উঠলেন ক'লকাতায়। প্রাণের সমস্ত সত্তা অর্ঘ্য দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন আচার্য্যের চরণ-প্রান্তে ; নিঃস্বার্থভাবে ঐকান্তিক প্রেরণায় আপনাকে দান করলেন ভারতের সেবায়!…সাগ্রহ আনন্দে এবং গভীর স্নেহে স্বামিজী গ্রহণ করলেন

কুমারী মার্গারেটকে।...কি-যেন এক নূতন আশায় তাঁরও সারা প্রাণ উঠলো দুলে! ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো তাঁর প্রত্যেকটি হৃদয়তন্ত্রী নূতন সুরে।

কুমারী মার্গারেটের সঙ্গে স্বামিজীর অন্যতমা শিষ্যা মিস্ মূলারও দেশের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে আশ্রয় নিলেন এসে ভারতে—গুরুদেবের পবিত্র চরণমূলে।

৭৮

সহসা সাদর আহ্বান এলো,—রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের কাছ থেকে। ঠাকুরের অন্যতম বিশিষ্ট গৃহীভক্ত ঘোষমহাশয়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্ম্মাণ করেছেন চমৎকার একখানি বাড়ী।... স্বামিজীকেই পৌরোহিত্য করতে হবে এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবে। এ তারই সাগ্রহ আহ্বান।

পরম শ্রদ্ধায় এ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন স্বামিজী; ডিঙ্গীতে ক'রে গঙ্গা পার হয়ে নামলেন এসে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও বালক ব্রহ্মচারিগণও এলেন তাঁর সঙ্গে।

স্বামিজী নিজে মৃদঙ্গ বাজিয়ে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে পৌছলেন এসে ঘোষমহাশয়ের বাটীতে। তাঁর নগ্নপদ—নিতান্ত সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশ দেখে কে ভাববে,—ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!

সানুচর স্বামিজী বাড়ীতে পৌছতেই শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠলো ঘনরোলে। স্বামিজী দেখলেন,—ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর-প্রস্তর-গঠিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন—তার ওপর ঠাকুরের পোর্সিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ীই পূজার সব ব্যবস্থা ও আয়োজন করা হয়েছে।

নবগোপালবাবুর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বামিজীর কাছে এসে বললেন দীনভাবে,—'আমাদের ক্ষমতা সামান্য,—সামান্য ঘরে পূজার আয়োজনও সামান্য! আমাদের কি সাধ্য যে, ঠাকুরের যোগ্য পূজার আয়োজন করি!'

"তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্ব্বেল-বাঁধানো ঘরে চৌদ্দপুরুষেও বাস করেননি।"—ঈষৎ হেসে রঙ্গরহস্যের ছলে বললেন স্বামিজী—"সেই অজ পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে তাঁর জন্ম। যেন তেন ক'রে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম ব্যবস্থায় যদি না থাকবেন তো আর থাকবেন কোথায়?"... কথাটায় সকলেই নির্ম্মল কৌতুকে হেসে উঠলেন।

—অতঃপর স্বামিজী বসলেন পূজকের আসনে। স্বামী প্রকাশানন্দ করতে লাগলেন মন্ত্রোচ্চারণ। যথারীতি পূজার্চ্চনার পর নীরাজনের শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠলো গম্ভীরনাদে।…কি শুভময় সে পবিত্র ক্ষণ! কি পুণ্যময় সে মহান্ দৃশ্য!—ধূপের গন্ধে—দীপের আলোকে, পুষ্প-চন্দনে—শঙ্খ-ঘণ্টারোলে—জয়-ধ্বনিতে যেন এক স্বর্গীয় ভাব নেমে এলো সেখানে।

নীরাজনান্তে স্বামিজী সেখানে বসেই রচনা করলেন ঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্র,—

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

স্বামিজীর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও সে মন্ত্র সমস্বরে আবৃত্তি ক'রে প্রণাম ক'রলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। প্রণামান্তে স্বামিজী যখন মাথা তুললেন,—তখন তাঁর চোখ দু'টি জলে ভ'রে এসেছে!

৭৯

মিস্ মূলার এখানে এসে স্বামিজীর হাতে প্রচুর অর্থ দেন ভারতের কল্যাণে। সেই অর্থে বেলুড়ে—গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিস্তীর্ণ এক ভূ-খণ্ড ক্রয় করেন স্বামিজী মঠ-নির্ম্মাণের জন্যে। সেই জমির ওপর একখানি পুরাতন বাড়ীও ছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে স্বামিজীর অন্যতমা দুই শিষ্যা মিসেস ওলি বুল এবং মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউডও এসে পৌছেন ভারতে—সেই সুদূর আমেরিকা থেকে।…উদ্দেশ্য—গুরুদেবের জন্মভূমি দর্শন ক'রবেন,—ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হবেন ঘনিষ্ঠভাবে এবং স্বামিজীর পবিত্র সংসর্গ লাভ ক'রে জীবন সার্থক করবেন তাঁদের।

বেলুড়ে নদীতীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করতে থাকেন তাঁরা। মাঝে মাঝে সেখানে এসে শিষ্যাদের দর্শন দিতেন স্বামিজী। নানা উপদেশ নিয়ে নিবৃত্ত করতেন তাঁদের মনের ক্ষুধা। পাশ্চাত্ত্যের অভিজাত বংশের সন্তান হয়েও এঁরা বাস করতেন—তপস্বিনীর মত দীনভাবে। বৃক্ষচ্ছায়া-তলে ব'সে স্বামিজীর কাছে নানা শাস্ত্রীয় কথা এবং পৌরাণিক উপাখ্যান শুনতে শুনতে তাঁদের মনে হ'তো,—এমন নির্ম্মল আনন্দ যেন তাঁরা নিজেদের বিরাট প্রাসাদে ব'সেও পাননি কোনদিন।

ভারতীয় সংস্কৃতি—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা—আর্য্যঋষিগণের অবদান—হিন্দু নারীর আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে সহজবোধ্য বর্ণনায় স্বামিজী তাঁদের সুকুমার নারী-হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতেন যেন কোন এক সুদূর কল্পলোকের অপার শান্তি। মিসেস ওলি বুলও আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কার্য্যের সাহায্যের জন্যে প্রচুর অর্থ দিলেন তাঁর হাতে—ব'ললেন একান্ত বিনীতভাবে,—'স্বামিজী, এই সামান্য অর্থ ভারতের কল্যাণে যদি গ্রহণ করেন,—আমার জীবন ধন্য মনে করবো।'

সানন্দে স্বামিজী গ্রহণ করলেন মহীয়সী শিষ্যার মহান্ দান। স্বামিজী নিজেও এনেছিলেন বহু অর্থ লণ্ডন থেকে। সুতরাং মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণের অর্থচিন্তা আর থাকলো না।

মঠভূমির পার্শ্বেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান। বাগানবাড়ীও এবার ভাড়া নেওয়া হলো অস্থায়ী মঠের জন্যে। আলমবাজার থেকে মঠও উঠে এলো এখানে। নূতন মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনাদিও সুরু হয়ে গেল অবিলম্বে। গঙ্গার তীরে মঠ নির্ম্মাণের সাধ বহুদিন থেকেই ছিল স্বামিজীর মনে। এখন সে আশা পূর্ণ হওয়ায় তিনি সভক্তি প্রণাম জানালেন পরমেশ্বরের চরণে!......

* * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবের দিন—বেলুড়-নীলাম্বর বাবুর বাগানে—স্বামিজী সমাগত সকল ভক্তকেই উপবীত দান করলেন। বললেন,—দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণ।...ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য দ্বিজাতির ভক্তগণকেও শাস্ত্র-সম্মত গায়ত্রী-মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন তিনি। পরে আবার বললেন,—"কালে দেশের সকলকে উঠিয়ে নিতে হবে ব্রাহ্মণ-পদবীতে। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর ভাই। শত শত বৎসর ধরে 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' ক'রেই আমরা দেশের অধঃপতন ডেকে এনেছি।...কিন্তু আর না,—এবার সকলকে টেনে তুলতে হবে। শোনাতে হবে অভয়বাণী,—'তোরাও আমাদের মত মানুষ! আমাদের মত তোদেরও সব অধিকার আছে।'

স্বামী সারদানন্দ ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন আমেরিকা থেকে। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন, তিনিও ফিরেছেন,—স্বামী ত্রিগুণাতীত গিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের সাহায্যে দিনাজপুরে,—তিনিও ফিরে এসেছেন সম্প্রতি।...কাজেই সকলের উপস্থিতিতে ঠাকুরের এবারকার জন্মতিথি-উৎসব সম্পন্ন হ'লো সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণভাবেই। ভক্তবর গিরিশচন্দ্রও

উপস্থিত ছিলেন এই উৎসবে। স্বামিজী তাকে একখানি গেরুয়া কাপড় পরিয়ে ব'ললেন,—"জি. সি. আজ তুমি আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে।" —সমাগত ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"ঠাকুর ব'লতেন ইনি ভৈরবের অবতার,—আমাদের সঙ্গে এর কোন প্রভেদ নেই।...তোমরা সব স্থির হ'য়ে ব'সে ঠাকুরের কথা শোন।"

গিরিশচন্দ্রের অন্তর উথলে উঠলো ভাবের আবেগে,—"পরম দয়াল ঠাকুরের কথা আমি আর কি ব'লবো।"—মনে মনে নীরবে কিছুক্ষণ ঠাকুরের চরণ ধ্যান ক'রে গাঢ়কণ্ঠে ব'ললেন তিনি,—'তাঁর অনন্ত দয়া, নইলে আজীবন কাম-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মাগণের সঙ্গে তিনি কি এ অধমকে একাসনে বসতে দেন?' —কিন্তু তাঁর কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হ'য়ে গেল ভাবের আধিক্যে। আর একটি কথাও আজ বলতে পারলেন না তিনি।....

* * * *

১৬ই মার্চ্চ—স্বামিজী দীক্ষা দিলেন কুমারী মার্গারেটকে। নূতন নামকরণ করলেন তাঁর 'নিবেদিতা'। কিন্তু এই পরম দীক্ষার সঞ্জীবনী মন্ত্রে মার্গারেট তো শুধু নামেই নিবেদিতা হ'লেন না; নাম-পরিবর্ত্তনের দিব্য প্রভাবে 'মার্গারেটের' সমগ্র সত্তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'য়ে—যেন নূতন সত্তায় নবজন্ম গ্রহণ করলো—'ভারত-সেবিকা নিবেদিতা'। একই জীবনে—একই দেহে—যেন এক অলৌকিক শক্তিমান্ স্রষ্টার সৃজন-মহিমায় হলো তাঁর জন্মান্তর বা পুনর্জ্জন্ম। আবর্ত্তন নয়—বিবর্ত্তন নয়—পরিবর্ত্তনও নয়,—সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি!

দীক্ষার পর নবীন শিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন স্বামিজী—যাও বৎসে, তুমি তাঁর অনুসরণ কর, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে পাঁচশত বার নিজেকে লোককল্যাণ-ব্রতে উৎসর্গ ক'রেছেন।

স্বামিজীর আদেশে সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দ গ্রহণ করলেন নিবেদিতার শিক্ষার ভার।

মঠের সন্ন্যাসিগণ নব-দীক্ষিতা এই বিদেশিনী তরুণীকে পরম প্রীতিভরে গ্রহণ করলেন—'ভগিনী' ব'লে। সেইদিন থেকে ভারতের ইতিহাসে নিবেদিতা খ্যাত হয়ে উঠলেন—'ভগিনী নিবেদিতা' (Sister Nivedita) ব'লে।

ভারতের যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাসে এই পুণ্য দিনের কথা চিরদিনের জন্যে লিখিত হয়ে গেছে স্বর্ণাক্ষরে!...

* * * *

—এরপর স্বামিজী ব'ললেন একদিন নিবেদিতাকে ডেকে—"শোন নিবেদিতা, এখন থেকে তোমার চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে তোমাকে সম্পূর্ণ হিন্দু হ'তে হ'বে। তোমার জীবনকে এখন ভেতরে-বাইরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করতে হবে।"

গুরুজীর সম্মুখে এসে নতশিরে দাঁড়িয়েছেন ভক্তিমতী নিবেদিতা। চোখে-মুখে এক অপূর্ব্ব নম্রতা, মধুর সারল্য, অন্তরে প্রবল অনুরাগ। উৎকর্ণ হ'য়ে পরম আগ্রহে শুন্‌ছেন গুরুজীর নির্দ্দেশ! যেন প্রাচীন ভারতের তাপস-কন্যা গার্গী দাঁড়িয়েছেন মহর্ষি গর্গের সম্মুখে।

স্বামিজী আরও ব'ললেন,—"চিন্তা নেই, যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে,—উপায় জুটে যাবে ঠিকই। কিন্তু ভুলে যেতে হ'বে তোমার অতীত জীবন,—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মনে রাখতে পারবে না।"

শুধু নির্দ্দেশই নয়,—প্রয়োজনীয় উপদেশও দিলেন স্বামিজী প্রিয়তমা শিষ্যার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

পাশ্চাত্ত্যের ভোগ-বিলাস-লালিতা কুমারী মার্গারেট—জড়বাদী ক্যাথলিক বংশের সন্তান মার্গারেট: কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে! ভারতের যুগঋষির মানসকন্যারূপে গ্রহণ করেছেন তিনি আজ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণী হ'বার নির্দ্দেশ। কি অচিন্ত্যনীয় মহিমময় এই দৃশ্য!—কল্পনার অতীত, কিন্তু তবু পরিণত হয়েছে বাস্তবে।

কিন্তু স্বামিজীর লক্ষ্য কি শুধু নিবেদিতারই ওপর ?—ঠিক তা' নয়। অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাদেরও তিনি নিজেদের গঠন করবার উপদেশ দিতেন ভারতীয় ভাবধারায়। অবশ্য চাপ দিয়ে কাউকে কিছু করাতে চাইতেন না তিনি। স্বেচ্ছায় একটু একটু ক'রে—ভুল ক'রে—আবার নিজেদেরই জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তা সংশোধন ক'রে—নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হ'বার সুযোগ দিতেন সকলকে।

তা' ছাড়া দেশীয় ও বিদেশীয় শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ-জ্ঞান রাখতে চাইতেন না স্বামিজী। একদিন তো ব'লেই ব'সলেন পাশ্চাত্ত্যের শিষ্যাদের—কিছু রান্নাবান্না করতে।

আচার্য্যের আদেশ: অবনতশিরে পালন করলেন শিষ্যারা। পরম আনন্দে তাঁদের হাতের রান্নাকরা ব্যঞ্জন খেয়ে স্বামিজী ব'ললেন তৃপ্তিভরে—'চমৎকার হ'য়েছে।' পরে ডাকলেন অপর সন্ন্যাসীদের'—'ওহে,—এসো, এসো, দেখ তোমাদের নূতন বোনেরা কেমন রান্না ক'রেছে!'

প্রথমটা যেন একটু দ্বিধা ক'রলেন সকলে। কিন্তু স্বামিজীর ইঙ্গিতে ঝেড়ে ফেললেন তা' পর-মুহূর্ত্তেই। নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করলেন সেই ব্যঞ্জন,—খেলেনও পরম তৃপ্তির সঙ্গে!···কিন্তু কই, স্বাদের বা গন্ধের তো কোন তফাৎ নেই!····শাদা হাত কি কালো হাত রান্না করেছে, তাওতো বোঝা গেল না কিছু!—তবে?

এমনি ক'রে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদেরও মনের সঙ্কোচ দূর ক'রে—তাঁদের অন্তরে উৎসাহ ও সমভাব জাগিয়ে তুলতেন স্বামিজী। স্বামিজীর এই উদার আচরণে ভাবতেও ভুলে যেতেন তাঁরা নিজেদের বিদেশিনী ব'লে।

মিস্ মূলার একদিন জিজ্ঞাসা ক'রলেন স্বামিজীকে—আচার্য্য, কেমন ক'রে আপনাকে আমরা বেশি সাহায্য করতে পারি, বলুন?

স্বামিজী প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন অল্প কথায়,—ভারতকে ভালবাস।···

৮০

স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে: তাই স্বামিজী এবার থেকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন একেবারে। সেই কলম্বো বন্দরে নেমে আজ পর্য্যন্ত কেবলি বক্তৃতা—আর বক্তৃতা! আর কতই বা বক্তৃতা দেবেন তিনি! অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর,—কিন্তু তবু তো ক্লান্তি আছে!

"সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই।"—চিকিৎসকগণের নির্দ্দেশ।—চ'লতেও হবে বাঁধাধরা নিয়মে; চিকিৎসকদের উপদেশ পালন করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে স্বামিজীকে যেতে হ'লো দার্জ্জিলিং। চিকিৎসকদের মতানুবর্ত্তী হ'য়ে দিনগুলি কাটতে লাগলো তাঁর পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যেই।

কিন্তু অক্লান্ত-অনন্ত-কর্ম্মা যে কর্ম্মবীর কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্যই এসেছেন জগতে—প্রয়োজনের তাগিদ এলে তিনি কি শয্যায় প'ড়ে থাকতে পারেন চুপ ক'রে?···সহসা স্বামিজী শুনলেন একদিন, ক'লকাতায় প্লেগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হ'য়েছে। শহর ছেড়ে পালাতে সুরু করেছে অনেকে। সরকারের প্লেগ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন—অতি কঠোর! সেবা-শুশ্রূষার অভাবেও বহু রোগী মারা পড়ছে একান্ত অসহায়ভাবে।

আর নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হ'লো না তাঁর পক্ষে। রোগার্ত্তের পরিম্লান-পাণ্ডুর মূর্ত্তি যেন ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে তাঁর চোখের ওপর।···অন্তর তাঁর বিচলিত হ'য়ে ওঠে দারুণ অস্বস্তিতে,—গভীর সহানুভূতির আবেগে!

ফিরে এলেন তিনি ক'লকাতায়—৩রা মে।....এসেই ঘোষণা প্রচার করলেন—ইংরাজী ও বাংলাতে,—রামকৃষ্ণ মিশনের সেবক-সন্ন্যাসিগণ রোগার্ত্তের সাহায্য ও সেবা-শুশ্রূষার ভার নেবে।

"কিন্তু টাকা ?"—প্রশ্ন করলেন জনৈক গুরুভ্রাতা,—"এত টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ?"

"কেন ?"—দৃষ্টি প্রখর হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর—কুঞ্চিত হ'লো তাঁর প্রশস্ত ললাট ভ্রূকুটি-ভঙ্গে,—'দরকার হ'লে নূতন মাঠের জন্যে যে জমি-জায়গা কেনা হ'য়েছে,—সব বিক্রী ক'রে দেব!....আমরা তো ফকির—সন্ন্যাসী-মানুষ,—ভিক্ষে ক'রে একবেলা খেয়ে—গাছতলায় শুয়েও দিন কেটে যাবে আমাদের।—হাজার হাজার মানুষ যদি বাঁচে—সেই তো পরম লাভ। মানুষই যদি গেল,—তবে কিসের মঠ—আর কিসেরই বা জমি-জায়গা ?'

গুরুভ্রাতা কিছুক্ষণের জন্যে চেয়ে রইলেন স্থিরদৃষ্টিতে স্বামিজীর মুখের দিকে। সে মুখে নেমে এসেছে তখন যেন এক স্বর্গীয় প্রভা,—ত্যাগের মহিমায় চোখ দুটি তখন জলসিক্ত পদ্ম-পলাশের মতই পেলব-সুন্দর মনে হচ্ছে!

কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে মহৎকাজে অগ্রসর হ'লে সহায় হন স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্!...মহৎ কার্য্যের জন্য চাই মহৎ প্রচেষ্টা! তাই স্বামিজীও ব'লতেন অনেক সময় তাঁর উপদেশের মধ্যে—'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না';—চাই নিষ্ঠা;—চাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন নিঃস্বার্থ হৃদয়।

অর্থ আসতে লাগলো নানাদিক থেকে।...মহাপুরুষের মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে—ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে—যথাশক্তি অর্থসাহায্য পাঠাতে লাগলো রামকৃষ্ণ মিশনে।...বিপুল উৎসাহে সন্ন্যাসিগণ লেগে গেলেন রোগার্ত্তের পরিচর্য্যায়। সাধারণের মধ্য থেকেও বহু লোক স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান ক'রলো সেবাকার্য্যে।

দেশের লোক গভীর শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো স্বামিজীর এই অভিনব কল্যাণরূপ। চোখের সম্মুখে খুলে গেল তাদের—বিবেকানন্দ-চরিত্রের আর একটি মহনীয় দিক।...না, স্বামিজী শুধু নীরস-কঠিন যুক্তি-তর্কবাদী দার্শনিকই নন্,—জটিল বেদান্তভাষ্যের মধ্যেই শুধু ডুবে থাকেন না তিনি,—স্নেহ-প্রীতি-মমতা-সহানুভূতিও আছে তাঁর প্রাণে!..."আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শেখায়।"—বাক্যের সঙ্গে কার্য্যেরও ঐকান্তিক যোগ আছে তাঁর।

স্বামিজীর প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধাবিশ্বাস—আরও গভীর—অধিকতর ব্যাপক হ'য়ে উঠলো।

আনন্দিত চিত্তে ব'ললেন স্বামিজী গুরুভ্রাতাদের,—দেখলি?...কাজ কি আট্‌কালো?...তোরা কিন্তু ভেবেই মরছিলি! ওরে, সৎ আর মহৎ কাজে লেগে পড়লে—ওই ওপর থেকে সাহায্য আসে।

প্রশান্ত নয়নে চাইলেন তিনি ঊর্দ্ধে,—মন তখন তাঁর ভ'রে উঠেছে প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেমে!

৮১

সারা ভারত পরিভ্রমণ ক'রে সম্প্রতি আলমোড়ায় বাস ক'রছিলেন সেভিয়ার দম্পতি। বার বার তাঁরা লিখছিলেন স্বামিজীকে আলমোড়ায় যেতে। স্বামিজীর অন্তরেও অবশ্য—সম্প্রতি আবার একবার হিমালয়-অঞ্চল-ভ্রমণে যাবার সংকল্প জেগেছিল।

সশিষ্য স্বামিজী প্রথমে পৌছলেন এসে নৈনিতালে। খেতড়ির রাজাও তখন বাস ক'রছিলেন সেখানে। রাজশিষ্যের সহিত পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের পরিচয় ক'রে দিলেন স্বামিজী।...রাজা সমাদরে আপ্যায়ন করলেন তাঁর বিদেশী গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের।

একজন ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হ'লো এখানে। বাইরে যাই হোক, মনে মনে তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। নানা আলাপ-আলোচনার মধ্যে তিনি বুঝলেন,—স্বামিজী শুধু দর্শনেই মহাপণ্ডিত নন,—আধ্যাত্মিক শক্তিতেও যথেষ্ট শক্তিমান্।

দু'তিন দিনের মধ্যেই স্বামিজীর পরম ভক্ত হ'য়ে পড়লেন মৌলভী সাহেব। একদিন তো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লেই উঠলেন—'স্বামিজী, ভবিষ্যতে আপনাকে যদি কেউ 'অবতার' ব'লে দাবী করে,—তবে জানবেন, আপনার এই মুসলমান বান্দাই হবে সকলের অগ্রণী।'

স্বামিজীর প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে ভদ্রলোক নিজেই 'মহম্মদানন্দ' নাম নিয়ে আপনাকে প্রচার করতে লাগলেন—স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ব'লে।......

দু'জন দেবদাসী এলো একদিন—স্বামিজীর নাম শুনে তাঁর পুণ্যচরণ-দর্শনের আশে। স্বামিজীর চারিপাশে ব'সে আছেন তখন সমাগত বহু দর্শনপ্রার্থী। ব'লে উঠলেন তাঁরা ব্যগ্রকণ্ঠে একযোগে,—না, না, স্বামিজীর সান্নিধ্যে আসবার অধিকার নেই দেবদাসীদের। ওদের ফিরিয়ে দাও,—ফিরিয়ে দাও।'

'না, না তা কি?'—বিচলিত হয়ে বাধা দিলেন স্বামিজী,—'কেন তারা নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাবে? দেবদাসী হোক—বেশ্যা হোক—পতিতা হোক,—তারাও তো নারী,—মাতৃজাতিরই শ্রেণীভুক্ত তারা। পাপীতাপী সকলের মনে শান্তিদান করাই কি সজ্জনের কর্ত্তব্য নয়?'

স্বামিজী সস্নেহে দর্শন দিলেন তাদের। কৃতার্থ হ'লো তারা মহাপুরুষের করুণা লাভ ক'রে। স্বামিজী তাদের আশীর্ব্বাদও করলেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকলো সকলে স্বামিজীর মুখের দিকে।··· কি উদার স্বর্গীয় ভাবেই না তখন তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে!···

নৈনিতাল থেকে আলমোড়া এসে স্বামিজী বাস করতে লাগলেন সেভিয়ার দম্পতির আবাসে। শিষ্য-শিষ্যাগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'লো আর একটি পৃথক বাড়ীতে।

মিসেস আনি বেশান্তের সহিত এখানে স্বামিজীর দেখা-সাক্ষাৎ হলো একদিন। মধুর আলাপ-আলোচনাতেই অনেকখানি সময় কাটলো তাঁদের। ভারী প্রীত হন শ্রীমতী বেশান্ত স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় এবং তাঁর প্রজ্ঞালোকদীপ্ত মহান অন্তরের পরিচয় পেয়ে।···

গুরুভ্রাতা এবং শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে নির্ম্মল হাস্য-কৌতুকে বেশ আনন্দেই দিন কাটতো এখানে স্বামিজীর। তাঁর চিত্তের সরস মধুর সারল্যের স্পর্শে অন্যান্যেরও মনের গ্লানি স'রে যেতো দূরে।...সময়ে সময়ে নানা সারগর্ভ শাস্ত্রীয় আলোচনায়—দেশ-বিদেশের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে—ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে নানা আলাপ ক'রেও আনন্দ লাভ ক'রতেন সকলে।

স্বামিজী গুরুভ্রাতাদের নিয়ে প্রতিদিন প্রত্যূষে বেড়াতে যেতেন নানাদিকে। চতুর্দ্দিকে কত রমণীয় দৃশ্য—পার্ব্বত্য প্রকৃতির বিচিত্র-সুন্দর পরিবেশ,—জন-মানবহীন শ্যামল বনানীর মহান গম্ভীরতা—বায়ু-আন্দোলিত তরুশ্রেণীর মর্ম্মর-ধ্বনি—সকলের মন ভ'রে তুলতো এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের রস-মাধুর্য্যে। ফিরে এসে স্বামিজী প্রাতরাশ সমাপন করতেন মিসেস্ বুলের বাসস্থানে। কোন-কোনদিন বা সেভিয়ার দম্পতিকে সঙ্গে ক'রে চলে যেতেন তিনি বহুদূরে—মঠ-নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করতে।

কখনো কখনো লোকসঙ্গ, কোলাহল, আলাপ-আলোচনা ভালো লাগতো না স্বামিজীর। কে যেন তাঁর মনকে টেনে নিয়ে যেতো মৌন-গম্ভীর নির্জ্জনতার দিকে; মনের সে গতি দুর্ব্বার হ'য়ে উঠতো মাঝে মাঝে। স্বামিজী একাকীই চলে যেতেন বিজন অরণ্যানীর নিবিড় প্রদেশে।

সেখানে গিয়ে কি করতেন,—তা কেউই জানতো না—বুঝতেও পারতো না। তবে স্বামিজী ফিরে এলে সকলে দেখতো,—মর-জগতের অতীত এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃতে তাঁর প্রশান্ত-সুন্দর মুখমণ্ডল দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে কষিত-কাঞ্চনের মত।

* * * *

আলোচনার বৈঠক বসতো প্রায় প্রতিদিনই।

কথায় কথায় একদিন ব'ললেন স্বামিজী,—ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদেরই ঐতিহাসিক প্রমাণ অকাট্য : আর সব যেন ছায়ায় ঘেরা। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ!—কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা, রাখাল, রাজা সব একত্রিত হ'য়ে গীতা-হস্তে এক অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে,—তারই নাম শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু এখন কৃষ্ণই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ।

একদিন এক বিদেশিনী মহিলা তাঁর মুখে ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভক্তি-সম্বন্ধে কোন কথা শুনে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরোধী ব'লে মনে করেন তাঁকে। এমন কি ব'লেও ওঠেন সুস্পষ্ট কণ্ঠে ; একি স্বামিজী, আমি জানতাম না যে,—আপনি বৌদ্ধ!

এক সুগভীর অনুরাগের জ্যোতিঃতে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর প্রশস্ত ললাট,—'ভদ্রে,'—আবেগে অধীর হ'য়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠস্বর,—"আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস! তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর,—নিজের জন্য কখনো কিছু করেননি। বিশাল হৃদয়ে সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন ক'রেছিলেন! রাজপুত্র হয়েও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—এত করুণা যে, একটি ছাগশিশুর জন্য নিজের প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত ; এত প্রেম যে,—একটি ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রেছিলেন। সানন্দে চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে—প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন তাকে।'...

আর একদিন নির্ম্মল প্রভাতে শুভ্র তুষার-মৌলি হিমগিরিশিখরের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন স্বামিজী।—রজত-শুভ্র তুষাররাশির ওপর উষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কনক-কিরণ প'ড়ে—কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই না তখন সৃষ্টি হ'য়েছে সেখানে! স্বামিজী ব'ললেন সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে নিবেদিতাকে,—ঐ দেখ শিব-উমা! ঐ উন্নত ধবলগিরি—শুভ্রকান্তি মহাদেবের উরঃস্থল ; আর ঐ হেমচ্ছটা আনন্দময়ী জগজ্জননী ভুবনমোহিনী উমার গৌর-বিভা।....

বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল সকলের। কিন্তু সহসা দুটি দুঃসংবাদে স্বামিজীর মর্ম্মে লাগলো প্রচণ্ড আঘাত!....তিনি শুন্‌লেন,—মহাত্মা পওহারী বাবা দেহ-

রক্ষা করেছেন ঃ আর তাঁর একান্ত অনুগত ভক্তশিষ্য মিঃ গুডউইনেরও মৃত্যু হ'য়েছে !

পওহারী বাবাকে বিশেষ ভক্তি করতেন স্বামিজী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরই তিনি নির্দ্দেশ করেছিলেন পওহারী বাবার স্থান !...আর গুড়উইন ?...তাঁর মৃত্যু-সংবাদে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়লো স্বামিজীর ! অশ্রু-সিক্তকণ্ঠে ব'ললেন তিনি,—আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল। আমি একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান শিষ্য ও অদ্ভুতকর্ম্মা হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে হারালাম। পরোপকারী লোকের সংখ্যা জগতে অতি অল্প। সেই স্বল্প সংখ্যারও একটি হ্রাস পেলো গুডউইনের মৃত্যুতে।

* * * *

আলমোড়ার গ্রামাঞ্চলে এই সময় যেন কি প্রয়োজনে এসেছিলেন বরিশালের দেশবিখ্যাত নেতা—'ভক্তিযোগ'-প্রণেতা মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত।

হঠাৎ একদিন শুনলেন তিনি,—এক সন্ন্যাসী এসেছেন আলমোড়ায়। তরুণ বয়স,—গৌরবর্ণ,—উন্নত-দেহ—উজ্জ্বল প্রশান্ত ললাট,—অনর্গল কথা বলতে পারেন ইংরাজিতে। ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়িয়ে বেড়ান ইচ্ছামত এদিকে-ওদিকে। গেরুয়া-কাপড়ের পোশাক,—তাই মানায় যেন রাজাধিরাজের মত !

দত্তমশায় বুঝলেন,—এ স্বামী বিবেকানন্দ না হয়ে যায় না !....সাগ্রহে এলেন তিনি একদিন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। বাসস্থানের নিকটে এসে দেখলেন,—স্বামিজী ঘোড়া থেকে নেমে চলে গেলেন বাড়ীর মধ্যে,—এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঘোড়াটা নিয়ে গেলেন আস্তাবলের দিকে।

সদর দরজায় এসে কপাটে কয়েকবার শব্দ করলেন অশ্বিনীবাবু। এক নবীন যুবক-সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন,—'কা'কে চান আপনি ?' প্রশ্ন করলেন তিনি ভ্রূকুটি ক'রে।

—"আমি চাই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে।"

'নরেন্দ্রনাথ ব'লে কেউ নেই এখানে।'—যুবক সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,—'এখানে যিনি আছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথের নাম লুপ্ত হ'য়েছে বহুদিন।'

"কিন্তু আমি স্বামী বিবেকানন্দকে চাই না।"—অশ্বিনীবাবুর কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠ্‌লো,—"আমি চাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরেনকে।"

এমন সময় স্বামিজী এসে পড়লেন সেখানে। "রামকৃষ্ণদেবের নরেন"—এ-কথা শুনতে ভারী মধুর লাগলো তাঁর ! "আসুন, আসুন,"—পরম আনন্দে

ও বহু সম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে স্বামিজী নিয়ে গেলেন দত্তমশায়কে বাড়ীর ভেতরে। আদর ক'রে বসালেন তাঁকে নিজের পাশে।·· তারপর দু'জনে কত কথা—কত আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে অশ্বিনীবাবু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজের উল্লেখ ক'রে ব'ললেন,—কিভাবে কলেজের উন্নতি করি, বলুন তো ?

'আপনার মত ব্যক্তিকে আমি আর কি উপদেশ দেবো ?'—সবিনয়ে উত্তর দিলেন স্বামিজী,—"তবে আপনার কলেজের ছাত্রদের গ'ড়ে তুলুন সত্যিকার মানুষ ক'রে। তাদের চরিত্র দৃঢ় হয় যেন বজ্রের মত। প্রত্যেকে হ'বে এক-একটি দধীচি—তাদের অস্থিতে যে বজ্র তৈরী হবে,—তাতে ভারতের পরাধীনতা দূর হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন স্বামিজী,—"হ্যাঁ. দেখুন,"—ব'ললেন পরে দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ ক'রে,—"আর একটা কথা আছে।···যে সব ছেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান গাইবে, চাবুক মারবেন তাদের পিঠে। আজ প্রয়োজন হচ্ছে—শক্তি, স্বাস্থ্য—তেজোদৃপ্ত মন—বুকভরা সাহস! যারা শক্তিহীন,—তাঁরা প্রেমের গান গায় কোন্ লজ্জায় ?

স্বামিজীর সারগর্ভ অমূল্য উপদেশগুলি পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন অশ্বিনীবাবু।

* * * *

মাদ্রাজ হ'তে ইংরাজিতে একখানি কাগজ প্রকাশিত হ'তো "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে।···স্বামিজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণের অর্থ-সাহায্যেই চ'লতো কাগজখানি। কিন্তু সম্পাদকের মৃত্যুতে তার প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়। স্বামিজী ভালবাসতেন এই কাগজটিকে—তার উদার মতবাদের জন্য। কাজেই কাগজটি বন্ধ হ'য়ে যেতে বড়ই দুঃখিত হন তিনি।···আলমোড়ায় থাকতে থাকতে একদিন "প্রবুদ্ধ ভারতের" কথা ওঠে। পত্রিকাটির প্রতি স্বামিজীর অনুরাগ দেখে মিঃ সেভিয়ার এর ব্যয়ভার এবং পরিচালনভার বহন করতে রাজী হন বিশেষ আনন্দে। স্বামিজী পরম সুখী হয়ে তার সম্পাদক নিযুক্ত করেন—স্বামী স্বরূপানন্দকে।···আলমোড়া থেকেই কাগজটি আবার প্রকাশিত হ'তে থাকে।···

৮২

আলমোড়া থেকে ভীমতাল হ'য়ে সানুচর স্বামিজী এসে পৌঁছলেন রাওয়ালপিণ্ডি। পাঞ্জাবীরা স্বামিজীকে গ্রহণ করলো সাগ্রহে এবং সহৃদয়ে। স্বামিজীও সেখানে পৌঁছেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন শিখগুরুদের ভাবে।

শিখদের সঙ্গে তিনি এমনি অভেদভাবে মিশে গেলেন যে, তাঁকে দেখলে মনে হ'তো,—তিনি এই প্রদেশেরই অধিবাসী। শিখদের ত্যাগ, মহত্ব, এবং ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেবের" নীতিকথার উল্লেখ ক'রে স্বামিজী ব'লতেন,—'শিখরা যেন বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিই প্রচার ক'রেছেন তাঁদের জাতি-গঠনে।'

স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান শিখেরা গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করতেন তাঁর মধ্যে। তবে তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যদের সম্বন্ধে কেউ কেউ একমত হতে পারতেন না স্বামিজীর সঙ্গে। অবশ্য স্বামিজী তাতে অসন্তুষ্ট না হ'য়ে—স্বমতের দৃঢ়তার জন্যে বরং অধিকতর প্রীতির চক্ষেই দেখতেন তাঁদের।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সকলে টঙ্গা ক'রে এলেন মরি—মরি থেকে শ্রীনগর। দুইপার্শ্বে শুভ্র তুষার-শীর্ষ গিরিশৃঙ্গ,—শ্যামল উপত্যকা, নানাজাতীয় পার্ব্বত্য কুসুমের বর্ণ-সমারোহ,—কৃষ্ণবর্ণ পার্ব্বত্যভূমির বক্ষে—রজত-রেখার ন্যায় কুলকুল রবে প্রবাহিতা স্বচ্ছতোয়া ক্ষীণাঙ্গী গিরি-তটিনী—নয়ন-মন মুগ্ধ করলো তাঁদের অপূর্ব্ব আনন্দে।

সকলকে নিয়ে শ্রীনগরের দিনগুলি বেশ ফুল্লমনেই কাটতে লাগলো স্বামিজীর। কত গল্প,—কত আলোচনা—কত হাস্যকৌতুকই না করতেন তিনি প্রাণের সরল-মধুর সরসতা মিশিয়ে!...গুরুভ্রাতা বা শিষ্যশিষ্যাগণ তখন ভাবতেই পারতেন না যে,—এই হাস্য-কৌতুক-প্রিয় ব্যক্তিই যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ।

কথা হচ্ছিল একদিন হিন্দুর দেব-দেবীমূর্ত্তির কল্পনা-সম্বন্ধে।

শিব-মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী ব'ললেন—"হ্যাঁ, এই শান্ত-সুন্দর তাপস মূর্ত্তিই আমার আরাধ্য হৃদয়-দেবতা।"...হরগৌরীর অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা ক'রে ব'ললেন তিনি—'এই পৌরাণিক কল্পনার মূলে নিহিত আছে দু'টি বিভিন্ন ভাব—একটি সর্ব্বত্যাগ ও সন্ন্যাসের,—অপরটি বিশ্বপ্লাবী প্রেমের। কোমলে-কঠোর সম্মিলনীই জগত্তত্ত্ব বুঝবার গূঢ় প্রণালী।'

ভগিনী নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কালীঘাটে দেখেছি, শত শত লোক দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূমি-চুম্বন করছে : এর অর্থ কি ?
একটি শান্ত অথচ গম্ভীর ভাব ফুটে উঠলো স্বামিজীর মুখে। ব'ললেন একটু চুপ ক'রে থেকে গাঢ় স্বরে,—'হিমগিরির পদ-প্রান্ত-চুম্বন আর দেবীর সম্মুখে ভূমি-চুম্বন কি একই নয় ?'…নিবেদিতা নীরবে ভাবতে চেষ্টা করলেন স্বামিজীর কথার মর্ম্মার্থ ! এ-যে সেই এক ব্রহ্মেরই বিরাটত্বের দুই ভিন্নরূপ অভিব্যক্তি। একটি মহাসাধকের মহান উপলব্ধি—অপরটি প্রাকৃতিক উন্মুক্ত প্রকাশ !…

একদিন আসক্তি ও অনাসক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে ক'রতে সহসা স্বামিজীর মুখে ফুটে উঠলো অবজ্ঞার হাসি,—ওদেশে অনেকে ব'লতো, 'লোকটার' জনকরাজার অবস্থা হ'য়েছে।…কিন্তু জনকরাজা হওয়া কি সোজা কথা ?—অনাসক্ত হ'য়ে রাজত্ব করা—ধন-জন-মান-স্ত্রী-পুত্র কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নেই—এমনভাবে সংসার করা—বড় সহজ নয় ! ভারতবর্ষেই জনকের মত লোক জন্মায় না, তা আবার ও-দেশে !
"দেহের বিষয় চিন্তা করাও পাপ।"—বললেন আর একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় নানাকথার মধ্যে,—"তা'ছাড়া শক্তি-প্রদর্শন করাও অনুচিত।"—ব'ললেন আবার নীরবে দু'এক পা অগ্রসর হয়ে,—"কোন জিনিষই আগের চেয়ে ভাল হয় না। জিনিষ যা, তাই থাকে,—শুধু আমরাই বদলে যাই।"—চ'লতে চ'লতে কতই না ব'ললেন এমন টুক্‌রো টুক্‌রো কথা।
এখানেও স্বামিজী কখনো কখনো একাকী চ'লে যেতেন নির্জ্জনে—পর্ব্বত-গুহার কিংবা অরণ্য-অঞ্চলে। ফিরে আসতেন অনেক পরে।
একদিন এক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মযাজক এলেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। স্বামিজী তখন সকলকে নিয়ে—হাস্য-পরিহাসে মগ্ন। এটা ভালো লাগলো না ধর্ম্ম-যাজকের। ব'ললেন তিনি নিজেকে সংযত করতে না পেরে,—'আচ্ছা স্বামিজী, আপনি সাধারণ লোকের মত হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু এটা কি ভালো ?'
'মন্দই বা কিসে ?'—প্রশান্ত হাস্যে উত্তর দিলেন স্বামিজী,—'আমরা জ্যোতিঃর সন্তান, আনন্দের তনয়,—আমরা কেন মুখ অন্ধকার ক'রে থাকবো ?'……
এরপর সকলকে নিয়ে স্বামিজী পৌছলেন এসে আচ্ছাবলে (অক্ষয় বল)। এখানে দেখলেন,—দু'তিন হাজার যাত্রী যাচ্ছে অমরনাথ।….অমনি স্বামিজীর মনেও জেগে উঠলো অমরনাথ-যাত্রার সঙ্কল্প।

অমরনাথের পথ দুর্গম। শিষ্যাগণের মধ্যে এক নিবেদিতা ছাড়া আর কেউ যেতে সাহস করলেন না সেই দুর্গম পথে স্বামিজীর সঙ্গে। স্বামিজীর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় অন্যান্য সকলে থেকে গেলেন পহ্লল গ্রামে।

৮৩

—তুষারাচ্ছন্ন বন্ধুর হিমালয়-পথ। শত শত যাত্রী চ'লেছে ভক্তিপূতচিত্তে দেব-দর্শনে,—সেই দুর্গমপথে অমরনাথের উদ্দেশে!...পথের মাঝে পাহাড়ের সানুদেশে স্থানে স্থানে পড়েছে—তাঁবু।...তাঁবুর মধ্যে শত শত সাধু-সন্ন্যাসী —কেউ বৃদ্ধ—কেউ প্রৌঢ়—কেউ যুবক।...কেউ ধ্যানস্থ—কেউ বা শাস্ত্রপাঠ ক'রছেন—কেউ বা অন্যের সঙ্গে ঈশ্বরের মহিমা-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন— পরম আগ্রহে।...কেউ বা আবৃত্তি করছেন মধুর গম্ভীর কণ্ঠে,—হর হর বম্ বম্। ভারী আনন্দিত হলেন স্বামিজী পার্ব্বত্য পথের এই অপরূপ-মধুর চিত্তস্পর্শী দৃশ্য দেখে। নিবেদিতাও দেখতে লাগলেন দুই আঁখিভরে,— স্বামিজীর ভারতের এক মহিমময় উজ্জ্বল রূপ,—পুণ্যার্থীদের হৃদয়স্পর্শী দেবানুরাগ! ইউরোপীয় শিষ্য আর যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাও উপভোগ ক'রলেন এই পবিত্র রমণীয় দৃশ্য সমগ্র অন্তর দিয়ে।

স্বামিজীকেও অবশ্য তাঁবু খাটাতে হলো একস্থানে। দীর্ঘপথ,—বিরাম না দিলে অতিক্রম করা কি সম্ভব?....কিন্তু পাশেই ছিল হিন্দু সাধুদের এক তাঁবু।—স্বামিজীর সঙ্গে বিদেশী লোক দেখে কয়েকজন সাধু তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে,—রূঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো,—শ্বেতাঙ্গ ম্লেচ্ছদের নিয়ে এখানে তাঁবু খাটানো চ'লবে না।

গ্রাহ্য করলেন না স্বামিজী তাদের কথা। ব'ললেন দৃপ্তকণ্ঠে—"এইখানেই থাকবে আমাদের তাঁবু।....শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা কি মানুষ নয়? মানুষে মানুষে কি কোন ভেদ আছে?"

দূর থেকে এক বৃদ্ধ নাগা সন্ন্যাসী স্বামিজীকে লক্ষ্য ক'রছিলেন,—বুঝলেন তিনি, এ-সন্ন্যাসী—সাধারণ সন্ন্যাসী নয়!—যথেষ্ট যোগবলসম্পন্ন শক্তিমান মহাপুরুষ। স্বামিজীর নিকটে এসে ব'ললেন তিনি,—"মহারাজ, আপনার শক্তি আছে স্বীকার করি।—কিন্তু তা দেখানো কি উচিত?"

স্বামিজী বুঝলেন তাঁর কথার মর্ম্ম। চমকে উঠলেন তিনি তাঁরই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি শুনে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের তাঁবু সরিয়ে নিলেন দূরে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—পরদিন থেকে সবই গেল যেন উল্‌টে! স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে এত খুশী হ'লেন সাধু-সন্ন্যাসীরা যে, স্বামিজী ও নিবেদিতার তাঁবু সকলের মাঝে পড়লেও—তাঁরা সানন্দেই মেনে নিতে লাগলো সে ব্যবস্থা। কোথায় ভেসে গেল তাদের প্রতিবাদ!—স্বামিজীর আকর্ষণে তাঁর দলের সান্নিধ্যই হ'য়ে উঠলো তাদের কাম্য—সকলেরই প্রিয়। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর মধুর ও সরল ব্যবহারে বিশেষ স্নেহের ও প্রীতির পাত্রী হ'য়ে উঠলেন সাধুদের।

পথে একটি তুষার-নদীও পার হতে হ'লো অতিকষ্টে।...দুর্লঙ্ঘ্য পথের সর্ব্ববিধ দুঃখ অকাতরে বরণ ক'রতে লাগলেন নিবেদিতা। স্বামিজী মাঝে মাঝে পরীক্ষাও করলেন তাঁকে কষ্টের মধ্যে।

ক্রমে অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম ক'রে—যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েই অবশেষে পৌছলেন তাঁরা ২রা আগষ্ট অমরনাথ গুহায়।

* * * *

গুহার মধ্যে মন্দির,—তুষারলিঙ্গরূপী ভগবান মৃত্যুঞ্জয় অনন্ত মহিমায় বিরাজ করছেন এই মন্দিরে—এক অন্ধকারময় স্থানে।

—বিগ্রহের সম্মুখে আভূমি নত হ'য়ে প্রণাম করলেন স্বামিজী। শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় বিরাট দেব-বিগ্রহের অপরূপ রূপের দিকে—স্থির নেত্রে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে পড়লেন তিনি।...যুক্তকরে স্তিমিতনেত্রে ধ্যান করতে লাগলেন—রত্নকল্লোজ্জ্বল-অঙ্গ প্রসন্নবদন দেবাদিদেব আশুতোষের।

অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তখন তাঁর চোখমুখ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আলোকে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে! নিবেদিতা প্রভৃতি অন্যান্য সকলে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর অপেক্ষায়।

নিবেদিতাকে ব'ললেন তিনি,—আজ কি আনন্দই-না লাভ করেছি! এই তুষার-লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ-স্বরূপ।...আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই এমন আনন্দ পাইনি!

সহসা কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো স্বামিজীর ভাবের আবেগে! একটু সামলে নিয়ে আবার ব'ললেন—'আজ আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে। পরম কারুণিক অমরনাথ কৃপা ক'রে আমায় দর্শন দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আমি 'ইচ্ছামৃত্যু' বর পেয়েছি।'

এরপর কয়েকদিন প্রতিনিয়ত অমরনাথের কথা—শুধু শিবের নাম, তাঁর মাহাত্ম্য—তাঁর অসীম-অনন্ত-অচিন্ত্য-অব্যক্ত মহিমা কীর্ত্তিত হ'তে লাগলো

স্বামিজীর কণ্ঠে। আবার শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে হঠাৎ একদিন তাঁর সমগ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো মাতৃভাবে।···

মুখে শুধু—মা···শুধু কালী কল্যাণময়ী বরাভয়দায়িনী মা! উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন মাঝে মাঝে,—মা-ই ব্রহ্ম!···তিনি কাল—তিনি পরিবর্ত্তন—তিনি অনন্তশক্তি;—ভীমা—মৃত্যুরূপা—লোলরসনা—করালিনীকে ধ্যান কর! তাঁর অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান ক'রে ফেল,—তবে মা'র দেখা পাবে।

আবার বলেন,—কালী, কালী, কালী! কিসের ভয়?···চিন্তাই বা কিসের? ভিক্ষা নয়—ভিক্ষা নয়,···মায়ের কাছে জোর ক'রে নিতে হবে।···যারা তাঁর প্রকৃত ভক্ত—তারা পাথরের মত শক্ত,—সিংহের মত নির্ভীক!...যে হৃদয়ে ভয় নেই—সেইখানেই তিনি। যেখানে ত্যাগ—আত্মবিস্মৃতি—মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা—সেইখানেই মা!···এখন আর "হরি ওঁ" নয়, এখন শুধু—মা—মা!

ভাবের প্রাবল্যে Kali the Mother (মৃত্যুরূপা মা) শীর্ষক একখানি কবিতা লিখে ফেললেন স্বামিজী,—

···কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে;—
কালনৃত্য করে উপভোগ—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।··

*   *   *   *

স্বামিজী এসেছেন দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে। এসেছেন একাকী। কাউকে ব'লেও আসেননি এখানে আসবার কথা। তাঁর খোঁজ-খবর করতেও নিষেধ ক'রে এসেছেন সকলকে। মাতৃভাবে-উদ্বেলিত অন্তরের দুর্ব্বার আকর্ষণই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে।

মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় সমুজ্জ্বল ক্ষীরভবানীর স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী ঝিরঝির ক'রে। লতাগুল্ম-বেষ্টিত পার্ব্বত্য শোভাও এক অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়ে তুলছে মনে প্রাণে।····মন্দিরের চারিপার্শ্বে কোন সাধক যেন রচনা করেছেন—আপন অন্তরের ভাব-সম্পদ দিয়ে এক মহান-গম্ভীর অথচ সদানন্দময় প্রশান্ত পরিবেশ!

যোগিজন-বাঞ্ছিত পরম শান্তির স্থল! স্বামিজীর মন ভরপুর হয়ে ওঠে এখানে এসে মাতৃপ্রেমে!—দেবীর সম্মুখে প্রত্যহ হোম করেন তিনি পরম নিষ্ঠায়।—কঠোর তপস্যাতেও মগ্ন হ'য়ে পড়েন এখানে কয়েকদিন।···

—মন্দির-পার্শ্বের এক প্রস্তর-বেদীর ওপর ব'সে—দেবীর মন্দিরের দিকে চেয়ে একদিন কত কথাই না ভেবে চলেছেন স্বামিজী!...দেবীর মন্দিরটি জীর্ণ,—ধ্বংসপ্রায়। মুসলমান অত্যাচারে বিধ্বস্ত হ'য়ে—বহুদিন থেকেই প'ড়ে আছে ঐ অবস্থায়।...দেবী-প্রতিমাটিরও দশা প্রায় সেইরকমই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন স্বামিজী,—হায়,—পশুবলের কি নির্ম্মম নিদর্শন! পুণ্যস্থানের নীরব প্রশান্তিময় সৌন্দর্য্যেরও কি দুর্গতি ঘটেছে ক্ষমতা-দম্ভী অত্যাচারীর হাতে!...কিন্তু কারো প্রাণে কি কোন ব্যথা জাগেনি মন্দিরের এই শোচনীয় অবস্থার দিকে চেয়ে!...দেশে ধনীর তো অভাব নেই,—কেউ কি ইচ্ছা করলে পারতেন না মায়ের মন্দিরের সংস্কার করতে?—আশ্চর্য্য!...

গভীর দুঃখে স্বামিজী ভেবেই চল্লেন,—কিন্তু আমি যদি সে-সময় থাকতাম, প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতাম মায়ের মন্দির। কখনোই এ-অত্যাচার নীরবে সহ্য করতাম না।...'মা, মা!' সহসা বিচলিত হয়ে উঠলেন ভাবের আবেগে—'তোর জন্যে একটি নূতন মন্দির তৈরী ক'রে দিতে পারলে যে আমার জীবন ধন্য, সার্থক হ'তো মা!....মা শক্তি—'

"মূঢ়!"—সহসা থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো দেবীর মন্দির: গম্ভীরনাদে ধ্বনিত হ'লো এক অশরীরী বাণী—"তুই কে? আমি তোকে রক্ষা ক'রছি—না তুই আমায় রক্ষা করছিস্?...অবিশ্বাসী বিধর্ম্মী যদি আমার মন্দিরের বা বিগ্রহের দুর্দ্দশাই করে—তাতে তোর কি?"

দুরু দুরু কাঁপতে থাকে স্বামিজীর বুক! ত্রস্ত-চকিত দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি এদিক্ সেদিক্: কিন্তু কই, কেউ তো কোথাও নেই!

অশরীরী বাণী তখনও ধ্বনিত হচ্ছে,—বৎস! আমি ইচ্ছা করলে অসংখ্য মন্দির-মঠ নির্ম্মাণ করতে পারি।—এই মুহূর্ত্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল স্থাপন করতে পারি।...আমার ইচ্ছামাত্র সবই হতে পারে।

রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর সর্ব্বদেহ,—মনের মধ্যে জেগেছিল যে অভিমান—তাও সরে গেল দূরে—তার স্থলে এলো গভীর অনুশোচনা—না, না, সত্যিই আমি অন্যায় করেছি!—মায়ের ইচ্ছা না-হলে আমার কি শক্তি! তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। তাঁরই ইচ্ছামত আমায় চালনা ক'রছেন তিনি!... আমার ভাবনারই বা কি দরকার? মায়ের কাছে আমি তো শিশু!....যা' ভাববার মা-ই ভাববেন!

সেই থেকে কেমন একটা পরিবর্ত্তনই এসে গেল স্বামিজীর মনে।...তিনি কর্ত্তা নন,—কর্ম্মী,—মায়ের নিয়োজিত কর্ম্মী!—অন্তরের মাঝে মায়েরই নির্দ্দেশ উপলব্ধি ক'রে চ'লতে হবে তাঁকে,—প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতিটি কার্য্যে।

*　　*　　*　　*

ক্ষীরভবানী থেকে স্বামিজী আবার ফিরলেন শ্রীনগরে।

কাশ্মীরে প্রথম মঠ-নির্ম্মাণের এবং একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা ছিল স্বামিজীর। একখণ্ড ভূমিও নির্ব্বাচন করেছিলেন তাঁর জন্যে!...মহারাজাও সম্মত ছিলেন মঠ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে সে ভূমি নিঃস্বার্থভাবেই দান করতে। কিন্তু প্রতিবাদ তুললেন কাশ্মীরের বৃটিশ রেসিডেণ্ট,—না, ওখানে মঠ তৈরী হ'তে পারে না।

বৃটিশের নাগপাশে বাঁধা ছিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ। কাজেই গভীর দুঃখেই সে ব্যবস্থা নাকচ করতে হ'লো মহারাজাকে!...স্বামিজী প্রথমটা ক্ষুব্ধ হলেন বটে, কিন্তু পরে বুঝে দেখলেন,—মঠ সর্ব্বাগ্রে বাংলার বাইরে স্থাপন না ক'রে—বাংলাদেশে—এমন কি কলকাতার কাছাকাছিই স্থাপন করা সমীচীন। বাংলার বাইরে—ভারতের নানাস্থানে—এমন কি বিদেশেও তার শাখা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে পরে।

অতঃপর স্বামিজী বারমুল্লা হয়ে এলেন লাহোরে। পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের ইচ্ছা—উত্তর ভারতে কয়েকটি স্থান দেখে যাবেন। তার ব্যবস্থাও করেছিলেন স্বামিজী,—তিনি ব'ললেন শিষ্যদের,—সারদাকে আমি পত্র দিয়েছি আসবার জন্যে,—তোমরা এখানে তার জন্যে অপেক্ষা কর। সে তোমাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে মঠে ফিরবে।'

তাই হলো। শিষ্যগণ থাকলেন স্বামী সারদানন্দের অপেক্ষায়। ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামিজী ফিরলেন বেলুড়ে—১৮ই অক্টোবর (১৮৯৮)।

৮৪

স্বামিজীর শরীর আরও ভেঙ্গে পড়েছে। তবু কি বিরাম আছে! পরিশ্রম ক'রে চলেছেন নানা কাজে। কর্ম্মযোগী মানুষ, প্রতিনিয়ত ভেবে চলেছেন কাজেরই কথা।

১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা এলেন নূতন মঠের জায়গা দেখতে বেলুড়ে। কয়েকজন মহিলা ভক্তও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত ছিলেন সকলে,—মা'কে প্রণাম করলেন তাঁরা ভক্তিভরে। মঠের জায়গা দেখে এবং স্বামিজীর মুখে তার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তনাদির কথা শুনে বিশেষ প্রীতিলাভ ক'রলেন শ্রীশ্রীমা।

বিকালে সকলে ফিরলেন বাগবাজারে। স্বামিজীর চেষ্টায় ভগিনী নিবেদিতা ইতিমধ্যেই হিন্দুনারীদের বিশেষ পরিচিতা হ'য়ে উঠেছিলেন বাগবাজার অঞ্চলে। একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি এখানে। আজ তার প্রতিষ্ঠা-দিবস। নিবেদিতার ঐকান্তিক প্রার্থনায় প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগ দিয়ে—শ্রীশ্রীমা জগদম্বার আশীর্ব্বাদ কামনা করলেন—বিদ্যালয়ের কল্যাণে।

এখন থেকে নিবেদিতা যথারীতি বাস করতে লাগলেন মায়ের কাছে—তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে। হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর নিয়ম-নিষ্ঠা অনুসারেই তিনি যাপন করতে লাগলেন তাঁর জীবন ;—মায়ের প্রতি অন্তর তাঁর উথলে উঠলো অপরিমেয় ভক্তিতে। মা-ও তুলে নিলেন তাঁকে স্নেহের ক্রোড়ে—একান্ত প্রীতিভরে—জননী যেমন তুলে নেন তাঁর আপন সন্তানকে !

ভাব-প্রকাশের জন্যই ভাষা ;—ভাব যেখানে ভাষার অপেক্ষা না রেখেই মূর্ত্ত হয়ে ওঠে পরিপূর্ণরূপে,—অন্তর যেখানে অন্তর দিয়েই বুঝে নেয়—অন্তরের কথা, সেখানে ভাষার প্রয়োজনের গুরুত্বও যেন কমে যায় অনেকখানি,—ভাষার দৈন্যও ঢাকা পড়ে যায় সেখানে। কাজেই—শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতা—পরস্পর পরস্পরের ভাষায় পারদর্শিনী না হলেও ভাবের আদান-প্রদানেই তাঁরা বুঝে নিতেন পরস্পরের কথা।···কোন অসুবিধা হতো না তাঁদের আলাপ-আলোচনায়।

* * * *

৯ই ডিসেম্বর বেলুড়ে মঠ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হলো বিরাট উৎসব। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ক'রে স্বামিজী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য পাদুকায় বিল্বদল ও পুষ্পাঞ্জলি দান ক'রলেন। অন্যান্য ভক্তগণও স্নানান্তে যোগ দিলেন সেই পুণ্য অনুষ্ঠানে। একটি তাম্রনির্ম্মিত কৌটায় ঠাকুরের পবিত্র ভস্মাস্থি এনে স্বামিজী স্থাপন ক'রলেন—নির্দ্দিষ্ট আসনে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো। ভূমিতে মাথা নত ক'রে সকলে প্রণাম ক'রলেন,—

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

স্বামিজী ব'ললেন সকলের দিকে চেয়ে,—ঠাকুর আমায় ব'লেছিলেন, তুই কাঁধে ক'রে যেখানে আমায় নিয়ে যাবি—আমি সেখানেই যাব।—তা কুটিরই কি—

আর গাছতলাই বা কি ?—বহুকাল পর্য্যন্ত—বহুজন হিতায় ঠাকুর এইস্থানে স্থির হয়ে থাকবেন। ঠাকুরের মতে—সমুদ্রের মত গভীর এবং আকাশের মত উদার হওয়াই ছিল মানুষের আদর্শ। আমাদের এই মঠ থেকেও ঠাকুরের ভাবই প্রচারিত হবে। সকল মতের—সকল ভাবের সমন্বয় থাকবে এখানে।'

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে নীরবে চোখ মুদলেন তিনি। তারপর সহসা ব'লে উঠলেন উচ্ছল কণ্ঠে,—'ওঃ, আজ আমার বার বছরের চিন্তা মাথা থেকে নামলো।'—এবার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দিকে মুখ ফেরালেন,—'কি ইচ্ছা হচ্ছে জানিস্ ?—এই মঠের চারিদিকে থাকবে তোদের মত সব ধার্ম্মিক গৃহস্থ—মধ্যে থাকবেন ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ—দক্ষিণদিকের জমিটায় হবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর।···আর এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান।'

'বড় অসম্ভব কল্পনা করছেন আপনি !'—ঈষৎ হেসে ব'ললেন স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র।—গভীর বিশ্বাসে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করলেন স্বামিজী,—'অসম্ভব কি-রে ? আমিতো শুধু পত্তন ক'রছি।····আরো ক'রবো যতটা পারি।··· তারপর তোরা আছিস্ কি জন্যে ? তোরাই করবি।····দৃঢ় মনোবল, সদিচ্ছা আর বিশ্বাস রেখে কাজ ক'রলে অসম্ভব আবার কি আছে রে জগতে ?

মঠ প্রতিষ্ঠা হ'লো বটে,—তবে অস্থায়ীভাবে এখন কিছুদিনের জন্য মঠের কাজ চলতে লাগলো নীলাম্বরবাবুর বাগানেই।

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে চলতে লাগ্‌লো মঠ-মন্দিরাদির নির্ম্মাণের কাজ। এই হরিপ্রসন্নবাবুই পরবর্ত্তী কালের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।···ঠাকুরের ইচ্ছা যে কখন কা'কে কোন্‌দিকে চালিত করে—কখন কা'র মনে কি পরিবর্ত্তন আনে,—কে ব'লতে পারে ?

৮৫

দুরতিক্রম্য পার্ব্বত্য পথ-ভ্রমণের গুরুতর শ্রম,—আহার-নিদ্রার অনিয়ম, স্বামিজীর ভগ্নস্বাস্থ্যের ওপর আঘাত হানলো প্রচণ্ডভাবেই। দেহের ওপর দিয়ে সমভাবে শীত এবং আতপ সহ্য করার ফলও প্রকাশ পেলো এতদিনে সুস্পষ্টভাবে। হাঁপানি তো পূর্ব্বেই দেখা দিয়েছিল, এখন তার টানও বেড়ে গেল,—ভারী কষ্ট হতে লাগলো স্বামিজীর হাঁপের সময়।

বাহ্যবিষয়েও এখন মন উদাসীন হ'য়ে উঠেছে স্বামিজীর। কি যেন চিন্তায় ডুবে থাকেন প্রতিটি মুহূর্ত্ত—দশবার জিজ্ঞাসা করলে তবে পাওয়া যায় একটা প্রশ্নের উত্তর।

ভক্ত ও শিষ্যবর্গ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে, বলেন,—ও কিছু নয়—হয়ত ক্ষীর-ভবানীতে কঠোর তপস্যার ফলেই এমনি হ'য়েছে ; সেরে যাবে দুদিন পরে।' কিন্তু তিনি উপেক্ষা দেখালেও ভক্ত-সন্ন্যাসিগণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না তাঁর কথায়। ডাক্তার-কবিরাজ ডেকে স্বামিজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন তাঁরা। চিকিৎসকগণ একবাক্যে মত প্রকাশ করলেন,—যথেষ্ট সাবধানে থাকতে হ'বে।...

কিন্তু বয়ে গেছে স্বামিজীর সাবধানে থাকতে! চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় এলেন,—কিন্তু সেখানে সে-অবস্থাতেও বিরাম নেই!—দর্শনার্থিগণ আসছেন—আর স্বামিজীও স্বাস্থ্যের কথা একদম ভুলে দর্শন দিচ্ছেন তাঁদের—নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রছেন তাঁদের সঙ্গে।

নিষেধ করলে,—ব'লে ওঠেন ক্ষুব্ধস্বরে,—'এঁরা সব আমায় দেখবার জন্যে,—কি আমার দুটো কথা শোনবার আশায়—কত দূর-দূরান্তর থেকে ছুটে আসছেন বুকে আগ্রহ নিয়ে,—আর আমি ফিরিয়ে দেব তাঁদের শরীর খারাপ ব'লে?—না, না, তা' হয় না।'

এরপর কে আর কি প্রতিবাদ করবে?...

প্রসঙ্গক্রমে শরৎবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন স্বামজীকে,—আচ্ছা, অমরনাথ-গুহায় শুনেছি, একরকম শাদা পায়রা আছে। কিন্তু সবাই দেখতে পায় না তাদের। যাদের তীর্থযাত্রা সফল ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়,—তারাই দেখতে পায়।...আপনি কি দেখেছিলেন সে রকম কোন পায়রা সেখানে?

'হ্যাঁ—হ্যাঁ'—তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন স্বামিজী—"দেখেছিলুম বই কি? সংখ্যায় তিন-চারটা ছিল। কিন্তু তারা গুহার মধ্যে থাকে,—কি পাহাড়ে থাকে,—তা জানি না।"

শরৎবাবু মনে মনে ভাবলেন,—স্বামিজীর মত পুণ্যচেতা ব্যক্তির যদি তীর্থযাত্রা সফল এবং মনস্কাম পূর্ণ না হ'বে তো হ'বে কার?

ক্রমশঃই কিন্তু হাঁপানি প্রবল হ'য়ে উঠলো স্বামিজীর। মাঝে মাঝে দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়,—মনে হয় প্রাণের স্পন্দন যেন থেমে যাবে এক্ষুনি!

এই সাংঘাতিক অবস্থায় অনেকের অনুরোধে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে ক'রে—বৈদ্যনাথধামে চ'লে গেলেন স্বামিজী।—সেখানে আতিথ্য গ্রহণ

ক'রলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে।...দিন কয়েক থাকতে থাকতে—
—সেখানকার জলবায়ুর গুণে রোগযন্ত্রণারও কতকটা উপশম বোধ হ'লো
তাঁর।...কিন্তু আরও একটু সুস্থ মনে হতেই ফিরলেন আবার মঠে।

৮৬

নূতন যারা সন্ন্যাসী হ'য়েছে—এবার স্বামিজী কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদান করতে লাগলেন তাঁদের।

কথায় কথায় বলেন,—আমাদের দেশে চিন্তাশীল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন সহজেই।...কিন্তু উদ্যমশীল—কর্ম্মনিষ্ঠ লোকের একান্ত অভাব।

যা'কে যে কাজের উপযুক্ত মনে করেন,—তাকে নিযুক্ত করেন, সেই কাজেই। কাউকে দেন তদ্বির-তদারকের ভার,—কাউকে নিযুক্ত করেন সমাগত ভদ্রব্যক্তিদের অভ্যর্থনার কাজে—কাউকে-বা আদেশ করেন বক্তৃতা দেওয়া বা কিছু রচনা করার অভ্যাস করতে।

শিষ্যদের মনের গ্লানি দূর ক'রে সেখানে নিষ্ঠার ভাব সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বলেন,—দেখ, যে কাজই হোক, খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হ'বে। কাজের ছোট-বড় নেই।...যে ভাল ক'রে এক ছিলিম তামাক সাজতে পারে, —সে ঠিক ঠিক ধ্যান-ধারণাও করতে পারে! আর যে রান্নাটাও ভাল করতে পারে না—সে কখনো পাকা সাধু হ'তে পারে না।...শুদ্ধমনে একাগ্রচিত্তে না রাঁধলে খাদ্য অখাদ্য হয়।

'লজ্জা করিসনে কোন কাজে।' ঠাকুর আমায় কি বলতেন জানিস্—'যখন লোক দেখে লজ্জা হ'বে,—তখন মনে করবি,—লোক-না—পোক। ক্রমেই দেখবি—লজ্জা কেটে গেছে।' বক্তৃতাই দে,—গানই গা' আর নৃত্যই কর, —সব কাজেই তাই।'

একদিন শিষ্যদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে করতে ব'ললেন,—জগতের ইতিহাস কি জানিস্? কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাসই হ'লো জগতের ইতিহাস!...প্রথমে আত্মশক্তিতে—পরে ভগবানে বিশ্বাস কর। একমুঠো শক্তিমান লোক জগৎটাকে টলমল ক'রে দিতে পারে! যে-মুহূর্ত্তে একটা মানুষ বা একটা জাত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারায়—সেই মুহূর্ত্তেই সে মরে!...আমাদের চাই, অনুভব করার হৃদয়,—চিন্তা করার মস্তিষ্ক—আর কাজ করবার হাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন কিজন্যে ?—জগতের কল্যাণেই প্রাণ দিতে।··· আমিও দেব,—তোদেরও দিতে হবে। কিছুতেই ভুলিসনে,—প্রাণ দিয়ে জগতের সেবা আর ঈশ্বরপ্রাপ্তিই—সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

এদেশের প্রত্যেক মঠ ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বড়লোকের দাসত্ব করতে গিয়ে—আর তাদের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রেই উচ্ছন্ন গেছে! আমার এখানে কোন সন্ন্যাসী অর্থবানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গীরব নিয়েই তাদের কারবার। গরীবদেরই তারা ভালবাসবে—যত্ন করবে—যথাশক্তি সেবা করবে।

মনের মধ্যে যদি সংসারের মোহ থাকে,·· গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে যাওয়াই ভাল। তবু সন্ন্যাস-আশ্রম কলুষিত করা উচিত নয়···গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ভাল নয় বটে,—কিন্তু কঠোর নিষ্ঠাবান্ হওয়া চাই।······কথা কইবি শুধু সৎপ্রসঙ্গে।

একদিন এক শিষ্যকে কবিতা লেখা প্রসঙ্গে ব'ললেন,—যা লিখবি,—তাতে যেন ভাবপ্রবণতা মোটেই না থাকে। এদেশের লোক যা' লেখে—তাতেই ভাবুকতার ছড়াছড়ি!—শক্তি চাই রে—শক্তি চাই! কাজে-কর্ম্মে-লেখায় একটা পৌরুষ ভাব থাকা চাই। আজকালকার দিনে এ জিনিষটার বড় অভাব। আমি একটা নূতন জীবন্ত ভাষায় বাংলা লিখবার চেষ্টা করছি, দেখবি পরে।···

এমনি যে কত সারগর্ভ উপদেশ দিতেন স্বামিজী, তা লিপিবদ্ধ করাও অসম্ভব। কোন কোনদিন দুঃখ ক'রে ব'লতেন—এদেশে কাজ করবো কেমন ক'রে বল ?—এখানে সবাই কর্ত্তা হ'তে চায়। কেউ কাউকে মানতে চায় না। বড় কাজ ক'রতে গেলে সর্দ্দারের হুকুম চোখ বুজে মেনে চলতে হয়। যে হুকুম তামিল ক'রতে পারে—সেই একদিন সর্দ্দার হয়। কিন্তু কে বোঝে সে কথা ? একদিন আত্মোন্নতির এবং প্রকৃত মানুষ হওয়ার পন্থা সম্বন্ধে বললেন এক শিষ্যকে,—জগতের কল্যাণে যে যত নিজেকে বলি দিতে পারে,—সেই তত বড় হয়।

"তবে আর আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতির চেষ্টা করতে বলেন কেন ?"—উত্তর দিলো শিষ্য অবুঝের মত।····গর্জ্জে উঠলেন স্বামিজী,—"তোরা কি আবার মানুষ ?···পশুর চেয়ে তোরা শ্রেষ্ঠ কিসে ? যদি একটু বুদ্ধিবৃত্তি না থাকতো, এতদিনে চতুষ্পদে পরিণত হতিস্ তোরা !····বাজে বড়াই ছেড়ে—কিভাবে জীবন কাটাচ্ছিস্ ভেবে দেখ তো ?···এই পশুত্ব তোদের মধ্যে দেখেছি ব'লেই না শিক্ষা দিচ্ছি,—শরীরটাকে পোক্ত করতে শেখ।

শরীর জোরালো হ'লে মন জোরালো হ'বে। ত্যাগের শক্তি আসবে। একবার মনটা নিজের বসে এলে শরীর গেল—আর থাকলো!—তখন তো আর শরীরের দাস নোস?"

কখনো-বা ব'লতেন,—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হ'য়ে তোদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা নিজের দেশের সেবা করতে পারবি না?···যেখানে মহামারী—যেখানে দুর্ভিক্ষ—যেখানে জীবের দুঃখকষ্ট···যা, ছুটে যা সেখানে। নয়, মরেই যাবি,—তাতে কি হ'য়েছে? মরবিই তো একদিন,—একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরাই ভাল।····তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়!···

মঠের ছেলেরা একাগ্রচিত্তে শুনে যেতো যুগগুরু স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ। নিজেদের গঠন করতেও চেষ্টা করতো সেইভাবে। আজীবন কঠোর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথাই রেখাপাত করতো তাদের অন্তরে গভীরভাবে।··· নিজের অন্তর খাঁটি না হ'লে অপরের প্রতি কোন উপদেশ-নির্দ্দেশ কি কার্য্যকরী হয়েছে কোনদিন?

কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত তরুণগণ স্বামিজীকে দর্শন ক'রতে মঠে এলে তিনি ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করতেন তাদের সঙ্গে—পরম উৎসাহে। আবার দেশ ও জাতির কথা ভেবেও বলতেন,—আগামী পঞ্চাশ বৎসর একমাত্র জননী জন্মভূমিই তোমাদের উপাস্য দেবতা।···তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখছো,—সেই বিরাটের উপাসনা কর।···এই সব মানুষ—এই সব পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর।

কখনো কখনো ব'লতেন,—'I want to preach a man-making religion.' মানুষ-গড়া ধর্ম্মই আমি প্রচার করতে চাই।

* * * *

একদিন "হিতবাদীর" সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর এসেছেন স্বামিজীকে দর্শন করতে। একজন পাঞ্জাবী বন্ধুও এসেছেন সঙ্গে।

উভয়ের একান্ত ইচ্ছা,—স্বামিজীর কাছে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু শুনবেন। স্বামিজী সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের।···কিন্তু দেশের কল্যাণ-চিন্তায় তাঁর হৃদয় তখন আকুল!···কিসে দেশের ভাল হ'বে,—দেশের লোকের দুঃখ দূর হবে,—শুধু সেইসব কথাই তিনি আলোচনা করতে লাগলেন নানাভাবে।

বিদায়ের সময় পণ্ডিত দেউস্করের বন্ধু ব'ললেন,—স্বামিজীর মুখে ধর্ম্মকথা শুন্‌বো,—এই আশায় একান্ত আগ্রহে এসেছিলাম আজ। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়,—সাধারণ কয়েকটি আলোচনা হ'লো মাত্র। একটিও 'ধর্ম্মকথা' শোনবার সৌভাগ্য হ'লো না। আজকার সাধুদর্শন যেন বিফলই হ'লো!

মুহূর্ত্তে গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন স্বামিজী। নিবিড় বিষাদের ছায়া ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠ্‌লো প্রখরতা,—"মশায়, যে পর্য্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে,—ততদিন তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম,—বাকী আর যা' কিছু—সব অধর্ম্ম!"

স্বামিজীর দৃপ্তকণ্ঠে চমকে উঠ্‌লেন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।—পণ্ডিত দেউস্কর নিজেও ছিলেন দেশপ্রেমিক।…আজকার ব্যাপারে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তাঁর।…প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কি,—আজ মনেপ্রাণে বুঝলেন তিনি স্বামিজীর আচরণে।…

এই সময় 'রামকৃষ্ণ মিশনের' মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা বের হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনায়। একটি ছাপাখানাও ক্রয় করা হয়—কাগজখানি ছাপবার জন্যে। স্বামিজী ভারী আনন্দিত হন এ ব্যাপারে।—ত্রিগুণাতীতকে ডেকে বহু সদুপদেশ দান করেন,—পত্রিকাখানির সুষ্ঠু সম্পাদন ও পরিচালন সম্বন্ধে।

*　　*　　*　　*

পরমভক্ত সাধু নাগমহাশয় এসেছেন মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে।… এঁর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের দেওভোগে—সেই সুদূর থেকে এসেছেন বুকে আগ্রহ নিয়ে স্বামিজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ঠাকুরের গৃহীশিষ্যদের মধ্যে এঁর মত নিরহঙ্কার—ভক্তিমান—উদার-হৃদয়, পূত-চরিত্র ব্যক্তি বিরল!…

…অতিথি এসেছেন নাগমহাশয়ের বাড়ীতে,—দুর্য্যোগের রাত্রি—প্রবলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু অতিথির আহার্য্য তো প্রস্তুত করতে হ'বে? স্ত্রী ব'ললেন,—জ্বালানি নেই—বৃষ্টিতে বাইরের সব ভিজে গেছে। অন্যোপায় না দেখে নাগমহাশয় ঘরের একটি খুঁটি ছাড়িয়ে তাই দিয়েই চুলী জ্বালিয়ে দিলেন।

—আহার্য্য তো হ'লো,—কিন্তু শোবার ব্যবস্থা? নাগমহাশয়ের ঘর মাত্র একখানি। অকাতরচিত্তে সেখানে অতিথির শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে,—সস্ত্রীক প'ড়ে থাকলেন তিনি সেই দুর্য্যোগের মাঝে সারারাত্রি বাইরে।……

এমনি বহু মর্ম্মগ্রাহী উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় নাগমহাশয়ের জীবনে। স্বামিজী ভারি প্রীত হ'লেন তাঁকে পেয়ে। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন তাঁর চরণে। তাড়াতাড়ি তাঁকে বুকে তুলে নাগমহাশয় ব'ললেন,—জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! আজ আমার সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'লো। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

"আপনিই ঠাকুরকে ঠিক চিনেছিলেন।"—ব'ললেন স্বামিজী,—"আমরা মিছে ঘুরে ঘুরেই মর'লাম। আজ ঠাকুরের কথা আমাদের কিছু শোনান।"

"না, না, ও-কথা কি ব'লছেন?"—পরম দীনতায় গ'লে গেলেন নাগমহাশয়,—"আপনি ঠাকুরের ছায়া,—এ-পিট আর ও-পিঠ! যার চোখ আছে,—সে দেখুক!...ঠাকুরের কথা আমি আর কি ব'লবো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।"

একটু চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে প্রশ্ন তু'ললেন স্বামিজী,—"এই যে মঠ-ফঠ হচ্ছে,—এসব কি ঠিক হচ্ছে?"

"আমি ক্ষুদ্র,"—দীনভাবেই উত্তর দিলেন নাগমহাশয়,—"আমি কি বুঝি? তবে একথা ঠিক যে, আপনি যা করবেন,—তাতে জগতের কল্যাণ হ'বে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!"

—"সেই রামকৃষ্ণের ইচ্ছা ভিন্ন তো কিছু হয় না?"

"তাঁর ইচ্ছা—আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।"—গভীর বিশ্বাসে ব'ললেন নাগমহাশয়,—"আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। কিন্তু কে বোঝে আপনাকে? দিব্যদৃষ্টি চাই,—নইলে আপনাকে চিনবার যো কি? একমাত্র ঠাকুরই আপনাকে চিনেছেন।...জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ! আমাদের এখন আপনাকে দেখলেই জীবন সার্থক!"

এমনিভাবে কত কথাই হ'লো দুই মহাপুরুষের মধ্যে।—একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—একজন নিষ্কাম অনাসক্ত গার্হস্থ্য-ধর্ম্মী।—দু'জনে দু'টি বিভিন্ন মার্গের মহান্ আদর্শ। অথচ দু'জনের 'লক্ষ্য' একই। কত সুন্দর—কত গভীর—কি পুণ্যময় এই মিলনদৃশ্য!

স্বামিজী ব'ললেন বিনীত মৃদু হাস্যে,—'আপনি এবার মঠে এসে থাকুন না। মঠের ছেলেদের বড় কল্যাণ হয় তা'হলে!'

"কিন্তু ঠাকুর ব'লেছেন গৃহেই থেকো।"—নাগমহাশয় উত্তর দিলেন ভক্তি-শান্তকণ্ঠে,—"তাই গৃহেই আছি। মাঝে মাঝে এখানে এসে আপনাকে দর্শন ক'রে ধন্য হ'বো।"

শেষের দিকে অপূর্ব্ব নম্রতায় নাগমহাশয়ের কণ্ঠ গাঢ় হ'য়ে এলো। স্বামিজী ব'ললেন,—'আমার একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি! মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তার ওপর অনাস্থাপর হ'য়ে ঘুমুচ্ছে! সাড়া নেই—শব্দ নেই! এদের জাগাতে পারি, বুঝবো, ঠাকুর বা আমাদের আসা সার্থক।...আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।'

—"আমি কি আশীর্ব্বাদ করবো?"—পূর্ব্ববৎ দীনকণ্ঠে ব'ললেন নাগমহাশয়—"ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ আছে আপনার ওপর।—জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে।"

সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'রলেন।

৮৭

শ্রীমতী সরলা দেবী এসেছেন বাগবাজারের বাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে।...মা ভারী খুশী হ'লেন তাঁকে দেখে। মাকে প্রণাম ক'রে সরলা দেবী ব'সলেন তাঁর সম্মুখে; ভগিনী নিবেদিতাও এসে ব'সলেন সেখানে।

স্নেহময়ী মা কত গল্প-গুজবই না করলেন দু'জনের সঙ্গে। সে সব গল্পের মধ্যে কতই না উপদেশ,—কতই না সুখ-দুঃখের কথা,—কতই না হাস্য-কৌতুক।...তখনই মা উপদেশ দিচ্ছেন,—শিক্ষাদাত্রীর উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যে—আবার পরমুহূর্ত্তেই মাতৃপ্রাণের সরল মাধুর্য্যে আনন্দ ঢেলে দিচ্ছেন সন্তানের প্রাণে।

—কথায় কথায় উঠলো স্বামিজীর কথা।...সরলা দেবী হাসতে হাসতে ব'ললেন,—'স্বামিজীর যে কোন্ বিদ্যাটি জানা নেই,—তা' তিনিই ব'লতে পারেন!—পুরুষ মানুষ হ'য়ে এমনি চমৎকার রান্না করেন যে,—মেয়েরাও হার মানে!'

'তাই না কি?'—নিবেদিতার দুই চোখে কৌতুক ফুট্‌লো,—'আপনি খেয়েছেন নাকি,—তাঁর হাতের রান্না?...পরম সৌভাগ্য আপনার ব'লতে হ'বে তা' হ'লে!'—সরলা দেবীর অবশ্য শোনা কথা।

কিন্তু কথাটা উঠ্‌লো গিয়ে একেবারে স্বামিজীর কানে! কৌতুকপ্রিয় সরল-প্রাণ স্বামিজী বুঝিবা নিবেদিতা ও সরলা দেবীর অন্তরের আশা পূর্ণ ক'রতে—একদিন আহারের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন দু'জনকেই মঠে।

স্বামিজীর নিমন্ত্রণ পেয়ে তো দু'জনেই অবাক! নিজেদের আলোচনার জন্যে—উভয়ের মনে নারীসুলভ একটা লজ্জা জাগলো,—আবার আনন্দিতও হ'লেন তাঁরা এই আশাতীত দুর্ল্লভ সৌভাগ্যে। কিন্তু তবু দারুণ কুণ্ঠা জাগতে লাগলো তাঁদের চিত্তে। হাজার হোক্—স্ত্রীলোক ত! অথচ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলেও হয়ত দুঃখ করবেন স্বামিজী; তাই দু'জনেই নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হ'লেন এসে মঠে।

স্বামিজী তাঁদের আপ্যায়ন করলেন পরম আদরে এবং উচ্ছলিত স্নেহে। অতি যত্নে নিজের হাতে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন ক'রে খাওয়ালেনও তাঁদের। প্রগাঢ় লজ্জা হলেও 'না' বলার উপায় ছিল না কারো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এত সুন্দর রাঁধতে পারেন স্বামিজী! ভাবলেন নিবেদিতা ও সরলা দেবী মনে মনে;—কিন্তু শুধুতো রান্নার গুণই নয়,—উদার পুণ্যচেতা পুরুষের অন্তরের প্রীতিসুধাও যে মিশিয়েছিল তার সঙ্গে! সেই উপাদেয় ব্যঞ্জন খেয়ে উভয়েরই মনে হলো,—যেন অমৃতই খেয়েছেন!

আহারাদির পর সুরু হ'লো নানা আলোচনা। আরও তিন-চারজন মহিলা, সমাগত কয়েকজন দর্শনার্থী—এবং মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণও যোগ দিলেন এসে সেই আলোচনার আসরে।

"নিবেদিতা শোন।"—সহসা স্বামিজী ডাকলেন নিবেদিতাকে,—ব্যস্তভাবে উঠে নিবেদিতা সসম্ভ্রমে এসে দাঁড়ালেন স্বামিজীর সম্মুখে।

"আমাকে একবার তামাকটা সেজে দাও তো?"—আদেশ করলেন স্বামিজী একান্ত স্বাভাবিকভাবে—"ঐ দেখ, হুঁকো-কল্‌কে,—তামাক-টিকে ঐ ওখানে রয়েছে।"

অবাক-বিস্ময়ে তাকালো সকলে একবার স্বামিজীর মুখের দিকে, আর বার নিবেদিতার দিকে।···হাজার হোক্, পাশ্চাত্ত্যের সম্ভ্রান্তবংশীয়া—উচ্চশিক্ষিতা মহিলা! অথচ স্বামিজী নির্ব্বিচারে হুকুম ক'রলেন তাঁকে তামাক সাজতে!··· নিবেদিতা কি পারবেন গ্রহণ করতে এ আদেশ সহজভাবে?

কিন্তু নিবেদিতা তাঁর আচরণে সকলের বিস্ময় দিলেন আরও বাড়িয়ে।···· গুরুজীর পরিচর্য্যার ক্ষণেক সুযোগ পেয়েও—তাঁর চোখ-মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠলো অপূর্ব্ব আনন্দে, পরম কৃতার্থতায়!····তামাক সাজা কোনদিন তাঁর অভ্যাস না থাকলেও স্বামিজীর জন্যে তামাক সাজতে অনেককে দেখেছেন তিনি অনেক বার! নিতান্ত অপটু হস্তেও ঠিক সেইভাবে—বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় তামাক সেজে এনে হুঁকোটি দিলেন তিনি স্বামিজীর হাতে।

"দেখুন, ঠিক হয়েছে কি-না!"—বললেন ঈষৎ কৌতুক-হাস্যে—"দুঃখ যে, আপনি এ রকম সৌভাগ্য দিতে চান না,—দিলে অভ্যাস থাকে।"—প্রীতির মাধুর্য্য যেন উপচে পড়ছে তাঁর মুখে-চোখে।

হুঁকোয় কয়েকটা টান দিয়ে স্বামিজীও বললেন হাসতে হাসতে,—'ঠিক হয়েছে!....তুমি তো একেবারে আমাদের ঘরের মেয়েই বনে গেছ!'

এরপর নিবেদিতা প্রভৃতি মহিলারা, এবং দর্শনার্থিগণ চলে গেলে স্বামিজী বললেন গুরুভাইদের,—দেখ, তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। নিবেদিতাকে দিয়ে তামাক-সাজানো আমার ঠিক উদ্দেশ্য নয়।...তবে আমি শুনেছি,—এদেশের বহু শিক্ষিত লোক ব'লে থাকেন, আমি নাকি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের স্তুতি ক'রে এবং তাদের মতানুযায়ী নানাভাবে তাদের মনে অনুরাগ জন্মিয়ে—তাদের শিষ্য করতে সমর্থ হ'য়েছি। আজ যারা এসেছিল এখানে—তারা সকলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের,—তাদের সামনে নিবেদিতাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে—তাদের একটু চৈতন্য এনে দিলাম। পাশ্চাত্ত্যের লোক আমাকে কিভাবে নিয়েছে এবং তাদের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত,—এখন তারা সে কথা বেশ বুঝবে।

৮৮

আবার সুদূরের ডাক,—সাগরপারের আহ্বান!

আমেরিকা থেকে ঘন ঘন পত্র আসছিল স্বামিজীর কাছে—কত আকুল মিনতি সে সকল পত্রে,—স্বামিজী, আমরা আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে দিন যাপন করছি,—শীগ্‌গির যাত্রা করুন।

এদিকে—চিকিৎসকরাও ব'লছেন, সমুদ্রযাত্রায় স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে। স্বামিজীর গুরুভ্রাতারাও তাঁর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা ক'রে কোন বাধা দিলেন না,—এই পুনর্যাত্রায়।

আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল দেখবার জন্যে স্বামিজীরও অবশ্য আগ্রহ ছিল প্রচুর আর একবার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের। সুতরাং সব দিক দিয়ে তাঁর পুনরায় আমেরিকাযাত্রাই সাব্যস্ত হ'লো সমীচীন ব'লে।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন—বাগবাজারের বাটীতে এসে স্বামিজী শ্রীশ্রীমা'র পদধূলি গ্রহণ করলেন। মা আশীর্ব্বাদ করলেন তাঁকে প্রাণভরে। স্নেহময়ী মা মঠের সন্ন্যাসিগণের আহারের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন আজ এখানে।

পরম তৃপ্তিতে মায়ের হাতে ভোজন ক'রে স্বামিজী গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শিষ্যা নিবেদিতাকে সঙ্গে ক'রে এলেন প্রিন্সেপ ঘাটে।—তখন অপরাহ্ণ। বিদায়-অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বহু বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন ঘাটে।... যথাসময়ে তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামিজী উঠলেন 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে। সমাগত বন্ধুবান্ধবদের মুখে ফুটে উঠলো বিষাদের রেখা,—চোখ ছলছল ক'রে উঠলো সকলের।...সকলের প্রাণের বেদনা উপলব্ধি ক'রে স্বামিজীর নিজের প্রাণও বিচলিত হ'য়ে উঠলো বিচ্ছেদ-ব্যথায়।

জাহাজে ব'সে নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন স্বামিজী,—দেখ, যত দিন যাচ্ছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করছি, মনুষ্যত্ব-লাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই অভিনব বার্ত্তাই আমি জগতে প্রচার করছি।...যদি অন্যায় কাজ করতে হয়, তবে তা মানুষের মতই কর। যদি দুষ্টই হ'তে হয়—তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও।

কথা দু'টির গভীর অর্থ সহসা ঠিক বুঝতে না পেরে—তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতা দু'জনেই চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কিছুক্ষণের জন্যে।

২৪শে জুন জাহাজ পৌছল মাদ্রাজে। তার-যোগে স্বামিজীর আগমন-সংবাদ পেয়ে,—মাদ্রাজের বহুসংখ্যক লোক ও শিষ্যগণ উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলেন তাঁর দর্শনের আশায়। কিন্তু এখানে তখন প্লেগের প্রকোপ খুব বেশি। কর্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে নামবার অনুমতি দিলেন না স্বামিজীকে। নিরুপায় হ'য়ে অনেকে নৌকোয় ক'রে এসে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা ক'রলেন,—ফলফুল ইত্যাদি নানা দ্রব্য উপহারও দিলেন তাঁকে।

মাদ্রাজ থেকে চারদিন পরে কলম্বো—সেখান থেকে ৮ই জুলাই এডেনে,—এডেন থেকে ১৪ই জুলাই এসে পৌছলেন সুয়েজ বন্দরে।

সুয়েজ বন্দর থেকে তাঁর কোন কোন শিষ্যকে পত্র লেখেন স্বামিজী। তার একখানির মধ্যে শ্রমজীবীদের প্রতি কি গভীর সমবেদনাই না ফুটে উঠেছে তাঁর !

—"ঐ যারা চাষাভুষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষ,—বিজাতি-বিজিত, স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত—তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে—তাদের পরিশ্রম-ফলও তারা পাচ্ছে না!...

কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না,—যেখানে সকলে ঘৃণা করে; সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা—অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা! আমাদের গরীবেরা ঘরে-বাইরে দিনরাত যে মুখবুজে কাজ ক'রে যাচ্ছে,—তাতে কি বীরত্ব নেই ?"

শুধু সহানুভূতিই নয়ঃ অপার লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত, ভারতের চির-অবহেলিত শ্রমজীবীদের পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন স্বামিজী। দুর্নিবার আবেগে বলতেন, তাদের উদ্দেশ ক'রে—'হে ভারতের শ্রমজীবীর দল, আমি তোমাদের প্রণাম করি।'

তবে আজ পায়ের তলায় পড়ে থাকলেও তাদেরও যে অভ্যুত্থানের দিন আসছে,—এ-ও যেন দেখতে পেতেন স্বামিজী দিব্যদৃষ্টিতে। তাই বলেছিলেন সেদিন,—"ব্রাহ্মণ্যশক্তি এখন অতীতের অতল গহ্বরে বিলীন,—ক্ষাত্রশক্তিও লুপ্ত হ'য়েছে,—এখন চলেছে বৈশ্যশক্তির শাসন,—কিন্তু এরও আয়ুষ্কাল প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এরপর শূদ্রশক্তি দেশ শাসন করবে।"

দেশে দেশে শ্রমিক-সরকারের প্রতিষ্ঠা কি আজ স্বামিজীর সেই ভবিষ্যৎ-বাণীরই সফলতা প্রমাণ করছে না?

এবারকার সমুদ্রযাত্রায় স্বামিজী জাহাজের মধ্যে ব'সেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পরিব্রাজক' এবং 'বর্ত্তমান ভারত' রচনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধনের' সম্পাদকের অনুরোধে এই বই দু'টির রচনা সুরু করেন তিনি। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বে স্বামিজী বলেছিলেন তাঁর এক শিষ্যকে—আমি এক নূতন ধরণের জীবন্ত বাংলা লিখবার চেষ্টা করছি। সেই ভাষার নমুনা-স্বরূপ তাঁর "বর্ত্তমান ভারতের" কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি এখানে। ভাবে, ভাষায় জ্বলন্ত,—এরূপ হৃদয়গ্রাহী অনবদ্য রচনা স্বামিজীর ন্যায় তেজস্বী পুরুষের লেখনীমুখেই নির্গত হওয়া সম্ভব ঃ

"বলবানের দিকে সকলে চায়ঃ গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে,—দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি,—তখন মনে হয়,—বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।...

"আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে,—ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি,—উহারা অনার্য্যজাতি,—উহারা আর আমাদের নহে!

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা—এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?

"হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না,—তোমার উপাস্য উমানাথ,—সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না

—তোমার বিবাহ,—তোমার ধন—তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ;—ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত,—ভুলিও না,—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র।

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি-মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই !···হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী,—ভারতবাসী আমার ভাই ! বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী,—চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর—ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন—আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—আর বল দিনরাত,—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর,—আমায় মানুষ কর।···

৮৯

স্বামিজী লণ্ডনে পৌছলেন ৩১শে জুলাই। টিলবেরী ডকে নামামাত্র বহু শিষ্য ও বন্ধু সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের। আমেরিকা থেকে দু'জন শিষ্যাও এসে অপেক্ষা করেছিলেন সেখানে। ভক্তশিষ্য ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় দু'টি সপ্তাহ লণ্ডনে কাটিয়ে—১৬ই আগষ্ট স্বামিজী তুরীয়ানন্দ এবং আমেরিকার শিষ্যাদ্বয়কে নিয়ে যাত্রা করলেন নিউইয়র্কে।

স্বামিজীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী—অথচ স্নেহের দিক দিয়ে মাতৃস্বরূপা মিসেস লিগেট পরম যত্নে নিয়ে গেলেন তাঁকে শহরের কোলাহল থেকে দূরে—স্বীয় নিভৃত পল্লীভবনে। শরীর খারাপ ব'লে সম্প্রতি তিনি কোন বক্তৃতা দিতে দিলেন না তাঁকে। শুধু মিসেস লিগেটই নয়,—মিঃ লিগেটও স্বামিজীকে স্নেহ করতেন পুত্রের মত। স্বামিজীর শিশুর মত সরল, সমুদ্রের মত প্রশান্ত ও গভীর চরিত্রই আকৃষ্ট করেছিল এই বিদেশীয় দম্পতিকে—পুত্র-স্নেহের দাবী নিয়ে। স্বামিজীর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থও ব্যয় করতেন এঁরা সানন্দে।

কিছুদিন সেখানে থেকে, স্বামিজী ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। ইতিমধ্যে স্বামিজীর বই পড়ে পরম শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে উঠেছিলেন

এখানকার অনেকে স্বচক্ষে স্বামিজীকে দর্শন করতে,—তাঁর মুখের মধুর উপদেশবাণী শুনতে ছুটে আসতে লাগলো তারা দলে দলে। তাঁর পূর্ব্বেকার শিষ্য, ছাত্র ও বন্ধুগণও এলেন সমধিক আগ্রহে—প্রাণে বিপুল আনন্দ নিয়ে।

লণ্ডন থেকে ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী তুরীয়ানন্দও স্বামিজীর কাজের সহায়তার জন্যে এলেন নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্ক থেকে চিকাগো প্রভৃতি কয়েকটি শহর ভ্রমণ ক'রে স্বামিজী পৌছলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রধান নগর লস্ এঞ্জেলসে এসে উঠলেন তাঁরা।

এখানেও সুধি-সমাজে স্বামিজীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো অবিলম্বে। বহু বিদ্বান ব্যক্তি প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠলেন তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে। স্বামিজী বুঝে দেখলেন,—ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত প্রচারের বিশেষ উপযুক্ত স্থান।

অবিলম্বে একটি কেন্দ্র স্থাপন ক'রে ব্রতী হ'লেন তিনি বেদান্ত প্রচারে।

তাঁর চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হ'লো বেদান্ত-সমিতি। অবশ্য পূর্ব্ব হ'তেই অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। কয়েকমাস ধ'রে অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য্য চালিয়ে ফিরে এলেন স্বামিজী আবার নিউইয়র্কে। ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগের প্রাক্কালে মিস মিলি বুক নামে স্বামিজীর এক পরম ভক্তিমতী শিষ্যা ১৬০ একর পরিমিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করলেন স্বামিজীকে বেদান্ত-চর্চ্চার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। স্থানটি হ্যামিলটন পর্ব্বতের সানুদেশে।—চতুর্দ্দিকে বনানী ও গিরিমালা-বেষ্টিত মনোরম স্থান।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্ত-প্রচারে বহু বক্তৃতাই দিতে হয়েছিল স্বামিজীকে; তাই পরিশ্রান্তও হয়েছিলেন তিনি খুবই। কিছুদিন বিশ্রামলাভের জন্যে তিনি বন্ধুদের নিয়ে—নিউইয়র্ক থেকে চলে গেলেন ক্যাম্পটেলর নামে এক পল্লীগ্রামে।

এখানে নদীতীরে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন একদিন—কয়েকজন যুবক সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে জলস্রোতে ভাসমান কয়েকটি ডিমের খোলাকে তাগ ক'রে গুলী ছুঁড়ছে,—কিন্তু কারো গুলী লাগছে না ডিমের খোলার গায়ে।

"ওহে বাপু, কাজটা অত সোজা নয়।"—হাসতে হাসতে তাদের কাছে এগিয়ে এসে ব'ললেন স্বামিজী,—"কই দেখি, একটা বন্দুক দাও তো।"

যুবকরা ভাবলে,—তিনি খুব ভাল বন্দুক চালাতে জানেন। সাগ্রহে তারা একটা বন্দুক দিলে স্বামিজীর হাতে।....স্বামিজীর প্রত্যেকটি গুলীই লাগলো

গিয়ে ডিমের খোলার গায়ে। অবাক চোখে তাকালো যুবকেরা স্বামিজীর মুখের দিকে।

তেমনি হাসতে হাসতে ব'ললেন স্বামিজী,—দেখ বাপু, আমি এর আগে কখনো বন্দুক হাতে নিইনি!—এটা আর কিছু নয়, শুধু মনঃসংযম।

হাঁ-ক'রে চেয়ে থাকলো যুবকের দল স্বামিজীর মুখের দিকে; যেন স্বপ্ন দেখছে!

* * * *

পল্লীগ্রাম থেকে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এসেছেন স্বামিজী। এ সময় প্যারীতে একটি ধর্ম্মেতিহাস-সভার আয়োজন হচ্ছিল। একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হচ্ছিল তার সঙ্গে। চিকাগো ধর্ম্মসভার থেকেই এই সভা আহ্বানের প্রেরণা জেগেছিল উদ্যোক্তাগণের মনে। সমগ্র ইউরোপে হিন্দুধর্ম্ম-বিশেষজ্ঞ-হিসাবে স্বামিজীর তখন যেমন খ্যাতি, তেমনি প্রভাব ও প্রতিপত্তি। তাই সাদরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি এই সভায় হিন্দুধর্ম্মের পর্য্যালোচনার জন্যে।

লেগেট দম্পতিও তখন অবস্থান ক'রছিলেন প্যারীতে। বারবার তাঁরা পত্র লিখছিলেন,—স্বামিজীকে সেখানে যেতে। সুতরাং স্বামিজী প্যারী যাত্রার উদ্দেশ্যে শিষ্য ও শিষ্যাগণসহ নিউইয়র্ক ত্যাগ করলেন ২৪শে জুলাই।

বিদায়ের পূর্ব্বে স্বামিজী তুরীয়ানন্দকে ডেকে ব'ললেন,—যাও ভাই, তুমি এবার ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে আশ্রম স্থাপন কর। এখন থেকে,—তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ক্যালিফোর্নিয়া। ভারতের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছে ফেল। বেদান্তের কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীন কর। সকলের ওপরে—কেমন ক'রে জীবনটা কাটাতে হয়,—তা এদের দেখাও। বাকী যা,—মা জগদম্বা ক'রে দেবেন।

অবনত মস্তকে স্বামিজীর নির্দ্দেশ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণ ক'রে—স্বামী তুরীয়ানন্দ যাত্রা করলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে দানসূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের ওপর বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রসারের জন্যে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন,—তার নাম রাখা হয় 'শান্তি আশ্রম'।···

নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত-প্রচারাদির ভার থাকলো স্বামী অভেদানন্দের ওপর।

আমেরিকা থেকে ফ্রান্স।

আবার স্বামিজী ভাসলেন সমুদ্রের বুকে। ফ্রান্সে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হ'লে—ফরাসী ভাষা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। অথচ ফরাসী ভাষা আদৌ জান্‌তেন না স্বামিজী। কিন্তু না জানলেও তো চলবে না।...জাহাজের মধ্যেই ফরাসী ভাষা শিক্ষা ক'রতে সুরু করলেন তিনি। এবং এই নাতিদীর্ঘ যাত্রার অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসীভাষা আয়ত্ত ক'রে ফেললেন যথোচিতভাবে।

প্যারীতে পৌঁছে আতিথ্য গ্রহণ করলেন স্বামিজী মিঃ লেগেটের ভবনে।... মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে আহারের আয়োজন ক'রে নিমন্ত্রণ করতেন,—প্যারীর বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মবেত্তা, শিক্ষাব্রতী, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি বহু জ্ঞানী-গুণীজনের প্যারীতে অবস্থিত স্বীয় প্রাসাদোপম বাসভবনে। এইভাবে স্বামিজীর সহিত সকলের পরিচয়ের সুযোগ ক'রে দেওয়াই ছিল এই উদারপ্রাণ অনুরাগী ভক্তের হৃদয়গত অভিলাষ।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামিজী বিখ্যাত ও সমাদৃত হ'য়ে উঠলেন প্যারীর গুণী-সমাজে। ...মিঃ লেগেটের সাহায্যে প্যারীর কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানও দেখলেন তিনি একে একে।

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিনে সভার অধিবেশন সুরু হ'লো। সভায় সুস্পষ্ট উচ্চারণে—সরল প্রাঞ্জল ফরাসী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। বক্তৃতার মধ্যে উপযুক্ত যুক্তি-যোগে প্রমাণ করলেন,—

বেদই হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ভারতীয় সকল ধর্ম্মের উৎপত্তির সাধারণ ভিত্তিভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী,—এবং গীতা মহাভারতের পরে রচিত নহে।

ভারতীয় সভ্যতা—গ্রীক চিন্তা ও গ্রীক শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই।

জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ইটালী প্রভৃতি বহু দেশ থেকে বহু প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি যোগদান ক'রছিলেন এই সভায়। স্বামিজীর অসাধারণ মনীষার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন তাঁরা মুক্তকণ্ঠে।...কত সুধী ও পণ্ডিত ব্যক্তি স্বামিজীর সহিত সাগ্রহ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ

হ'য়ে কৃতার্থ বোধ করলেন নিজেদের।···চারিদিকেই একটা সাড়া প'ড়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দের নামে। দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো তাঁর দর্শন কামনায়।

অধিবেশন শেষ হ'লে স্বামিজী মিসেস ওলি বুলের নিমন্ত্রণে ব্রিটানির অন্তর্গত লালিনোয় গমন করেন। ভগিনী নিবেদিতাও তখন এসেছিলেন এখানে।···

এবার ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতের নারী-কল্যাণে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন নিবেদিতা স্বামিজীর কাছে।

স্বামিজী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন সমগ্র অন্তরে,—"যাও বৎসে"—প্রগাঢ় স্নেহে বললেন,—"কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। যদি আমি তোমায় গ'ড়ে থাকি, তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও।···কিন্তু জগদম্বা যদি তোমায় গ'ড়ে থাকেন,—তবে চিরায়ুষ্মতী হও।"

কয়েকদিন পরে স্বামিজী ফিরে আসেন আবার প্যারীতে।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী দর্শন ক'রে বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হ'য়েছিলেন স্বামিজী। তিনি তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে লিখেছেন,—এই প্যারী ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখী ; এ বিরাট রাজধানী মর্ত্ত্যের অমরাবতী, —সদানন্দ নগরী। এ বিলাস—এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে— না আর কোথাও! ···প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞানসভা এদের একাডেমীর নকল।...এদের রচনার নকল সকল ইউরোপী ভাষায়।···

দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পের খনি এই প্যারী।···এই প্যারী এক মহাসমুদ্র,—এখানে মণি-মুক্তা-প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর-কুম্ভীরও অনেক।···

তিনমাস প্যারীতে বাস ক'রে স্বামিজী কয়েকজন ধনী ও পণ্ডিত বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে।

প্রথমে এলেন তাঁরা ভিয়েনা। তিনদিন ছিলেন তাঁরা এখানে। ভিয়েনা থেকে হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে এলেন— কন্‌স্টাণ্টিনোপলে।···সেখান থেকে স্টীমার-যোগে এথেন্স,—গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। এখানকার ক্ষোদিত ভাস্করমূর্ত্তি,—'লিম্পিয়ান জুপিটারের' মন্দির প্রভৃতি দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ করলেন সকলে।

এথেন্সে চারদিন থেকে স্বামিজী এলেন মিশরের রাজধানী কায়রো। প্রবল প্রতাপান্বিত ফ্যারাও-(মিশরীয় সম্রাট)-দিগের অতীত বিপুল কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ—স্বামিজীর চিত্তে জাগিয়ে তুললো পার্থিব সম্পদসমূহের

নশ্বরতার কথা। মনে মনে ব'ললেন তিনি,—হায়, অনিত্য কখনও অবিনাশী হয় না!

প্যারীর পর অবশ্য ইউরোপের আর কোন শহরই তেমন ভাল লাগেনি স্বামিজীর চোখে। আর কোন শহর তাঁর চিত্তকে অনুরূপ মুগ্ধ করতে পারেনি। তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা—চর্ব্ব-চুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা!···কিন্তু শহরগুলির অধিকাংশের মধ্যে কেবলই ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের আড়ম্বর—আপন আপন স্বার্থসাধনের চিন্তা এবং প্রবল-দুর্ব্বল ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে দারুণ বৈষম্য—দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ইত্যাদি দেখে বিশেষ আহত হ'লেন স্বামিজী মনে-প্রাণে!

সহসা একদিন স্বামিজীর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো ভারতের জন্যে। তিনি কাউকে কিছু না ব'লে কায়রো ত্যাগ ক'রে রওনা হলেন ভারতের অভিমুখে। এবার কিন্তু বিশেষ সাবধান হ'লেন অভ্যর্থনাদি ব্যাপারে।.. পথের মাঝে যা'তে কেউ তাঁকে চিন্‌তে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাইয়ে এসে সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ক'রে সাহেবী পোশাক পরলেন,—মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপি দিলেন।...তারপর ট্রেনযোগে রওনা হলেন ক'লকাতা।

বাস্তবিক সাহেবী পোশাকে কেউ তাঁকে চিনতে পারলো না।...যদিই বা কোথাও কারো সন্দেহ হ'লো,—তবু বিশ্ববন্দিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কি কখনো সাহেবী পোশাক পরতে পারেন,—এমনি একটা ধারণায় বিশেষ কেউ আর লক্ষ্য করলো না তাঁর দিকে!···এইভাবে অভ্যর্থনা-সম্বর্দ্ধনাদির ঝঞ্ঝাট দূরে ঠেলে তিনি অন্যের নিতান্ত অজ্ঞাতসারে নামলেন এসে হাওড়া স্টেশনে।

৯ই ডিসেম্বর (১৯০০)—রাত্রি তখন অনেকটাই হ'য়েছে। মঠের সন্ন্যাসীরা খেতে ব'সেছেন সকলে। হঠাৎ বাগানের উড়ে মালী ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে,—"একো সাহেবো আউচি।"—হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে সে, সঙ্গে সঙ্গে 'গেট' খুলবার জন্যে চাবিও চাইলে।

এত রাত্রে আবার সাহেব কে এলো রে বাবা! অবাক হ'লেন সন্ন্যাসীরা মালীর কথায়,—এলোই বা কোথা থেকে,—দরকারই বা কি?

এদিকে সাহেবও ততক্ষণে মঠের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন সকলের সম্মুখেই। চমকে উঠে কেউ কেউ এগিয়ে এলেন সাহেবের দিকে—তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রতে। ইংরাজিতে দু'একটি প্রশ্নও উত্থিত হ'লো এদিক সেদিক থেকে: কিন্তু অর্দ্ধপথেই থেমে গেল সে প্রশ্ন! যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে অধীর হ'য়ে উঠলো তাদের কণ্ঠ: স্বামিজী এসেছেন, স্বামিজী এসেছেন!

বিদ্যুৎ-গতিতে সে সংবাদ মঠের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।—মুহূর্ত্তে আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখর হ'য়ে উঠলো সেই গভীর রাত্রেই। সকলের মনেই তখন কিন্তু একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে,—তাইত, এত রাত্রে বিনা-সংবাদে—এভাবে স্বামিজী এলেন কোত্থেকে ?···সাহেবী পোশাকেই বা কেন ?

স্বামিজী সংক্ষেপে সব পরিচয় দিয়ে অবশেষে ব'ললেন হাসতে হাসতে,—মালীকে চাবি আনতে ব'লে অপেক্ষা ক'রছি,—এমন সময় বেজে উঠলো তোদের খাবার ঘণ্টা।···ঐ-রে, তা' হলে বুঝি—সব সাবাড় হ'য়েই যায়! তাই আর চাবির জন্যে দেরী না ক'রে পাঁচীল টপ্‌কে ঢুকে পড়লুম একেবারে ভেতরে।

কৌতুক-প্রিয় স্বামিজী হেসে উঠলেন হো-হো ক'রে। অন্যান্য সকলেও বিমল আনন্দে যোগ দিলে—সে হাস্য-কৌতুকে। নিবিড় রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে সেই কলহাস্যের ধ্বনি যেন ছড়িয়ে পড়লো বায়ু-তরঙ্গে—দিকে দিকে।

অবিলম্বে স্বামিজীর আহারের জায়গা ক'রে দেওয়া হ'লো। বহুদিন পরে—স্বামিজী আজ আহার করলেন পরম তৃপ্তিভরে। আপন-ঘরের শাক-অন্নও—সে যে বড়ই মধুর !

···সে রাত্রিটা কাটলো শুধু গল্পে আর আনন্দে। ঘুম আর এলো না কারও চোখে।

৯১

বেলুড়ে পৌঁছে স্বামিজী অবিলম্বে যাত্রা ক'রলেন মায়াবতী। হিমালয়ের সানুদেশে—এই শান্তি রসাস্পদ নির্জ্জন পার্ব্বত্য ভূমিতে স্বামিজী প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন একটি মঠ—নাম দিয়েছিলেন 'মায়াবতী আশ্রম'। সেভিয়ার দম্পতির প্রচুর সহযোগিতা ছিল এর মূলে।

স্বামী স্বরূপানন্দের অধিনেতৃত্বে এখানে থাকতেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। একটি ঠাকুর ঘরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজাদির ব্যবস্থাও ছিল এখানে।

মিঃ সেভিয়ারই ছিলেন এই আশ্রমের সভাপতি। উদার-হৃদয়—ধর্ম্মপ্রাণ সেভিয়ার সাহেব সস্ত্রীক বাস ক'রছিলেন এখানে,—দিনগুলি তাঁদের কাটছিল ধর্ম্মচর্চ্চায় ও ঐশ্বরিক আলোচনায় পরম শান্তিতে।

কিন্তু কখন কা'র ডাক আসে, কে ব'লতে পারে ?—কিছুদিন হ'লো পরলোক গমন করেছেন মিঃ সেভিয়ার।···এই প্রৌঢ় বিদেশীয় দম্পতির কাছে স্বামিজী

শুধু শ্রদ্ধাভক্তিই নয়,—অকৃত্রিম স্নেহও পেয়েছিলেন পুত্রের মত। কাজেই মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুতে—তিনি যেন পিতৃ-বিয়োগ-ব্যথাই পেয়েছিলেন নূতন ক'রে! বেলুড়ে পৌছেই তাই তিনি স্বামী-শোকাতুরা মাতৃসমা—মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দান করাই প্রথম কর্ত্তব্য ব'লে মনে করলেন তাঁর।

একান্ত অনুগত সরল-প্রাণ শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ ও শিবানন্দ এবার হ'লেন স্বামিজীর সঙ্গী। বিরজানন্দ ছিলেন একান্ত নিরীহ এবং শান্ত ব্যক্তি। নির্ঝঞ্ঝাটে থেকে—নিশ্চিন্তে নির্জ্জনে ব'সে সাধনা করবার অনুমতি প্রায়ই চাইতেন তিনি গুরুর কাছে। স্বামিজী নিজের অতীত দিনগুলির দিকে চেয়ে,—তাঁর অন্তরের আকুলতা বুঝলেও—তাঁকে খানিকটা কর্ম্মজগতে ধ'রে রাখবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ক'রতেন লোক-সেবায়।

অবশ্য গুরুর আদেশ শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারেই পালন করতেন বিরজানন্দ।··· একবার স্বামিজী তাঁকে প্রচারকার্য্যে যেতে বলেন পূর্ব্ববঙ্গে। বিরজানন্দ তো মুস্কিলেই পড়লেন! কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি আমি ব'লবো সেখানে? আমি তো কিছুই জানি না।'

দু'এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থাকলেন স্বামিজী,—পরে ব'ললেন তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে,—যাও,—সেখানে গিয়ে ঐ কথাই বল যে—আমি কিছুই জানি না। ঐ এক মহৎ বার্ত্তা,—ওতেই কাজ হ'বে।

উত্তর শুনে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চেয়ে থাকেন বিরজানন্দ স্বামিজীর দিকে।······অবশ্য সেবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে—তিনি কাজ করেছিলেন সুচারুভাবেই।···

মায়াবতীর পথঘাট সম্বন্ধে কতকটা জানাশোনা ছিল বিরজানন্দের। কাজেই এবারকার যাত্রায় তিনিই হ'লেন পথের দিশারী। সমতল ভূমি অতিক্রম ক'রে পার্ব্বত্য ভূমির কাছাকাছি হতেই দারুণ ঠাণ্ডায় শরীর যেন জমে আসতে লাগলো সকলের! কি দুরন্ত কন্‌কনে শীত!—কতকটা রাস্তা অতিক্রম করলেন তাঁরা অশ্বারোহণে। ক্রমশঃ পথ দুর্গম হ'য়ে উঠলো,—তখনই চড়াই—আবার তখনই ওতরাই,—তার ওপর আবার সর্ব্বত্র তুষারাচ্ছন্ন।

চড়াই জায়গায় স্বামিজী হাঁটতে লাগলেন—বিরজানন্দের কাঁধে ভর দিয়ে। "দেখছিস্,—কত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি।"—ব'ললেন হাঁপাতে হাঁপাতে,—"অথচ এইসব জায়গা একদিন হেলায় পার হ'য়ে গেছি।"—বিরজানন্দ বিশেষ সাবধানে ও যত্নে স্বামিজীকে নিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন ধীরে ধীরে।

আশ্রমে পৌঁছতেই—সেখানকার সন্ন্যাসিগণ স্বামিজীকে জানালেন বিরাট অভ্যর্থনা। পত্রে-পুষ্পে আশ্রমটি সেদিন সজ্জিত করা হ'য়েছিল—স্বামিজীর সম্মানের জন্যে। স্বামিজী বিশেষ প্রীতিলাভ করলেন আশ্রম ও তার ব্যবস্থাদি দেখে। পার্ব্বত্য প্রকৃতির মধুর পরিবেশের মধ্যে জন-কোলাহল-হীন এই স্থান বেশ একটি তৃপ্তিও এনে দিলে তাঁর অন্তরে। একটা অপার্থিব শান্তিরসেও চিত্ত ভ'রে উঠলো তাঁর।

যথাসম্ভব শীঘ্র এদিককার কাজ সেরে স্বামিজী গেলেন মিঃ সেভিয়ারের বাসভবনে। মিসেস সেভিয়ার তাঁকে দেখেই উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌লেন পরম স্নেহে। স্বামীহারা নারী উপযুক্ত পুত্রকে কাছে পেলে—যেমন এক অনির্ব্বচনীয় সান্ত্বনা লাভ করেন মনে-প্রাণে,—স্বামী-বিচ্ছেদের তীব্র শোকও যেমন কতকটা ভুলতে পারেন,—পুত্র-প্রতিম স্বামিজীকে পেয়ে মিসেস সেভিয়ারও তেমনি গভীর সান্ত্বনা পেলেন তাঁর শোকতপ্ত চিত্তে!

মাতৃগত-প্রাণ শিশুর মতই স্বামিজীও তাঁর কাছে ব'সে কত অন্তরের কথাই না ব'লতে লাগলেনঃ সে সব কথার মধ্যে কি-যে অমৃত ছিল,—মিসেস সেভিয়ারের মনে হ'লো,—তাঁর স্বামিহীন নিরলম্ব জীবনে—এমন দুর্ল্লভ অবলম্বন থাকতে—তাঁর আর চিন্তা কি?…

বেশ শান্তিতেই কাট্‌লো সেখানে স্বামিজীর কয়েকদিন।…তবে একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একদিনও ঘুরেফিরে বেড়াবার সুযোগ পেলেন না। প্রবল তুষারপাতের জন্যে মায়াবতীর পথঘাট দুর্গম হ'য়ে উঠেছে!…তুষার-মণ্ডিত মায়াবতীর রূপের দিকে চেয়ে কিন্তু স্বামিজীর চিত্ত বিভোর হ'য়ে উঠতো।—মুগ্ধ চিত্তে সহসা একদিন ব'লে উঠলেন তিনি মিসেস সেভিয়ারকে,—জীবনের শেষভাগে সব কাজ ছেড়ে আসবো এখানে,—আর শুধু বই লিখে এবং সঙ্গীত আলাপ ক'রেই দিন কাটিয়ে দেবো!

আশ্রমে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজার্চ্চনার নিত্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামিজী একদিন সন্ন্যাসীদের বলেন,—"দেখ, মায়াবতী আশ্রম অদ্বৈত আশ্রম; অদ্বৈত ভাবেই পূর্ণ থাকা উচিত,—দ্বৈত ভাবের কোন ক্রিয়াকলাপ এখানে অনুষ্ঠিত না হওয়াই ভাল। অখণ্ড-অদ্বয় ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণার জন্যেই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। সাধনার অঙ্গ-হিসাবে এখানে অন্য ব্যবস্থা থাকলে স্থান-মাহাত্ম্যের হানি হয়।"

মঠের এক সন্ন্যাসী ছিলেন এই ঠাকুরঘর ও পূজাদির ব্যবস্থাপয়িতা। পাছে তাঁর প্রাণে আঘাত লাগে,—তাই স্বামিজী অবশ্য হঠাৎ কোন

ব্যবস্থান্তরের কথা তোলেন না,—তবে বুঝেসুঝে দেখবার যেন একটা সুযোগ দেন সকলকে।

আশ্রমের মধ্যে একরূপ বন্দী হয়েই দিন কাটছিল স্বামিজীর,—চতুর্দ্দিক বরফাচ্ছন্ন,—যেন এক স্নিগ্ধ-মধুর শুভ্রতা—স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে দিগ্‌দিগন্তে! সেই তুষাররাশি ভেদ ক'রে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে পথ-চলা মানুষের পক্ষে সাধ্যের অতীতই বটে!…সেখানকার প্রচণ্ড শীতও যেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না স্বামিজী। আবার নানান্ প্রয়োজনও তাঁকে আহ্বান ক'রছিল বেলুড় মঠে।

সুতরাং স্বামিজীকে এবার প্রস্তুত হতে হ'লো বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যে। কিন্তু একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন তো সে পথে যাত্রা করা সুকঠিন। স্বামী স্বরূপানন্দ বহু চেষ্টা ক'রে—নিকটবর্ত্তী চা বাগান থেকে কয়েকজন কুলি সংগ্রহ করলেন মোটা বকসিস্ দিয়ে। তুষারাবৃত পথ অতিক্রমের অনেক ব্যবস্থা জানা আছে এই কুলিদের। প্রয়োজন হ'লে মানুষকে কাঁধে চড়িয়েও পার ক'রে দেয় তারা। কুলিদের সাহায্যে স্বামী সদানন্দ, বিরজানন্দ এবং শিবানন্দ—স্বামিজীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

প্রায় পনেরো মাইল অতিক্রম ক'রে তারা এলেন দেউড়ি;—দেউড়িতে যোগাড় করলেন খুব দ্রুতগামী তেজী ঘোড়া,—তারপর ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন,—পিলিভিত রেল-স্টেশনে। কিছুদিনের জন্যে স্বামী শিবানন্দ ও বিরজানন্দ থেকে গেলেন এখানে,—ভবানী দত্ত নামে এক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির আমন্ত্রণে।

যথাসময়ে ট্রেন এসে থামলো স্টেশনে। স্বামিজী সদানন্দকে নিয়ে উঠলেন ট্রেনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। ঐ কামরায় ইতিপূর্ব্বেই এক ইংরেজ কর্নেল বসেছিলেন তাঁর লট-বহর নিয়ে জাঁকিয়ে। একে নেটিভ—তায় সন্ন্যাসীদের সে কামরায় উঠ্‌তে দেখে—মনে মনে চটে উঠ্‌লেন কর্নেল সাহেব।

কিন্তু স্বামিজীর দীপ্ত চক্ষু আর গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে,—তার ওপর কামরার দরজার নিকট এসে বহুজন তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে দেখে—সহসা নিজে কিছু ব'লবার সাহস হ'লো না সাহেবের; সরাসরি স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে দৃঢ় আদেশ করলেন,—আমার কামরা থেকে নেটিভদের নামিয়ে দাও।

একে ইংরেজ—তায় কর্নেল! সুতরাং পুরাদস্তুর মিলিটারী মেজাজ! কি জানি বাবা, যদি গুলী ক'রেই বসে!…কাজেই ভয়ে ভয়ে স্টেশন মাস্টার

এলেন স্বামিজীর কাছে : কিন্তু তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভড়কে গেলেন ভদ্রলোক ! তবু মরি-বাঁচি ক'রে ব'ললেন স্বামিজীকে আমতা আমতা ভাবে কথায়,—আপনি দয়া ক'রে অন্য একটা কামরায়—এই—মানে—আর একটা—

কিন্তু কথা শেষ করবার সুযোগ হ'লো না ! স্বামিজীর দৃষ্টিতে যেন আগুন ছুটলো,—"লজ্জা হ'লো না তোমার অন্যায় অনুরোধ করতে ?"—কণ্ঠেও ফুটে উঠ্‌লো তীব্র উত্তেজনা,—"চাকরী ক'রতে এসে কি মনুষ্যত্ব—ন্যায়-অন্যায়-বোধ—সব বিসর্জ্জন দিয়েছ একেবারে ! যাও, আমি নড়বো না এখান থেকে।"

বেগতিক দেখে স্টেশন মাস্টার সটান অগ্রসর হ'লেন তাঁর অফিস রুমের দিকে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কর্নেল সাহেব ভাবলেন,—কাজ বোধ হয় হাসিল,—স্টেশন মাস্টার নেটিভদের নেমে যেতে কড়া আদেশ দিয়ে এসেছে নিশ্চয় !… কিন্তু মিলিটারী মেজাজে খট্ খট্ বুটের শব্দ করতে করতে কামরার কাছে এসে তিনি দেখলেন,—সঙ্গীসহ স্বামিজী তেমনি গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে আছেন !

অমনি চ'টে গেল সাহেবের কর্নেলী মেজাজ !…'মাস্টার, স্টে-শন মাস্টার !—' চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন তিনি আবার। কিন্তু স্টেশন মাস্টার পড়েছেন শাঁখারির করাতের মুখে,—এদিকেও কাটে,—ওদিকেও কাটে !…তিনি ভাল ক'রে নিজের রুমের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে মিছেমিছিই, 'টরে-টক্কা' সুরু ক'রে দিলেন। কর্নেল সাহেব আর করেন কি ? বিষহীন ভুজঙ্গের মত নিষ্ফল গর্জ্জন করতে করতে নিজের লটবহর নামিয়ে তিনিই চ'লে গেলেন অন্য কামরায়।…তবু কি নেটিভদের সঙ্গে যাওয়া যায় !

২৪শে জানুয়ারী (১৯০১) স্বামিজী ফিরলেন বেলুড় মঠে। তাঁর প্রত্যাগমনে মঠ আবার জমজমাট হ'য়ে উঠ্‌লো। মায়াবতী আশ্রমের বহু প্রশংসা করতে করতে ব'ললেন তিনি ঈষৎ হেসে,—আমি ভেবেছিলুম, অন্ততঃ একটা জায়গাতেও অদ্বৈত ভাবটি সম্পূর্ণ বজায় থাকবে। কোনরূপ বাহ্যপূজাদি হবে না। কিন্তু 'বুড়ো' দেখি সেখানেও গিয়ে জেঁকে বসেছে !

কৌতুকের মধ্যে একটা গভীর ভক্তির ভাবও ফুটে উঠ্‌লো স্বামিজীর কণ্ঠে। অন্য সকলেরও চোখমুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো সেই একই ভাবে।…

মায়াবতী আশ্রমের বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান অবশ্য পরে বন্ধ হ'য়ে যায়।…এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন যে সন্ন্যাসী,—শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশে তিনিও সাধনা করতে সুরু করেন সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবে।

৯২

এদিকে তখন ঢাকা থেকে বারবার সাগ্রহ আহ্বান আসছে স্বামিজীর কাছে। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের ইচ্ছাও ছিল স্বামিজীর। আবার পূর্ব্ববঙ্গের তীর্থস্থানগুলি দেখবার সাধ বহুদিন থেকেই ছিল ভুবনেশ্বরীর অন্তরে।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হ'লেও পরম স্নেহময়ী জননী ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছা ছিল স্বামিজীর কাছে দেবাদেশের মত।....এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের জলবায়ুতে স্বাস্থ্যেরও কিছু উপকার হ'তে পারে; আর প্রচারকার্য্যও হয়ত হবে কিছু একই যোগে; সুতরাং কয়েকজন সন্ন্যাসী ও শিষ্যসহ স্বামিজী ঢাকা রওনা হলেন ১৮ই মার্চ্চ।...ভুবনেশ্বরীর তীর্থদর্শনেরও অবশ্য সুযোগ ঘটলো সেইসঙ্গে।

স্টেশনে পৌছতেই ঢাকার নাগরিকগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানালেন স্বামিজীকে। অসংখ্য স্কুল-কলেজের ছাত্রও উপস্থিত থেকে—তাঁর জয়ধ্বনি করতে লাগলো! জমিদার মোহিনী মোহন দাস তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত ক'রে পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন নিজের বাসভবনে।

স্বামিজীকে একবার মাত্র দেখবার জন্যে ঢাকায় সে কি বিপুল জনসমাগম! যেন মর্ত্ত্যের বুকে নেমে এসেছেন অমর্ত্ত্যের কোন আরাধ্য দেবতা। আকুল হ'য়েছে জনগণ দুর্ল্লভদর্শন সেই দেবতার দর্শন-লালসায়!...শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত অনুরোধে জগন্নাথ কলেজের হলে স্বামিজী দুর্ব্বল স্বাস্থ্য নিয়েও একদিন দিলেন একটি বক্তৃতা,—বক্তৃতার বিষয়—'আমি কি শিখেছি।'

'কি শিখেছি?'—স্বামিজী ব'ললেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে।—'জীবনে শিখেছি এই যে—

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়॥

প্রথমেই চাই মনুষ্যত্ব,—তারপর মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষের জন্য সুখ-দুঃখের বাইরে আসবার ব্যাকুলতা—সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য—তারপর মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ। নচেৎ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা কি?

আর একদিন ব'ললেন অপর এক বক্তৃতায়,—বেদের উপদেশ-নির্দ্দেশই আমাদের সারমর্ম্ম। 'বেদ' নামধেয় ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশিতে সর্ব্বসাধারণের অধিকার আছে। আমাদের দেশে প্রতি ঘরে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে

বেদেরও পূজো হওয়া উচিত। শুধু প্রাচীন কালের নজীর দিয়ে আমাদের নিচেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকলে চলবে না,—আমাদেরও তেমনি হ'তে হ'বে। যাঁরা বলেন,—বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নান করলে মুক্তি হয়,—যাঁরা বলেন,—শিব-রাম প্রভৃতি যাঁরই প্রতি হোক না,—ঈশ্বর-বুদ্ধি ক'রে উপাসনা করলে মুক্তি হয়,…আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত।…

স্বামিজীর দুইটি বক্তৃতাই গভীর চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ভাবে ভাবিত শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মনে।…

*   *   *   *

এক বারবিলাসিনী এসেছে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। এসেছে সর্ব্বাঙ্গ নানা মূল্যবান্ অলঙ্কারে মণ্ডিত ক'রে ফিটন গাড়ীতে চ'ড়ে। সঙ্গে আছে তার মা।…

হাঁপানির ব্যারাম আছে এই মেয়েটির।…শুনেছে সে,—স্বামিজী খুব বড় রকমের একজন সাধু।…সাধুবাবাদের তুকতাকে তো দুরারোগ্য অনেক রোগই সারে!—স্বামিজীর কৃপা পেলে—হয়ত তার হাঁপানিটাও সেরে যেতে পারে,—এই আশা নিয়েই অবশ্য এসেছে সে। সাধুদর্শনে পুণ্যলাভ তার উদ্দেশ্য নয়।

মহাপুরুষদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অনেক সময় অসাধ্যও সুসাধ্য হয় বটে; স্বামিজীর ইচ্ছাশক্তির ফলেও দু'একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে আশ্চর্য্যজনকভাবে বেঁচে উঠতেও দেখা গেছে ইতিপূর্ব্বে;—কিন্তু বারবিলাসিনী তাঁর প্রতি যে ধারণা নিয়ে এসেছে এখানে,—স্বামিজী তো তার বহু উর্দ্ধে!…সাধনার অতি নিম্নস্তরেই বিচরণ করছে যা'রা,—এ ধারণা আরোপ করা চলে তাদেরই ওপর। অবশ্য অজ্ঞ পতিতা নারীর সে সব কথা বোঝবার মত শক্তি কোথায়?…তার স্বার্থ তাকে যেভাবে চালিত ক'রে এনেছে,—সে এসেছে সেইভাবে—সেই আশার মোহে।

প্রথমটা অবশ্য বাধাও দিলে তাকে অনেকে,…না, না, বেশ্যার অধিকার নেই স্বামিজীর কাছে যাবার। ফিরে যাও তুমি। স্বামিজী তোমাকে দেখলে অসন্তুষ্ট হবেন।

ভারী নিরাশ হ'লো মেয়েটি। মনটা দমে গেল তার। এদিকে কথাটা তখন উঠেছে গিয়ে স্বামিজীর কানে। 'না, না, আসতে দাও, আসতে দাও তাকে,'—শুনেই ব'লে উঠলেন তিনি ব্যগ্রভাবে,—বেশ্যা,—সেও তো নারী!

—তা'ছাড়া, পাপী-তাপীদের উদ্ধারের জন্যেই তো সংসারে আসেন সাধু-সজ্জন ব্যক্তি।

ঠিক এমনই কথাই বলেছিলেন স্বামিজী নৈনিতালে দেবদাসীদের সম্বন্ধে···

দক্ষিণেশ্বরে বেশ্যাদের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধেও প্রশ্ন ক'রে একবার এক পত্র লিখেন কোন ভদ্রলোক স্বামিজীকে। স্বামিজী তাঁকেও উত্তর দিয়েছিলেন,—বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পারে,—তো কোথায় যাবে?··· পাপীদের জন্যে প্রভুর বিশেষ প্রকাশ,—পুণ্যবানের জন্যে তত নয়।

যারা ঠাকুরঘরে গিয়েও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাদের (যাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যত কম হয়,—ততই মঙ্গল।···যারা ভক্তের জাতি, যোনি বা ব্যবসায় দেখে,—তারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা,—শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে—বরং একজন ভদ্রলোক না আসে,—না আসুক।···বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার!

আমেরিকার এক প্রশ্নোত্তর সভায়ও বলেন একদিন এক শিষ্যাকে,—পথোপরি তাদের দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করো না; তারাই বর্ম্মের মত দাঁড়িয়ে শত শত সতীকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করছে! তাদের ধন্যবাদ দাও।···

যা'হোক্ ঢাকার বেশ্যাটি শেষ পর্য্যন্ত স্বামিজীর আদেশ পেয়ে দাঁড়ালো এসে তাঁর সম্মুখে। তার মা-ও অবশ্য সঙ্গেই আছে। দু'জনেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলো স্বামিজীকে। মেয়েটি অতঃপর কাতরকণ্ঠে নিবেদন ক'রলো তার দুরারোগ্য এবং তার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার কথা।—শেষে আশায় চোখমুখ উজ্জ্বল ক'রে চাইলো তাঁর হাঁপানির ওষুধ।

"এই দেখ মা।"—এতটুকু রুক্ষ হ'লেন না স্বামিজী, বরং সহানুভূতি এবং স্নেহই যেন যুগপৎ ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠে,—"আমি নিজেই হাঁপানির যন্ত্রণায় অস্থির,—কোন কাজকর্ম্ম করতে পারছি না। রোগ নিরাময় করবার ক্ষমতাই যদি থাক্‌বে,—তা'হলে আমার নিজেরই কি এই দশা হয়? তুমিই বুঝে বল না সে কথা।"

কি বেদনাকুল স্নেহার্দ্র কণ্ঠের সেই বাণী! রোগিনীর মনে হ'লো,—যেন তার রোগের জ্বালা-যন্ত্রণা সব দূর হ'য়ে গেছে! ঔষধ সে পেলো না: কিন্তু কোনরূপ ক্ষোভও জাগলো না তার অন্তরে। বরং কি যেন এক অজানা আনন্দে ভ'রে উঠলো তার বুক। অন্যান্য সকলেও তখন স্বামিজীর করুণা-স্নিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে আছে বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায়।

মেয়েটি এবং তার মা স্বামিজীকে প্রণাম ক'রলো প্রগাঢ় ভক্তিতে। তারপর স্বামিজীর দিকে আরও দু'এক মুহূর্ত্ত শ্রদ্ধাভরে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল দু'জনে।...

ঢাকায় থাকতে থাকতে একদিন সাধু নাগমহাশয়ের পুণ্য বাসস্থান দর্শন ক'রে এলেন স্বামিজী। নাগমহাশয় অবশ্য এখন পরলোকে। তাঁর সাধ্বী পত্নী স্বামিজীকে রেঁধেবেড়ে খাওয়ালেন পরম যত্নে ও সমাদরে। স্বামিজী মনে মনে ভাবলেন,—এই সব স্থান যেদিন দেশের তীর্থ হ'বে, সেই-দিনই হ'বে দেশের প্রকৃত কল্যাণ।

* * * *

এরপর আরও কয়েকদিন ধ'রে ঢাকায় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য ভাব-ধারা প্রচার ক'রে,—স্বামিজী গেলেন মহাপীঠ কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থ-দর্শনে। সেখান থেকে ফিরে এলেন—গোয়ালপাড়া, পরে গৌহাটি। এখানে বিশ্রাম করলেন কয়েকদিন।

স্বামিজীর শরীর কিন্তু ভারী খারাপ হ'য়ে পড়লো গৌহাটিতে এসে।...ছ'ত্রিশ মাইল দূরে শিলং, সেখানের জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর। যদি সেখানে কিছুদিন থাকলে শরীর ভাল হয়,—তাই গৌহাটি থেকে স্বামিজী অন্যান্য সকলের সঙ্গে এলেন শিলং-এ।

স্যার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনার। ভারতের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছিল এই বিদেশী রাজপুরুষের অন্তরে। স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাও পোষণ করেন তিনি মনে মনে। অনেক দিন থেকে স্বামিজীকে দেখবার ইচ্ছাও ছিল তাঁর। এখন সুযোগ হ'য়েছে দেখে,—তিনিও একদিন সময়-সুযোগ ক'রে উপস্থিত হলেন এসে স্বামিজীর আবাস-স্থলে।

বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হ'লো দু'জনের।

"স্বামিজী"—হাসতে হাসতেই ব'ললেন কটন সাহেব কৌতুকভরা কণ্ঠে—"ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এই জঙ্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন?"

"স্বামিজীও ঈষৎ হাসলেন তাঁর কথায়। ব'ললেন,—'শারীরিক অবস্থা বড় খারাপ—এখানকার জলবায়ু ভাল,—এসেছি যদি কিছু উপকার হয়।...তাছাড়া এ-যে আমার নিজের দেশ! আমার চোখে চিরদিনই সুন্দর!

উদ্বিগ্ন হ'লেন কটন সাহেব স্বামিজীর স্বাস্থ্যের কথা শুনে। স্থানীয় সিভিল-সর্জ্জেনকে তিনি এরপর দু'বেলা পাঠাতে লাগলেন—স্বামিজীর সংবাদ নিতে।

স্বামিজী [illegible] ব'লেন,—"এই একটি লোক—কটন সাহেব, ভারতের অভাব-অভিযোগ ইনি ঠিক ঠিক বোঝেন,—কল্যাণও কামনা করেন ভারতের।"

অসুস্থ শরীর নিয়েও মিঃ কটনের অনুরোধে স্বামিজীকে একদিন শিলং-প্রবাসী ইংরেজদের এবং তত্রস্থ শিক্ষিত সমাজের সভায় একটি বক্তৃতা দিতে হ'য়েছিল। ইংরাজীতে প্রদত্ত সেই বক্তৃতা ভাবে ও ভাষায় ছিল অপূর্ব্ব—অনবদ্য!

* * * *

কিন্তু স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হ'লো না স্বামিজীর শিলং-এর জলবায়ুতে উপরন্তু তাঁর রোগের প্রকোপ গেল আরও বেড়ে। হাঁপানির টানে অসহ্য কষ্ট হ'তে লাগলো তাঁর। তিন-চারটে বালিশ বুকে চেপে ধ'রে যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করেন। হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক সময় দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে তাঁর,—চোখমুখ স্থির হ'য়ে যায়,—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় প্রাণ কেঁপে ওঠে সকলের!

তার ওপর আছে বহুমূত্র। হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকোপও বেড়ে ওঠে। শরীর দিনের পর দিন দুর্ব্বল হ'তে থাকে। জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্যে স্বামিজী ভগবানের ধ্যানে মনকে সমাহিত করবার চেষ্টা করেন। একদিন এই অবস্থায় আত্মগতভাবে ব'লে ওঠেন অনুচ্চ কণ্ঠে,—"যাক, মৃত্যুই যদি এবার আসে, ক্ষতি কি? যা দিয়ে গেলাম,—দেড় হাজার বছরের খোরাক।"

জনৈক শিষ্য দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে,—স্বামিজীর আত্মগত অনুচ্চ কণ্ঠের প্রত্যেকটি কথাই—কর্ণগোচর হ'লো তাঁর। মনে মনে স্বীকার করলেন তিনি,—একান্ত সত্য কথা। বিশ্বের ভাবরাজ্যে স্বামিজীর দান অফুরন্তই বটে!

৯৩

মে মাসের মাঝামাঝি স্বামিজী ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। কিন্তু মঠে ফিরবার পর স্বামিজীর অবস্থা আরও আতঙ্কজনক হ'য়ে দাঁড়ালো। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ—সকলেই স্বামিজীকে সর্ব্ববিধ কার্য্য ও চিন্তা থেকে বিরত রাখবার ব্যবস্থা করলেন সর্ব্বতোভাবে।…

দ্বিতলের একটি কক্ষে বাস করেন স্বামিজী। যখনই একটু ভাল থাকেন,—তখনই এটা-ওটা কাজে লিপ্ত হবার চেষ্টা করেন,—কিন্তু গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যদের সতর্কতায় বাধ্য হয়ে নিরস্ত হ'তে হয় তাঁকে। হাল্‌কা হাসি-তামাসার গল্প-গুজব এবং কৌতুককর আলোচনা ছাড়া কোন চিন্তাজনক বিষয়ের কথা কেউই তোলে না সেখানে। সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসাও চলে যথারীতি নিয়মিতভাবে।

সাত-আট মাস কাটলো এইভাবে। স্বামিজী কিছু সুস্থও হ'য়ে উঠলেন। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে—স্বামিজীর দর্শন-লালসায় বহু সুধী ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি আসতেন বেলুড় মঠে। যা'তে তিনি কারো সঙ্গে বিশেষ কোন আলোচনায় যোগ না দেন,—তারজন্যে সর্ব্বদাই নিষেধ করতেন গুরুভ্রাতারা। স্বামিজী কিন্তু আগন্তুকদের একেবারে নিরাশ করতে পারতেন না। যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয় করতেন তাঁদের সঙ্গে পরম হৃদ্যতায়।

ভগিনী নিবেদিতা বিলাতে প্রচারকার্য্য সেরে ইতিপূর্ব্বেই ফিরেছিলেন কলকাতায়। যথারীতি তিনি স্বামিজীর প্রত্যেকটি সংবাদ রাখতেন,—তাঁর নির্দ্দেশমত স্বীয় দায়িত্ব পালন ক'রেও যেতেন নীরবে। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় কোনদিনই বিরক্ত করতে চাইতেন না স্বামিজীকে।

মঠের পাঠাগারে সম্প্রতি কিছুদিন হ'লো নূতন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopædia Britannica) কেনা হ'য়েছে। বিরাট গ্রন্থ—খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। নূতন ঝক্‌ঝকে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে জনৈক নবীন সন্ন্যাসী ব'লে উঠলো,—এত বই এক জীবনে পড়ে শেষ করা অসম্ভব।

'কি ব'ললি?'—স্বামিজী ব'সেছিলেন পাঠাগারে। শিষ্যের কথা শুনে তীব্র দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে,—"অসম্ভব কিরে? আমি যে এর দশখণ্ড এরই মধ্যে পড়ে ফেলেছি: একাদশ খণ্ড সুরু করেছি।"

'অ্যাঁ!'—শিষ্যের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো বিপুল বিস্ময়ে,—'আপনি এই শরীরে এই ক'দিনের মধ্যেই দশ খণ্ড পড়ে ফেলেছেন! না, না, আপনি নিশ্চয়ই রঙ্গ করছেন আমার সঙ্গে।'

"আচ্ছা, তুই ঐ দশ খণ্ডের যেখান থেকে হোক যে কোন প্রশ্ন কর আমাকে।" —হাসতে হাসতে ব'ললেন স্বামিজী,—'দেখ, আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি কি না।'

তখনও কিন্তু শিষ্যটি গুরুর কথায় ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেনি। সে বেছে বেছে কঠিন কঠিন কতকগুলো প্রশ্ন বইয়ের যেখান সেখান থেকে ক'রে বসলো স্বামিজীকে। স্বামিজী টপ্ টপ্ ক'রে উত্তর দিয়ে গেলেন সব প্রশ্নেরই। বিস্ময়ের আধিক্যে শিষ্যের মুখে তখন আর কথা ফোটে না! মনে হচ্ছে, যেন ভোজবাজি! কিছুক্ষণ পরে সে ব'ললে,—এ কিন্তু মানুষের শক্তি নয়।

'মানুষেরই শক্তি।'—দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন স্বামিজী,—'ব্রহ্মচর্য্যের গুণ। তাই তো এত ক'রে আমি তোদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে বলি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে শিষ্য আবার ব'ললে,—তা যাই বলুন, শুধু ব্রহ্মচর্য্য নয়, আরও কিছু আছে!

স্বামিজী সে কথার আর কোন উত্তর দিলেন না।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৯৪

শরৎ এসে পড়েছে!

বর্ষা-বিধৌত সুনীল আকাশে খেলা ক'রছে অপূর্ব্ব মাধুরী! গলিত স্বর্ণের মত বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণে ঝলমল করছে পৃথিবী,—শিশিরসিক্ত রাশি রাশি শুভ্র শেফালি ঝরে পড়ছে প্রভাতের মৃদুল সমীরণে—যেন কা'র চরণে অর্ঘ্যরূপে। আকাশে-বাতাসে—অমিয় স্বরে কে যেন আলাপ করছে আগমনীর চিত্তাকর্ষী সুর—

'যাও, যাও গিরি, আনিতে উমারে।'

সকালবেলায় শরৎ-প্রকৃতির উদার-নির্ম্মল রূপ-মাধুরীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্বামিজীর সহসা সাধ হ'লো,—এ-বছর মঠে দশপ্রহরণ-ধারিণী সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবীদুর্গার পূজা করবেন।

এ কিন্তু শুধু খেয়ালই নয়—একেবারে অন্তরের গভীরের ঐকান্তিক কামনা। তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমা'র অনুমতি আনবার জন্য উপযুক্ত লোক পাঠানো হ'লো বাগবাজারে। পূজার সংকল্প হ'বে শ্রীশ্রীমার নামে—তার নির্দ্দেশ চেয়ে পাঠালেন স্বামিজী শ্রীশ্রীমার কাছে।

'মায়ের পূজায়' মা কি আর আপত্তি করতে পারেন ?···সানন্দে সম্মতি দান করলেন তিনি স্বামিজীর প্রস্তাবে।

আর চিন্তা কি ?···মায়ের আদেশ পাওয়া গেছে! পূজার আয়োজন চ'লতে লাগলো মহানন্দে।···মণ্ডপ নির্ম্মাণ হ'লো,—বেদী গঠিত হ'লো। যথাসময়ে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা এনেও স্থাপন করা হ'লো বেদীর ওপর। দশভূজা দেবী জগত্তারিণীর পূজার আয়োজনও সম্পন্ন হ'লো ষোড়শোপচারেই।···কোন ত্রুটিই থাকলো না কোনদিকে।

শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে—দেবীর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা সমাপন হ'লো মহাসমারোহে। পূজা-প্রাঙ্গন ভ'রে উঠলো অসংখ্য ভক্তের সমাবেশে। দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলো সকলে—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥'

দশমী-বিহিত পূজার পর দেবীর বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজলো। কি করুণ সে সুর!···আগমনীর সুরে—যেমন আনন্দ এসেছিল প্রাণে প্রাণে,—বিসর্জ্জনের বাদ্যে তেমনি বিদায়-ব্যথায় কেঁদে উঠ্‌লো সকলের প্রাণ!······বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে গঙ্গাবক্ষে হ'লো দেবী-প্রতিমার নিরঞ্জন।······

কোজাগরী পূর্ণিমায়—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীরও পূজা করা হ'লো প্রতিমা এনে।··· কঃ জাগর—কে জেগে আছ? অলসতা, ভীতি, জড়তা ত্যাগ ক'রে কে উদ্যম-উৎসাহ নিয়ে চলেছ কর্ম্মপথে?—সেই লাভ ক'রবে কমলার স্নেহ ·· পূজা সমাপন হ'লো সুচারুরূপেই।···

রূপ থেকে রূপান্তরে—কত বিভিন্নরূপেই না দেবী মঙ্গলময়ীর মহিমায় বিকাশ, —বরাভয়দায়িনী দেবীর শক্তির কতই না অভিব্যক্তি! সেই অভিব্যক্তির আর একটি রূপ—লোলরসনা—দিগ্‌বসনা—নৃমুণ্ডমালিনী—মহাকালবক্ষারূঢ়া শ্রীশ্রীকালী করালিনী!

তাই স্বামিজীও তাঁর Kali the Mother কবিতায় লিখেছেন,—

···করালি! করাল নাম তোর মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!"—

লক্ষ্মীপূজার পর শ্রীশ্রীকালীপূজাও সম্পন্ন হ'লো সর্ব্বাঙ্গীনভাবে। তিনটি পূজা উপলক্ষেই প্রচুর আয়োজন ক'রে হ'লো দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা। অসংখ্য দীন-দরিদ্রকে ভোজন করানো হ'লো পরম তৃপ্তিভরে। এখানে দরিদ্রের প্রতি করুণার ভাব নেই,—দম্ভের লেশ নেই,—এ জীবে দয়া নয়—জীবের সেবা—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-নামাঙ্কিত স্থানে—প্রত্যেকটি কার্য্যই অনুষ্ঠিত হ'লো তাঁরই সর্ব্বজনীন উদার ভাবধারায়।

*   *   *   *

পুত্র ভোগী হোক—ত্যাগী হোক, রাজা হোক—সন্ন্যাসী হোক,—প্রাসাদে থাক, অথবা আশ্রমে,—বনে কিংবা গিরি-গুহার মধ্যেই থাক,—তার জননীর কাছে সে চিরকালই পুত্র।···মা···পুত্রের সর্ব্ব-অবস্থাতেই মা!

বিশ্ববিখ্যাত যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ আজিও তাই ভুবনেশ্বরীর কাছে তাঁর পরম আদরের একান্ত স্নেহের সেই 'বিলে।'···জগৎ-বন্দিত বিরাট পুরুষের স্থান—এখনও তাঁর স্নেহের নীড় সেই ক্ষুদ্র অঙ্কে! কাজেই স্বামিজীর জীবন ইদানীং যখন প্রায়ই নানা রোগে বিপন্ন হ'তে লাগলো, তখন সহসা একদিন ভুবনেশ্বরীর স্মরণ হ'লো—বাল্যকালে তাঁর একবার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি 'কালীঘাটে মায়ের' কাছে—পুত্রের রোগ আরোগ্যের জন্যে মানত করেছিলেন; কিন্তু সে-মানতের কথা এতদিনের মধ্যে একবারও মনে পড়েনি তাঁর।

মায়ের মন,—পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় স্বভাবতঃই দুর্ব্বল,—ভুবনেশ্বরীরও মনে হ'লো,—হয়ত কালীঘাটের মানত শোধ করা হয়নি—তাই ছেলের শরীরের অবস্থা এমনি যাচ্ছে।'···যেই মনে হওয়া, অমনি তিনি স্বামিজীর কাছে সংবাদ পাঠালেন,—তোমার ছেলেবেলায় আমার মানত ছিল, তোমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পূজা দিব,—মায়ের মন্দিরে তোমাকে গড়াগড়ি দেওয়াব। মানত শোধ হয়নি,—ভারী 'অপরাধ' হ'য়েছে মায়ের চরণে। তোমাকে একদিন যেতে হ'বে আমার সঙ্গে কালীঘাটে—মানত শোধ করতে।

অপ্রমেয় জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী—বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিন্দুমাত্রও অভিমান জাগলো না। মহামহিমান্বিত যুগাচার্য্যের আসনে বসেও একান্ত সরল মনে মাথা নত করলেন মায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের কাছে। শীঘ্রই একদিন ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে—

মায়ের কথামত কালীগঙ্গায় স্নান ক'রে, সিক্তবস্ত্রে মন্দিরে এসে—দেবীবিগ্রহের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দিলেন স্বামিজী।

অবাক-স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রইলো সমাগত সকলে স্বামিজীর দিকে!...মায়ের কাছে তিনি যেন সেই শিশু!...মা-ই যেন তাঁর নির্ভর।...শিশু যেমন নির্ব্বিচারে মায়ের আদেশ পালন করে,—স্বামিজীও তেমনি ভুবনেশ্বরীর প্রত্যেকটি কথাই পালন করলেন নিষ্ঠাভরে!

মানত শোধ হবার পর মন্দির-চত্বরে যজ্ঞ করলেন স্বামিজী। প্রজ্বলিত হোমানলশিখার সম্মুখে উপবিষ্ট স্বামিজীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দিকে চেয়ে সকলের মনে জাগলো বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তি,—স্বর্গের কোন দেবতাকেই যেন দেখছে তারা মর্ত্ত্যের মাঝে!

মঠে ফিরে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ব'ললেন স্বামিজী,—কালীঘাটে কেমন উদারভাব দেখলুম। আমাকে বিলাত-ফেরৎ বিবেকানন্দ জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধা দেননি! বরং পরম সমাদরে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছামত পূজা করতে সাহায্য ক'রেছিলেন।

বেদান্তধর্ম্মী—অদ্বৈতবাদী স্বামিজীর সাকার দেবদেবীর প্রতি ভক্তির কথাও উঠতো মাঝে মাঝে। স্বামিজী বলতেন,—আমিতো শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট করতে আসিনি,—তার মর্য্যাদা পূর্ণ করতেই এসেছি।...

ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে যিনি পূজিত হ'য়েছেন সমগ্র বিশ্বে,—একথা তাঁরই যোগ্য। উপাসনার পদ্ধতি বিভিন্ন হ'তে পারে,—কিন্তু সবই তো শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। সবই তো সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ড-অদ্বয় পুরুষকে পাবার জন্যেই।...সুতরাং সাকার উপাসনার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে স্বামিজী কি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করতে পারেন?

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যও অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী হ'য়েও সাকার দেবদেবীর কত স্তবস্তুতি রচনা ক'রে গেছেন পরম ভক্তিভরে!...

শঙ্করাচার্য্য আর স্বামী বিবেকানন্দ। দু'জনেই বেদান্তবাদী—দু'জনেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।...দু'জনের চরিত্রবল, চিত্তের দৃঢ়তা,—দু'জনের ত্যাগ এবং বিশ্বকল্যাণ-প্রচেষ্টা,—যেন একই সূত্রে বাঁধা। দু'জনেই অটুট ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী, দু'জনেই অদ্বৈতবাদী—আবার দু'জনেই সাকার দেবদেবীর প্রতি ভক্তিমান।...ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব-মহান সমন্বয় সাধন করেছেন এঁরা নিজেদের জীবনে একইভাবে।...স্বামিজীকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লতে বাধা কোথায়?

ইংলণ্ডে অনেকে তাঁকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গেও তুলনা করতেন।

প্রিয়তম শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এসময় প্রায়ই থাকতেন আচার্য্যের কাছে। অনেক কথা হ'তো গুরুশিষ্যে। স্বামিজী একদিন ব'ললেন,—'নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারোটি যুবক পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালিয়ে দিতে পারি।'…'তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর ক্ষীণ—মন সাহসশূন্য—তাদের দিয়ে কি কাজ হয়?'…আবার ব'ললেন দু'একদিন পরে,—'মহাবীর হনুমানের চরিত্রকেই এখন তোদের আদর্শ করতে হ'বে।' 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'—এছাড়া পথ নেই। রামের আজ্ঞায় মহাবীর সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল। এক দিকে সেবাভাব—অন্যদিকে সিংহবিক্রম। শুধু রামের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্রহ্মত্বলাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা!….ঐরকম একাগ্র নিষ্ঠা চাই।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার ব'ললেন,—'খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফঝম্ফ ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে তো সব পেটরোগীর দল—তাতে অত লাফালে-ঝাঁপালে সইবে কেন?…কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে! দেশে দেশে—গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে।…ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না?…ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা।…ছেলেবেলা থেকে কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল!'…

'ডমরু-শিঙ্গা বাজাতে হ'বে। ঢাকে রুদ্রব্রহ্ম তালে দুন্দভিনাদ তুলতে হ'বে।' 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর বোম বোম' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।…তুই যদি একা ঐভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস্,—তবে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে…তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।

শরচ্চন্দ্র ব'ললেন,—কিন্তু দেখুন, নিজেকে সময়ে সময়ে বড় দুর্ব্বল—বড় সাহসহীন মনে হয়।

"যখনই তা মনে হবে,"—স্বামিজী ব'ললেন দৃপ্ত কণ্ঠে,—"তখনই ভাববি,—আমি অমৃতের সন্তান, আমি অমুকের শিষ্য, আমি বীর্য্যবান, মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান। কখনো মনে দুর্ব্বলতা আসতে দিবি না। স্মরণ করবি—মহামায়াকে—স্মরণ করবি মহাবীরকে। রামপ্রসাদের গান শুনিস্‌নি?—'এ সংসারে ডরি কারে—রাজা যার মা মহেশ্বরী।'—

ব'লতে ব'লতে সহসা কেমন যেন ভাবাকুল হ'য়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নীচে। শরৎবাবুও এলেন পিছুপিছু। নীচে এসেই—নূতন সন্ন্যাসী ও

ব্রহ্মচারীদের দেখেই ব'লে উঠলেন স্বামিজী,—এই যে এদের দেখছিস্—এরাই সব ব্রহ্ম।

শরচ্চন্দ্র বুঝলেন,—ভাবের প্রবল আলোড়ন জেগেছে স্বামিজীর অন্তরে।

এরপর যিনি নিকটে আসেন,—তাকেই 'ব্রহ্ম' ব'লে উল্লেখ করেন স্বামিজী। চিত্রার্পিতের মত চেয়ে থাকলো সকলে স্বামিজীর দিকে।···সহসা স্বামিজী মগ্ন হ'য়ে পড়লেন গভীর ধ্যানে। অমনি কি আশ্চর্য্য—স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি আর যাঁরা ছিলেন সেখানে—তাঁরাও ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়লেন আচ্ছন্নের মত!

স্বামিজীর ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব জেগে উঠলো যেন অন্তরে অন্তরে।

ধ্যানভঙ্গে স্বামিজী শরচ্চন্দ্রকে ব'ললেন,—এরা সব ঠাকুরের সন্তান কি'না—তাই এমনটা হ'লো! নইলে কি আর হ'তো?

৯৫

কতকগুলি সাঁওতাল নরনারী এসেছে মঠে।

জঙ্গল-সাফ, মাটি-কাটাই প্রভৃতি কাজ ক'রছে তারা। প্রতি বছরই তারা এই সময়টায় আসে,—কাজ শেষ হ'লে আবার চ'লে যায় নিজেদের দেশে। স্বামিজী কত রঙ্গ-রহস্য করেন এদের নিয়ে,—কত ভালোই না বাসেন এইসব সরল—স্বাস্থ্যবান্ লোকগুলিকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বুড়ো সর্দ্দার কেষ্ট নিজেদের দেশের গল্প করে স্বামিজীর সঙ্গে।

একদিন স্বামিজী তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে ব'সলেন,—'ও'রে কেষ্ট, আজ তোরা সব্বাই খাবি এখানে।'

'কিন্তুক',—সরল সাঁওতাল জাতি—কোনরূপ কৃত্রিম ভদ্রতার আবরণ দিতে জানে না,—খোলাখুলিই ব'লে উঠলো সর্দ্দার—'আমরা যে তুদের হাতের নুন দে'য়া জিনিষ খাই না রে স্বামী বাবা!'

"বেশ তো, নুন না-দিয়েই রেঁধে দেবে তোদের।"—কেষ্টর সারল্যে প্রীত হ'য়েই নিতান্ত সহজ ও সরল কণ্ঠে ব'ললেন স্বামিজী,—"তোরা নুন দিয়ে নিস্।"

'হ-হ তাই হবেক।'—কেষ্ট রাজী হ'লো সানন্দেই।

স্বামিজীর নির্দ্দেশে তাদের খাওয়াবার আয়োজন হ'লো ভালোই। খেতে খেতে সর্দ্দার ব'লে উঠলো পরম তৃপ্তিতে,—"তুরা ইমন ভাল জিনিষ কুথা পাস্‌রে স্বামী বাবা,—আমরা ত জনমে খাই নাই ইমন জিনিষ।"

লোকগুলির তৃপ্তি দেখে স্বামিজীর সে-কি আনন্দ—কত তৃপ্তি!—'তোরা যে সব নারায়ণ রে!'—গাঢ় স্বরে ব'ললেন তিনি,—'খারাপ জিনিষ কি দেওয়া যায় তোদের?…তা' পেট ভ'রেছে তো?'

খু-উ-ব,—খু-উ-ব!

লোকগুলি খেয়ে উঠে গেলে স্বামিজী ব'ললেন,—"এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ!…এমন সরল চিত্ত,—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, আর দেখিনি!"

নিকটে যে-সকল সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—"এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি?—নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'লো? পরহিতায় সর্ব্বস্ব অর্পণ,—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছা হয়, মঠ-ফট সব বিক্রী ক'রে,—এই সব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই।… আহা! দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, আমরা কোন্ প্রাণে—মুখে অন্ন তুলছি!…দেশের লোকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে মনে হয়,—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো—ঘণ্টা নাড়া,—ফেলে দিই—তোর নিজে মুক্ত হ'বার চেষ্টা।"

"আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্যে কেউ ভাবেনা রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে,—যে মেথর-মুদ্দাফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হা'য় তাদের সহানুভূতি করে,—তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়,—দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ না,—হিন্দুদের সহানুভূতি পায় না ব'লে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া খ্রীষ্টান হ'য়ে যাচ্ছে।…আমরা কেবল দিনরাত তাদের ব'লছি—ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে!"

একটু চুপ ক'রে থেকে—একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আবার ব'ললেন,—"দেশে কি আর দয়াধর্ম্ম আছে রে বাপ? কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা—মার লাথি! ইচ্ছে হয়,—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে—এখনি যাই—'কে কোথায় কাঙ্গাল-দীন-দরিদ্র আছিস্'—ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে 'মা' জাগবেন না।…আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না। তবে আর কি হ'লো?"….

"দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে,—আমি দিব্যচোখে দেখছি,—এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন : কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র! সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হ'লে—কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্?···একটা অঙ্গ পড়ে গেলে—অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন কাজ হয় না,—এ নিশ্চিত জানবি।"

নীরব-নিশ্চলভাবে শুনলো সকলে স্বামিজীর বাণী। দেশের গরীব-দুঃখীর প্রতি কি গভীর দরদই না লুকিয়ে রয়েছে—এই সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর অন্তরে!···· ভাবতে গিয়েও তাদের চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো সমানুভূতিতে!

* * * *

ডিসেম্বরের শেষ : নিখিল ভারত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হচ্ছে এ বছর ক'লকাতায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ যোগদান ক'রেছেন এই অধিবেশনে।···সভায় যোগদান করা ছাড়াও আর একটি আকর্ষণ ছিল তাঁদের।—যাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে সমগ্র ইউরোপে উড্ডীন হয়েছে ভারতের জয়ধ্বজা,—সেই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আলাপ-পরিচয় করার জন্যও সকলের অন্তরে ছিল একটি পরম ঔৎসুক্য।····

অবকাশ সময়ে প্রত্যহ দলে দলে বিভিন্ন প্রদেশের নেতা ও প্রতিনিধিগণ আগমন করেন বেলুড় মঠে। স্বামিজী তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন সরল বিশুদ্ধ হিন্দীতে।···আলোচনা-প্রসঙ্গে কারো বুঝতে বাকী থাকে না যে,—স্বামিজী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও—দেশের ও জাতির কল্যাণকামী হিসাবে—তাঁর স্থান কংগ্রেসসেবীদেরও বহু উচ্চে।

দেশে যাতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার এবং বেদ-বেদান্তের যথারীতি চর্চ্চা হয়,—স্বামিজী স্বীয় বক্তব্যের মধ্যে তারই ওপর জোর দেন বেশি। ব'লেন,—বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে—সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যাপনা এবং প্রাচীন ঋষিগণের চিন্তাধারার সঙ্গে দেশবাসীর প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থায় উপযুক্ত আচার্য্য গ'ড়ে তুলতে হবে। ভারতের প্রকৃত প্রাণ এবং জাতীয় কল্যাণ তার অধ্যাত্ম-সম্পদের মধ্যেই নিহিত আছে। বেদচর্চ্চা ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যতীত তা' পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। ধর্ম্মবলে বলী হতে না পারলে দেশ ও জাতির অভ্যুত্থানও সম্ভব নয়।'

নেতৃবৃন্দ স্বামিজীর বক্তব্য শুনে যান সাগ্রহে,—মনে মনে স্বীকারও করেন তার যৌক্তিকতা,—কংগ্রেসের অধিবেশনে সেই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতেও সম্মত হন তাঁরা। এবং যাতে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়—তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেও প্রতিশ্রুতি দেন স্বামিজীকে।

৯৬

জাপান থেকে এসেছেন আচার্য্যপাদ ওডা আর তাঁর সহযোগী মিঃ ওকাকুরা স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের আশায়।....আচার্য্যপাদ ওডা জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ। শীঘ্রই জাপানে একটি ধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে,—স্বামিজী যাতে সে সময় জাপানে উপস্থিত থাকেন,—তাই পূর্ব্ব থেকেই তিনি এসেছেন তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে।

আচার্য্য ওডা নিবেদন ক'রলেন একান্ত বিনীতভাবে,—স্বামিজী, আপনার ন্যায় বিশ্বপূজ্য ব্যক্তি আমাদের সভায় যোগ দিলেই তার সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা সম্পন্ন হবে। ধর্ম্মের জাগরণ বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে জাপানে। আপনার সাহায্য এবং উৎসাহ ভিন্ন—সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

মঠাধ্যক্ষ ওডা এবং তাঁর সহযোগীর কথাবার্ত্তায় এবং শিষ্টাচারে বড়ই প্রীত হ'লেন স্বামিজী। একটি উন্নতিশীল অগ্রগামী দেশ ও জাতির ধর্ম্মের জাগরণে—তার কল্যাণ-সাধনায় আহ্বান এসেছে, স্বামিজী কি সে আহ্বান পারেন প্রত্যাখ্যান করতে?....নিজের শরীরের অবস্থা ভুলে গেলেন তিনি। সভায় উপস্থিত থেকে যথাশক্তি সহযোগিতা করবার সম্মতি দান করলেন সাগ্রহে এবং সানন্দে।

অতঃপর আচার্য্য ওডা এবং মিঃ ওকাকুরাকে কয়েকদিন মঠে থাকবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন স্বামিজী। এতবড় একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ পরম ভাগ্যের কথা! আচার্য্য ওডা মুখ ফুটে ব'লেই ফেললেন,—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য স্বামিজী!

যাতে তাঁরা ভালভাবে থাকতে পারেন,—স্বামিজীর নির্দ্দেশে যথারীতি ব্যবস্থা হ'লো তার। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটলো স্বামিজীর তাঁদের সাহচর্য্যে। বিদায় কালে—মিঃ ওকাকুরা অনুরোধ করলেন স্বামিজীকে তাঁর সঙ্গে বোধগয়া দর্শনে যেতে।...

আচার্য্যপাদ ওডা বরাবর ফিরে যাবেন জাপানে।

বারাণসী-যাত্রার প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বেই করেছিলেন স্বামিজী।…এখন ওকাকুরার অনুরোধে স্থির করলেন,—প্রথমে বোধগয়ায় যাবেন—পরে সেখান থেকে ফিরে আসবেন কাশীধামে।

যা' হোক, শীঘ্রই একদিন তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন বারাণসীর উদ্দেশে।

* * * *

বোধগয়ায় পৌছলে,—সেখানকার মোহন্ত-মহারাজ পরম সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রলেন স্বামিজীকে। নিজের বাসভবনেই বিশেষ যত্নে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন তাঁর।…স্বামিজীর নামই তিনি শুনে আসছিলেন এতদিন ধ'রে ; কিন্তু তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ এর আগে আর হয়নি। যাতে স্বামিজীর কোনরূপ অসুবিধা না হয়,—প্রতিনিয়ত সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন মোহন্তজী। স্বামিজীর দর্শন-আশায়—প্রত্যহ দলে দলে অসংখ্য ব্যক্তি আসতে লাগলো মোহন্তজীর মঠে।

বোধগয়া দেখে স্বামিজী তার পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন স্থানসমূহও দেখলেন একে একে। ভগবান তথাগতের সাধন-পীঠ বোধিদ্রুম-মূলে ব'সে একদিন ধ্যান করতে করতে গভীর সমাধিমগ্ন হ'য়ে পড়লেন তিনি। সন্ন্যাসজীবনের প্রথম প্রভাতে একদা অধীর হৃদয়ে এসেছিলেন তিনি এখানে,—ধ্যানের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের পুণ্য দর্শন-লাভেও ধন্য হ'য়েছিল তাঁর জীবন।…

প্রভাতের পর ক্রমশঃ বেড়েছে বেলা,—এসেছে মধ্যাহ্ন,—আকাশ-পরিক্রমায় মধ্যাহ্ন-তপনের মত,—সেই তরুণ সাধকের সাধনার প্রখর প্রভায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্ব।—

মধ্যাহ্নের পর ধীরে ধীরে আসে অপরাহ্ণ,—প্রখর দীপ্তি পরিণত হ'তে থাকে স্নিগ্ধ আলোকে ;—সেই আলোক ধীরে ধীরে বিশ্বের বুকে শান্তির সমীরণ এনে দিয়ে—আকাশের অন্তরালে রক্তিম-রশ্মি ছড়িয়ে মিলিয়ে যায় দিগ্-দিগন্তে ;—আসে মৌন-গম্ভীর-মহান-সুন্দর ধূসর সন্ধ্যা !—

অনন্ত-অসীম সাধনাকাশে স্বামিজীর জীবনরবি পরিক্রমণ করেছে কি এইভাবে ? মধ্যাহ্নের খর দীপ্তি বিকীরণের পর—অপরাহ্ণে স্নিগ্ধ আলোক ছড়িয়ে এবার অগ্রসর হচ্ছে কি ধূসর সায়াহ্নের দিকে ?…বোধিদ্রুমমূলে নির্ব্বিকার-নির্ব্বিকল্প ধীর-স্থির-শান্ত-সমাহিত চিত্তে ভগবান তথাগতের এই ধ্যান—অন্তরের কোন্ ভাবের ছায়া প্রকটিত করছে তাঁর তরঙ্গহীন গভীর

প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ?…চিরজ্যোতিঃর মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হবার প্রার্থনাই কি আজ করছেন তিনি ?…কে জানে !…

বোধগয়া থেকে—পূর্ব্ব-প্রস্তাবমত স্বামিজী এলেন বারাণসী।…মিঃ ওকাকুরাও এসেছেন স্বামিজীর সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে বিদায় চাইলেন তিনি স্বামিজীর কাছে। বললেন নম্রকণ্ঠে,—'স্বামিজী, আপনার সঙ্গে যে দিনগুলি কেটেছে,—তার কথা জীবনেও ভুলবো না। যতই আপনার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং মহান চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি,—ততই অন্তর ভরে উঠেছে পরম শ্রদ্ধায়।…আমাদের আবেদনের কথা কিন্তু মনে রাখবেন।'

'অবশ্যই মনে রাখবো।'—হৃষ্ট চিত্তেই ব'ললেন স্বামিজী—'শরীর একটু ভাল বুঝলেই ঠিক কবে বা কখন জাপানে যেতে পারবো,—তা আপনাদের জানাবো।

'ধন্যবাদ !'—সানন্দেই বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ ওকাকুরা।…

সাধু-সন্ন্যাসী, মোহন্ত, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত,—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি,—সদাচারী গৃহস্থ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এখানে গ্রহণ করলেন স্বামিজীকে পরম সম্মানে ও সমাদরে। "বিলাত-ফেরৎ" ব'লে স্বামিজীর প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব গেল না কারো মনে।

এবার স্বামিজী কাশীতে থাকতে থাকতে—একটি মহান কার্য্যের সূত্রপাত হ'লো। কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক—স্বামিজীর উপদেশে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করলে। তারপর শহরের এখানে-ওখানে অলি-গলিতে—অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসহায় রুগ্ন-দুর্ব্বল, অন্ধ-খঞ্জ—যে কোন ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে পড়লো—তাকেই নিয়ে এলো সেই বাটীতে।—পরমযত্নে করতে লাগলো তার সেবা-শুশ্রূষা—চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা।

স্বামিজী অপার আনন্দে ব'ললেন প্রগাঢ় কণ্ঠে,—বৎসগণ, এরই নাম প্রকৃত মানব-ধর্ম্ম। অনেকদিন ধ'রে সমগ্র অন্তর দিয়ে—আমি এমনি এক দল যুবকের কামনা করছিলাম। ভগবান তোমাদের সহায় হোন্।…কখনো সাহস ও ধৈর্য্য হারিয়োনা। অর্থের জন্য চিন্তা করোনা। অর্থ এসে যাবেই। যেখানে রোগ, মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর হাহাকার—সেইখানেই এগিয়ে যাবে তোমরা আর্ত্তের কল্যাণে। আশীর্ব্বাদ করছি,—তোমাদের এই শিশু-প্রতিষ্ঠান—একদিন বিরাট হ'য়ে উঠবে।

বিফল হয়নি সিদ্ধবাক্ যোগী স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ। এই ক্ষুদ্র প্রনিষ্ঠানই কালে পরিণত হ'য়েছে—বিখ্যাত "রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে"।

—কাশীতে অনেকটা ভালোই ছিলেন স্বামিজী। বিশ্বেশ্বরের চরণ-রেণু-পূত পুণ্যধাম বারাণসীর নানা মনোরম দৃশ্য,—অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির,—সাধু-সন্ন্যাসী-অধ্যুষিত কত মঠ—পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্নানার্থী-পূর্ণ অগণন ঘাট,—শত শত নর-নারীর ভক্তি-উদ্বেলিত কণ্ঠের "জয় কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর" ধ্বনি, স্বামিজীর মনকে ডুবিয়ে রাখতো এক অপার আনন্দ-সাগরে। আকাশে-বাতাসে অবিরাম নিনাদিত হ'তো যেন তাঁরই অন্তরবাণীর প্রতিধ্বনি—হর হর বম্ বম্!—স্থান-মাহাত্ম্যে রোগের যন্ত্রণা একরূপ ভুলেই থাকতেন স্বামিজী।

৯৭

কাশী থেকে বেলুড় মঠে ফিরলেন স্বামিজী প্রসন্নচিত্তে। তাঁর প্রফুল্ল চোখমুখের দিকে চেয়ে আশান্বিত হ'য়ে উঠলো মঠের সকলে।....কিন্তু হায়, বেলুড়ে কয়েকদিন না আসতে আসতেই—তাঁর অবস্থা আবার শঙ্কাজনক হ'য়ে উঠলো।

আগে তবু বা একটু চ'লে ফিরে বেড়াতে পারতেন,—এখন একেবারে শয্যাগত হ'য়ে পড়লেন!...সর্ব্বদেহে হ'লো জল-সঞ্চার,—পা দুটিও উঠলো ফুলে।...একটু হাঁটবারও সামর্থ্য থাকলো না আর।...তাঁর দিকে চেয়ে গভীর শঙ্কা ও উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠলো সকলের চোখেমুখে।

প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র অবিরত স্বামিজীর কাছে থেকে—তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন প্রাণ ঢেলে,—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ প্রতিমুহূর্ত্ত বসে থাকেন বহির্দ্বারে,—যাতে হঠাৎ কেউ স্বামিজীর কক্ষে ঢুকে তাঁকে বিরক্ত না করে।

এদিকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবও এসে পড়লো। কিন্তু কারো মনে সুখ নেই, নেই কোন শান্তি—নেই বিন্দুমাত্র আনন্দ! স্বামিজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা গভীর বিষাদে মুহ্যমান ক'রে রাখলো সকলকে। শয্যাগত অবস্থাতেই নির্দ্দেশ দিলেন স্বামিজী,—কোন ত্রুটি যেন না থাকে—ঠাকুরের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে।

পালিত হ'লো বটে সে-নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে,—উৎসবও সম্পন্ন হ'লো যথারীতি। কিন্তু তবু মনে হ'লো, সব যেন প্রাণহীন,—কলের পুতুলের মত নড়ছে সকলে,—কারো অন্তরে নেই যেন একটুও প্রাণের স্পন্দন।....

সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে একদিন গভীর দুঃখে কেঁদে ফেললেন শরচ্চন্দ্র।....

"কি ভাবছিস্ ব'লতো ?"—স্বামিজী বললেন তাঁর মর্ম্মব্যথা উপলব্ধি ক'রে,—"মরে যাব ? তা জন্ম হ'লেই তো মৃত্যু হবে। তোদের মধ্যে আমার ভাবগুলো যদি কিছুটা ঢুকে থাকে,—জানবো দেহধারণ সফল হ'য়েছে।...সব সময়ই মনে রাখবি,—ত্যাগই হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র।...এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।"

"কিন্তু আমার কি গতি হ'বে ?"—ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়লো শরৎবাবুর চোখে,—'আপনার কৃপা ছাড়া তো আমার উপায়ান্তর নেই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন,—যেন এই জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাই।'—আকুলভাবে স্বামিজীর পা দুইটি জড়িয়ে ধরলেন তিনি,—'এবার আমায় উদ্ধার করতেই হবে।'

'বৎস',—স্নেহের আবেগে স্বামিজীর স্বর ভারী হ'য়ে উঠলো,—'কে কা'কে উদ্ধার করতে পারে বল! গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর ক'রে দিতে পারেন। আবরণ দূর হ'লেই আত্মা আপন গৌরবে জ্যোতিষ্মান হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পায়।—আমি তো সহকৃৎ।....কোটি জন্মের দুঃখতাপ থেকে একজন্মে মুক্ত ক'রে দিতে একমাত্র অবতারেরাই পারেন।'

অবতাররূপী ভগবান যখন অবনীতে অবতীর্ণ হন,—তখন তাঁর লীলা-সহচরেরাও দেহধারণ ক'রে নেমে আসেন ধরার অঙ্গনে।...এঁদের মুক্তির জন্যে কোন চেষ্টা করতে হয় না,—যেহেতু এঁরা 'নিত্যমুক্ত'। পরমহংসদেব এঁদেরই বলতেন,—'ঈশ্বরকোটি।' এবং তিনি যে কয়জনকে অভিহিত করতেন ঈশ্বরকোটি ব'লে,—তার মধ্যে স্বামিজীই ছিলেন তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ।...

স্বামিজী বুঝি নিজের আসল রূপটিই বোঝাতে চাইলেন অবতার-প্রসঙ্গে। কিন্তু শরৎবাবুর প্রগাঢ় আস্থা গুরুর ওপর।—'অবতার, ঈশ্বরকোটি',—এসব যার কাছে আছে থাক,—তিনি জানেন,—গুরুই সংসার-সমুদ্রে তাঁর জীবন-তরীর কাণ্ডারী।...তিনিই মুক্তিদাতা—পরিত্রাতা! তাছাড়া, 'একই জন্মে জন্মান্তর' এনে দেবার শক্তি রাখেন যিনি,—সেই অসীম অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মহাতাপস স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু।...এমন গুরু যাঁর—মুক্তির জন্যে তিনি আবার যাবেন কা'র কাছে ?

প্রিয় শিষ্যের মনের মধ্যে যে আলোড়ন জেগেছে, তা বুঝতে পেরেই স্বামিজী আশ্বাস দিলেন তাঁকে আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে—'ভয় কি ? এখানে যখন এসে পড়েছিস্,—সব ঠিক হ'য়ে যাবে সময়ে।...আমার যা দেবার তা' তো দিয়েইছি, দিয়েও যাব সব। তার ওপর তাঁকে ডাক।...ডাকতে ডাকতে হয়ত এই শরীরেই একদিন তাঁর কৃপা মিল্‌বে।'

স্বামিজীর উপদেশের মর্ম্ম—এবার বেশ সরলভাবেই বুঝতে পারলেন শরচ্চন্দ্র। আগের চেয়ে অনেকটা আশ্বস্তও হ'লেন তিনি এতক্ষণে।

সহসা সংবাদ দিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ,—ভগিনী নিবেদিতা এসেছেন সাক্ষাতের আশায়। কয়েকজন ইংরেজ মহিলাও আছেন তাঁর সঙ্গে। স্বামিজী তাড়াতাড়ি একটা আলখাল্লা পরে চেপে বসলেন মেজের ওপর।

অনুমতি পেয়ে নিবেদিতা—অন্যান্য মহিলাদের পুরোভাগিনী হয়ে—প্রবেশ করলেন সে কক্ষে।...খুব ধীরে—পায়ের কোন শব্দ না ক'রে—নতশিরে ঢুকলেন তাঁরা একে একে।

দৃষ্টি তুলে চাইলেন স্বামিজী প্রিয়তমা শিষ্যার দিকে। 'বসো।'—মৃদুকণ্ঠে বললেন শুধু এই একটি কথা। কিন্তু ওরই মধ্যে প্রকাশ পেলো যেন সমগ্র অন্তরের সাদর আপ্যায়ন—অনন্ত স্নেহ-প্রীতি। স্বামিজীর দেখাদেখি—নিবেদিতা প্রভৃতিও চেপে বসলেন মেজের ওপর।

"কেমন আছেন এখন?"—গুরুর পাদস্পর্শ ক'রে মাথার হাত ঠেকিয়ে—অগাধ ভক্তিমতী ও স্নেহময়ী শিষ্যা নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন,—"কাশীতেই ভালো ছিলেন দেখছি।"—পিতৃ-প্রতিম আচার্য্যের শরীরের অবস্থার দিকে চেয়ে নিবেদিতার গলার স্বর কেঁপে উঠলো এক সুতীব্র ব্যথার আলোড়নে।

"আত্মা অবিনশ্বর,—কিন্তু শরীরটা তো ক্ষয়শীল,"—স্বামিজী ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠেই ব'ললেন,—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···তথা শরীরাণি',··· পড়েছ তো গীতায়? আমার এ দেহটাও ভুগে ভুগে জীর্ণ হ'য়ে গেছে এবার। হয়ত নূতন দেহের প্রয়োজন।"—শেষের দিকে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠলো স্বামিজীর মুখে।

নিবেদিতা বুঝলেন,—কথা কইতে স্বামিজীর কষ্ট হচ্ছে,—তাঁকে বেশি বিরক্ত করা উচিত নয়। কাজেই আর দু'একটি মাত্র একান্ত প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা ক'রে—তিনি অবিলম্বে বিদায় গ্রহণ করলেন সঙ্গিনীদের নিয়ে।

"দেখ, এরা কেমন সভ্য?"—শরচ্চন্দ্রের দিকে চেয়ে ব'ললেন স্বামিজী,—"শরীরের অবস্থা দেখেই বুঝে নিলে—বেশি বিরক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের জাত হ'লে,—আমার এমন অবস্থাতেও অন্ততঃ আধঘণ্টা বকিয়ে ছাড়তো।···তা' ছাড়া, নিবেদিতা তার কর্ত্তব্য কেমন নীরবে ধীরে-ধীরে পালন ক'রে যায়,—কোন কারণে কোনদিন বিরক্ত করে না আমাকে। আর আমাদের এদের,—সব কাজেই চাই আমার যুক্তি!···

ক্রমে ক্রমে মঠ-সংক্রান্ত প্রায় সকল কাজেই উদাসীন হ'য়ে পড়লেন স্বামিজী। সর্ব্বদাই যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন। মন প্রতিনিয়ত ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং জগদম্বার চরণে সমাহিত হবার জন্যে। মাঝে মাঝে ব'লেও ওঠেন—দেহত্যাগের কথা।

—তাঁর ভাবগতিক দেখে গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যগণও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন—নানা দুশ্চিন্তা এসে জোটে তাঁদের মনে।…একদিন তো এক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা ক'রেই ব'সলেন স্বামিজীকে,—আচ্ছা, ঠাকুর যে ব'লতেন, আপনি যেদিন আপনাকে জানতে পারবেন—সেদিন আর দেহ রাখবেন না;—তা' পেরেছেন কি জানতে—'আপনি কে?'

—"হ্যাঁ, পেরেছি বৈকি।"—ধীরকণ্ঠে ব'ললেন স্বামিজী। কেমন যেন একটি দিব্যভাব ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন গুরুভ্রাতা স্বামিজীর সুস্পষ্ট উত্তর শুনে।…তাহলে তো যে কোন সময়ে—ইচ্ছামত দেহত্যাগ করতে পারেন তিনি!…হায়, হায়, সত্যিই কি—তিনি এবার ছেড়ে যাবেন তাঁদের?….ভাবতেও যেন তাঁর বুকের ভেতরটা টন্ টন্ ক'রে উঠলো দারুণ ব্যথায়।…

সেদিন একাদশী—স্বামিজী উপবাসী আছেন সারাদিন। কিন্তু নিজে উপবাসী থাকলে কি হবে? শিষ্যগণকে আহার্য্য পরিবেশন ক'রলেন—স্বহস্তে। পরিবেশন করতে করতে কত হাস্য-পরিহাসই না ক'রলেন তাদের সঙ্গে। আহারের শেষে নিজেই আঁচাবার জল ঢেলে দিলেন সকলের হাতে। এমন কি তাদের হাত-মুখও মুছিয়ে দিলেন গামছা দিয়ে।

"এ কি স্বামিজী,"—অবাক হয়ে কুণ্ঠিতভাবেই ব'লে উঠ্লো জনৈক শিষ্য—"আপনি কেন এ সব করছেন? আমরা আপনার পরিচর্য্যা করবো,—না, আপনি আমাদের করবেন? এ যে উল্‌টো হচ্ছে!"

"তা'তে কি হ'য়েছে?"—সরল মধুর হাস্যে ব'ললেন স্বামিজী,—"যীশুখ্রীষ্টের কথা কি তোদের মনে নেই? তিনিও তো নিজের হাতে শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন!"

শিষ্যের মন কেঁপে উঠলো আসন্ন বিপদের শঙ্কায়! অ্যাঁ—সে যে অন্তিম সময়ে! তবে কি স্বামিজী—আর ভাবতেও পারলো না সে। উদ্গত অশ্রু দমন করলো বহু কষ্টে!…

দিন কিন্তু সত্যই আসছিল ঘনিয়ে। অথচ স্বামিজীকে দেখে মনে হচ্ছিল—আর কোন অসুখই নেই তাঁর দেহে। হঠাৎ একদিন তিনি একখানা পাঁজি আনতে আদেশ করলেন স্বামী শুদ্ধানন্দকে।

শুদ্ধানন্দ তদ্দণ্ডেই একখানি পাঁজি এনে দিলেন স্বামিজীর হাতে।....এরপর দেখা গেল—পাঁজির পাতা প্রায়ই উল্টিয়ে চলেছেন স্বামিজী।

—তিন চারদিন পরে—শিষ্যদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে স্বামিজী গঙ্গাতীরের একটি জায়গার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেন,—"আমি দেহত্যাগ করলে—ঐখানে আমার সৎকার করবি।"

—শিষ্যেরা চমকে উঠ্‌লো! গভীর আঁধার মুহূর্ত্তে নেমে এলো যেন তাদের সম্মুখে। কা'রো বুঝতে বাকী থাক্‌লো না যে,—শীঘ্রই দেহত্যাগ করবার সংকল্প করেছেন স্বামিজী। হয়ত সেদিনটিও নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন পাঁজি ঘেঁটে।

৯৮

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই :

এর আগে স্বামিজী প্রতিদিনই ধ্যান করতে বসতেন সকলের সঙ্গে।.....আজ কিন্তু ধ্যান করতে না গিয়ে গল্প-গুজব করতে লাগলেন ব'সে ব'সে।—সে সব গল্প অতীতের। স্মৃতিপটে যেন একে একে ভেসে উঠছে আজ তাঁর অতীতের প্রতিটি দৃশ্য। উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেছে যেন স্মৃতির দুয়ার হঠাৎ আজ তাঁর চক্ষের সম্মুখে।

পরদিন অমাবস্যা, শনিবার,—মঠে শ্রীশ্রীকালীপূজা করবার সংকল্প ক'রলেন স্বামিজী। তান্ত্রিক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—তিনি পূজার আয়োজনের ভারও দিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দের ওপর।

সহসা স্বামিজী ঠাকুর ঘরে ঢুকে—ঘরের দরজা-জানালা সবই দিলেন বন্ধ ক'রে।...সকলে সাশ্চর্য্যে ভাবতে লাগলো—স্বামিজী দরজা-জানালা বন্ধ ক'রলেন কেন? কই, কোনদিনই তো এমন করেন না?

একটু পরে—"মন চল নিজ নিকেতনে।

কেন সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে

ভ্রমিতেছ অকারণে॥"...

গানটি গাইতে গাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ধীর-গম্ভীরভাবে পাদচারণা করতে লাগলেন মঠের প্রাঙ্গনে।..."যদি এখন আর একজন

বিবেকানন্দ থাকতো”,—মৃদুস্বরে ব'লতে লাগলেন আপন মনে,—“তাহলে সে বুঝতো, বিবেকানন্দ কি ক'রেছে। কালে কিন্তু অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।”

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। স্বামিজী মৃদুকণ্ঠে বললেও কথাগুলি সুস্পষ্ট বাজলো তাঁর কানে। চমকে উঠলেন তিনি,—গভীর ভাবসমাহিত যোগারূঢ় অবস্থা ভিন্ন—স্বামিজী তো এমন সব কথা বলেন না!

আহারের ঘণ্টা পড়তেই,—স্বামিজী নীচে বারান্দায় নেমে গিয়ে খেতে বসলেন সকলের সঙ্গে।...বিস্ময় ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো সকলের চোখে,—ইদানীং তিনি তো একত্র বসে আহার করেন না,—আজ এ-ব্যতিক্রমের কারণ কি?...কিন্তু বিস্ময় জাগলেও কোনরূপ সন্দেহ জাগলো না কারো মনে: বরং স্বামিজী আজ একত্র খেতে বসতে আনন্দিত হ'লেন সকলে। খেতে বসে গুরুভাইদের সঙ্গে অভ্যাস-মতই হাস্য-পরিহাস করতে লাগলেন স্বামিজী।—“আজ আমার শরীর অন্যান্য দিনের চেয়ে খুব ভাল বোধ হচ্ছে।”—ব'ললেন প্রসন্নচিত্তে পরম তৃপ্তির সহিত আহার সমাপন ক'রে।

আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে—শিষ্যবর্গের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হ'লেন।...বিকালে প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেও বেরোলেন—বেলুড় বাজার পর্য্যন্তই চ'লে গেলেন দু'জনে গল্প করতে করতে। কথা-প্রসঙ্গে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—‘বেদ পাঠে আমাদের দেশের লোকের কি উপকার হ'বে?’

“অন্ততঃ তার দ্বারা অনেক কুসংস্কার তো দূর হবে।”—অল্প কথায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন স্বামিজী।

* * * *

মঠে ফিরে সান্ধ্যক্রিয়াদি যথারীতি সেরে খানিকটা রাত্রি হ'তেই স্বামিজী উঠে এলেন দ্বিতলের শয়নকক্ষে। একজন ব্রহ্মচারী-শিষ্য সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকতো তাঁর। স্বামিজী তাকে আদেশ করলেন,—‘ঘরের সব দরজা-জানালা খুলে দাও।’

ব্রহ্মচারী আদেশ পালন ক'রলো নীরবে।...মুক্ত বাতায়ন-পথে স্বামিজী দৃষ্টি প্রসারিত করলেন সুদূর অনন্তের পানে।

দিগ্-দিগন্ত ক্রমেই ছেয়ে আসছে গভীর অন্ধকারে।...নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশ যেন অসংখ্য নেত্রে চেয়ে আছে ধরিত্রীর তামসী সৌন্দর্য্যের দিকে!...

আত্মসমাহিতচিত্ত স্বামিজীর মনে হলো—ওই প্রগাঢ় তমসার বক্ষে যেন রাশি রাশি জ্যোতিঃর তরঙ্গ খেলা করছে!—নীরব-নিস্তব্ধ নৈশ্য-প্রকৃতির অসীম বক্ষে বেজে উঠছে—যেন কা'র আকুল-করা সুমোহন বাঁশরীর তান!

অদূরে পরিপূর্ণা ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছে কলকল নাদে। তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে উঠ্‌ছে তার অগণিত নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব—যেন রাশি রাশি মণি-মাণিক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই তরঙ্গের নৃত্য-লাস্যে!

ধীরে ধীরে স্বামিজীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো দক্ষিণেশ্বরের দিকে,—স্থির নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলেন তিনি—অন্ধকারের মধ্যে যথাসম্ভব দৃষ্টি চলে—কালী-মন্দিরের পানে। মন ডুবে গেল তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-চিন্তায়।

—বহুক্ষণ পরে সহসা বাহ্য-সম্বিৎ ফিরে এলো স্বামিজীর। ব্রহ্মচারীকে ব'ললেন,—'তুমি ঘরের বাইরে ব'সে নাম জপ কর।'…নিজেও জপমালা হাতে ক'রে উপবেশন ক'রলেন পদ্মাসনে। মুহূর্ত্তে চক্ষু দুইটি স্তিমিত হ'য়ে এলো তাঁর: ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে পড়লেন তিনি গভীরভাবে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল একটি ঘণ্টা। সহসা স্বামিজী আসন ছেড়ে—জপমালা হাতেই শুয়ে পড়লেন মেজের ওপর। ব্রহ্মচারীকে ডেকে ব'ললেন মৃদুকণ্ঠে,—"আমাকে বাতাস কর।"

তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে—ব্রহ্মচারী ব্যজন করতে লাগলো স্বামিজীকে।

* * * *

রাত্রি তখন নয়টা,—চারিদিকের অন্ধকার আর একটু ঘন হ'য়ে এসেছে। বিশ্ব-প্রকৃতিও যেন পূর্ব্বের চেয়ে আর একটু নীরব—আর একটু শান্ত! স্বামিজী একবার পাশ ফিরলেন!…দু'এক মিনিট পরেই তাঁর হাতটি একটু কেঁপে উঠ্‌লো,—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেল্‌লেন তিনি। তার পরেই ক্ষুদ্র শিশু যেমন নিদ্রিত অবস্থায় চমকে কেঁদে ওঠে—স্বামিজীও তেমনি কেঁদে উঠ্‌লেন একবার! আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়লো তাঁর,—মাথাটি হেলে বালিশ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।…সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদেহও নিস্পন্দ-নিথর হ'য়ে উঠ্‌লো!

মুখে কিন্তু কোনরূপ মালিন্য নেই,—দিব্য প্রভায় তখনও সে মুখ উদ্‌ভাসিত! —নিমীলিত আয়ত নেত্র দুইটি দেখে মনে হচ্ছে স্বামিজী সুগভীর ধ্যানে মগ্ন!

কিন্তু সত্যই তো মহাধ্যানী মগ্ন হ'য়ে পড়েছেন মহাধ্যানে! এ ধ্যান যে চির-অবিচ্ছিন্ন!—এর সীমা নেই—শেষ নেই,—এ ধ্যান আর ভাঙ্গে না কখনো! মহাযোগী শয়ন করেছেন অনন্ত শয়নে! কর্ম্মক্লান্ত মহাপুরুষ স্বীয় কার্য্যের শেষে চির-বিশ্রাম লাভ করেছেন মহানিদ্রার কোলে!

ব্রহ্মচারীটি উদ্বিগ্ন চিত্তে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ স্বামিজীর দিকে নিস্পলক চক্ষে। কিন্তু সে অল্পবয়স্ক, অভিজ্ঞতা তার কম; নিজে কিছু বুঝতে পারলো না। ব্যাকুল হৃদয়ে ক্ষিপ্রপদে নেমে গেল নীচে।···নীচে স্বামী প্রেমানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, বোধানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। ব্রহ্মচারী আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলো,—আসুন, শীগ্‌গির আসুন,—স্বামিজী—

আর ব'লতে হ'লো না। নীচে যাঁরাই ছিলেন, বিপুল উদ্বেগে ও আশঙ্কায় ছুটে এলেন তাঁরা ওপরে। আকুলভাবে ব'সলেন সকলে স্বামিজীকে ঘিরে। স্বামী বোধানন্দ কম্পিত হস্তে স্বামিজীর হাতটি তুলে নাড়ী পরীক্ষা ক'রেই কেঁদে উঠলেন,—হায়, হায়, হায়, আর দেখবো কি—?···আর যে—

অশ্রুর আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেলো তাঁর। বাকীটা আর কণ্ঠে না ফুটলেও কারো কিছু বুঝতে বাকী থাকলো না। মুহূর্ত্তে "হায় হায়" রবে চারিদিক ভ'রে উঠলো! তমসাচ্ছন্ন নিঃশব্দ প্রকৃতির বুকে সেই আর্ত্তকণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগলো দিকে-দিকে!

রাত্রি দশটার সময় কলকাতা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দও এসে পড়লেন মঠে—সেই দুঃসংবাদ পেয়ে। বরাহনগরের ডাক্তার মহেন্দ্র মজুমদার এসেও স্বামিজীকে পরীক্ষা ক'রে মত প্রকাশ করলেন,—স্বামিজী দেহরক্ষা করেছেন!

* * * *

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর তিরোধানের কথা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে শুনলো সেই মহাপ্রয়াণের কথা। সূর্য্য উঠলেও যেমন চরাচর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দিব্য আলোকে, অস্ত গেলেও তেমনি দিগ-দিগন্ত ভরে যায় ঘন অন্ধকারে. ভারত-রবি বিবেকানন্দের অস্ত গমনের সংবাদে প্রাণে প্রাণে ঘনিয়ে এলো—বিষাদের গভীর অন্ধকার। কলকাতার ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো সে শোক-গাথা করুণ সুরে।···প্রাণাধিক পুত্র সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হলেও ভুবনেশ্বরীর অন্তর থেকে এক মুহূর্ত্তও দূরে যেতে পারেননি। তার দেহত্যাগের সংবাদে

মায়ের প্রাণ বিচ্ছেদের প্রচণ্ড ব্যথায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দুই চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো তার অবিরাম ধারা। হোক্ পুত্র সন্ন্যাসী,—কিন্তু মায়ের প্রাণ কি কোন সান্ত্বনাই মানে? দুই ভাই মহেন্দ্র এবং ভূপেন্দ্রের পক্ষেও আজ শোকাবেগ দমন করা সম্ভব হলো না।···সন্ন্যাসী দাদার সঙ্গে সাংসারিক কোন বন্ধন ছিল না তাঁদের।···কিন্তু প্রাণের বন্ধন—রক্তের আকর্ষণ তাঁরা অস্বীকার করবেন কেমন ক'রে?···

দেখতে দেখতে মঠবাড়ী পূর্ণ হ'য়ে উঠলো নানা শ্রেণীর অসংখ্য জনসমাগমে! দলে দলে নানাস্থান থেকে লোক আসতে লাগলো মহাপুরুষের অন্তিমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করতে। এ-যে ইন্দ্রের পতন! দিক্‌পালের তিরোধান! কে স্থির হ'য়ে থাকতে পারে এত বড় বিপর্য্যয়ের সংবাদ শুনে?

ভগিনী নিবেদিতাও এসে পড়লেন বাগবাজার থেকে। স্বামিজীর দেহের পাশে ব'সে ধীরে ধীরে ব্যজন করতে লাগলেন তিনি।—যেন স্নেহময়ী ভক্তিমতী কন্যা পরম স্নেহময় পিতার পার্শ্বে ব'সে পরিচর্য্যা করছে তাঁর। চোখ দু'টি ছল ছল করছে নিবেদিতার! ঘন ঘন চাইছেন শুধু স্বামিজীর মুখের দিকে। কি জানি,—নিবেদিতা হয়ত ভাবছেন, এখনও স্বামিজীর আত্মা আবদ্ধ আছে তাঁর দেহের মধ্যে। স্বামিজীর শিক্ষা-দীক্ষায়ই যে জেনেছেন নিবেদিতা,—আত্মা অমর—আত্মা অবিনশ্বর!

তা'ছাড়া, নিবেদিতা যে সব ছেড়ে স্বামিজীর স্নেহের আকর্ষণেই এসেছিলেন ভারতে! স্বামিজীর মধ্য দিয়েই তিনি পেয়েছিলেন ভারতকে,—একান্তভাবেই মিশিয়ে দিয়েছিলেন আপন সত্তা ভারতীয় সত্তার সঙ্গে।···সেই স্বামিজী! নিবেদিতার মনের মণি-কোঠায় ব'সে আছেন যিনি দেবতাররূপে—পিতার অনন্ত স্নেহ নিয়ে!···এতবড় প্রিয়জনকে বিদায় দিতে প্রাণ চায় কার? তাই ধীরে ধীরে ব্যজন করতেই লাগলেন তিনি তাঁর পিতৃ-প্রতিম আচার্য্যদেবকে!

*　　*　　*　　*

বেলা দু'টোর সময় স্বামিজীর পুণ্যদেহ গৈরিক বাসে আবৃত ক'রে পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করা হ'লো। একে একে সকলে প্রণাম করলেন সেই বিগত-আত্মা মহাপুরুষের চরণে।—তারপর শঙ্খঘণ্টা-নাদে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হ'লো গঙ্গাতীরে;—স্বামিজীরই নির্দ্দেশিত স্থানে অন্ত্যেষ্টির জন্যে।······

কাল নিরবধি—কাল বিপুল,—কাল অনন্ত ;—কালে কালে কত আসছে,—আবার লয় পাচ্ছে কালের বুকেই! কোথায় কা'র চিহ্ন থাকে ?—অসীম-অনন্ত-মহাসমুদ্রের বুকে একটি বুদ্বুদের মতই মিশে যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে!

কিন্তু তারই মধ্যে আসেন—ক্বচিৎ কোন কোন ক্ষণজন্মা বিরাট পুরুষ,—কালের সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে—অমর হয়ে যান তাঁরা মর-জগতে! দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে—ভাস্বর হ'য়ে থাকে তাঁদের স্মৃতি—অনন্তকালের বুকে। মহাকাল তাঁদের কাছে নতি স্বীকার করে,—মৃত্যুও তাঁদের স্পর্শ ক'রে মৃত্যুহীন হ'য়ে যায়! তাঁদের প্রাণের 'অমৃত-পরশে' লক্ষ লক্ষ প্রাণহীন বুকে জেগে ওঠে প্রাণের সাড়া!···

স্বামিজী তাঁদেরই একজন!—বিশ্বের ভাণ্ডারে অবদান তাঁর অসীম—অফুরন্ত! কি দিয়ে গেছেন তিনি—কত দিয়ে গেছেন—এখনও তার সম্যক হিসাব হয়নি,—কবে-কতকালে হবে,—মানব-সমাজ কোনদিন সে হিসাব কর্‌তে পারবে কি না,—তাই বা কে জানে! নিত্যধাম থেকে—এসেছিলেন কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ,—আপনার কর্ম্মশেষে আবার ফিরে গেছেন—স্ব-স্থানে। বিশ্বের কল্যাণে তাঁকে কর্ম্ম-জগতে আবদ্ধ রাখবার জন্যেই এতদিন বুঝি সে ধামের চাবি ছিল—তাঁর শক্তির উৎস, জীবনের কর্ণধার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের হাতে।—প্রয়োজনের শেষে সেই চাবি দিয়ে দ্বার কি আজ খুলে দিলেন ঠাকুর?···কর্ম্মক্লান্ত সন্তানকে টেনে নিলেন কি আপন স্নেহ-শীতল প্রশান্ত বক্ষে?···

—০—

এই পুস্তক-রচনায় সাধারণতঃ যে সকল পুস্তক থেকে অল্প-বিস্তর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

স্বামী বিবেকানন্দ (১ম ও ২য় ভাগ)—শ্রীপ্রমথনাথ বসু

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ (৫ম ভাগ)—স্বামী সারদানন্দ

The Master as I Saw Him.—মদীয় আচার্য দেব,—যেমনটি তাঁহাকে দেখিয়াছি : এবং স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা

ও

স্বামিজীর কিছু কিছু রচনা।